প্রকাশক
প্রশান্ত ভট্টাচার্য
সারস্বত লাইব্রেরী
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
জ্যৈষ্ঠ ১৩৬১

প্রচ্ছদশিল্পী
চারু খান

মুদ্রাকর
বিভাস ভট্টাচার্য
সারস্বত প্রেস
২০৬ বিধান সরণী
কলিকাতা ৬

সূচি :

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা ঃ সমালোচনার প্রেক্ষাপট

১

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে সচেতন সাহিত্যজিজ্ঞাসার পরিচয় খুব বেশি নেই। সাহিত্যজিজ্ঞাসা সাহিত্যের আত্মসচেতনতারই অন্যতম প্রকাশ। সে দিক থেকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে আত্মসচেতনতার অভাব সুস্পষ্ট। গ্রামীণ এবং ধর্মভিত্তিক সাহিত্যে এই রকম ঘটাই বোধকরি স্বাভাবিক।

সুপ্রাচীন কালে যেমনই হোক না কেন, ক্লাসিক সংস্কৃত সাহিত্য বরাবরই বিদগ্ধ, নাগরিক এবং আত্মসচেতন সাহিত্য। সংস্কৃতে সাহিত্যচিন্তা সুপ্রচুর এবং সুসমৃদ্ধ। এ-ব্যাপারে অনাধুনিক বাংলাসাহিত্যের সঙ্গে সংস্কৃতসাহিত্যের কোনো মিল নেই।

সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্র ঐশ্বর্যশালী সন্দেহ নেই, কিন্তু কেন জানি না, একটু যেন একপেশে, একটু যেন অপূর্ণাঙ্গ। সংস্কৃতসাহিত্যের আত্মসচেতনতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাহিত্যের তত্ত্বজিজ্ঞাসার পথে অগ্রসর হয়েছে, সেই তত্ত্বের ব্যবহারিক প্রয়োগে তার বিশেষ আগ্রহ দেখা যায় না। অর্থাৎ সংস্কৃতে তত্ত্ব-মীমাংসা অনেক আছে, কিন্তু ব্যবহারিক সমালোচনা যৎসামান্য।

প্রাচীন বা মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যে সাহিত্যতত্ত্ব যা অল্প-স্বল্প আছে তা সম্পূর্ণভাবে সংস্কৃতের প্রভাবজাত অথবা অনুকরণজাত। সংস্কৃত থেকে ধার-করা সেই সব আপ্তবাক্যসমূহ বাংলাসাহিত্যের এক বিন্দু উপকার করে নি, ক্ষতি প্রচুর করেছে। ব্যবহারিক সমালোচনা সংস্কৃতেও না-থাকার মতো, বাংলাতেও নেই। থাকলে হয়তো তা ক্ষতিরই কারণ হ'তো।

সে যা-ই হোক, সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে না দেখলে সাহিত্যচিন্তা বা সাহিত্যজিজ্ঞাসার উন্মেষ ঘটে না—সাহিত্যতত্ত্বও জন্মায় না, ব্যবহারিক

সমালোচনাও জন্মায় না। সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে দেখার প্রথম উল্লেখযোগ্য নিদর্শন বাংলাসাহিত্যে বোধকরি ভারতচন্দ্র। কিন্তু ব্যাপারটা আসলে আধুনিক কালের। কী সাহিত্যতত্ত্ব, কী ব্যবহারিক সমালোচনা, বাংলা-সাহিত্যে দু'য়েরই আবির্ভাব আধুনিক কালের ঘটনা। এর সূচনা অষ্টাদশ শতকে হলেও এর পরিণতি ঘটেছে উনবিংশ ও বিংশ শতকে। বলা বাহুল্য, পাশ্চাত্য শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে সংযোগের ফলেই তা ত্বরান্বিত হয়েছে।

২

সাহিত্যচিন্তা কথাটার অর্থের পরিধি ব্যাপক, তার সীমানাও অল্পবিস্তর অনির্দিষ্ট। সেখানে সাহিত্যের তত্ত্ব ও প্রয়োগকে পৃথক্ করা অসম্ভব নয়, এমন কিছু অসঙ্গতও নয়। কিন্তু সাহিত্যসমালোচনা ব্যাপারটা অপেক্ষাকৃত বিশিষ্ট ও নির্দিষ্ট। সেখানে তত্ত্ব ও প্রয়োগকে পৃথক্ করা যায় না। প্রয়োগ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন যে সাহিত্যতত্ত্ব, তা নিছক আপ্তবাক্য। অন্যদিকে, তত্ত্ব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন যে সাহিত্য-সমালোচনা, তা অর্থহীন ভাবোচ্ছ্বাস—অনধিকারীর প্রলাপোক্তি।

বস্তুত, সাহিত্যসমালোচনার দুই দিক। একটি তত্ত্বের, একটি প্রয়োগের। দুই দিকের দুই রূপ। তত্ত্বের দিকের রূপটিকে বলি সাহিত্যতত্ত্ব। অর্থের যৎসামান্য ইতরবিশেষকে অগ্রাহ্য করলে তাকে ইংরেজি ক'রে পোয়েটিক্স্ও বলতে পারি, থিয়োরি অব লিটারেচারও বলতে পারি, এমনকি ফিলসফি অব লিটারেচার বা সাহিত্যদর্শনও বলতে পারি। সাহিত্য যেমন শিল্পসাধারণের একটি শাখা, সাহিত্যতত্ত্বকেও তেমনি শিল্পতত্ত্বের একটি শাখা হিসাবে গণ্য করা যায়। অপর পক্ষে, প্রয়োগের দিকের রূপটিকে বলতে পারি ব্যবহারিক সমালোচনা, ইংরেজিতে যাকে বলে প্র্যাক্টিক্যাল ক্রিটিসিজ্‌ম। অনেক সময় সমালোচনা বলতে কেবল ব্যবহারিক সমালোচনাকে বোঝানো হয়ে থাকে। সে হিসেবে সমালোচনা কথাটি দ্ব্যর্থবোধক। বিস্তৃত অর্থে সমালোচনা হ'লো সাহিত্যতত্ত্ব, সমালোচনাতত্ত্ব এবং ব্যবহারিক সমালোচনার সমগ্রতা।

সংকীর্ণ অর্থে সমালোচনা কেবলই ব্যবহারিক সমালোচনা। কিন্তু বিস্তৃত অর্থেই ধরি আর সংকীর্ণ অর্থেই ধরি, সাহিত্যতত্ত্বই ধরি আর ব্যবহারিক সমালোচনাকেই ধরি, সমস্ত ক্ষেত্রেই একেবারে গোড়াকার শর্ত হ'লো সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে দেখা, সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে ভালবাসা।

কিন্তু ঠিক কোন্ রকম ভাবে দেখলে তাকে বলা যাবে সাহিত্য হিসেবে দেখা? সাহিত্যপ্রেমিকের সহজ বুদ্ধির কাছে প্রশ্নটা কঠিন নয়। কেননা সে-দেখা সাহিত্যপ্রেমিকেরই দেখা। সে-দেখা ছাত্রের দেখা নয়, শিক্ষকের দেখা নয়, পণ্ডিতের দেখা নয়, প্রচারকের দেখা নয়, প্রকাশকের দেখা নয়, সাহিত্যব্যবসায়ীর দেখা নয়, সাহিত্যরসিক পাঠকের দেখা, বলতে পারি খাঁটি পাঠকের দেখা।

পাঠকের কাছে সাহিত্যের প্রথম এবং প্রধান পরিচয় এই যে তা আনন্দকর। আনন্দ ছাড়াও সাহিত্য আরও অনেক কিছু দেয়, কিন্তু আনন্দটাই অব্যবহিত, পাঠকের কাছে আনন্দটাই প্রথম কথা এবং সব থেকে বড়ো কথা। সাহিত্যের এই আনন্দকরতার দিকটিকে মুখ্য ক'রে দেখাটাই হচ্ছে সাহিত্যকে সাহিত্য হিসেবে দেখা। এই দেখাই খাঁটি পাঠকের দৃষ্টি দিয়ে দেখা। এই দেখাই সমালোচকের দেখা। এইটেই অবশ্য সব নয়, কিন্তু এইটেই সমালোচকের যোগ্যতার ন্যূনতম শর্ত। সাহিত্যসমালোচক প্রথমত এবং প্রধানত খাঁটি পাঠক—প্রখরভাবে সাহিত্যসচেতন পাঠক, সংবেদনশীল, রসগ্রাহী, বিচারশীল পাঠক। শুধু তা-ই নয়, সংস্কৃতিবান্ এবং সংস্কৃতিসচেতন পাঠক।

একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে। খাঁটি পাঠক, পাঠকত্বই যার তন্মাত্র, আর কিছুই নয় কেবলই পাঠক, এমন বস্তু কোথাও নেই। এ হ'লো একটা অবচ্ছিন্ন তত্ত্ব, একটা কাল্পনিক আদর্শ, বাস্তব ক্ষেত্রে তাকে পাওয়া যাবে না। কোনো পাঠকই কেবল পাঠক নয়, সব পাঠকই রক্ত-মাংসের মানুষ, মানুষ হিসেবে সব পাঠকই সামাজিক জীব, মানুষ হিসেবে সব পাঠকই মানবেতিহাসের অংশ। বাস্তব পরিবেশের সঙ্গে, দেশকালের সঙ্গে, সভ্যতা ও সংস্কৃতিপ্রবাহের সঙ্গে অসংখ্য সম্পর্কজালে সব মানুষই আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। কোনো অবস্থাতেই মানুষ এই সব সম্পর্কজালের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে পারে না, রসাস্বাদনের মুহূর্তেও নয়।

ক্লাইভ বেল্ প্রমুখ ফর্মবাদীরা অবশ্য বলে থাকেন যে, শিল্পসম্ভোগ সাহিত্যসম্ভোগের ক্ষেত্রে আমরা আমাদের বাস্তব জীবন থেকে, মানবিক সম্পর্কজাল থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে একেবারে অসঙ্গ অবস্থায় গিয়ে দাঁড়াই। সেই অসঙ্গ সম্ভোগই নাকি বিশুদ্ধ সম্ভোগ। কথাটা শুনতে ভালই, কিন্তু মুশ্‌কিল এই যে, কোনো অসঙ্গ অবস্থারই খবর আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সমালোচকের পক্ষে তার স্মৃতি বহন ক'রে নিয়ে আসাও সম্ভব নয়।

সমালোচক অর্থাৎ সংস্কৃতি-সচেতন পাঠক নিশ্চয়ই নিঃসঙ্গ পাঠক নন। বিশুদ্ধ সম্ভোগের সেই তথাকথিত অনির্বচনীয় ক্ষণে কী ঘটে জানি না, তেমন অনির্বচনীয় ক্ষণ আদৌ আছে কি না—জীবনসম্পর্ক-বিচ্ছিন্ন চৈতন্য আদৌ সম্ভব কি না জানি না, কিন্তু সম্ভোগের যে-সব স্তর সম্পর্কে আমরা সচেতন, যে-সব স্তর সম্পর্কে আমরা কিছু বলতে বা লিখতে পারি, সে-সব স্তরে আমরা জীবনকে বেশ নিবিড়ভাবেই স্পর্শ ক'রে থাকি। সেই হিসেবে সব সচেতন পাঠকই জীবনপ্রবাহমধ্যগত পাঠক, কোনো পাঠকই বৃন্তহীন নিরালম্ব সত্তা নয়।

সাহিত্য অসংখ্য দিক থেকে মানুষের চিত্তকে, মানুষের জীবনকে স্পর্শ করে। মানুষের জীবনও তেমনি অসংখ্য দিক থেকে সাহিত্যকে স্পর্শ ক'রে থাকে—মানুষের চিত্ত সাহিত্যকে একই সঙ্গে বহুবিধ দিক থেকে দেখতে পারে, গ্রহণ করতে পারে। সমস্ত দিককে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে, সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে কেবলমাত্র সাহিত্যের আনন্দকরতার দিকটিই দেখবো, কার্যক্ষেত্রে এটা মানুষ পারে না। বাস্তবজীবনে মানুষের কোনো আনন্দই তেমন কেবল-আনন্দ হতে পারে কি না সে প্রশ্ন না-হয় এখানে না-ই তুললাম। কিন্তু এ-কথা তো মানতেই হবে যে, মানুষের রুচির মধ্যে, আকাঙ্ক্ষার মধ্যে, মানুষের আনন্দ উপভোগ করার ক্ষমতার মধ্যে সমাজ সংসারের দান, সভ্যতা-সংস্কৃতির দান সব সময় মিশে থাকে। এগুলিকে বাদ দিতে গেলে মানুষ আর মানুষই থাকে না। বিশুদ্ধ পাঠক অর্থ নিঃসম্পর্কিত অবাস্তব পাঠক নয়, বিশুদ্ধ পাঠক অর্থ সেই রকম পাঠক সাহিত্যের আনন্দ-করতার দিকটি যার কাছে মুখ্য, অন্যান্য সমস্ত দিক যার কাছে গৌণ। যে

সাহিত্যপাঠে আনন্দই প্রত্যক্ষ এবং অব্যবহিত সত্য—সে আনন্দের মধ্যে যতো বিচিত্র উপাদানই মিশে থাকুক না কেন—অন্য সমস্ত-কিছু পরোক্ষ, সেই সাহিত্যপাঠই খাঁটি পাঠকের সাহিত্যপাঠ। এই সাহিত্যপাঠ থেকেই সমালোচকের কাজের আরম্ভ।

এ-কাজের একটা অপরিহার্য প্রস্তুতিভূমি আছে। সাহিত্যতত্ত্ব সেই প্রস্তুতি ভূমি। সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে সমালোচক দর্শনের এমন প্রান্তদেশে এসে দাঁড়ান যে, তখন তাঁকে খাঁটি পাঠক বলা কঠিন। তখন তাঁর ভূমিকা যুগপৎ পাঠক ও দার্শনিকের ভূমিকা। কিন্তু ব্যবহারিক সমালোচনার ক্ষেত্রে পাঠক-ভূমিকাই সমালোচকের একমাত্র ভূমিকা।

লোকপ্রচলন যে সাধারণত সাহিত্যতত্ত্বকে সমালোচনা বলে মানতে কুণ্ঠিত হয়, লোকপ্রচলন যে কেবল ব্যবহারিক সমালোচনাকেই সমালোচনা বলে' গণ্য করে, তা খুব অসঙ্গত বা অযথার্থ নয়। ব্যবহারিক সমালোচনা সাহিত্যবস্তুর সঙ্গে যেমন নিবিড়ভাবে, যেমন প্রত্যক্ষভাবে এবং যেমন জীবন্তভাবে যুক্ত, সাহিত্যতত্ত্ব তা নয়।

বর্তমান আলোচনায় আমরাও লোকপ্রচলনকে—অন্তত আংশিকভাবে স্বীকার করে নেবো। ব্যবহারিক সমালোচনার পূর্বশর্ত হিসেবে, ব্যবহারিক সমালোচনার মানদণ্ডের সরবরাহকারী হিসেবে সাহিত্যতত্ত্বের গুরুত্বকে আমরা অবশ্যই স্বীকার করবো, কিন্তু যথার্থ সাহিত্যসমালোচনার প্রসঙ্গক্ষেত্রে ব্যবহারিক সমালোচনার উপরেই আমরা সমধিক গুরুত্ব দেবো। সমালোচনা কথাটাকে আমরা সাধারণভাবে কেবল ব্যবহারিক সমালোচনার ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করবো।

৩

যদি এ-কথা মানি যে, সাহিত্য তার পাঠককে একই সঙ্গে নানাদিক থেকে নানা ভাবে স্পর্শ করে, তাহলে এ-ও মানতে হবে যে, আনন্দকে মুখ্য স্থান দিলেও, আরো নানান ভাব, নানান ক্রিয়া তার সঙ্গে প্রায় অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ, তাহলে

এ-ও মানতে হবে যে, খাঁটি সমালোচনা-কর্মের সঙ্গে আরো এমন সব অনেক কর্ম এসে যুক্ত হয়ে পড়ে, যারা সমালোচনাকে সাহায্য করে, কিন্তু নিজেরা সমালোচনা নয়। এবং সেই সঙ্গে আরো এমন সব অনেক কর্মও এসে যুক্ত হয়, যারা সমালোচনা তো নয়ই, সমালোচনাকে সাহায্যও করে না। অথচ এদের সমালোচনা থেকে বিচ্ছিন্ন করাও দুঃসাধ্য। এই কারণেই সমালোচনার সংজ্ঞা নির্ধারণ করা, সমালোচনার পরিধি কতদূর বিস্তৃত তা স্থির করা এত কঠিন। এই কারণেই, সমালোচনার কাজ কী, অথবা কী নয়, ঠিক কোনখানে গিয়ে সমালোচনার সীমানা শেষ হ'লো, কোন কাজটি সমালোচনার পক্ষে অনাবশ্যক, তা নিয়ে কোনো দুজন সমালোচকের সিদ্ধান্ত হুবহু এক নয়।

জটিলতার এক কারণ যেমন সমালোচনার সঙ্গে আনুষঙ্গিক কর্মের, পূর্বগামী ও অনুগামী কর্মের মিশ্রণ, জটিলতার তেমনি অপর এক কারণ হ'লো সমালোচনার বহুবিধতা। অথবা বলতে পারি, পাঠকের বা সমালোচকের দৃষ্টিকোণের বিভিন্নতা। কিন্তু কথাটাকে বোধকরি আর একটু খুলে বলা দরকার।

কী সমালোচনা আর কী সমালোচনা নয়, তা বিচার করবার একমাত্র মানদণ্ড হচ্ছে এইটে নির্ধারণ করা যে, কোন্ আলোচনাতে সাহিত্যের ,আনন্দকরতাকেই সাহিত্যপাঠের কেন্দ্রস্থ সত্য বলে গ্রহণ করা হয়েছে, আর কোন্ আলোচনাতে বা তা হয় নি। হিসেবটা কিন্তু সহজ নয়। যেহেতু আনন্দ ব্যাপারটার মধ্যেই সমাজ সংসার সংস্কৃতি সব এসে অনুপ্রবিষ্ট হয়, সেই হেতু নিছক আনন্দজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রেও কাকে যে রাখবো আর কাকে যে বাদ দেবো তা নির্ণয় করা অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু এই দুরূহতার বাধাকে অতিক্রম করা প্রত্যেক সমালোচকের কর্তব্যের অপরিহার্য অঙ্গ। অপর পক্ষে, সমালোচকের দৃষ্টিকোণের বহুত্বের ফলে যে জটিলতা, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের ব্যাপার। মুশকিল এই যে, অনেক সময় কার্যক্ষেত্রে এই জটিলতা এমনভাবে পূর্বোক্ত দুরূহতার সঙ্গী হয়ে দাঁড়ায় যে, উভয়কে পৃথক্ করা যায় না।

সমালোচনার বহুবিধতার অর্থ যথার্থ সমালোচনার সঙ্গে বহুবিধ ভিন্ন

ধরনের ক্রিয়ার মিশ্রণ নয়, সমালোচনার বহুবিধতাকে মেনে নেওয়ার অর্থ হ'লো যথার্থ সমালোচনার গোত্রভেদকে স্বীকার করে নেওয়া। এই কথা স্বীকার করা যে, সমালোচনা নানান জাতের হতে পারে। তাদের মধ্যে একটা মৌল ঐক্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু চরিত্রে এবং চেহারায় ভিন্নতাও তাদের মধ্যে কিছু কম নয়।

যদি এ-কথা মানি যে, দেশকাল ও জীবনপরিবেশ আমাদের রসাস্বাদন-ক্ষমতার মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট থাকে, তাহ'লে এ-ও মানতে হবে যে, রসবস্তু হিসেবেই সাহিত্য তার পাঠকের মনে জটিল ও বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে এবং সেই প্রতিক্রিয়ার প্রত্যেকটিরই সমালোচনা বলে' গৃহীত হবার দাবি থাকতে পারে। আনন্দের পূর্বপট, আনন্দের পশ্চাৎপট, আনন্দের হেতু, আনন্দের ফল, প্রত্যেকটির সম্পর্কেই পাঠকের বক্তব্য থাকতে পারে। সাহিত্যকে আনন্দকর বলে জানাতে সমালোচকের কাজের আরম্ভ। কিন্তু তার শেষ কোথায়? বিশেষ একটি সাহিত্যবস্তু, সমালোচক তাকে আনন্দকর বলে' জানলেন, কিন্তু তারপর? তিনি কি সেই আনন্দকে আবার দ্বিতীয়বার অপর পাঠকের সামনে পরিবেশন করবেন? অথবা, তিনি কি হিসেব ক'রে, অনুসন্ধান ক'রে সেই আনন্দকরতার হেতু নির্ণয় করবেন? অথবা, তিনি কি সেই আনন্দকরতার পরিমাপ ও মূল্যবিচার করবেন? অথবা, তিনি কি পাঠক সাধারণের রসাস্বাদনের সম্ভাব্য বাধাগুলিকে দূর করতে চেষ্টা করবেন? অনেকেই হয়তো আপন আপন রুচি ও বুদ্ধি অনুযায়ী এর একটিকে রেখে অপর সব ক'টিকে বাতিল ক'রে দেবেন। কিন্তু যেহেতু এর প্রত্যেকটিই বিশুদ্ধ পাঠকের প্রতিক্রিয়া, এর কোনোটিকেই বর্জন করার কোনো যুক্তি নেই—এর প্রত্যেকটিই সমালোচনা, অথবা সমালোচনার অঙ্গ।

সাহিত্য যে পাঠকের মনে বহুবিধ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দিতে পারে, সাহিত্যের আনন্দকরতাকে ঘিরেও যে বহুবিধ প্রশ্ন, বহুবিধ সমস্যা থাকতে পারে, এইখানেই সমালোচনার বহুবিধতার উৎস। এইসব বহুবিধ কর্মের সমগ্রতাকে যেমন সমালোচনা বলতে পারি, এর যে-কোনো একটিকেও—যে-কোনো অংশবিশেষকেও পৃথক্‌ভাবে সমালোচনা বলতে পারি। সমালোচক-ভেদে

সাহিত্যবস্তুর সম্পর্কে আলোচনায় যে রূপভেদ ঘটে, এক-এক সমালোচকের কাছে সমালোচকের দায়িত্বের এক-একটা দিক যে বড়ো হয়ে ওঠে, অনেক সময় একই সমালোচকের কাছে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দায়িত্বের ভিন্ন ভিন্ন দিক বড়ো বলে মনে হয়, এটা অস্বাভাবিকও নয়, অসাহিত্যিকও নয়। আমরা যাকে বলি types of Criticism—বিভিন্ন গোত্রের সমালোচনা, সমালোচনার এই গোত্রভেদের মূল এইখানে।

সমালোচনার গোত্রভেদ নিয়ে বিভ্রান্তির কোনো কারণ দেখি না। প্রচলিত গোত্রগুলির কোনোটিই বর্জনীয় নয়, কিন্তু কোনো একটির মধ্যেই সমালোচনার সমস্ত দিকগুলি নিঃশেষিত হয়ে যায় না, এর কোনো একটিকেই সমালোচনার সমগ্রতা বলে' দাবি করা চলে না। যদিও আলাদা-আলাদাভাবে অনেক সমালোচনাতাত্ত্বিক এবং অনেক সমালোচক এই রকম গোঁড়া এবং একদেশ-দর্শী দাবি তুলে থাকেন, কিন্তু সাহিত্যের ইতিহাস এই রকম সংকীর্ণ দাবিকে কখনোই সমর্থন করে না। আমরা যাকে সাধারণভাবে সমালোচনার ইতিহাস বলে জানি, সেখানেও এই ধরনের সংকীর্ণ দাবির সমর্থন মিলবে না। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু এই সংকীর্ণতাই সমালোচনার স্বরূপ-নির্ণয়ে সব থেকে বড়ো বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

৪

রসগ্রাহী, বিচারশীল, সংস্কৃতিসচেতন, বিষয়নিষ্ঠ, তথ্যজ্ঞ—এবং প্রকাশক্ষম পাঠকের সাহিত্যপাঠের প্রতিক্রিয়া যখন সাহিত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে, তখন তাকেই আমরা সাহিত্যসমালোচনা বলে' অভিহিত ক'রে থাকি। বলা বাহুল্য, এটা সমালোচনার সংজ্ঞা নয়, নিতান্তই কাজচলা-গোছের পরিচয়। এ-পরিচয়ের অতি-ব্যাপ্তি দোষকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু এর সুবিধের দিক হ'লো এই যে, এর মধ্যে সমালোচনার কোনো গোত্রেরই স্থানাভাব হবে না।

খুব মোটাভাবে দেখলে বলা যায়, সমালোচনার দুটি গোত্র। এক, তথ্যকেন্দ্রিক সমালোচনা। দুই, মূল্য-কেন্দ্রিক সমালোচনা। এ রকম

ভাগের তাৎপর্য এই যে, এক জাতের সমালোচনা সমালোচ্য বিষয়ের তথ্য-পরিচয় ও তথ্যব্যাখ্যাতেই নিঃশেষিত এবং অপর জাতের সমালোচনায় তথ্য অবহেলিত, তার একমাত্র লক্ষ্য মূল্যায়ন।

কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে এ রকম ভাগকে যুক্তিযুক্ত বলা চলে না। সমস্ত সমালোচনাতেই আনন্দমূল্য স্বীকৃত, তথ্যকেন্দ্রিক সমালোচনাতেও তাই। নিছক তথ্যপরিবেশন কোনো সমালোচনারই শেষ কথা নয়। অপর পক্ষে, এমন কোনো সমালোচনাই নেই যেখানে মূল্যায়ন শূন্যের উপর ঘটে, তথ্যের উপর ঘটে না। দুয়ের তফাৎটা আপেক্ষিক। সমালোচনায় তথ্য আর মূল্যকে কখনোই সম্পূর্ণ পৃথক্ করা চলে না।

আসল কথা সমালোচকের প্রবৃত্তি ও প্রবণতার আপেক্ষিক গুরুত্ব। যেহেতু তথ্যের জন্য তথ্য সমালোচনায় কখনোই আদৃত নয়, সেই হেতু কোনো গোত্রকেই নিছক তথ্যকেন্দ্রিক বলে' চিহ্নিত করা সঙ্গত নয়। এই সব বিবেচনায় সমালোচনা-ব্যাপারটিকে দুই গোত্রে ভাগ না ক'রে তিন গোত্রে ভাগ করাই বোধকরি যুক্তিসঙ্গত হবে।—এক, ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা; দুই, রস-পরিচয়মূলক সমালোচনা; তিন, বিচারমূলক সমালোচনা।

একটু আগে সমালোচনার পরিচয় দিতে গিয়ে সমালোচকের যে-সব অপরিহার্য গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তার মধ্যেই আমরা সমালোচনার ত্রিবিধ গোত্রের ইঙ্গিত পেতে পারি। কোনো কোনো গুণ রস-পরিচয়ের, কোনো কোনোটা ব্যাখ্যার, কোনো কোনোটা বিচারের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে। সমালোচককে রসগ্রাহী পাঠক হতে হবে—এই রসগ্রাহিতাই ক্ষেত্রবিশেষে সমালোচককে সমালোচ্য বিষয়ের রসপরিচয়ের দিকে টেনে নিয়ে আসে। সমালোচককে বিচারশীল ও সংস্কৃতি-সচেতন হতে হবে—এই বিচারশীলতা, সাংস্কৃতিক মূল্য বিষয়ে এই সচেতনতাই সমালোচককে তুলনামূলক মূল্যবিচারে প্রবৃত্ত করে। সমালোচককে বিষয়নিষ্ঠ ও তথ্যজ্ঞ হতে হবে, সমালোচ্য বিষয়ের স্থূল সূক্ষ্ম সমস্যাবলীর সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। এই মূলধনের প্রেরণাই সমালোচককে ব্যাখ্যা ও তথ্যপরিচয়ের বিষয়ে উৎসুক ক'রে তোলে। সর্বশেষে সমালোচকের প্রকাশক্ষমতার কথা, সমালোচনার সুসাহিত্য হয়ে ওঠার কথা বলা

হয়েছে। কথাটা সব গোত্রের সমালোচনার পক্ষেই সমানভাবে প্রযোজ্য সন্দেহ নেই। তবু অনেক সময় সমালোচকের এই স্বাধীন প্রকাশ-প্রেরণাই সৃজনশীল সমালোচনার জন্ম দিয়ে থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৃজনশীল সমালোচনাকে আমরা রসপরিচয়মূলক সমালোচনার গোত্রেই ফেলতে পারি।

একটা কথা এখানে বলে' রাখা প্রয়োজন। সমালোচনার এই ত্রিবিধ গোত্রবিভাগের ভিত্তি হ'লো সমালোচকের মৌল প্রবৃত্তি, তাঁর ক্রিয়ার বিশিষ্টতা। সাহিত্যবস্তুর কোন্ দিকটি সমালোচককে উদ্‌বুদ্ধ করেছে, এবং সেই দিকটিকে নিয়ে সমালোচক কী করতে চান, সেই বিবেচনার দ্বারাই এই ভাগের মানদণ্ড পরিচালিত হয়েছে।

বলা বাহুল্য, এ ছাড়াও আরো অনেক রকমের ভাগ হতে পারে। যেমন, সমালোচনার অন্তর্নিহিত সাহিত্যতত্ত্ব বা সাহিত্য-আদর্শ দিয়ে ভাগ। এই রকম ভাগের ভিত্তিতেই আমরা রোমান্টিক সমালোচনা, ক্লাসিকপন্থী সমালোচনা ইত্যাদি জাতিভেদের উল্লেখ করে' থাকি। সমালোচকের কাজের বহিরঙ্গকে নিয়ে অথবা সমালোচকের আলোচনাভূমির বিশেষত্বকে নিয়ে, আলোচনার উপাদান-উপকরণকে নিয়েও ভাগ হতে পারে। যেমন, ঐতিহাসিক সমালোচনা, মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা, নৃতত্ত্বভিত্তিক সমালোচনা, সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা ইত্যাদি। কিছু ভাগ আছে যাদের ভিত্তি পাঁচমিশালী ধরনের। যেমন, তুলনামূলক সমালোচনা। অথবা নিউ ক্রিটিকদের নব্য-সমালোচনা।

কেউ কেউ আবার সাহিত্যসমালোচনাকে কবি-সমালোচকের শিল্পী-সমালোচকের সমালোচনা এবং অন্যদিকে পণ্ডিতী বা কলেজীয় বা এ্যাকাডেমিক সমালোচনা, এই দুই গোত্রে ভাগ করেছেন। প্রথমটিকে বলেছেন উদ্দীপিত সমালোচনা, উত্তেজিত সমালোচনা। আর দ্বিতীয়টিকে বলেছেন স্তিমিত সমালোচনা, সাবধানী সমালোচনা। বলা বাহুল্য, যে-মানদণ্ডের সাহায্যে এই গোত্রভাগ সংসাধিত হয়েছে, তা সমালোচনাক্রিয়ার কোনো অন্তরঙ্গ পরিচয়কে বহন করে না। কবি-সমালোচকের সমালোচনা যে সাধারণভাবে উদ্দীপিত সমালোচনা, নতুন পথের সন্ধানী দুঃসাহসী সমালোচনা, এবং

কোনো কোনো সময় অলজ্জিতভাবে পক্ষপাতদুষ্ট সমালোচনা, অপরপক্ষে পণ্ডিতী বা এ্যাকাডেমিক সমালোচনা যে অধিকাংশ সময়ই স্তিমিত, হিসেবী, অতি-সতর্ক, এবং অনেক সময় স্বাধীন মতপ্রকাশে কুণ্ঠিত সিদ্ধান্ত-ভীরু সমালোচনা, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সমালোচনাক্রিয়ার পক্ষে এ পার্থক্য বহিরঙ্গগত। মেজাজের এই প্রবল পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে চরিত্রগত ঐক্য থাকা অসম্ভব নয়।

আর-এক রকমের সমালোচনার কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়। সাধারণত তা সাময়িক পত্রের পুস্তকসমালোচনার সঙ্গে—ইংরেজিতে যাকে ঈষৎ নিন্দার সুরে 'বুক রিভিউ' বলা হয়, তার সঙ্গে যুক্ত। এর একটা অপেক্ষাকৃত উচ্চাঙ্গের রূপও আছে। তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমালোচনার পদ্ধতির মধ্যে, এবং অনেক সময় রসপরিচয়মূলক রূপ-পরিচয়মূলক সমালোচনার মধ্যে তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সাধারণত তাকে ডেস্‌ক্রিপ্‌টিভ ক্রিটিসিজ্‌ম বা বর্ণনাত্মক সমালোচনা বলা হয়। তুচ্ছার্থে 'বুক রিভিউ' রূপে তা সমালোচ্য বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বা তরলীকৃত বর্ণনা, নিছক প্যারাফ্রেজ। এখানে কাহিনীর সরলীকরণ, কাহিনীর পুনরাবৃত্তি, এইটেই লক্ষ্যবস্তু। অন্যত্র তা নয়। রূপের বা রসের পরিচয় যেখানে লক্ষ্য, সেখানেও বিষয়-বর্ণনার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বর্ণনা সেখানে উপায় বা পদ্ধতিমাত্র। এরকম সমালোচনাকে তুচ্ছ করার হেতু নেই। এরকম বর্ণনার ইঙ্গিত আমরা এ্যারিস্টট্‌লের পোয়েটিক্‌সেই পেতে পারি।

বাংলা সমালোচনায় বিষয়-বর্ণনা একটি অন্যতম প্রধান অবলম্বন। বিশেষ ক'রে উপন্যাস বা গল্প যেখানে সমালোচ্য বিষয়, সেখানে বিষয়-বর্ণন প্রায় অপরিহার্য, অন্তত পদ্ধতি বা সহায়ক প্রক্রিয়া হিসেবে। এ পদ্ধতির সাহায্য বঙ্কিমচন্দ্রও নিয়েছেন, রবীন্দ্রনাথও নিয়েছেন, পরবর্তীরাও নিয়েছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিখ্যাত 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' এই পদ্ধতির প্রয়োগের একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সে যা-ই হোক, বর্ণনা যেখানে পদ্ধতিমাত্র, যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিতে', রবীন্দ্রনাথের 'রাজসিংহে' অথবা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-সমালোচনায়, সেখানে তাকে বর্ণনামূলক সমালোচনা বলার কোনো অর্থ

হয় না। কেননা এর প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে, সমালোচকের মূল লক্ষ্য ব্যাখ্যা বা রসপরিচয় বা বিচার—অথবা তাদের সমন্বয়। আর যেখানে বর্ণনাই লক্ষ্য, কাহিনীর পুনরাবৃত্তিতেই আলোচনার শেষ, সেখানে তাকে সমালোচনা বলাই অর্থহীন। ব্যাখ্যা, রসপরিচয়, বিচার, সকলের ক্ষেত্রেই বর্ণনা অপরিহার্য অঙ্গ। কিন্তু নিছক বর্ণনা, যেমন অনেক সময় জনপ্রিয় সাময়িকপত্রের পুস্তক-সমালোচনা শীর্ষক অংশে ঘটে' থাকে, তা সচেতন পাঠকের সাহিত্যগত প্রতিক্রিয়ার যথার্থ প্রকাশ নয়। যদিও এই জাতীয় বস্তুই সমালোচনা নামে সব থেকে বেশি প্রচলিত, তা হলেও সমালোচনার ইতিহাস একে সুলভ সাহিত্যিক সাংবাদিকতারূপেই গণ্য ক'রে থাকে।

সাময়িকপত্রের পুস্তক-সমালোচনা মাত্রই যে সুলভ সাহিত্যিক সাংবাদিকতা, এমন মনে করলে ভুল হবে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত সমালোচনা-প্রবন্ধের অধিকাংশই বঙ্গদর্শন পত্রিকায় পুস্তক-সমালোচনা হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'রাজসিংহ' কিংবা 'কৃষ্ণচরিত্র' সাধনা পত্রিকার পুস্তক-সমালোচনা। শুধু এই দুটি নয়, রবীন্দ্রনাথের আধুনিক সাহিত্য-গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধই সাধনায় পুস্তক-সমালোচনা রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে। পরিচয় পত্রিকায় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বিখ্যাত সমালোচনা-প্রবন্ধগুলি সাময়িক পত্রের পুস্তক-সমালোচনা হয়েও আধুনিক বাংলা সাহিত্যে উন্নত মানের সমালোচনার উৎকৃষ্ট আদর্শস্থল। কিন্তু যেখানেই পুস্তক-সমালোচনা যথার্থ সমালোচনা, সেখানেই দেখতে পাবো, বিষয়বর্ণনা তার উপায় মাত্র, আদৌ লক্ষ্য নয়। অর্থাৎ বর্ণনা তার মূল নয়। সেই কারণে, কী উচ্চাঙ্গের কী নিম্নাঙ্গের, কোনো ক্ষেত্রেই তথাকথিত বর্ণনা-মূলক সমালোচনাকে সাহিত্যসমালোচনার একটি স্বতন্ত্র গোত্র বলে' দাবি করা যায় না।

কেউ কেউ সমালোচনার গোত্রভেদের প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক সমালোচনার কথাও বলে' থাকেন, যেন তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমালোচনাও সাহিত্য সমালোচনার একাধিক জাতির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট জাতি।

সহজেই মনে হতে পারে, দর্শনধর্মী সমালোচনা যদি থাকতে পারে, শিল্পধর্মী সমালোচনা যদি থাকতে পারে, তাহলে বিজ্ঞানধর্মী সমালোচনাই বা থাকতে পারবে না কেন? প্রশ্নটা অসঙ্গত নয়, কিন্তু তার দৌড় খুব বেশি

দূর নয়। কেননা, মনে রাখতে হবে, কোনো বস্তুরই স্বধর্ম একাধিক নয়। মনে রাখতে হবে যে, একমাত্র দর্শনই খাঁটি দর্শনধর্মী, একমাত্র শিল্পই খাঁটি শিল্পধর্মী। যা খাঁটি সমালোচনা তা সব সময়ই সমালোচনাধর্মী, অপর কোনো ধর্মী নয়। তথাকথিত দর্শনধর্মী সমালোচনা যদি খাঁটি সমালোচনা হয়, বুঝতে হবে, সে দর্শনের সাহায্য নিয়েছে, তার বেশি নয়। সমালোচনা যেহেতু মূলত সাহিত্য, সেই কারণে কিছু শিল্পধর্ম সব সমালোচনাতে আছে, থাকতে বাধ্য। শিল্পধর্মেরই যদি একাধিপত্য ঘটে—যেমন কোনো-কোনো সময় কবি-সমালোচকদের ক্ষেত্রে ঘটে থাকে, তখন তা স্বাধীন কবিতা বা স্বাধীন শিল্প, খাঁটি সমালোচনা নয়।

সমালোচনার পক্ষে বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া সম্ভব, খাঁটি বিজ্ঞানধর্মী হয়ে ওঠা কখনোই সম্ভব নয়। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের মধ্যে যে মৌলিক ভিন্নতা আছে, তা কখনো সম্পূর্ণ মিলিয়ে যেতে পারে না। সমালোচনা যদি সাহিত্য হয়, তাহলে তা কখনোই বিজ্ঞান হতে পারে না। সাহিত্য মূল্যের কারবারী, বিজ্ঞান মূল্যের কারবারী নয়। সমালোচনার আদি উদ্বেজনা আনন্দ-মূল্যে, সমালোচনার সুদূর লক্ষ্যও আনন্দ-মূল্য। মাঝখানে অনেকখানি ভূমি তথ্য-অনুসন্ধানের, তথ্য-ব্যাখ্যার। এইখানে সমালোচনা অনায়াসে বিজ্ঞানের পদ্ধতি-প্রকরণ নিজের কাজে ব্যবহার করতে পারে। করলে, তার দরুন সে সঙ্গে সঙ্গেই বিজ্ঞানধর্মী বা বৈজ্ঞানিক হয়ে ওঠে না।

অনেক ব্যাখ্যামূলক সমালোচনায়, রূপ-পরিচয়মূলক সমালোচনায় বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ-পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। স্বয়ং এ্যারিস্টট্‌ল এর প্রধান পথপ্রদর্শক। নৃতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব, মিথলজি বা পুরাণবিদ্যা—এই সব ক্ষেত্রের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান আধুনিক সমালোচনায়, বিশেষ ক'রে আধুনিক সমালোচনার ব্যাখ্যামূলক গোত্রে প্রায় যুগান্তর এনে দিয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত 'বৈজ্ঞানিক সমালোচনা' নামে কোনো নতুন গোত্রের সমালোচনার জন্মের সংবাদ পাওয়া যায় নি। সমালোচনাকে যাঁরা বিজ্ঞান বলে দাবি করেন, দেখা যাবে তাঁদের অধিকাংশই সিদ্ধান্তকুণ্ঠ, মূল্যায়ন-ভীরু, আত্মরক্ষা-প্রবণ কলেজীয় পণ্ডিত।

অনেকে মার্ক্‌স্‌বাদী সমালোচনাকেও সাহিত্যসমালোচনার স্বতন্ত্র একটি

গোত্র বলে' মনে করেন। মার্ক্‌স্‌বাদ একটি সামগ্রিক জীবনদর্শন। সাহিত্যিক যদি মার্ক্‌স্‌বাদী হন, তাহলে তার সাহিত্যও মার্ক্‌স্‌বাদী হবে। কিন্তু তা সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট জাতিতে পরিণত হবে না। তেমনি সমালোচক যদি মার্ক্‌স্‌বাদী হন, তাহলে তাঁর সাহিত্য-সমালোচনায় উক্ত জীবনদর্শনের ছাপ অবশ্যই পড়বে। মার্ক্‌স্‌বাদী সাহিত্য-আদর্শ মার্ক্‌স্‌বাদী ডায়লেকৃটিক্‌সের সঙ্গে—তার শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত। সেখানে অপর সমালোচকদের সঙ্গে মার্ক্‌স্‌বাদী সমালোচকের মতের মিল হবে না। এই আদর্শ মার্ক্‌স্‌বাদী সমালোচককে সাহিত্য-বিশেষের সম্পর্কে যে-বিশেষ ধরনের সিদ্ধান্তের দিকে নিয়ে যাবে, সে-সিদ্ধান্ত অপর-কোনো সমালোচকেরই মনঃপূত হবে না। কিন্তু সাহিত্য-আদর্শের ভিন্নতা অথবা সিদ্ধান্তের ভিন্নতা আর সমালোচনা-ক্রিয়ার ভিন্নতা এক নয়। ক্রিয়ার প্রেরণা, প্রবৃত্তি ও চরিত্র যদি অভিন্ন হয়, তাহলে তাকে আলাদা গোত্রের বস্তু বলে' দাবি করা যায় না। মার্ক্‌স্‌বাদী সমালোচক সাহিত্যসমালোচনার কালে হয় ব্যাখ্যা করেন, না-হয় বিচার করেন, না-হয় রসপরিচয় দেন, অথবা এদেরই দুই বা তিনের মিশ্রিত একটা-কিছু পরিবেশন করেন। অপর সমালোচকেরাও তাই ক'রে থাকেন।

মার্ক্‌স্‌বাদী সমালোচনা নামটা মোটেই অযৌক্তিক বা অসার্থক নয়। কিন্তু তার পক্ষ হয়ে তার গোত্রস্বাতন্ত্র্যের দাবিটা অযৌক্তিক। একথা সকলেরই সুবিদিত যে, মার্ক্‌স্‌বাদী সমালোচনা সব সময়ই বিচারমূলক সমালোচনা, এবং সে-বিচার ব্যাখ্যাকে আশ্রয় ক'রে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এ-ও সকলেরই সুবিদিত যে, মার্ক্‌স্‌বাদী ব্যাখ্যা আর সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা মূলত এক জাতেরই ব্যাখ্যা।

ইচ্ছা করলে আরো অনেক রকম গোত্রের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু এদের কোনোটিই সমালোচকের মৌল প্রবৃত্তির উপর, সমালোচনা-কর্মের মৌল বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি ক'রে দাঁড়ায় নি। এর কোনোটিই কোনোটির সঠিক পরিপূরক নয়। এর মধ্যে অনেক আছে যা একই ভূমিতে অবস্থিত,যারা একই পরিধির মধ্যে প্রায় একই ধরনের ক্রিয়া করে। ঐতিহাসিক সমালোচনা, মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা কি নৃতাত্ত্বিক সমালোচনা, তিনেরই

মূল প্রবৃত্তি তথ্যগত ব্যাখ্যা। এই ধরনের অধিকাংশ সমালোচনাই মূলত ব্যাখ্যা-গোত্রের।

ক্লাসিকপন্থী ও রোমাণ্টিক উভয় ধরনের সমালোচনার অন্তর্নিহিত সাহিত্য-আদর্শের পার্থক্য সুগভীর। ক্লাসিকপন্থী সমালোচকের দৃষ্টি প্রকৃতির অনুকরণের দিকে, জগৎ-সত্যের রূপায়ণের দিকে, এবং আনুষঙ্গিকভাবে সৌষ্ঠব, সংযম ও পরিমিতির দিকে, নিয়ম-শৃঙ্খলার দিকে। রচনার গঠন-পারিপাট্যের দিকে। রোমাণ্টিক সমালোচকের দৃষ্টি রচনার মধ্যে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশের দিকে। এবং আনুষঙ্গিকভাবে নয়, প্রায় সমান গুরুত্বপূর্ণ-ভাবেই, রচনায় আবেগের তীব্রতা, গভীরতা ও প্রবলতার দিকে; রচনার স্বতঃস্ফূর্ততা, আন্তরিকতা ও সজীবতার দিকে। ক্ষেত্রবিশেষে কল্পনার প্রসারের দিকে, কল্পনার বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বের দিকে। কিন্তু, সাহিত্য-আদর্শ পৃথক্ হলেও, সমালোচনাক্রিয়ার ক্ষেত্রে ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক উভয় আদর্শের সমালোচকেরই মূল প্রেরণা ও প্রবৃত্তি মোটামুটি অভিন্ন। উত্তর-কালের রোমাণ্টিক সমালোচকের মধ্যে কিছু ব্যতিক্রম পাওয়া যাবে, সেটুকু বাদ দিলে সাধারণভাবে সমস্ত রোমাণ্টিক সমালোচকই ক্লাসিকপন্থী সমালো-চকদের মতো প্রখরভাবে আদর্শ-সচেতন। অর্থাৎ কী ক্লাসিক কী রোমাণ্টিক, উভয় ধরনের সমালোচনার মধ্যেই ক্ষেত্রবিশেষে আমরা অকুণ্ঠ বিচারপ্রবণতার সাক্ষাৎ পাবো। সেই হিসেবে বলা যেতে পারে যে, সমালোচনাক্রিয়ার মৌল স্বভাবের দিক থেকে অনেক ক্ষেত্রেই এরা সগোত্র—সাহিত্য-আদর্শের দিক থেকে এরা যতোই পরস্পরের বিপরীত হোক না কেন।

ব্যাখ্যা, বিচার ও রসপরিচয়, প্রত্যেকেরই ভূমি স্বতন্ত্র, কিন্তু এরা এক মহাদেশেরই অন্তর্গত। এরা পরস্পরকে সাহায্য করে, পুষ্ট করে, পূর্ণ করে, কিন্তু কেউ কাউকে আবৃত বা অভিভূত করে না। এই তিনকে নিয়ে সমালো-চনার সমগ্রতা। কোনো সমালোচকই এই তিনের বাইরে যেতে পারেন না।

আদর্শ হয়তো এই তিনের সার্থক সমন্বয়, যদিও খুব কম সমালোচকের মধ্যেই তার সাক্ষাৎ মিলবে। প্রসঙ্গত এখানে এ্যারিস্টট্লের নাম করা যেতে পারে। এ্যারিস্টট্লের পোয়েটিক্স্ পুস্তিকাটিতে ব্যবহারিক সমালোচনার অবকাশ যৎসামান্য। তা হলেও, সমালোচনার ত্রিবিধ গোত্রের সংকেতই তার

মধ্যে পাওয়া যাবে। ব্যাখ্যা ও বিচার নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ নেই, রসপরিচয় নিয়ে হয়তো কিছু প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কিন্তু রূপ-পরিচয়কে যদি রস-পরিচয়ের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখি—তা না দেখবার কোনো হেতু নেই—তাহলে এ্যারিস্টট্‌লের ওই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটির মধ্যে আমরা ব্যাখ্যা, বিচার ও রসপরিচয় তিনেরই সাক্ষাৎ পাবো।

৫

সাহিত্যের ইতিহাস যদিও এই তিন গোত্রের কোনোটিকেই সমালোচনা হিসেবে সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত বলে' মেনে নেয় না, তা হলেও সমালোচনার ইতিহাস যে অল্পবিস্তর এদের আত্মকলহেরও ইতিহাস, তা অস্বীকার করা যায় না। সাধারণভাবে বলা যায়, সমালোচনায় বিচারপন্থীরা ব্যাখ্যা ও রসপরিচয়ের মূল্য স্বীকার করতে অনিচ্ছুক ; ব্যাখ্যাপন্থীরা মূল্যায়নকে বা রসপরিচয়কে স্বীকার করতে চান না ; রসপরিচয়বাদীরা ব্যাখ্যা বা মূল্যায়ন কোনোটাকেই যথার্থ সমালোচনা বলে' মানতে চান না।

এই কলহের অংশীদার হিসেবে নয়, বাইরে দাঁড়িয়ে এদের প্রত্যেকের বক্তব্যকে অনুধাবন করলে, এই তিন গোত্রের সম্পর্কেই আমাদের ধারণা স্পষ্টতর হবে বলে' আশা করা যায়।

প্রথমে বিচারমূলক সমালোচনার কথাই ধরা যাক, কেননা বিচারমূলক ধারাটি সমালোচনার ইতিহাসের প্রাচীনতম ধারা। বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম আদি সমালোচক প্লেটো প্রায় পুরোপুরিই বিচারপন্থী ছিলেন। সে-বিচার উগ্র আক্রমণাত্মক বিচার, মুখ্যত খণ্ডনাত্মক বিচার। প্লেটোর আক্রমণ কোনো রচনাবিশেষের বিরুদ্ধে নয়, সাহিত্য-ব্যাপারটারই বিরুদ্ধে, শিল্প-ব্যাপারটারই বিরুদ্ধে। প্লেটোর আপত্তি মেনে নিলে সমালোচনা-বিষয়টিই সম্পূর্ণ অর্থহীন হয়ে পড়ে।

প্লেটোর প্রধান অভিযোগগুলি মূলত তত্ত্বগত। এ্যারিস্টট্‌ল থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত বহু সাহিত্যতাত্ত্বিক এই অভিযোগগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা ক'রে আসছেন। সমস্ত অভিযোগের সন্তোষজনক উত্তর এখন পর্যন্ত

মিলেছে বলে' মনে হয় না। তাতে অবশ্য কার্যক্ষেত্রে শিল্প বা সাহিত্যের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নি। এ-প্রসঙ্গ এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়। এখানে আমাদের প্রয়োজনীয় তথ্য হ'লো এই যে, কালে কালে বা জনে জনে বিচারের মানদণ্ড পৃথক্, কিন্তু সাহিত্যসমালোচনায় বিচার সেই প্লেটোর কাল থেকে আজ অবধি অব্যাহত আছে।

প্লেটোর মানদণ্ড ত্রিবিধ। এক, সত্য; দ্বিতীয়, লোকহিত। প্লেটো শিল্প-সাহিত্যকে বাতিল করেছেন এই কারণে যে, প্রথমত তা মিথ্যার ব্যাপারী, দ্বিতীয়ত তা আবেগ-অনুভূতির কারবারী বলে' জনসাধারণের পক্ষে অহিতকারী। সেই সঙ্গে তিনি এও বলেছেন যে, সাহিত্যের তৃতীয় দোষ হ'লো এই যে, সাহিত্য দেবনিন্দুক।

এ্যারিস্টটলের মানদণ্ড সার্থক অনুকরণ এবং গভীরতর সত্যের প্রকাশ। এবং ক্ষেত্রবিশেষে ক্যাথারসিসের দ্বারা অনুভূতির বিশুদ্ধিকরণ বা অনুভূতির সৌষম্য। রেনেসাঁসের কালের সমালোচকেরা একদিকে যেমন অনুকরণের কথা বলেছেন, অন্যদিকে আবার সেই সঙ্গে তাঁরা নীতিশিক্ষা ও আনন্দ, চিত্তশুদ্ধি ও রসসঞ্চার দুই মানদণ্ডের উপরেই একসঙ্গে জোর দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রে আমরা ঠিক এই জিনিসই দেখতে পাবো। রোমান্টিক সমালোচকেরা সকলেই বিচারপন্থী নন, তবে অধিকাংশই তাই। যাঁরা বিচারপন্থী, তাঁদের মানদণ্ড স্রষ্টার সার্থক আত্মপ্রকাশ, আবেগ-প্রকাশ, অনুভূতির সত্যতা ও প্রবলতা। নব্য-ক্রিটিকদের অনেককেই আপাত-দৃষ্টিতে ব্যাখ্যাপন্থী মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁদের অধিকাংশই দ্বিধাহীনভাবে ভালো-মন্দের রায় দিয়ে থাকেন। তাঁদের বিচারের মানদণ্ড কখনো আয়রনি বা শ্লেষ, কখনো নানার্থবোধকতা বা এ্যাম্বিগুইটি, কখনো বা ভাষার সুষ্ঠু সংগঠন, ফর্মের সৌষ্ঠব। যদিও মুখে তাঁরা অধিকাংশ সময়ই বিচারবিরোধী।

বাংলা সমালোচনা প্রথমাবধি অকুণ্ঠভাবে বিচারপন্থী। কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের নয়, বঙ্গদর্শনের প্রায় সমস্ত সমালোচনাই বিচারমূলক। মানদণ্ডের ব্যাপারে বঙ্কিমগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই বঙ্কিমচন্দ্রের মতো অনুকরণ, চিত্তশুদ্ধি ও আনন্দলাভ এই ত্রিমুখী-আদর্শের সমর্থক। রবীন্দ্রনাথও প্রায় সম-পরিমাণেই বিচারপন্থী, কিন্তু তাঁর বিচার অনেক ক্ষেত্রেই প্রচ্ছন্ন বা পরোক্ষ। রবীন্দ্রনাথের

বিচারের আদর্শ অনেকটা এ্যারিস্টটলের মতো গভীরতর সত্যপ্রকাশের আদর্শ, কিন্তু তার সঙ্গে রোমান্টিক আদর্শেরও প্রচুর মিশ্রণ ঘটেছে।

পরবর্তী বাংলা সমালোচকেরাও কেউ-ই বিচারবিমুখ নন। তার প্রধান একটা কারণ হয়তো এই যে, আমেরিকান সমালোচনাসাহিত্যের বিচারবিমুখী আন্দোলনের প্রভাব এখন পর্যন্ত বাংলা সমালোচনাকে বিশেষ অভিভূত করতে পারে নি। বাংলা সমালোচনা এখনো তেমনভাবে বিশ্ববিদ্যালয়-অধিকৃত হয়ে ওঠে নি। আরো বড়ো কথা, এখানকার সাহিত্যের অধ্যাপকদের মধ্যে ইঙ্গ-মার্কিন নব্য-সমালোচনার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক শাখা এখনো তেমন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে নি।

সঙ্গে ব্যাখ্যা বা রসপরিচয় থাকতে পারে, তা হ'লেও সাধারণভাবে বাংলা সমালোচনা বরাবরই বিচারমূলক। বাংলা সমালোচনার ইতিহাসে সর্বত্রই এর প্রমাণ মিলবে। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে চন্দ্রনাথ বসু, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কি সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, অথবা বিপিনচন্দ্র পাল বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ ক্লাসিকপন্থী আধা-ক্লাসিকপন্থীদের সমালোচনাই যে কেবল বিচারমূলক তা নয়, পরবর্তী রোমান্টিক বা আধা-রোমান্টিক সমালোচনাও মূলত বিচারপন্থী। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা—ব্যাখ্যা ও রসপরিচয়ে অসামান্য সিদ্ধি সত্ত্বেও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাও প্রধানত বিচারমূলক। বস্তুত, চিঠিপত্রের মধ্যে যে সমালোচক-মধুসূদনকে পাওয়া যায় সেই মধুসূদন থেকে আরম্ভ ক'রে কবি-সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা প্রমথনাথ বিশী বা বুদ্ধদেব বসু, অথবা অন্যদিকে প্রমথ চৌধুরী, অজিতকুমার চক্রবর্তী থেকে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কি সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, বাংলা সাহিত্যের সকল উল্লেখযোগ্য সমালোচকই অল্পবিস্তর বিচারপন্থী। অথবা বলতে পারি, সকলেই ব্যাখ্যা, রসপরিচয় ও বিচার এই তিনের সমন্বয়পন্থী।

বিচারমূলক সমালোচনার মূল বক্তব্যটা এখানে সংক্ষেপে সেরে নেওয়া যেতে পারে। তবে মনে রাখতে হবে, এ-বক্তব্য সমন্বয়পন্থীর ক্ষেত্রে ততোটা প্রতিনিধিত্বমূলক হবে না যতোটা হবে চূড়ান্ত বিচারপন্থীর ক্ষেত্রে। চূড়ান্ত বিচারপন্থীদের কথাটাই এখানে আমরা নমুনা হিসেবে বিবেচনা ক'রে দেখব।

সে যা-ই হোক, এখন মূল কথাটা কী দেখা যাক। বিচারপন্থীদের মতে ব্যাখ্যা বা রসপরিচয় কোনোটাই খাঁটি সমালোচনা নয়। ব্যাখ্যা প্রয়োজনীয় সন্দেহ নেই, কিন্তু তা উপায়মাত্র, লক্ষ্য নয়। ব্যাখ্যা সমালোচনাকর্মের একটা নিম্নতর ধাপ। পরিচয়ও প্রয়োজনীয়, কিন্তু তা রসপরিচয় নয়, রসপরিচয় সমালোচকের সাধ্যের অতীত। সমালোচক যা দিতে পারেন তা হ'লো তথ্যগত পরিচয়, বিষয়পরিচয়। সে পরিচয়ও ব্যাখ্যার মতো সমালোচনা-কর্মের একটি নিম্নতর ধাপ। সমালোচক সব সময়ই মূল্যসন্ধানী। তাঁকে তুলনা করতে হয়, তৌল করতে হয়, রায় দিতে হয়। খাঁটি সমালোচনা হ'লো রচনাবিশেষের মূল্যায়ন। প্রশ্ন হতে পারে, কোন্ মূল্য? নানা উপগোত্রের বিচারপন্থী নানা রকম কথা বলতে পারেন। কেউবা নৈতিক মূল্য, কেউ-বা ধর্মীয় মূল্য, কেউ-বা রাজনৈতিক কি সামাজিক মূল্যের কথাও বলতে পারেন, তবে অধিকাংশ বিচারপন্থীই শেষ পর্যন্ত আনন্দমূল্যের কথাই বলে' থাকেন। যাঁরা নৈতিক বা অন্য কোনো মূল্যের কথা বলেন, তাঁরা আনন্দমূল্যকে সোজাসুজি বাতিল না করেই নিজেদের অভিপ্রেত মূল্যের কথা বলেন। কোন্ মূল্য তা আসলে সমালোচকের সাহিত্য-আদর্শের উপর নির্ভর করে।

বিশেষ আদর্শ অনুযায়ী বিশেষ সিদ্ধিতেই সাহিত্যের মূল্য। কিন্তু মূল্যায়নের পদ্ধতিটা কী? বলা বাহুল্য, সিদ্ধির পরিমাণ নির্দেশ ক'রে, সিদ্ধির হেতু নির্দেশ ক'রে। যদি আনন্দকেই চরম মূল্য বলে' মেনে নিই, তাহলে সেই আনন্দের হেতু নিরূপণ ক'রে, রচনাবিশেষের মধ্যে আনন্দের যে কারণগুলি নিহিত আছে, সেই কারণগুলির আবিষ্কার, উপস্থাপনা ও তাৎপর্য-নির্ণয় ক'রে।

বিচারপন্থীদের মতে—অন্তত চূড়ান্ত বিচারপন্থীদের মতে সাহিত্যের রসাস্বাদন সম্ভব, কিন্তু সেই আস্বাদনের লিখিত পরিচয় দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়। রস একটা অদ্বিতীয় আস্বাদন, তা একটা অনন্য অনুভূতি। সমালোচক বক্তৃতা দিয়ে কখনোই তার যথার্থ পরিচয় দিতে পারবেন না—সে চেষ্টা তাঁর পক্ষে বিড়ম্বনা। কেউ কেউ সমালোচনার মধ্যে সমালোচ্য বিষয়ের রসের অনুরূপ একটি বিকল্প-রসের সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু রসের কোনো বিকল্প হয় না। মূলের রস আর সমালোচনার রস দুই রসই অনন্য, কেউ

কারো বিকল্প নয়। প্রতিভাধর কবি-সমালোচকেরা, যাঁরা যুগপৎ সমালোচক এবং সৃজনশীল শিল্পী, তাঁরা সমালোচনার নামে রসসৃষ্টি ক'রে থাকেন বটে, কিন্তু সে রসের সঙ্গে মূল বিষয়ের রসের কোনো সম্পর্ক থাকে না। অন্তশ্চরিত্রে তারা পৃথক্। যেমন পৃথক্ কালিদাসের মেঘদূতের রস আর রবীন্দ্রনাথের মেঘদূত সমালোচনার রস। বিচারপন্থীদের মতে রসাস্বাদন সমালোচনার পূর্বশর্ত, সমালোচনার যাত্রারম্ভ, কিন্তু সমালোচনার লক্ষ্য নয়। সমালোচনার লক্ষ্য বিশেষ মানদণ্ডের সাহায্যে রচনার উৎকর্ষবিচার।

ঠিক এই কারণেই, এঁদের মতে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণাদিও সমালোচনার লক্ষ্য নয়। এঁদের মতে, রসপরিচয় হ'লো অস্থানে কবিত্ব করা, আর ব্যাখ্যা হ'লো অস্থানে শিক্ষকতা করা। কেননা, ব্যাখ্যার লক্ষ্য হ'লো অশিক্ষিত পাঠককে শিক্ষিত করা, অজ্ঞানী পাঠককে জ্ঞান দেওয়া, রস-উদাসীন পাঠককে রস-উৎসুক ক'রে তোলা, রসগ্রাহী ক'রে তোলা। কাজটা আসলে গুরুগিরি। কিন্তু যথার্থ সমালোচনার লক্ষ্য পাঠক নয়, লক্ষ্য সাহিত্যবস্তু, তারই উৎকর্ষ-অপকর্ষ। যথার্থ সমালোচক মূল্যের দিক থেকে রচনাবিশেষকে অন্যান্য মূল্যবান সাহিত্যবস্তুর সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন, তার মান নির্ণয় করেন। দেশের সংস্কৃতি ঐতিহ্যে—ক্ষেত্রবিশেষে বিশ্বের সংস্কৃতি-ঐতিহ্যে তার স্থান নির্দেশ করেন।

একে জজিয়তী বলে' ব্যঙ্গ করার অর্থ হয় না। বিচার নিঃসন্দেহে, কিন্তু কদর্থে জজিয়তী কখনোই নয়। সাহিত্যকে ভালোবাসার মূল্যে সমালোচক এই অধিকার অর্জন করেন। সাহিত্যের আনন্দমূল্যে যিনি শ্রদ্ধাশীল, অপ-সাহিত্যের মিথ্যা দাবিকে খণ্ডন করার অধিকার তাঁর অবশ্যস্বীকার্য।

ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তাকে এঁরা অস্বীকার করেন না। অন্যপক্ষে, এ-ও এঁরা স্বীকার করেন যে, গোড়ায় রসাস্বাদন না-থাকলে সমালোচনার প্রশ্নই উঠতে পারে না। শুধু গোড়ায় নয়, হয়তো এ-ও এঁরা স্বীকার করেন যে, সমালোচ্য বিষয়ের একটি রসমূর্তিকে যথার্থ সমালোচক সব সময়ই তাঁর মনের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেন। এঁরা আরো স্বীকার করেন যে, তথ্য-সন্ধান, তথ্য-সংগ্রহ এবং তথ্য-ব্যাখ্যা—শুধু তথ্য-ব্যাখ্যা নয়, সর্ববিধ ব্যাখ্যা—সমালোচনার পক্ষে অবশ্য-প্রয়োজনীয়। কিন্তু এঁদের মত এর কোনোটাই সমালোচনা নয়। রসাস্বাদন সমালোচনার অপরিহার্য পূর্বশর্ত, কিন্তু

সমালোচনার অঙ্গ নয়। ব্যাখ্যা সমালোচনার পথ-প্রস্তুতি, সে-ও সমালোচনার অঙ্গ নয়। সমালোচকের আসল কাজ বিচার—বিশেষত্ববিচার রসবিচার মূল্যবিচার। শুধু রায় দেওয়া নয়—হেতুনির্দেশ সহকারে সামগ্রিক ও আনুপূর্বিক বিচার।

আগেই দেখেছি, বিচার যে সব সময় সাহিত্যমূল্যেরই বিচার, কার্যক্ষেত্রে এমন না-ও হতে পারে। বিচারমূলক সমালোচনাকে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করা যায়। এক, যেখানে সাহিত্যের স্বরাজ স্বীকৃত, অর্থাৎ যেখানে সাহিত্যের আনন্দমূল্য চরম বলে' স্বীকৃতি পেয়েছে। দুই, যেখানে সাহিত্যের স্বরাজ অল্পবিস্তর অস্বীকৃত, সাহিত্যের নিছক আনন্দমূল্য প্রাধান্য না পেয়ে যেখানে নৈতিক মূল্য, বা ধর্মীয় মূল্য অথবা সামাজিক অগ্রগতির মূল্য প্রাধান্য পেয়েছে। অর্থাৎ আমাদের মতে, যেখানে খাঁটি সমালোচনা গৌণ হয়ে পড়েছে।

নৈতিক মূল্যের শ্রেষ্ঠ সমর্থক প্লেটোর কথা সকলেরই সুবিদিত। এ্যারিস্টট্‌লের মতো আনন্দমূল্যের সমর্থকও নৈতিক মূল্যের বিবেচনাকে অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। ক্লাসিকপন্থী পণ্ডিতেরা মুখে আনন্দ এবং কল্যাণ দুই মূল্যের কথা বললেও কার্যক্ষেত্রে কল্যাণেরই অর্থাৎ নৈতিক মূল্যেরই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। বঙ্কিমগোষ্ঠীর সমালোচকদের ক্ষেত্রেও ঠিক এই জিনিসই দেখতে পাওয়া যায়। এঁরা সকলেই অকুণ্ঠ সমাজকল্যাণবাদী। ব্যাবিট্-প্রমুখ নব্য-মানবতাবাদী সমালোচকদের প্রবল নৈতিকতার সঙ্গে অনেকেই সুপরিচিত। মার্ক্‌স্‌বাদী সমালোচকদের স্বীকৃত মূল্য হ'লো সামাজিক অগ্রগতি, শ্রেণীসংগ্রামে সাফল্য বা সমাজবিপ্লব। নীতির আদর্শটা ভিন্ন, কিন্তু একেও গূঢ় অর্থে নৈতিক সমালোচনা বলতে বাধা নেই। মধ্যযুগের খ্রীষ্টান ধর্মগুরুদের দ্বারা একসময় সাহিত্যে ধর্মীয় আদর্শ প্রবল পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। সেকথা আজ বিস্মৃতপ্রায় হয়ে এসেছে, কিন্তু আধুনিক কালে সাহিত্যে ধর্মীয় মূল্যের যিনি শ্রেষ্ঠ সমর্থক, সেই টলস্টয়ের কথা নিশ্চয়ই কারো অজানা নেই। সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রও কখনো কখনো ধর্মীয় মূল্যের অগ্রাধিকারের কথা বলেছেন, কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে—অর্থাৎ সমালোচক হিসেবে তিনি কখনোই সে-পথে অগ্রসর হন নি।

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বাধিকারে আস্থাশীল; সাহিত্যের

আনন্দমূল্যের অকুণ্ঠ সমর্থক। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, লোকশিক্ষা সমাজ-কল্যাণ ধর্মপ্রচার এসব কিছুই সাহিত্যের উদ্দেশ্য নয়, সাহিত্যে আনন্দই হ'লো সব শেষের কথা। কিন্তু 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের একাধিক সমালোচনা প্রবন্ধে, যেমন 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা', 'শকুন্তলা' কিংবা 'রামায়ণে' স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্যমূল্যের স্বীকৃতি প্রায় দেখতেই পাওয়া যায় না। সেখানে নৈতিক মূল্যের বা সমাজকল্যাণের আদর্শের, যা রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রায় ধর্মীয় আদর্শের সমগোত্রের, তারই পরিপূর্ণ একাধিপত্য।

রবীন্দ্রনাথের এই সমালোচনা-প্রবন্ধগুলি পড়লে, বিশেষ ক'রে 'রামায়ণ' ও 'শকুন্তলা' পড়লে, নিছক আনন্দমূল্য সম্পর্কে—সাহিত্যের আনন্দমূল্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে মনে একটি প্রশ্ন জাগে। সত্যিই কি সাহিত্যের আনন্দমূল্য মানুষের নৈতিক মূল্য থেকে, জীবনমূল্য থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্? বিভিন্ন মূল্যগুলি কি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বয়ংসম্পূর্ণ? মূল্যগুলির উৎস কি ভিন্ন ভিন্ন, না সকলেরই উৎস অভিন্ন, সকলের উৎস জীবনের গভীরতায়? 'রামায়ণে' এবং 'শকুন্তলা'য় রবীন্দ্রনাথের লক্ষ্য নৈতিক মূল্য, কিন্তু নৈতিক মূল্যকে সেখানে আনন্দমূল্য থেকে কিছুতেই পৃথক্ করা যায় না, সেখানে আনন্দ এবং কল্যাণ প্রায় এক হয়ে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধগুলি আমাদের এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছে দেয় যে, নীতি যেখানে লৌকিক বিধিমাত্র, প্রচলিত রীতিমাত্র, সে-নীতি সাহিত্যের আনন্দমূল্যকে স্পর্শ না করতেও পারে, কিন্তু যে-নীতি জীবনের গভীর মূলদেশ থেকে উৎসারিত, তা আমাদের আনন্দ-বোধের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। জীবনের গভীর সত্যের সঙ্গে সাক্ষাৎকার যে-সাহিত্যে ঘটে, সেখানে আমরা এই দুই মূল্যের পার্থক্য কখনোই স্মরণ রাখতে পারি না।

মার্ক্স্‌বাদী সমালোচকেরা তাঁদের বিশিষ্ট নৈতিকতার সমর্থনে ঠিক এই ধরনের যুক্তিই প্রয়োগ ক'রে থাকেন। তত্ত্ব হিসেবে এ যুক্তি হয়তো অকাট্য, কিন্তু এর গ্রহণীয়তা আসলে নির্ভর করে প্রয়োগের ক্ষেত্রের উপর। বিশেষ ক'রে রবীন্দ্রনাথের 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটি নিঃসন্দেহে সেই রকম গ্রহণীয় ক্ষেত্র। কিন্তু যে-কোনো নৈতিক বিচারেরই যে গ্রহণীয়তা আছে এমন মনে করলে ভুল হবে।

বিচারমূলক সমালোচনার বিরুদ্ধে সব থেকে বড়ো আপত্তি সাহিত্য-বিচারের মানদণ্ডের অনিশ্চয়তা নিয়ে। অনেকে মনে করেন, সাহিত্যের ভালোমন্দ বলে' কোনো স্থির ও তদ্‌গত ব্যাপার নেই ; যা আছে তা হ'লো সাহিত্যপাঠকের ভালো-লাগা মন্দ-লাগা, পাঠকের রুচির মর্জি। এই রুচি পাঠকের ব্যক্তিগত, কালগত, অথবা যুগপরিবেশগত। অর্থাৎ সাহিত্যের ভালোমন্দ সম্পূর্ণ আপেক্ষিক ব্যাপার। সাহিত্যের তন্নিষ্ঠ বিচার কখনোই সম্ভব নয়।

আপেক্ষিকতার যুক্তিকে তত্ত্বের ক্ষেত্রে খণ্ডন করা কঠিন, কিন্তু কার্যের ক্ষেত্রে সব সময়ই একে আমরা খণ্ডন ক'রে ক'রেই চলি। তা নইলে জীবনের পথে আমরা এক পা-ও চলতে পারতাম না। বস্তুত, চূড়ান্ত এবং একনিষ্ঠ আপেক্ষিকতা যে অচল অবস্থার সৃষ্টি করে তা মানুষের জীবনচর্যার, মানুষের জৈবধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী। চূড়ান্ত আপেক্ষিকতা শেষ পর্যন্ত আত্মখণ্ডনকারী। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে তাকে আমরা প্রশ্রয় দিই না। তাহলে সাহিত্যেই বা কেন দেবো ? যেখানেই মূল্যের প্রশ্ন, সেখানেই আপেক্ষিকতার আপত্তি তোলা যায়—কী সত্য, কী কল্যাণ, কী আনন্দ, সব ক্ষেত্রেই। সত্যের ক্ষেত্রে, কল্যাণের ক্ষেত্রে আপেক্ষিকতাকে ভয় ক'রে আমরা কখনো বিচারে বিরত থাকি না। বিচারের মুহূর্তে বিচারের মানদণ্ডকে আমরা আপেক্ষিক অর্থে—আমাদের দেশকালের প্রেক্ষাপটে—নিরপেক্ষ বলেই গ্রহণ করি। সাহিত্যের মানদণ্ড সেই রকম আপেক্ষিক রকমের নিরপেক্ষ মানদণ্ড।

মানদণ্ড নেই বলা, আর মানদণ্ডকে অনিশ্চিত বলা এক নয়। মানদণ্ড নেই বলার অর্থ এই যে, ভালো-লাগার কোনো বিষয়গত কেন নেই। কিন্তু এই বিশ্বাসই যদি মানুষের থাকবে, তাহ'লে মানুষ সাহিত্যকর্মে প্রবৃত্তই হ'তো না, সমালোচনা জিনিসটাই থাকতে পারতো না। সমালোচনা যদি থাকতে পারে—সাহিত্য সম্বন্ধে তদ্‌গত আলোচনা যদি সম্ভব হতে পারে, তাহ'লে বিচারও সমানই সম্ভব।

সমালোচনার ইতিহাসে ভ্রান্ত বিচারের দৃষ্টান্ত ভূরি ভূরি মিলবে। গ্যেটের মতো প্রাজ্ঞ সাহিত্যরসিক বায়রন সম্পর্কে যে-সব উচ্ছ্বসিত অত্যুক্তি করেছেন, তা আজকে অনেকটা হাসির খোরাকে পরিণত হয়েছে। মিলটন

নিয়ে সমালোচনার ইতিহাসে যে তেজী-মন্দীর পালা চলেছে, তার মধ্যে, অথবা মেটাফিজিক্যাল কবিদের উত্থান বা শেলির পতন, অথবা আমাদের বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের উত্থান-পতন, সবের মধ্যেই সমালোচকের রুচির কৌতুককর অস্থিরতার প্রমাণ মিলবে। টলস্টয়ের মতো রসজ্ঞ স্রষ্টা শেক্‌স্‌পীয়ার সম্পর্কে চূড়ান্ত অরসিকের মতো সিদ্ধান্ত করেছেন। সাঁৎ বোভ্‌-এর মতো পাকা সমালোচক বোদ্‌লেয়ারকে বুঝতে পারেন নি, নিজের কালকে বুঝতে পারেন নি। ম্যাথ্যু আর্নল্ড শেলিকে বুঝতে পারেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ সম্পর্কে সুবিচার করেন নি, হেমচন্দ্র সম্পর্কে অত্যুক্তি করেছেন। রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে হেমচন্দ্র সম্পর্কে এবং পরিণত বয়সে বিহারীলাল সম্পর্কে অত্যুক্তি করেছেন, মধুসূদনের প্রতিভার স্বরূপ বুঝতে পারেন নি। এ রকম অজস্র দৃষ্টান্ত দেওয়া যাবে। কিন্তু তা থেকে বিচার ব্যাপারটার তত্ত্বগত অযৌক্তিকতা প্রমাণিত হয় না। বিচারবিভ্রাট বিচারের দুরূহতাকেই প্রমাণিত করে, বিচারের অবাস্তবতাকে প্রমাণ করে না।

যতোই দুরূহ হোক, কালের হাতে সাহিত্যের বিচার অনবরতই হয়ে চলেছে। মহাকালের এই গ্রহণ-বর্জনের মধ্যে দিয়েই বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রত্নগুলি ধীরে ধীরে অমরতা অর্জন করে। বিচারপন্থী সমালোচক নিজেকে সেই বিপুল গ্রহণ-বর্জনলীলার অন্যতম অংশীদার বলে' মনে করেন। কেননা, মহাকালের গ্রহণ-বর্জন আসলে তো বিচারশীল পাঠক-সাধারণেই গ্রহণ-বর্জন।

৬

সমালোচনায় বিচারের অধিকার মোটামুটি সর্ব যুগেই স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে আপেক্ষিক গুরুত্বের দিক থেকে যদি দেখি, তাহলে বলতেই হবে যে, উনবিংশ ও বিংশ শতকের সমালোচনায় বিচারের প্রতিপত্তি পূর্বের তুলনায় অনেক কম। উনবিংশ শতকে বেশি প্রতিপত্তি ছিল রসপরিচয়ের, বিংশ শতকে ব্যাখ্যার।

উনবিংশ শতকের অধিকাংশ শ্রেষ্ঠ সমালোচকই সাহিত্য-আদর্শে রোমান্টিক। উনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য সমালোচনার ইতিহাসের দিকে

তাকালে এমন মনে হওয়া বিচিত্র নয়, যে, রসপরিচয়মূলক সমালোচনা এবং রোমান্টিক সমালোচনা কার্যত অভিন্ন। এ ধারণা পুরোপুরি অভ্রান্ত নয়। রোমান্টিক সমালোচনার সঙ্গে রসপরিচয়মূলক সমালোচনার মেজাজগত সাম্য প্রচুর, কিন্তু এদের মধ্যে কোনো তত্ত্বগত বা কার্যকারণগত অনিবার্য যোগ নেই। প্রথম যুগের রোমান্টিক সমালোচকেরা অধিকাংশই প্রধানত বিচারপন্থী ছিলেন। উত্তর পর্বের সমস্ত রোমান্টিক সমালোচকই যে রসপরিচয়পন্থী এমনও নয়। তবু রোমান্টিক সমালোচনার সঙ্গে রসপরিচয়-পন্থার ইতিহাসগত যোগাযোগ অবশ্যস্বীকার্য।

রোমান্টিক সমালোচনার বাইরেও রসপরিচয়মূলক সমালোচনার সাক্ষাৎ মেলে। আগেই বলেছি, রূপের পরিচয়, ফর্মের পরিচয় পরোক্ষভাবে রসপরিচয়েরই ভূমিকা রচনা করে। সেই বিবেচনায়, ক্লাসিকপন্থীদের অগ্রগণ্য হলেও, এবং বিচার ও ব্যাখ্যার পন্থা অনুসরণ করা সত্ত্বেও, এ্যারিস্টট্‌লকে আমরা অনায়াসে রসপরিচয়পন্থীও বলতে পারি।

রসপরিচয় অর্থ যদি আস্বাদনের পরিচয় হয় এবং আস্বাদন অর্থ যদি ভোক্তার চিত্তের ভাবগত প্রতিক্রিয়া হয়, তাহলে রসপরিচয়ের প্রসঙ্গে আমরা এ্যারিস্টট্‌লের ক্যাথার্‌সিস্‌তত্ত্বের কথাও এখানে উল্লেখ করতে পারি। কেউ কেউ ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের রসবাদের সঙ্গে এ্যারিস্টট্‌লের ক্যাথার্‌সিস্‌ সংক্রান্ত মতবাদের সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। দুই মতবাদেরই মূল কথা হ'লো সহৃদয় পাঠক বা দর্শকের—অর্থাৎ সহৃদয় ভোক্তার অনুভূতি। উভয়েরই লক্ষ্য ভোক্তার বেদনাময় চৈতন্য। সেইখানেই ক্যাথার্‌সিসের সংঘটন। যদি রূপ বলি, তাহলে বলবো, সেইখানেই সাহিত্যবস্তুর সাহিত্য-রূপের আবির্ভাব। যদি রস বলি, তাহলে বলবো, সেইখানেই সাহিত্যের রসমূর্তি, সেইখানেই রসসঞ্চার, সেইখানেই রসাস্বাদন। রস যদি অনুভূতিই হয়, রসের অধিষ্ঠান যদি সহৃদয় ভোক্তার চিত্তই হয়, রসপরিচয়ের সঙ্গে যদি ভোক্তার চিত্তের প্রতিক্রিয়ার সাক্ষাৎ সম্পর্ক থাকে, তাহলে ক্যাথার্‌সিস্‌-তত্ত্বের সঙ্গে রসবাদের সাদৃশ্যের কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা যায় না। এবং তা যদি না যায়, তাহলে এ্যারিস্টট্‌লকে এদিক থেকেও আমরা খানিকটা রসপরিচয়বাদী বলে' মেনে নিতে পারি।

ক্যাথার্সিসের সূত্রে এরিস্টট্‌লকে রসপরিচয়বাদী বলার যুক্তিটা অবশ্য বিশেষ জোরালো নয়। স্থূল অর্থে যদি-বা রসপরিচয়বাদী বলা যায়, বিশিষ্ট বা পারিভাষিক অর্থে এ্যারিস্টট্‌লকে মোটেই রসবাদী বলা যায় না। রসবাদের সঙ্গে ক্যাথার্সিসতত্ত্বের সাদৃশ্য মোটেই গভীর নয়। এ্যারিস্টট্‌ল ভোক্তাচিত্তের যে অনুভূতির কথা বলেছেন, তা নিতান্তই লৌকিক অনুভূতি, অলৌকিক রস নয়, ব্রহ্মাস্বাদের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র আত্মীয়তা নেই। এ্যারিস্টট্‌ল বিভিন্ন স্থায়িভাব ও বিভিন্ন রসের কথা বলেন নি, বিশেষ ক'রে ট্র্যাজেডির ক্ষেত্রের কথাই বলেছেন, এবং করুণা ও ভয়—এই দুটি মাত্র কষ্টদায়ক অনুভূতির কথাই বলেছেন। এ্যারিস্টট্‌ল ভাবের রসপরিণামের কথা বলেন নি, ভোক্তার স্বসংবিদানন্দ চর্বণের কথা বলেন নি, তিনি কষ্টদায়ক অনুভূতিদ্বয়ের মোক্ষণ বা বিশুদ্ধিকরণের কথা অথবা তাদের সামঞ্জস্যবিধানের কথা বলেছেন। সুতরাং দূরতম অর্থেও এ্যারিস্টট্‌লকে রসবাদী বলে' দাবি করা যায় না।

এ্যারিস্টট্‌লকে রসবাদী বলবার কোনো প্রয়োজনও নেই। তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব যে সাহিত্যের রূপ-কে ও রসমূর্তিকে উপেক্ষা করেনি, এইটেই এখানে সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয়। বস্তুত, যিনিই ভোক্তাচিত্তের অনুভূতির মধ্যে দিয়ে সাহিত্যবস্তুর বৈশিষ্ট্যকে দেখতে চেষ্টা করবেন, তিনিই রসপরিচয়ের অনেকখানি কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন, তাতে সন্দেহ নেই। এই সূত্রে প্রাচীন সাহিত্যতাত্ত্বিকদের মধ্যে আমরা বিশেষ ক'রে লঙ্গাইনাস্‌কে স্মরণ করতে পারি। লঙ্গাইনাসের সাব্‌লাইম-তত্ত্বের নির্ভর একদিকে যেমন লেখকচিত্তের মহত্ত্ব, অন্যদিকে তেমনি পাঠকচিত্তের রসগ্রাহী প্রতিক্রিয়া এই প্রসঙ্গে আধুনিক সাহিত্যতাত্ত্বিক ও সমালোচকদের মধ্যে কেনেথ্‌ বার্কের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্যবস্তুর ফর্মের সার্থক সংগঠনে, তার সাহিত্যরূপের সফল সংরচনে, সাহিত্যবস্তুর রসমূর্তির প্রাণপ্রতিষ্ঠায় পাঠক-চিত্তের ভূমিকার অপরিসীম গুরুত্ব যাঁদের আলোচনায় সব থেকে সুষ্ঠুভাবে প্রতিপাদিত হয়েছে, একালে কেনেথ্‌ বার্ক তাঁদের অগ্রগণ্যদের অন্যতম। ঠিক রসপরিচয়ের দিক থেকে না হলেও, পাঠকচিত্তের প্রতিক্রিয়ার প্রসঙ্গে আই. এ. রিচার্ড্‌সের সাহিত্যতত্ত্বও এখানে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করি।

রসপরিচয়মূলক সমালোচনায় নির্দিষ্টতা ও বিশুদ্ধতার অভাব লক্ষ করা যায়। এই গোত্রের সমালোচনার অনেক উপগোত্র। উপগোত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে তত্ত্বগত ঐক্য খুব নিবিড় নয়। সম্ভবত রোমান্টিক সমালোচনাক্ষেত্রের বিশৃঙ্খলাই রসপরিচয়মূলক সমালোচনার বিশৃঙ্খলতার মূল কারণ। কথাটা একটু খুলে বলা দরকার।

সকলেই জানেন, রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব অনুভূতি-ভিত্তিক সাহিত্যতত্ত্ব। অন্যদিকে রস ব্যাপারটাও অনুভূতিভিত্তিক—রসপরিচয় কাজটারও কেন্দ্রস্থলে আছে অনুভূতি। অনেকটা বোধ করি এই কারণেই রসপরিচয়ে রোমান্টিক সমালোচকেরাই সব থেকে বেশি উৎসাহী। কিন্তু এই উৎসাহের গোড়াতেই একটা গলদ থেকে গিয়েছে। রসপরিচয়ের ভিত্তি হ'লো ভোক্তার অনুভূতি, আর রোমান্টিকদের আসল লক্ষ্য স্রষ্টার অনুভূতি। দু'য়ের মধ্যে অনেকখানি দূরত্ব।

সমালোচক যদি সত্যিই সমালোচ্য বিষয়ের যথার্থ রসপরিচয় দিতে পারেন, তাহলে তিনি যে একটি অত্যন্ত মূল্যবান কাজ করলেন, এ-কথা কেউ অস্বীকার করবে না। কিন্তু কাজটা বলতে যতো সহজ, করতে ততো সহজ নয়। প্রশ্ন হবে, রসবস্তু নিজেই নিজের অনন্য রসপরিচয়, অন্য কেউ তার রসপরিচয় দিতে পারে কি? যদি পারেও, সমালোচকের পক্ষে এ-কাজ সম্ভব কি? কোন্ পরিচয়টাকে যথার্থ রসপরিচয় বলবো? রসপরিচয় দেবার সঠিক উপায়টা কী?

এই সব প্রশ্ন থেকেই রসপরিচয়মূলক সমালোচনায় নানাবিধ উপগোত্রের সৃষ্টি হয়েছে। এবং এদের প্রায় প্রত্যেকটি উপগোত্রের মধ্যেই স্রষ্টার—এ-ক্ষেত্রে অবশ্য মূল সমালোচ্য বিষয়ের স্রষ্টার প্রশ্ন ওঠে না, এখানে সমালোচকই স্রষ্টা, অতএব—সমালোচকের আত্মগতভাবের প্রাধান্য অল্পবিস্তর দেখতে পাওয়া যাবে।

কোথাও দেখা যায়, সমালোচকের দাবি হ'লো যে, তিনি মূল রচনার রসটিকেই সমালোচনার মধ্যে সংক্ষেপে পুনর্বার পরিবেশন করবেন। কোনো কোনো উপগোত্রে সমালোচক মূলের রস নয়, মূলের অনুরূপ—মূলের বিকল্প একটি রসকে সমালোচনায় পরিবেশন করতে চেষ্টা করেন। কোনো

কোনো উপগোত্রে সমালোচক সমালোচ্য বিষয়কে অবলম্বনমাত্র ক'রে স্বাধীন রসসৃষ্টি করেন, সে-রস সমালোচ্য বিষয়ের অনুরূপ কি না তা নিয়ে তিনি মাথা ঘামান না। কোনো কোনো উপগোত্রে সমালোচক সরাসরি নিজেকেই প্রকাশ করেন—উত্তরপর্বের খাঁটি রোমান্টিক সমালোচকদের যা আদর্শ-কর্ম। কোনো কোনো উপগোত্রে সমালোচকের প্রাথমিক ও অব্যবহিত প্রতিক্রিয়ার রূপায়ণ, সাহিত্যবস্তুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকারের প্রাথমিক অভিজ্ঞতার রূপায়ণ, এইটেই সমালোচকের একমাত্র লক্ষ্য।

সমস্ত উপগোত্রেই সফল সমালোচনার প্রাথমিক শর্ত হ'লো সমালোচকের নিজস্ব সৃজনক্ষমতা। তা হ'লেও এই তালিকার প্রথম তিনটি উপগোত্রকেই সাধারণত সৃজনশীল সমালোচনা বলা হয়ে থাকে। এই তালিকার শেষোক্ত উপগোত্রটি সচরাচর ইম্‌প্রেশনিস্ট সমালোচনা আখ্যা পেয়ে থাকে। প্রথম তিনটির সঙ্গে শেষেরটির যে কোনো রকম বিরোধ আছে, তা নয়। সুতরাং একই সমালোচনা অনায়াসে একই সঙ্গে ইম্‌প্রেশনিস্টিক এবং সৃজনশীল দুই নামেই অভিহিত হতে পারে।

উপগোত্রের সংখ্যাগণনার চেষ্টা পরিত্যাগ ক'রে, রসপরিচয় গোত্রের সমালোচকের মূল বক্তব্যটা কী, এই বারে সেইদিকে একটু দৃষ্টি দেওয়া যাক।—

প্রত্যেক সাহিত্যবস্তু, তা সে কাব্যই হোক, নাটকই হোক আর উপন্যাসই হোক, তার যেমন একটা তথ্যগত পরিচয় আছে, একটা মূল্যগত পরিচয়ের দিকও আছে, তেমনি আর-একটা দিকও আছে যেটা তার রূপরসের বিশিষ্টতার দিক, তার নিজত্বের দিক, তার স্বাদের স্বাতন্ত্র্যের দিক, যেখানে সাহিত্যবস্তু হিসেবে সে একেবারে অদ্বিতীয়, যেখানে রসসত্তা হিসেবে সে একেবারে অনন্য। রসপরিচয়বাদী তাঁর সমালোচনায় এই অনন্যতার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন। রামায়ণ আর ইলিয়াড দুই-ই নারীহরণ ও যুদ্ধকাহিনী, দুই-ই উত্তম মহাকাব্য, দুই দেশের দুটি শ্রেষ্ঠ রত্ন। তবু রামায়ণ ইলিয়াড নয়, ইলিয়াড রামায়ণ নয়। সমালোচকের লক্ষ্য হবে রামায়ণের রামায়ণত্ব, অথবা ইলিয়াডের ইলিয়াডত্ব। মেঘদূতও উত্তম, মহাভারতও উত্তম। শুধু উৎকর্ষের পরিমাপ দিয়ে মেঘদূতকেও চেনা যাবে না, মহাভারতকেও

চেনা যাবে না। রসপরিচয়বাদীদের মতে, সমলোচক আসল মেঘদূতকে, আসল মহাভারতকে দেখিয়ে দেবেন। সমালোচকের কাজ সমালোচ্য বিষয়টিকে ঠিকভাবে চিনিয়ে দেওয়া—রসবস্তু হিসেবে চিনিয়ে দেওয়া।

রসপরিচয়মূলক সমালোচনার লক্ষ্যটা সুস্পষ্ট, কিন্তু সেই লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপায়টা স্পষ্ট নয়। তাঁদের চেষ্টাটা প্রশংসনীয়, কিন্তু সিদ্ধি বড়োই অনিশ্চিত। আগেই বলা হয়েছে, রসবস্তু বা সাহিত্যবস্তু বস্তু হিসেবে যা-ই হোক না কেন, রস হিসেবে অনন্য, বিকল্পরহিত এবং স্বয়ংসিদ্ধ। তার পরিচয় সে নিজেই, আর কেউ নয়। সমালোচক প্রবন্ধ লিখে তার কী পরিচয় দেবেন? অন্ধকার দিয়ে কি আলোকে দেখানো যায়? সমালোচক নিজেও আলো জ্বালতে পারেন—আর-একটা রসবস্তু রচনা করতে পারেন। কিন্তু সে হ'লো একটা আলো জ্বালিয়ে আর-একটা আলোকে দেখানোর মতন, টর্চ জ্বালিয়ে সূর্যকে দেখানোর মতন।

বলা হয়, সমালোচক অনুরূপ রসের সঞ্চার ক'রে তার সাহায্যে মূল বিষয়ের রসকে চিনিয়ে দেন। কিন্তু একটা রস যে আর একটা রসের যথার্থই অনুরূপ, তা শুধু তিনিই বুঝতে পারেন যিনি স্বাধীনভাবে সমালোচ্য বিষয় ও সমালোচনা দুই রসবস্তুরই আস্বাদ গ্রহণ করতে পারেন, এবং একই সঙ্গে দুই রসবস্তুকে চিত্তের মধ্যে পাশাপাশি সাজিয়ে মিলিয়ে দেখতে পারেন। সকলে সে-রকম পারেন না। যিনি পারেন, তিনি তো সমালোচ্য বিষয়ের রসকে আগেই চিনে নিয়েছেন—সমালোচনা তার জন্য নয়।

রসপরিচয়ের এই সব এবং আরো অনেক তত্ত্বগত বাধা নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এই সব বিবেচনা কার্যক্ষেত্রে রসপরিচয়মূলক সমালোচনার খুব বড়ো প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে নি। সমালোচকের কাছে পাঠক সমালোচ্য বিষয় সম্পর্কে যে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা প্রত্যাশা করে, বিষয়-পরিচিতি তার একটা বড়ো দিক। কিন্তু রূপের পরিচয়, রসের পরিচয়কে বাদ দিলে বিষয়ের পরিচয় আর কতোটুকু সম্ভব হতে পারে? যথার্থ বিষয়-পরিচিতি থেকে রসপরিচিতিকে পৃথক্ করা যায় না। মনে রাখতে হবে, সাহিত্যে অনুভূতির স্থান মোটেই অগণ্য নয়। এক অনুভূতিকে আর-এক অনুভূতি দিয়ে হয়তো পুরো ধরা যায় না, কিন্তু যেটুকু ধরা যায়, তা হয়তো

অনুভূতির সরণী দিয়েই, অন্য পথ নেই। অনুভূতির সরণী আলোকিত রাজপথ নয়, তার বিসর্পিল গতি অনেক আলো-আঁধারি পার হয়ে আসে। · সাহিত্যবস্তুর সমগ্র পরিচয় দিতে হলে' সমালোচককে আলো-আঁধারির রাজ্যে পা দিতেই হবে। তথ্য নয়, তর্ক নয়, ব্যাখ্যা নয়, বিশ্লেষণ নয়—উপলব্ধির সাক্ষ্যই সেখানে শেষ কথা।

বস্তুত, সাহিত্যের যে-দিকটি বুদ্ধির অতীত, যে দিকটি রহস্যময়, যে দিকটি যুক্তি তর্ক বিচার সবকিছুকেই এড়িয়ে যায়, যার পরিচয় কেবল রূপচেতনাতে, কেবল রসোপলব্ধির মধ্যে, তাকে নিছক বিবৃতির ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়, অথচ তাকে সম্পূর্ণ বাদ দিতে গেলে হ্যাম্‌লেট-নাটক থেকে ডেনমার্কের রাজকুমারই যেন বাদ পড়ে যাবেন। এইখানেই রসপরিচয়বাদের জোর। রসপরিচয়ের চেষ্টা সমালোচকের দায়িত্বেই অঙ্গ, তার সাফল্য যা-ই হোক না কেন।

সাফল্য যে কখনোই হয় না, সমালোচনার ইতিহাস সে-কথা বলে না। তাছাড়া ক্ষেত্রটা এমন যে এখানে সাফল্যের মান আলাদা, সাফল্যের আদর্শ আলাদা। বিশেষত এখানে সব সাফল্যই আপেক্ষিক সাফল্য, সব ব্যর্থতাই আপেক্ষিক ব্যর্থতা। সাহিত্য যদি হিসেব-কষা বিজ্ঞান হ'তো, তাহলে তার সম্পর্কে যে-চেষ্টাকে আমরা নিশ্চিতভাবে ব্যর্থ বলতে পারতাম, সাহিত্য সাহিত্য বলেই সেই ধরনের অনেক আপাত-ব্যর্থ চেষ্টাকে আমাদের মূল্য দিতে হয়।

রসপরিচয়মূলক বা সৃজনশীল অথবা ইম্‌প্রেশনিস্টিক সমালোচনার ব্যর্থতার নিদর্শন হিসেবে—সাহিত্য হিসেবে সার্থক হয়েও যা সমালোচনা হিসেবে ব্যর্থ—এমন সমালোচনার উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে ওয়াল্টার পেটারের মোনালিসা চিত্রসমালোচনার কথা প্রায়ই উল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু কোন্ সর্বজনস্বীকৃত মাপকাঠি দিয়ে এখানে পেটারের ব্যর্থতাকে পরিমাপ করা যাবে? রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'মেঘদূত' প্রবন্ধটিকে যদি সমালোচনা বলে মানি, তাহলে তাকেও অনুরূপ একটি দৃষ্টান্ত বলে ধরা যেতে পারে। কিন্তু 'মেঘদূত' যে সমালোচনা হিসেবে ব্যর্থ, কোন্ বিচারে তা বলা যাবে? রবীন্দ্রনাথের 'রাজসিংহ' রসপরিচয়মূলক সৃজনশীল

সমালোচনা। ব্যাখ্যা এবং বিচার আছে সন্দেহ নেই, কিন্তু রসপরিচয়াত্মক বর্ণনা—বর্ণনার মধ্যে দিয়ে পুনর্গঠন—এইটেই এর প্রধান অংশ। 'রাজসিংহ' যদি ব্যর্থ হয়, তাহলে কোন্ সমালোচনা যে সার্থক জানি না।

খাঁটি ইম্‌প্রেশনিস্টিক সমালোচনা, যা প্রভূত পরিমাণে সমালোচকের তাৎক্ষণিক মেজাজের উপর নির্ভরশীল, তা বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে খুব প্রাধান্যলাভ করতে পারে নি। প্রথম যৌবনের দু'চারটি রচনার কথা বাদ দিলে, এমন কি রবীন্দ্রনাথেও এ-বস্তু বেশি দেখতে পাওয়া যাবে না। বাংলা সমালোচনায় রসপরিচয়াত্মক বিষয়বর্ণনা কাহিনাবর্ণনা, এরই প্রাধান্য দেখা যায়।

বর্ণনা রসপরিচয়মূলক সমালোচনার একটি প্রধান অঙ্গ। আগেই বলেছি, যে-বর্ণনা কেবল বর্ণনার জন্যই, তার মূল্য যৎসামান্য। কিন্তু বর্ণনা যেখানে রসসঞ্চারের উপায় এবং উপলক্ষ, সেখানে তার মূল্য অস্বীকার করা যায় না। শিল্পীসমালোচকের হাতে সৃজনধর্মী বর্ণনা সমালোচনায় ইন্দ্রজাল রচনা করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'রাজসিংহে', কিছু কিছু 'কাব্যের উপেক্ষিতা-'য়, কিছু কিছু 'শকুন্তলা'য় এই ইন্দ্রজালের সাক্ষাৎ পাবো।

কিন্তু সে-ইন্দ্রজাল সকলের জন্য নয়। বর্ণনায় সকলেই অধিকার আছে, কিন্তু সৃজন সকল সমালোচকের সাধ্যায়ত্তও নয়। যাঁর অবাধ সৃজনের পথে অগ্রসর হওয়ার অধিকার আছে, তাঁর পক্ষে বর্ণনার অবলম্বন অত্যাবশ্যকও নয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত' প্রবন্ধে দেখতে পাই।

অবাধ সৃজন নয়, বর্ণনাত্মক রসপরিচয়ই অধিকাংশ রসপরিচয়বাদী সমালোচকের অভীষ্ট। বিষয়বর্ণনার মধ্যে দিয়েই, কাহিনীর পুনর্গঠনের মধ্যে দিয়েই সমালোচনায় রসসঞ্চারের অবকাশ ঘটে, অলক্ষ্যে সীমিত অর্থে সৃজনশীলতারও অবকাশ ঘটে। এইভাবে রসাত্মক বিষয়বর্ণনার মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হওয়াই সমালোচনার সব থেকে প্রচলিত এবং পরিচিত রীতি। বাংলাসাহিত্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-প্রবন্ধ 'উত্তর-চরিতে'র কথা এখানে স্মরণ করতে পারি। প্রবন্ধটির একেবারে শেষ ভাগে বঙ্কিমচন্দ্র বিচারের উপর জোর দিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু প্রবন্ধটির দীর্ঘতর এবং উৎকৃষ্টতর অংশ—অর্থাৎ প্রবন্ধটির প্রথম দুই-তৃতীয়াংশ এই জাতীয়

রসাত্মক বর্ণনার রীতি অনুসরণ ক'রেই রচিত। বিশ্বস্ত বিষয়-বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার মনোধর্মের অনুকূল নয়, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে, সীমিত পরিধির মধ্যে, রবীন্দ্রনাথও এই রীতি অনুসরণ করতে কুণ্ঠিত হন নি। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' এই রীতির সমালোচনার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

৭

একটি ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুতে যেমন সমস্ত আকাশ প্রতিফলিত হয়, সাহিত্যেও অনেকটা সেই রকম ঘটে—বিশেষ একটি সাহিত্যবস্তুর শিশির-বিন্দুতে বিরাট মহাবিশ্ব এবং বিপুল মহাকাল যেন আপন আপন ছায়াকে মেলে ধরে। সাহিত্যের সবটাই যদি বর্তমান মুহূর্তের দান হ'তো, তার মধ্যে যদি সুদূর অতীতের, বিস্মৃত জন্ম-জন্মান্তরের ছায়া এসে আপতিত না হ'তো, তাহলে সাহিত্যের মধ্যে জটিলতা ও দুর্বোধ্যতার হয়তো খুব বেশি-কিছু থাকতো না। সাহিত্য যদি একটি বিশেষ দেশের বিশেষ সংস্কৃতিরই দান মাত্র হ'তো, তার মধ্যে যদি অসংখ্য অদৃশ্য পথে নানা দূর দেশের, নানা দূর সংস্কৃতির দান নানাভাবে নানা অলক্ষিত উপায়ে এসে মিশে না যেতো, তাহলেও তার মধ্যে জটিলতা ও দুর্বোধ্যতার অবকাশ কমই ঘটতো—তাকে বোঝবার জন্য খুব বেশি প্রয়াসের দরকার হ'তো না। অথবা, সাহিত্য যদি কেবল একলা লেখকেরই ব্যাপার হ'তো, যদি তার মধ্যে সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ইতিহাসের ঘটনা, দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—যদি তার মধ্যে ভৌগোলিক পরিবেশ, জলবায়ু, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য—যদি তার মধ্যে নদী-পর্বত, অরণ্য-প্রান্তর, নগর-গ্রাম সব-কিছু গভীরভাবে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে না থাকতো, তাহলেও তা পাঠকের কাছে অনেক সহজবোধ্য, সহজগ্রাহ্য ব্যাপার হ'তে পারতো।

সাহিত্যের রচয়িতা যদি নিছক লেখকমাত্রই হতেন, সাহিত্যের মধ্যে যদি তাঁর কর্মজীবন, পারিবারিক জীবন, দাম্পত্যজীবন—তার আশৈশব সমগ্র ব্যক্তিজীবন প্রবিষ্ট না হ'তো, তাহলেও পাঠকের

কাজ, সমালোচকের কাজ বেশ সহজ হয়ে যেতে পারতো। এমন কি, সাহিত্যের সবটাই যদি লেখকের সজাগ বুদ্ধির ক্রিয়া হ'তো, সবটাই যদি লেখকের জাগ্রত-চৈতন্যের ব্যাপার হ'তো, তার মধ্যে যদি লেখকের অবচেতন মনের কোনো দান না থাকতো—অথবা, জানি না, তার মধ্যে যদি সমগ্র সমষ্টিগত অবচেতনা, যাকে বলা হয়েছে 'collective unconscious'—তার ক্রিয়া না থাকতো, তাহলেও হয়তো সাহিত্যপাঠের ব্যাপারে, সাহিত্য-সম্ভোগের ব্যাপারে ব্যাখ্যার বিশেষ কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকতো না।

অন্য দিকে সাহিত্যের ভাষা যদি একলা সাহিত্যিকেরই তৈরি জিনিস হ'তো, অথবা তা যদি কেবল অভিধানেরই অনুগামী হ'তো, সাহিত্যের ভাষা যদি বাধ্য ভারবাহী জন্তুর মতো নিস্তেজ, নির্জীব, বশংবদ বাহন হ'তো, যদি সে বেগবান দুরন্ত উচ্চৈঃশ্রবার মতো দুর্ধর্ষ শক্তি না হ'তো, যদি সে নিজেও স্রষ্টা না হ'তো, তাহলেও ব্যাখ্যার প্রয়োজন অনেকখানি কমে' যেতো। কিন্তু তা হবার উপায় নেই। মানুষের প্রত্যেক ক্রিয়া, প্রত্যেক সৃষ্টি, প্রত্যেক অস্ত্র মানুষকেই তৈরি করে। সুতরাং ভাষার সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, সাহিত্যের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, যেমন বিবিধার্থসাধক, তেমনি বহুমুখী ও বহুস্তরান্বিত। তার যতোটুকু জানা, তার থেকে অজানা বেশি, যতোটুকু দৃশ্যমান, তার থেকে অদৃশ্য বেশি, যতোটুকু উক্ত, তার থেকে অনুক্ত বেশি। সাহিত্যের সবটাই সরল, সাবলীল এবং স্বপ্রকাশ নয়। এইখানেই ব্যাখ্যাবাদী সমালোচকের জোর।

সাহিত্য জীবনের ফসল, সাহিত্য জীবনেরই দান। তা জীবনেরই মতো জটিল, জীবনেরই মতো দুজ্ঞের্য়, জীবনেরই মতো দুর্বোধ্য। সাহিত্যের এই মৌল দুর্বোধ্যতাই ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার মুখ্য উদ্বেজনা। সাহিত্য যদি জীবনের পরিচয় হয় এবং—যেটা আরো তাৎপর্যপূর্ণ কথা—সাহিত্য যদি জীবনের ভাষ্য হয়, তাহলে সমালোচনা হ'লো সাহিত্যের ভাষ্য। ব্যাখ্যাবাদী সমালোচক বলেন, সাহিত্যিক যেমন জীবনের ভাষ্যকার, সমালোচকও তেমনি সাহিত্যের ভাষ্যকার—তাঁর ভাষ্যের সূত্রগুলি প্রধানত জীবন থেকেই আহরিত।

ব্যাখ্যাও এক ধরনের পরিচয়, কিন্তু পরিচয়মাত্রেই ব্যাখ্যা নয়। যে-ব্যাখ্যা রসের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট, সে-ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র গোত্র রচনা করে না। সে রসপরিচয়েরই অঙ্গ। ব্যাখ্যা যখন প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যের মূল্যায়নের সঙ্গে অর্থাৎ রসবিচারের সঙ্গে যুক্ত, তখনও সে কোনো স্বতন্ত্র গোত্র নয়। তখন সে মূল্যায়নেরই অঙ্গ। সেই ব্যাখ্যা নিয়েই সমালোচনার স্বতন্ত্র গোত্র, যে-ব্যাখ্যা রসের নয়, বিচারের নয়, যে-ব্যাখ্যা প্রথমত এবং প্রধানত তথ্যগত ব্যাখ্যা—সাহিত্যবস্তুর ভিত্তিমূলে, তার পূর্বপটে, পশ্চাৎপটে, তার পরিবেশে, আবহমণ্ডলীতে যে সব তথ্য তার অস্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্যের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ, তাদের সহায়তায় সাহিত্যব্যাখ্যা। সে-ব্যাখ্যা অবশ্য পরোক্ষভাবে রসের সঙ্গে বা মূল্যের সঙ্গে যুক্ত থাকতে বাধ্য, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে নয়। ক্ষেত্রবিশেষে তা রসপরিচয় বা মূল্যায়নের সহায়ক হতে পারে বটে, কিন্তু সমালোচকের সেটা সাক্ষাৎ লক্ষ্য নয়। সমালোচকের ক্রিয়াটি চরিত্রধর্মের দিক থেকে তথ্যসন্ধান, তথ্যবিন্যাস, তথ্যবিশ্লেষণ—এবং অবশেষে তথ্যগত সিদ্ধান্ত, অনেকটা সেই রকম যে-রকম বিজ্ঞানীরা ক'রে থাকেন। রসের সঙ্গে অথবা বিচারের সঙ্গে সম্পর্ক যদি কোথাও কিছু না থাকতো, তাহলে ব্যাপারটাকে পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া বলা যেতে পারতো। যদিও ব্যাখ্যতেই ব্যাখ্যার শেষ নয়—এবং যদিও তথ্যই শেষ-কথা নয়, তা হ'লেও ব্যাখ্যাপন্থী সমালোচকের অব্যবহিত দায়িত্ব যে তথ্যকে নিয়েই, তা অস্বীকার করা যায় না।

এই প্রসঙ্গে ভাব-ব্যাখ্যার কথা, তত্ত্ব-ব্যাখ্যার কথা তোলা যেতে পারে। ভাব কিংবা তত্ত্ব, তাকেও কি তথ্য বলতে হবে? না বলবার হেতু নেই। ভাবই হোক আর তত্ত্বই হোক, সাহিত্যে তারা তো কখনোই শেষ কথা নয়, কখনোই পরম বস্তু নয়, তারা সাহিত্যের উপাদান উপকরণের অঙ্গ, সাহিত্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সংলগ্ন। সেই কারণে, ব্যাখ্যার বিশেষ প্রসঙ্গ-ক্ষেত্রের মধ্যে ভাবই হোক আর তত্ত্বই হোক, চরিত্রধর্মে তারাও তখন তথ্যজাতীয়।

যে-তথ্য ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার প্রধান অবলম্বন, সে-তথ্য সব সময়ই অল্পবিস্তর নিহিত তথ্য, আপেক্ষিক অর্থে দুর্জ্ঞেয় তথ্য। সমালোচক সেই

সব তথ্যেরই সন্ধান করবেন, যা সাহিত্যবস্তুটির অন্ধকার মূলদেশকে আলোকিত করবে, সাহিত্যবস্তুর সর্ববিধ রহস্যোদ্‌ঘাটনে যা সহায়তা করবে।

ব্যাখ্যা অর্থ কঠিনকে সহজ করা, জটিলকে সরল করা, দুর্বোধ্যকে সুবোধ্য করা। সব ব্যাখ্যাই বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের মধ্যে দিয়ে তথ্যের পুনর্বিন্যাস করে, এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্নকে সমগ্রের সঙ্গে যুক্ত করে, বিষয়কে নতুন তাৎপর্যে প্রতিষ্ঠিত করে। সাহিত্যব্যাখ্যা নানা রকমেরই হতে পারে, তবে ব্যাখ্যাপন্থী সমালোচকের সব ব্যাখ্যাই মূলত অভিন্ন— নিহিত কার্যকারণসূত্রের আবিষ্কার, সমগ্রের সঙ্গে সংযোগসাধন, বিষয়ের যথার্থ তাৎপর্যের উদ্‌ঘাটন। সোজা কথায়, সাহিত্যবস্তুর কী-কবে-কেন-কোথায় ইত্যাদির সহযোগে তাকে তার বস্তুগত ও ভাবগত সমগ্রতায় দেখা —এবং দেখানো।

যাঁরা চরম ব্যাখ্যাপন্থী, অর্থাৎ যাঁরা ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোনো-কিছুকেই সমালোচনা বলে মানতে রাজি নন, তাদের মূল বক্তব্যটা এইবারে শোনা যাক।

বিচার সম্পর্কে তাঁদের মত রসপরিচয়বাদীদেরই অনুরূপ। বিচারের কোনো নির্দিষ্ট মানদণ্ড নেই, সাহিত্যের ভালোমন্দের আদর্শ—বা সোজা কথায় সাহিত্যরুচি—দেশে-দেশে কালে-কালে ভিন্ন। ভালোমন্দের তর্ক সম্পূর্ণ পণ্ডশ্রম, অন্তত তা সমালোচকের কাজ নয়। অন্যপক্ষে, রসপরিচয় সম্পর্কে এঁদের অভিমত অবিকল বিচারপন্থীদের অভিমতের অনুরূপ। রসের কোনো বিকল্প নেই, নিজের বাইরে তার আর কোনো পরিচয় সম্ভব নয়। মূল রসের অনুরূপ কোনো রসের সৃষ্টি করা, তাও সমালোচকের কাজ নয়। তার কারণ রসসৃষ্টি কোনো বিষয়ান্তরের ধার ধারে না, অপর কিছু অনুরূপ হওয়ার বাধ্যবাধকতা তার নেই, রস নিজের খুশিতে নিজের মতো ক'রেই সঞ্চারিত হয়। সমালোচক যখন রসসৃষ্টি করেন, তখন তিনি স্বাধীন স্রষ্টা, মোটেই সমালোচক নন।

এঁদের মতে সমালোচকের কাজ পাঠকের রসাস্বাদনে সাহায্য করা, প্রত্যক্ষভাবে নয়, পরোক্ষভাবে—পাঠকের হাতে প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ

ক'রে, পাঠকের জ্ঞানগত বা বুদ্ধিগত ত্রুটিগুলিকে সংশোধন ক'রে। সমালোচকের কাজ পাঠকের পক্ষে রসাস্বাদনের উপযোগী জ্ঞানগত পরিবেশ রচনা ক'রে দেওয়া। যে ভূমিগর্ভ থেকে বিশেষ সাহিত্যবস্তুটি প্রাণরস আহরণ করেছে, যে-আকাশ যে-হাওয়া যে-জল যে-আলো সাহিত্যবস্তুটিকে পুষ্টি দিয়েছে, পাঠকের সামনে তার পরিচয় মেলে ধরা। কাজটা আস্বাদন গোত্রেরও নয়, জজিয়তীগোত্রেরও নয়, কাজটা টেক্‌নিক্যাল ধরনের—বুদ্ধিধর্মী এবং অনুসন্ধানমূলক, অনেকটা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের মতো। সমালোচনার নেপথ্যভূমিতে যদি মূল্যের স্বীকৃতি না থাকতো, সমালোচকের উদ্বেজনামূলে যদি রসচেতনার ক্রিয়া না থাকতো, তথ্যগত আবিষ্কারই যদি সমালোচনার শেষ লক্ষ্য হ'তো, তাহলে সমালোচকের কাজটাকে খাঁটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানই বলা চলতো। এখানে বলে' রাখা দরকার যে, এমন অনেক ব্যাখ্যাপন্থী আছেন যাঁরা সমালোচনাকে খাঁটি বিজ্ঞান বলেই মনে করেন।

সমস্ত ব্যাখ্যাই মূলত সংযোগসাধন। কিন্তু সংযোগের ক্ষেত্র অসংখ্য। তার কারণ সাহিত্যের সঙ্গে জীবন এবং জীবনের সঙ্গে সাহিত্য অসংখ্য দিক থেকে অসংখ্যভাবে যুক্ত। সেই কারণে ব্যাখ্যার ক্ষেত্রও অসংখ্য। এক-একটি ক্ষেত্র নিয়ে ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার এক-একটি উপগোত্র গড়ে' উঠেছে। যেমন, সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা, মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা, ঐতিহাসিক সমালোচনা, জীবনীভিত্তিক সমালোচনা ইত্যাদি।

সম্প্রতিকালে ব্যাখ্যার আরো অনেক নতুন ক্ষেত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি পড়েছে। এবং তার ফলে আমরা আরো অনেক নতুন নতুন উপগোত্রের সাক্ষাৎ পেতে আরম্ভ করেছি। তার কোনোটা নৃতত্ত্বভিত্তিক, কোনোটা বা পুরাতত্ত্বভিত্তিক, কোনোটা-বা এই দু'য়ের কাছ থেকেই সাহায্য নিয়ে জোর দিয়েছে প্রাচীন পুরাণ-কথা (মিথ্‌) এবং লোক-কথার উপর। বিভিন্ন ক্ষেত্রের তথ্যজ্ঞানকে মাধুকরী-আহরণের দ্বারা সংকলিত ক'রে, সমস্তটাকে ইয়ুং-এর মনস্তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে, বিশেষ ক'রে তাঁর 'সমষ্টিগত অবচেতনা' বা collective unconscious'-এর কাঠামোতে ফেলে, আর-এক নতুন উপগোত্র সমালোচনা জগতে কিছুকাল যাবৎ প্রতিষ্ঠা পেতে শুরু করেছে, যার নাম আর্কিটাইপ্যাল সমালোচনা।

ভাষাভিত্তিক টীকাভাষ্য, যা এক সময় বিশেষ ক'রে বাইবেল পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রেই প্রাধান্য লাভ করেছিল, বর্তমানকালে তা সমস্ত সাহিত্যপাঠের ক্ষেত্রেই প্রভূত গুরুত্ব পেয়েছে। যে-টেক্‌স্‌চুয়াল সমালোচনা অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি বা মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠভিত্তিক সমালোচনা—বিশুদ্ধ পাঠের প্রতিষ্ঠা, পাঠান্তর-বিচার, প্রক্ষিপ্তের বর্জন, পাণ্ডুলিপি-বিচার ইত্যাদি যে-সব কর্ম এক সময় কেবল প্রবীন অধ্যাপক, খুঁৎখুঁতে সম্পাদক এবং বাতিকগ্রস্ত গবেষকের নেশার বিষয় ছিল, বিশেষ ক'রে নব্য-ক্রিটিকদের টেক্‌স্‌ট-ভিত্তিক সমালোচনাতত্ত্বের প্রসাদে তা এখন সাহিত্যসমালোচনার একটি বিশিষ্ট ধারা রূপে স্বীকৃতি পেয়েছে।

ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার উপগোত্রগুলির প্রত্যেকের সীমানা যে সুনির্দিষ্ট, প্রত্যেকের প্রসঙ্গক্ষেত্র যে স্বতন্ত্র এবং পরস্পরবহির্ভূত এমন বলা যায় না। এদের নামকরণেও খুব একটা নিয়মশৃঙ্খলা দেখতে পাওয়া যায় না। বৈজ্ঞানিক বিভজনের সূত্র ও বিধিনিষেধকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই সমালোচনার ইতিহাসে নানা ঘটনার মধ্যে দিয়ে এক-এক ক'রে এই উপগোত্রগুলো গজিয়ে উঠেছে। বিশৃঙ্খলার দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলেই ব্যাপারটি বোঝা যাবে।—

ঐতিহাসিক সমালোচনা এবং সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা নামে পৃথক্ হলেও কাজে মোটেই পৃথক্ নয়। ঐতিহাসিক সমালোচনার একটি পণ্ডিতী কিন্তু শীর্ণ শাখা প্রাচীন লেখকের রচনার আলোচনায় তৎকালীন ঐতিহাসিক পটভূমিকার উপর একটু অতিরিক্ত রকমের জোর দিয়েছে। জোরটা একান্তভাবে তৎকালীনতার উপর, কার্যকারণসূত্রের গভীরতার উপর নয়। এই বিশেষ শাখাটিকে বাদ দিলে, সমস্ত ঐতিহাসিক সমালোচনাই সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা, সমস্ত সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনাই ঐতিহাসিক সমালোচনা। জীবনীভিত্তিক সমালোচনা একটি স্বতন্ত্র উপগোত্র হ'লেও, সূক্ষ্ম অর্থে তাকেও ঐতিহাসিক সমালোচনা বলা যায়। অন্য দিক থেকে, জীবনীভিত্তিক সমালোচনাকে মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা বলতেও খুব বাধা নেই। প্রসঙ্গক্ষেত্রের অথবা আপেক্ষিক গুরুত্বের অল্পস্বল্প পার্থক্য ছাড়া এদের মধ্যে অন্য কোনো পার্থক্য নেই বললেই হয়।

তেইনের সাহিত্যসমালোচনা ও মার্কস্‌বাদী সাহিত্যসমালোচনায় মৌলিক ভেদ আছে, কিন্তু সমালোচনাতত্ত্বের দৃষ্টিতে দুই-ই ঐতিহাসিক, দুই-ই সমাজতাত্ত্বিক। বঙ্কিমচন্দ্রের 'উত্তরচরিতের' সূচনাংশ বা গীতি-কাব্যের আলোচনা, অথবা রবীন্দ্রনাথের রামায়ণ-ব্যাখ্যা বা তাঁর লোক-সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনা জীবনদর্শনে মানসিকতায় এবং অন্যান্য নানা দিকের বিবেচনায় রাল্‌ফ ফক্সের উপন্যাস আলোচনা থেকে বা জর্জ লুকাকৃসের সাহিত্যসমালোচনা থেকে নিশ্চয়ই পৃথক্‌, কিন্তু এর সবগুলোই ঐতিহাসিক সমালোচনা, সবগুলোই সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনা। এড্‌মাণ্ড উইল্‌সনের সমালোচনাগ্রন্থগুলি জীবনীভিত্তিক সমালোচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। গ্রন্থগুলিকে অনায়াসে ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার নিদর্শন বলেও ধরা যায়। অন্য দিকে, মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনার দৃষ্টান্ত হিসেবেও এদের দাবি নিতান্ত কম নয়। বস্তুত উইল্‌সনের সমালোচনার মধ্যেই আমরা ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার অনেকগুলি উপগোত্রের পরস্পরের মধ্যেকার মৌলিক অভিন্নতার চমৎকার নিদর্শন দেখতে পাব।

আলাদা ক'রে দেখলে, মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা ব্যাপারটাও কিছু কম জটিল নয়। এই উপগোত্রটির মধ্যে প্রসঙ্গক্ষেত্রের ভিন্নতা অনুযায়ী অন্তত তিনটি প্রশাখার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কার মনস্তত্ত্ব তাই নিয়েই এই ভিন্নতা। সাহিত্যের একদিকে যেমন সাহিত্যগত পাত্রপাত্রী—সাহিত্য-সংসারের নরনারী, হ্যাম্‌লেট-ম্যাক্‌বেথ-ভাঁড়ুদত্ত-কপালকুণ্ডলা-বিনোদিনী—অন্যদিকে তেমনি এক প্রান্তে লেখক, অন্য প্রান্তে পাঠক। এখন প্রশ্ন হ'লো, সমালোচক তাঁর সমালোচনায় কার মনস্তত্ত্ব ব্যাখ্যা করবেন—সাহিত্যমধ্যগত পাত্রপাত্রীর, না লেখকের, না পাঠকের? তিন রকমই সম্ভব, এবং তিন রকমই করা হয়ে থাকে। তিনটিই মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা নামে পরিচিত।

আর্ন্‌স্ট জোন্‌স্‌-কৃত হ্যাম্‌লেট-চরিত্রের ফ্রয়েডীয় ব্যাখ্যা প্রথমটির সুপরিচিত দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথের 'মালিনী' নাটকের মালিনী-চরিত্র নিয়ে—মালিনীর প্রেম নিয়ে যে-সব মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা বা তর্ক-বিতর্ক হয়েছে, তাকেও এই জাতীয় সমালোচনার নিদর্শন বলে ধরা যায়। রোহিণীকে

নিয়ে বা শৈবলিনীকে নিয়ে যে-আলোচনা কিংবা দামিনীকে নিয়ে বা অচলাকে নিয়ে যে-আলোচনা, তা-ও এই জাতের মনস্তাত্ত্বিক সমালোচনা।

আজকাল সাহিত্যগত নরনারীর মনস্তত্ত্ব-ব্যাখ্যার কদর কমে' গিয়েছে। এখন লেখক-মনস্তত্ত্ব বা শিল্পীর মনস্তত্ত্বই সমালোচকদের অধিক কৌতূহলের বিষয়। সাহিত্যসমালোচনা না হ'লেও ফ্রয়েড-কৃত লেয়োনার্দো দা ভিঞ্চির আলোচনা এই জাতীয় সমালোচনার অন্যতম প্রধান পথপ্রদর্শক। লেখকের মনস্তত্ত্ব অবলম্বন ক'রে সাহিত্যসমালোচনার চমৎকার নিদর্শন মিলবে এড্‌মাণ্ড উইল্‌সনের জীবনীভিত্তিক সমালোচনাসমূহে। এই জাতীয় সমালোচনা প্রকৃত পক্ষে সমালোচনা কি জীবনী তা নির্ণয় করা কঠিন হয়ে পড়ে। সার্ত্রে'র বোদ্‌লেয়ারের জীবনী যুগপৎ সাহিত্যব্যাখ্যা এবং জীবনব্যাখ্যা।

পাঠক-মনস্তত্ত্ব সমালোচকের পক্ষে সব থেকে আলো-আঁধারির এলাকা। সাহিত্যতত্ত্বে পাঠকের মন যে-পরিমাণ গুরুত্ব পেয়েছে, ব্যবহারিক সমালোচনায় মোটেই তা পায় নি। আই. এ. রিচার্ড্‌স কিংবা কেনেথ্‌ বার্কের লেখায় আমরা পাঠক-মনস্তত্ত্ব অবলম্বন ক'রে সাহিত্য-আলোচনার কিছু নিদর্শন পাবো।

আর্কিটাইপ্যাল সমালোচনা নামের উপগোত্রটির মধ্যেও জটিলতা বা মিশ্রণের অন্ত নেই। আর্কিটাইপ্যাল সমালোচনাকে এক দিকে যেমন পুরাতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বলা যায়, এবং ঠিক অনুরূপ না হ'লেও প্রায় অনুরূপ কারণেই যেমন তাকে পুরাণ-কথা-ভিত্তিক (মিথ্‌-ভিত্তিক) ব্যাখ্যা বলা যায়, তেমনি বিপরীত দিক থেকে তাকে মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বলতেও কোনো বাধা নেই। আবার একটু গভীর অর্থে ধরলে একে ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা, সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বলতেও কোনো অসুবিধা নেই। এ থেকে সহজেই বোঝা যায়, এইসব ভাগগুলো কীভাবে একে অপরের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে আছে।

আর্কিটাইপ্যাল সমালোচনার একটি নিজস্ব অসুবিধার ব্যাপারও আছে। তা হ'লো অপ-বিজ্ঞানের আক্রমণ। সকলেই জানেন, আর্কিটাইপ্যাল সমালোচনার আসল অবলম্বন ডেপ্‌থ্‌ধর্মী মনোবিজ্ঞান—বিশেষ ক'রে ইয়ুংপন্থী মনোবিজ্ঞান, যদি তাকে আদৌ বিজ্ঞান বলা যায়। সে যা-ই

হোক, আর্কিটাইপ্যাল সমালোচনার পা দু নৌকোয়। তার দ্বিতীয় অবলম্বন পুরাতত্ত্ব। কিন্তু মুশকিল এই যে, ইয়ুং-পন্থী মনস্তত্ত্বের সঙ্গে পুরাতত্ত্বের কোনো নিবিড় যোগ বা কোনো অপরিহার্য সম্পর্ক নেই। এবং একই সঙ্গে উভয় ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ হওয়াও কারো পক্ষে সম্ভব নয়। আর্কিটাইপ্যাল সমালোচনার অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি মড বড্‌কিন-কে যদি আদৌ বিশেষজ্ঞ বলতে হয়, তো তিনি ইয়ুংপন্থী মনোবিদ্য'—অথবা সাহিত্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগের বিশেষজ্ঞ, পুরাতত্ত্বের নন।

পুরাতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব সম্পূর্ণ পৃথক্ বিদ্যা, উভয়ের ক্ষেত্র স্বতন্ত্র। এরা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে, এবং করে, কিন্তু কেউ কারো নির্ভর হতে পারে না। এ-কথা নৃতত্ত্ব ও মনোবিদ্যার সম্পর্কেও সমানভাবেই প্রযোজ্য। নৃতত্ত্ব ও মনোবিদ্যার পারস্পারিক সাহায্যের উদাহরণ ফ্রেজারে বা ফ্রয়েডে মিলবে। খাঁটি পুরাতাত্ত্বিক সমালোচনার কথা ধরা যাক। কর্ন্‌ফোর্ড, গিলবার্ট মারে কিংবা জেন হ্যারিসনের সাহিত্যব্যাখ্যা মনস্তত্ত্বের সাহায্য নিতে কুণ্ঠিত নয়. কিন্তু কোনো মনস্তত্ত্ববিশেষের উপর সে নির্ভরশীল নয়। তার আসল জোর মিথ্ এবং রিচুয়ালের উপর। এঁরা—প্রাচীন গ্রীক সংস্কৃতির উল্লিখিত বিশেষজ্ঞেরা মুখ্যত পুরাতত্ত্বেরই সাধক। এঁদের আসল উত্তমর্ণ একটিই এবং সেখানে এঁদের পাদপীঠ সুদৃঢ়। এঁদের সমালোচনা সাধারণত নিজের অধিকার-ভূমির বাইরে বিচরণ করে না এবং সেই কারণে এঁদের আলোচনায় অপবিজ্ঞানের অনুপ্রবেশের সুযোগ কম।

আর্কিটাইপ্যাল সমালোচনার প্রধান নির্ভর বিশেষ এক জাতের ডেপথ্-মনস্তত্ত্ব। কিন্তু তার বিচরণ-ক্ষেত্র সুবিস্তৃত এবং তার উত্তমর্ণ অনেক। এই সমালোচনা মানুষের মনের রহস্য আর মানুষের সুদূর অতীতের রহস্য উভয়কে একই পেটিকার মধ্যে ধ'রে তাকে সাহিত্যব্যাখ্যার কাজে লাগাতে চায়। অর্থাৎ আর্কিটাইপ্যাল সমালোচনা পুরাতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ব উভয়ের উপরেই প্রায় সমানভাবে নির্ভর করতে চায়। জ্ঞানের অপরিহার্য সীমাবদ্ধতার ফলে তাকে উভয় দিকেই অপবিজ্ঞানের প্রবেশপথ উন্মুক্ত ক'রে দিতে হয়।

সে যা-ই হোক, বোধকরি তথ্য-আশ্রিত এবং অনুসন্ধানধর্মী বলেই

উপগোত্রের সংখ্যা ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার ক্ষেত্রেই সর্বাধিক। মানুষের তথ্যজ্ঞান যতো নতুন পথে নতুন দিগন্তের সন্ধান পাচ্ছে, ততোই সাহিত্য-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নতুন-নতুন উপগোত্রের উপ-উপগোত্রের জন্ম হচ্ছে। সমালোচনা যেখানে বিজ্ঞানকে আদর্শ রূপে গ্রহণ করে সেখানে এইটেই স্বাভাবিক।

একটা কথা এখানে উল্লেখ করা দরকার। তথ্যের অনুসন্ধান মাত্রেই জ্ঞান নয়; তথ্য মাত্রেই মূল্যবান নয়। সাহিত্যে ব্যাখ্যার জন্যই ব্যাখ্যা নয়। ব্যাখ্যাকারী-সমালোচক অনেক সময়ই এই কথাটা মনে রাখেন না। এই কারণেই ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে এতো বিশৃঙ্খলা।

ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার উপগোত্রগুলির মধ্যে স্বাভাবিকভাবে কোনো বিরোধ থাকবার কথা নয়। এটাই বাঞ্ছিত যে এরা একে অপরের পরিপূরক রূপে কাজ করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তা হয় না। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই অপরকে অস্বীকার ক'রে একান্ত হয়ে উঠবার ভাব, একটা যেন একচ্ছত্রতার দাবি লক্ষ করা যায়। এটা বোধকরি স্বাভাবিক। ব্যাখ্যার কোনো ক্ষেত্রই নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, সকলেই পরস্পরের মধ্যে অল্পবিস্তর অনুপ্রবিষ্ট। কিন্তু কী সমাজতত্ত্ব, কী ইতিহাস, কী মনস্তত্ত্ব কোনো ক্ষেত্রেই যখন পণ্ডিত ও গবেষকদের মধ্যে মতৈক্য নেই, তখন সাহিত্যব্যাখ্যার বিভিন্ন প্রসঙ্গক্ষেত্রগুলি যে অনায়াসে একে অপরের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে একটি নিটোল সমগ্রতার রচনা করবে না, তা সহজেই বোঝা যায়। মুশ্‌কিল এই যে, এদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরস্পর-বিরোধিতা ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে নেবার উপক্রম করে। সমালোচক, যিনি কোনো প্রসঙ্গক্ষেত্রেরই বিশেষজ্ঞ নন, তাঁর পক্ষে নানা মুনির নানা মতের বনে সম্পূর্ণ পথভ্রষ্ট ও সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত হয়ে পড়া কিছু অস্বাভাবিক নয়।

ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা যে সমালোচককে খানিকটা ভিক্ষাজীবীতে পরিণত করে তাতে সন্দেহ নেই। এটা অবশ্য নিতান্তই কম-বেশির কথা—পরিমাণের কথা। এ-বিপদ্ সব গোত্রের সমালোচনাতেই অল্পবিস্তর আছে। কোনো ক্ষেত্রেই সমালোচক স্বয়ম্ভূ, স্বয়ংসিদ্ধ বা স্বয়ং-সম্পূর্ণ নন। তবে ব্যাখ্যামূলক সমালোচনাতে—তথাকথিত বৈজ্ঞানিক সমালোচনাতে

সমালোচকের পরনির্ভরতা সর্বাধিক। একদিকে জ্ঞানের কঠিন সীমাবদ্ধতা, অন্যদিকে পদে পদে পরনির্ভরতা, এই অবস্থাটাকে সহজভাবে মেনে নিতে না পারলে অপবিজ্ঞানের প্রশ্রয়লাভ অবশ্যম্ভাবী!

বলা বাহুল্য, এটা ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার অথবা তার আর্কিটাইপ্যাল উপগোত্রের তত্ত্বগত ত্রুটি নয়, নিতান্তই ব্যবহারিক ক্ষেত্রের দুর্বলতা। তত্ত্বগত ত্রুটি—শুধু আর্কিটাইপ্যাল উপগোত্রের নয়, সমস্ত ব্যাখ্যামূলক সমালোচনারই—তত্ত্বগত ত্রুটি ঘটে সেইখানে, যেখানে ব্যাখ্যাকেই চরম বলে' ধরা হয়, যেখানে ব্যাখ্যার জন্যই ব্যাখ্যা, যেখানে সমালোচনা নিজেকে সাহিত্যের বিজ্ঞান বলে' দাবি করে।

সন্দেহ নেই, সাহিত্যেরও একটা বিজ্ঞান-অংশ আছে। সে তার নির্মিতির অংশ, তার আঙ্গিকের, তার পদ্ধতি-প্রকরণের অংশ। যে-ব্যাখ্যা এই ক্ষেত্রের মধ্যে আবদ্ধ, তাকে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বলতে আপত্তি নেই। তাকে সমালোচনার অঙ্গ বলতেও আপত্তি নেই। শুধু তা-ই নয়, অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা যে সমালোচনার পক্ষে অপরিহার্য, তা স্বীকার করতেও বাধা নেই। কিন্তু যতোই মূল্যবান হোক, যতোই অপরিহার্য হোক, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সমগ্র সমালোচনা নয়। এমন কি তা সমগ্র ব্যাখ্যাও নয়। তা সামগ্রিক সাহিত্যব্যাখ্যার ভগ্নাংশমাত্র। সাহিত্য শুধুই নির্মিত নয়। সাহিত্যের ব্যাখ্যাও তাই শুধুই নির্মিতির ব্যাখ্যা নয়। নির্মিতির বিজ্ঞান হয়, কিন্তু যা নির্মিত হ'লো সেই রসবস্তুর বিজ্ঞান হয় না।

বলা আবশ্যক যে, সব ব্যাখ্যাবাদী সমালোচনাই স্বাধিকারপ্রমত্ত নয়। তা যেখানে নয়, ব্যাখ্যা যেখানে রসবিচারের অথবা রসপরিচয়ের সহায়—অথবা ব্যাখ্যা যেখানে মূল্যসচেতন এবং মূল্যবোধের দ্বারা উদ্বোধিত, সেখানে ব্যাখ্যা মহামূল্যবান। বিচার উহ্য থাকতে পারে, রসপরিচয় নেপথ্যে থাকতে পারে, আধুনিক সমালোচনায় ব্যাখ্যার আসন রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্রস্থলে।

সমালোচনার গোত্র তিনটির পরিচয় দেবার সময় এমনভাবে বলা হয়েছে যেন এদের একটিকে গ্রহণ করলে অপর দুটোকে বর্জন করতেই হবে। এটা শুধু এদের প্রত্যেকের পরিচয়কে স্পষ্ট করার জন্য, প্রত্যেকের সমালোচনা-তত্ত্বকে তীক্ষ্ণ সীমারেখায় অঙ্কিত ক'রে দেবার জন্য, প্রত্যেকের স্বাতন্ত্র্যটুকুকে একান্ত ক'রে দেখবার জন্য। কিন্তু এই একান্ততাকেই যেন আমরা চরম বলে' মনে না করি। আপাতদৃষ্টিতে এদের যতোই পরস্পরবিরোধী মনে হোক না কেন, তত্ত্বের দিক থেকে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে, এদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্য আছে কিন্তু বিরোধ নেই। একই সমালোচক তাঁর সমালোচনা-কর্মের মধ্যে এই তিন গোত্রের সমালোচনাকেই স্থান দিতে পারেন, ক্ষমতা থাকলে এদের সমন্বিত ক'রেও নিতে পারেন।

এ তো গেল তত্ত্বের কথা। কার্যক্ষেত্রে এদের নৈকট্য আরো স্পষ্ট। তত্ত্বের তর্কে আমরা মনকে জল-অচল কতকগুলি ভিন্ন ভিন্ন কুঠুরিতে ভাগ ক'রে নিতে পারি, কার্যক্ষেত্রে সব সময় তা পারি না। আমরা জানি, তিন গোত্রের সমালোচনার প্রত্যেকটির অন্তর্নিহিত প্রবৃত্তি স্বতন্ত্র, সেই কারণেই এদের তিনটি পৃথক্ গোত্রে ভাগ করা সম্ভব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে মানুষ তার প্রবৃত্তিগুলিকে পৃথক্ রাখতে পারে না, কোনো একটিকে বেছে অপর দুটিকে একদম বাতিল ক'রে দেওয়া, তা-ও পারে না। রসবিচার আর রসপরিচয় নিবিড়ভাবে জড়ানো, কোন্‌খানে একটার শেষ অপরটার আরম্ভ ধরা যায় না। অন্যদিকে, নিজের কাছেই হোক, পরের কাছেই হোক, ব্যাখ্যা ভিন্ন—অর্থাৎ দুর্বোধ্যকে বোধগম্য করতে না পারলে, বিচ্ছিন্নকে সমগ্রে দেখতে না পারলে, রসপরিচয় রসবিচার কিছুই সম্ভব নয়। আবার এ-ও সমানই সত্য যে, মন যদি বিচারবিমুখ হয়, মন যদি রসের উদ্বেজনা না পায়, তাহলে ব্যাখ্যার প্রবৃত্তিই নয় হয়ে যায়। সমালোচক যেখানেই এই তিন প্রবৃত্তির একটিকে অপর দুটির বিরোধীরূপে গণ্য করেন, একটিকে গ্রহণ ক'রে অপর দুটিকে পরিহার করতে চেষ্টা করেন, সেইখানেই তিনি সমালোচনাধর্ম থেকে ভ্রষ্ট হন।

বস্তুত শ্রেষ্ঠ সমালোচকেরা প্রায় সকলেই, জেনে হোক আর না জেনে হোক, অল্পবিস্তর এই তিন পথেরই পথিক। মুখে যে যা-ই বলুন, শ্রেষ্ঠ সমালোচকেরা কেউই গোঁড়া অদ্বৈতবাদী নন, যদিও পন্থাবিশেষের প্রতি তাঁদের পক্ষপাত থাকতে পারে। কবিরা যেমন তাঁদের কবিস্বভাবের ভেদনিবন্ধন কাব্যজগতের এক-এক প্রদেশে বিচরণ করতে ভালবাসেন, সমালোচকেরাও তেমনি তাঁদের সমালোচক-স্বভাবের ভেদনিবন্ধন সমালোচ্য বিষয়ের এক-এক দিকের উপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখতে পাবো, প্রত্যেক পূর্ণাঙ্গ সমালোচনার মধ্যেই সাহিত্যবস্তুর তথ্যগত পরিচয়, মূল্যগত পরিচয় এবং রসবিশিষ্টতাগত পরিচয় একসঙ্গে মিশে থাকে।

আগেই বলেছি, পোয়েটিক্‌সে এ্যারিস্টট্‌ল যে সাহিত্যতত্ত্ব সমালোচনা-তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন এবং প্রসঙ্গক্রমে যেটুকু ব্যবহারিক সমালোচনার নিদর্শন দিয়েছেন, তার মধ্যে আমরা সমালোচ্য বিষয়ের রূপগত পরিচয় —এবং পরোক্ষভাবে রসপরিচয়, ব্যাখ্যা এবং বিচার, তিনেরই সাক্ষাৎ পাই। আপেক্ষিক গুরুত্বের অনেক ইতরবিশেষ হতে পারে, রোমাণ্টিকদের সমালোচনায় রসপরিচয়ের উপর এবং আধুনিক কালের সমালোচনায় তথ্যগত ব্যাখ্যার উপর কিছু বাড়তি ঝোঁক পড়তে পারে, কিন্তু অদ্যাবধি এ্যারিস্টট্‌ল-নির্দেশিত সমন্বিত-পন্থাকেই সমালোচনার ইতিহাসের প্রশস্ততম রাজপথ বলে' ধরা যেতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ—বাংলা সমালোচনাসাহিত্যের দুই দিকপালের দুজনেই এই সমন্বয়-পথের পথিক। দুজনের সমালোচনাতেই বিচার, রসপরিচয় ও ব্যাখ্যা অচ্ছেদ্যভাবে মিশে আছে। তা হলেও এঁদের সমালোচক-স্বভাবের ভেদকে মোটেই উপেক্ষা করা যায় না।

একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, বিচার বঙ্কিমচন্দ্রে স্পষ্ট, অকুণ্ঠ এবং সু-উচ্চারিত। রবীন্দ্রনাথে তা নয়। অনেক ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন প্রচ্ছন্ন, নেপথ্যচারী। অনেক সময় তা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা-প্রবন্ধের মূল উদ্বেজক বা পূর্বস্বীকৃতি, কিন্তু প্রবন্ধমধ্যে তার সরব আত্মপ্রকাশ নেই। আরো দেখা যাবে যে, ব্যাখ্যা আর রসপরিচয়ের মধ্যে

তুলনা করলে, বঙ্কিমচন্দ্রের ঝোঁক ব্যাখ্যার দিকে বেশি। অন্যপক্ষে, ব্যাখ্যার দিকে রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণ কিছু কম নয়, তাহলেও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে পাল্লা বোধকরি রসপরিচয়ের দিকটাতেই একটু বেশি ভারী হবে।

সমালোচক-স্বভাবের এই ভেদের কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রকে অনেকটা বিজ্ঞানপন্থী সমালোচক বলে' মনে হয়। বলে' রাখা ভাল, বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিজ্ঞানপন্থিতা সমালোচনাকে বৈজ্ঞানিক ক্রিয়ায় পরিণত করার প্রয়াস বলে' গণ্য হতে পারে না। তাহলেও একথা সত্য যে, বঙ্কিমচন্দ্র তথ্যে আস্থাশীল। যদিও তাঁর সমালোচনা কখনোই নিছক তথ্য-আহরণেই সীমাবদ্ধ নয়, তা হ'লেও তিনি তথ্যব্যাখ্যায় বিশেষ আগ্রহী। আমরা জানি, ব্যাখ্যাবাদী সমালোচক মাত্রেই সাহিত্যবস্তুর কন্‌টেক্‌স্‌ট বা প্রসঙ্গপট সম্পর্কে সচেতন—যে-কারণে ব্যাখ্যাবাদী সমালোচনার অপর নাম কন্‌টেক্‌স্‌চুয়াল সমালোচনা। বঙ্কিমচন্দ্রও সাহিত্যবস্তুকে তার প্রসঙ্গপটে রেখে দেখতে আগ্রহশীল। এরই কারণে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাকে কোনো কোনো দিক থেকে আধুনিক সমালোচনার সমধর্মী বস্তু বলে' মনে হয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব সাহিত্যবস্তুর প্রসঙ্গপটের মূল্যকে স্বীকার করে নি। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ঐতিহাসিকতায় বিশ্বাসী নন। কিন্তু সে প্রধানত তত্ত্বের এবং তর্কের ক্ষেত্রেই। কার্যকালে—অর্থাৎ ব্যবহারিক সমালোচনায় রবীন্দ্রনাথ বহু ক্ষেত্রেই প্রসঙ্গের গুরুত্বকে, সামাজিক পটভূমির গুরুত্বকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তা সত্ত্বেও মানতে হবে যে, তথ্যব্যাখ্যায় নয়, রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সমালোচনাপ্রবন্ধগুলির প্রধান পরিচয় তাদের সৃজনশীলতায়।

সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মন যে অনেকখানি পরিমাণে কার্য-কারণসন্ধানী এবং বিজ্ঞানমুখী তাতে সন্দেহ নেই, যদিও তাঁর সমালোচনাকে বৈজ্ঞানিক সমালোচনা বললে বাগর্থের অপপ্রয়োগ ঘটবে। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকে সৃজনধর্মী সমালোচনা বললে সে-রকম কোনো ত্রুটি ঘটবে না। শুধু তা-ই নয়, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাকে যদি কবিসমালোচকের বা শিল্পী-সমালোচকের সমালোচনা বলি, তাহলেও বোধকরি ভুল করা হবে না।

কবি-সমালোচক কথাটা নিয়ে একটু খট্‌কা হতে পারে। অনেকের মতে কবি ছাড়া অপর কেউ সমালোচক হতেই পারেন না। অর্থাৎ, তাঁদের বিবেচনায়, সব যথার্থ সমালোচকই কবি-সমালোচক, বা শিল্পী-সমালোচক এবং সব যথার্থ সমালোচনাই সৃজনধর্মী সমালোচনা। একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে, এ মতবাদ আসলে রসপরিচয়মূলক সমালোচনারই একটি চরমপন্থী সমর্থন। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৃজনধর্মী সন্দেহ নেই, কিন্তু এখানে মাত্র সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথকে কবি-সমালোচক বলা হচ্ছে না। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা সব সময়ই কবিত্বপূর্ণ—এই যুক্তিতেও এখানে আমরা রবীন্দ্রনাথকে কবি-সমালোচক বলছি না। এখানে কবি-সমালোচক কথাটার অর্থ একটু বিশিষ্ট। এই বিশিষ্ট অর্থটা যতো-না সমালোচনার চরিত্রের ইঙ্গিত দেয়, তার থেকে অনেক বেশি ইঙ্গিত দেয় সমালোচকের মেজাজের। ইঙ্গিতটা এই যে কবি-সমালোচকেরা কবিদের মতোই মুক্ত-মেজাজের মানুষ, আপন খেয়ালে আপন পথে চলার মানুষ, নিজের মধ্যেকার কবি-স্বভাবের দ্বারা চালিত মানুষ। সৃজনশীলতা অবশ্যই থাকবে, কিন্তু এখানে আসল কথাটা হচ্ছে কবি-স্বভাবের স্বেচ্ছাবিহার।

কবি-সমালোচক কথাটার এই বিশিষ্ট অর্থের সঙ্গে—হয়তো কিছুটা অসঙ্গতভাবেই খানিকটা নিন্দাও যুক্ত হয়ে থাকে, বিশেষ ক'রে কথাটাকে যদি একটু সংকীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা যায়। সংকীর্ণ অর্থে তিনিই কবি-সমালোচক, যিনি কেবল নিজের কবিতার প্রবর্তনাতেই—নিজের কবিতার প্রয়োজনেই সমালোচক। যে-কবি কেবল নিজের বিশেষ ধরনের কাব্যপ্রয়াসের সমর্থনের জন্যই সমালোচনা লিখে থাকেন, যাঁর প্রত্যেকটি সমালোচনা প্রত্যক্ষভাবে হোক আর পরোক্ষভাবে হোক নিজের কাব্যরুচির এবং নিজের কাব্য-তত্ত্বের পোষকতা, যিনি কবিতারচনার প্রতি লক্ষ রেখেই সমালোচনা লিখে থাকেন, বিশিষ্ট এবং ঈষৎ পারিভাষিক অর্থে তিনিই কবি-সমালোচক। এলিয়ট কথাটাকে এই অর্থে গ্রহণ করেই প্রথম বয়সে কবি-সমালোচকদের প্রশংসা করেছিলেন, একমাত্র কবি-সমালোচকের সমালোচনাকেই যথার্থ সমালোচনা বলে' ঘোষণা করেছিলেন ('The Perfect Critic', Sacred Wood, 1920), আবার অনেক কাল পরে

পরিণত বয়সে কথাটাকে অবিকল এই অর্থে ধরেই তিনি কবি-সমালোচকদের সমালোচনার সীমাবদ্ধতার নিন্দাও করেছেন ('The Music of Poetry', On Poetry and Poets, 1957)।

রবীন্দ্রনাথকে এই সংকীর্ণ ও নিন্দনীয় অর্থে কবি-সমালোচক বলা যায় কি না তা নিয়ে তর্ক উঠতে পারে। কিন্তু আসলে এটা নিন্দা প্রশংসার কথাই নয়। কবি-সমালোচক হ'লেই যে তিনি অপরাধী বলে' গণ্য হবেন এমন ভাবার কোনো যুক্তি নেই। কবি-সমালোচকের সমালোচনাকে সমালোচনা বলে' মানবো না, এ-ও একটা গোঁড়ামি। এই গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় দিলে বিশ্ব-সাহিত্যের অনেক শ্রেষ্ঠ সমালোচনা থেকে আমাদের বঞ্চিত হতে হবে। কবি-সমালোচকদের সমালোচনায় অনেক সময় সংকীর্ণতা যেমন থাকে, তেমনি অনেক সময় কল্পনাতীত শক্তির পরিচয়ও থাকে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের সমালোচনা পূর্ব-কথিত সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত নয় এ কথা মানতেই হবে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাপর্বের সমালোচনার ক্ষেত্রে এ অভিযোগ বোধকরি খুব সুপ্রযুক্ত হবে না।

তবু প্রশ্ন থাকে। প্রতিষ্ঠাপর্বের সমালোচনায় এই সংকীর্ণতার আভাসমাত্রও নেই, এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় কি? তা বোধকরি যায় না। কবি-সমালোচকের বিশিষ্ট স্বভাবের কোনো প্রকাশই যে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠাপর্বের সমালোচনাতে নেই, এমন মনে করলে ভুল হবে। রবীন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত পরিণত বয়সের সমালোচনাতেও কবি-সমালোচকের সমস্ত শক্তির এবং কিছু-কিছু দুর্বলতার বা সীমাবদ্ধতার সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। সেই সঙ্গে কবি-সমালোচকের একদেশদর্শিতার, কবি-সমালোচকের স্বেচ্ছাবিহারের নিদর্শনও কিছু কিছু পাওয়া যাবে। আর পাওয়া যাবে সেই দুর্লভ অসামান্যতা, যা একমাত্র কবি-সমালোচকেই সম্ভব, অপরে সম্ভব নয়।

৯

আগেই বলেছি, বাংলাসাহিত্যে যথার্থ সমালোচনার জন্ম ও বিকাশের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যসংযোগের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই

পাশ্চাত্যসংযোগ যে কেবল সাহিত্যরুচিতেই বিপ্লব ঘটিয়েছে তা নয়, এই সংযোগের ফলে তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির সমগ্র জীবনদৃষ্টিতেই একটা ছোটখাটো বিপ্লব ঘটে গিয়েছে। বাঙালির জীবনের তথা সাহিত্যরুচির পালাবদলের একটা পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব, এবং তার ঠিক পরবর্তী পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

বাঙালির জীবনে, বিশেষ ক'রে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির জীবনে যে পালাবদল ঘটেছিল, তার গভীরতা, ব্যাপ্তি ও গুরুত্ব নিয়ে ঐতিহাসিকেরা সমাজতাত্ত্বিকেরা আলোচনা করবেন। আমাদের লক্ষ্য সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনা। অথবা, সাধারণভাবে বললে, আমাদের লক্ষ্য সাহিত্য। বর্তমান প্রসঙ্গে সমাজের বদল নয়, সাহিত্যরুচি ও সাহিত্যপ্রয়াসের বদল, এইটেই আমাদের মুখ্য লক্ষ্য। কিন্তু জীবনের প্রসঙ্গ সম্পূর্ণ বাদ দিলে এ-আলোচনা কিছু কৃত্রিম ও খণ্ডিত হতে বাধ্য।

সকলেই জানেন, পাশ্চাত্যসংযোগের প্রথম পর্বে শহরের শিক্ষিত বাঙালির জীবনে একটা যুক্তিবাদের বা এন্‌লাইটেন্‌মেণ্টের কাল এসেছিল। হয়তো তা ক্ষণস্থায়ী, হয়তো তার দীপ্তি খুব বেশি নয়, পরিসর যৎসামান্য, কিন্তু তাহলেও কোনো কোনো দিক থেকে তা ইউরোপের জ্ঞানদীপ্তিরই অনুরূপ। এই সময় থেকেই বাংলাসাহিত্য তার মধ্যযুগীয় চরিত্র পরিত্যাগ ক'রে আধুনিক হয়ে উঠতে থাকে। অল্পকালের মধ্যেই এই আধুনিকতা বাঙালির সাহিত্যচিন্তায়, তার সাহিত্যতত্ত্ব ও সমালোচনার মধ্যেও স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ দু'জনেই বাঙালির 'নব-জাগরণের', বাঙালির সেই জ্ঞানদীপ্তি-পর্বের দুই প্রধান সাধক। দুজনের সাহিত্যরুচিতে মিল যেমন আছে, তেমনি অমিলও অনেকখানি। দুজনের সাহিত্যপ্রয়াস ভিন্ন ধরনের। উভয়ের সাহিত্যকে গ্রহণ করবার মনোভঙ্গী এক নয়। উভয়ের সাহিত্যতত্ত্ব, কিঞ্চিৎ গোড়াকার মিল সত্ত্বেও, ভিন্ন জাতের সাহিত্যতত্ত্ব। উভয়ের সমালোচনাতত্ত্বে ঝোঁকের পার্থক্য লক্ষণীয়। এবং বলা বাহুল্য, দুজনের ব্যবহারিক সমালোচনাও পৃথক্ ধরনের।

এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। তার কারণ, আগেই বলেছি, বাংলাসাহিত্যের

আধুনিকতার ইতিহাসে দুজনে দুই পৃথক্ পর্বের প্রতিনিধি। বঙ্কিমচন্দ্র (১৮৩৮) ও রবীন্দ্রনাথের (১৮৬১) মধ্যে বয়সের ব্যবধান তেইশ বৎসরের। যে-কোনো ক্রান্তিকালে এই রকম প্রায়-সিকি-শতাব্দীর ব্যবধানকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবধান বলেই ধরতে হবে।

সাহিত্যক্ষেত্রে উভয়ের প্রবেশকালের ব্যবধান অবশ্য অনেক কম—সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রেও তাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাহিত্যচিন্তামূলক প্রবন্ধ 'উত্তরচরিত' প্রকাশকালে (১৮৭২) বঙ্কিমচন্দ্র রীতিমতো বয়স্ক ব্যক্তি, তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ। অন্যদিকে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্যচিন্তামূলক প্রবন্ধ 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা অবসরসরোজিনী দুঃখসঙ্গিনী' প্রকাশকালে (১৮৭৬) রবীন্দ্রনাথ পনেরো বৎসর বয়সের বালক মাত্র। যদিও উভয়ের এই দুই প্রথম সমালোচনাপ্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশকালের দূরত্ব মাত্র চার বৎসরের, তাহলেও উভয়ের সাহিত্যদৃষ্টির পার্থক্য তুলনা করলেই দুজনের জন্মকালের পার্থক্যটা স্পষ্ট হয়ে পড়ে।

সাহিত্যক্ষেত্রের কোনো বড়ো পরিবর্তনই একদিনে হঠাৎ ঘটে না, একেবারে একটানাভাবেও ঘটে না। একটা বৃহৎ পরিবর্তন-প্রক্রিয়ার মধ্যে লক্ষ করলে একাধিক ছোট-বড়ো ধাপ বা পর্বাঙ্গ দেখতে পাওয়া যাবে। বাঙালির সাহিত্যরুচির পরিবর্তনের ক্ষেত্রেও সেই রকমই ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের পূর্বেই বাংলাসাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে মধ্যযুগীয় ভাব ও আদর্শ অনেক পরিমাণে বিদায় নিয়েছে এবং তার স্থানে ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাবে—বিশেষত সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের ইংরেজ লেখকদের প্রভাবে পাশ্চাত্য নব্য-ক্লাসিক্যাল ধরনের একটা সাহিত্য-আদর্শ বাংলা-সাহিত্যে মোটামুটি প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, তখনকার কালের প্রচলিত সংস্কৃত ক্লাসিকপন্থিতার জীর্ণ ভগ্নাবশেষের সঙ্গে রফা ক'রে পশ্চিম-থেকে-আমদানী-করা এই নব্য-ক্লাসিক্যাল সাহিত্য-আদর্শ বাংলা-সাহিত্যে এক ধরনের বুদ্ধিপ্রধান গদ্যধর্মী ভাববিমুখ সাহিত্যরুচির পোষকতা আরম্ভ করেছে। কবিতার ক্ষেত্রে বস্তুপ্রধান বর্ণনাত্মক কাহিনীমূলক কাব্যকথা ছাড়া, অথবা 'সাহিত্যিক মহাকাব্য' ছাড়া অন্য কিছুতেই এর রুচি নেই।

এই সাহিত্য-আদর্শটা সম্পূর্ণ বদলে গেল রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবের

পরে। কিন্তু বদল শুরু হয়েছে, অন্তত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বদল দেখা দিয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সময়েই। এ-ব্যাপারে মধুসূদনের দানও অবশ্যস্বীকার্য, কিন্তু তা হ'লেও প্রধানত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবেই বাংলাসাহিত্য নব্য-ক্লাসিক্যাল রীতি-প্রধান সাহিত্য-আদর্শকে পরিত্যাগ ক'রে নতুন কালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী সাহিত্য-আদর্শকে গ্রহণ করার দিকে, বুদ্ধিপ্রধান গদ্যধর্মী সাহিত্য-আদর্শকে পরিত্যাগ ক'রে ভাবপ্রধান কাব্যধর্মী রোমান্টিক সাহিত্য-আদর্শকে গ্রহণ করার দিকে ঝুঁকে পড়েছে।

কিন্তু ঝুঁকে পড়া অর্থই সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণ সম্পূর্ণ ক'রে ফেলা নয়। ব্যাপারটা সময়সাপেক্ষ—অভ্যস্ত আদর্শ মুহূর্তে পরাভূত হয় না, বদ্ধমূল সংস্কার নিমেষে নির্মূ'ল হয় না। এ একটা ভাব-সংঘর্ষের কাল, একটা ভাঙা-গড়ার সন্ধিলগ্ন। বঙ্কিমচন্দ্র এই সন্ধিলগ্নের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। সন্ধিলগ্নের কোনো প্রতিনিধিই পুরোপুরি ক্লাসিকপন্থী নন, পুরোপুরি রোমান্টিকও নন। প্রত্যেকের মধ্যেই কম-বেশি পরিমাণে একটা দোটানা লক্ষ করা যায়। কথাটা বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে এই ভাবদ্বন্দ্ব তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। একমাত্র মধুসূদনেই হয়তো কিছু দোটানার ভাব লক্ষ করা যায়, সে-দোটানা তাঁর রচনায় কোনো সত্যিকারের টেন্‌শনের, কোনো প্রবল আততির সৃষ্টি করতে পারে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে তা করেছে।

সকলেই জানেন, সৃজনের রাজ্যে, রসসাহিত্যে—উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র রোমান্টিক এবং ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী, অল্পবিস্তর বিদ্রোহী, মোটামুটিভাবে আধুনিক। চিন্তার রাজ্যে, মননশীলতার ক্ষেত্রে—যুক্তিমূলক প্রবন্ধরচনার কালে আমরা অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠ অপর-এক বঙ্কিমচন্দ্রের সাক্ষাৎ পাই। প্রবন্ধসাহিত্যে তাঁরই প্রাধান্য। সেই বঙ্কিমচন্দ্র মোটামুটি ক্লাসিকপন্থী এবং সমাজকল্যাণবাদী, ক্ষেত্রবিশেষে রক্ষণশীল, কখনো-কখনো উগ্র সনাতনী। বিদ্রোহী নন, বিপ্লবীও নন, আলোকপ্রাপ্ত একজন সংস্কারপন্থী।

আর সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে, সমালোচনার ক্ষেত্রে, যেখানে আনন্দের দাবি আর সমাজকল্যাণের দাবি একই সঙ্গে মনের সামনে উপস্থিত থাকে?

সাহিত্যচিন্তা বা সমালোচনা, যেখানে সৃজন সম্পর্কিত মনন, অথবা যেখানে একই সঙ্গে মনন এবং সৃজন, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকা কী?—সেখানে প্রায় সমান গুরুত্বে দুই বঙ্কিমচন্দ্রকেই আমরা একসঙ্গে অথবা পাশাপাশি দেখতে পাব। দেখতে পাব, সাহিত্যচিন্তায় বা সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে রোমাণ্টিক এবং ক্লাসিকপন্থী। সর্বত্র অবশ্য এই দুই পন্থার সমন্বয় ঘটেনি। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যা দেখতে পাই, তা হচ্ছে প্রখর দ্বৈততা।

সর্বত্র সমান প্রখর না হতে পারে, কিন্তু এই দ্বৈততা অল্পবিস্তর সকল ক্ষেত্রেই বিদ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে মাঝে মাঝে এই দ্বৈততা যে কী বিড়ম্বনার সৃষ্টি করেছে, তা আমরা সকলেই জানি। তা হ'লেও সেখানে এ-দ্বৈততা অনেকটা প্রচ্ছন্ন। এই দ্বৈততা বোধকরি সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রেই সব থেকে প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট।

সাহিত্যতত্ত্ব এবং সমালোচনা এই দুই ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে ক্লাসিক-রোমাণ্টিক দুই প্রবণতার দোটানাটা বিশেষভাবে অনুধাবন ক'রে দেখবার মতো। আমরা জানি, সাহিত্যতত্ত্ব বিশেষভাবে চিন্তামূলক ব্যাপার। অপর পক্ষে, ব্যবহারিক সমালোচনা অনেকটা মিশ্রিত প্রক্রিয়া, তার মধ্যে সৃজন-ধর্মিতা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়। একটু লক্ষ করলেই দেখা যাবে, সাহিত্যতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র অধিক পরিমাণে ক্লাসিকপন্থী, স্বল্প পরিমাণে রোমাণ্টিক। কিন্তু ব্যবহারিক সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র, তুলনামূলক বিচারে, অনেক বেশি রোমাণ্টিক, অনেক বেশি আধুনিক।

কিন্তু এই রকম পরিচ্ছন্ন ভাগ বোধকরি কিছুটা কৃত্রিম এবং অসত্য। ওজনের হিসেবটা আসল কথা নয়, দ্বৈততার আততিটাই আসল সত্য। আসল সত্য দোটানার অস্থিরতা। সন্ধিলগ্নের সার্থক প্রতিনিধির পক্ষে এইটেই স্বাভাবিক।

ক্লাসিক ও রোমাণ্টিক সাহিত্যআদর্শের দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব-কালেও ছিল। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মধ্যেই যেমন দ্বন্দ্ব, রবীন্দ্রনাথের নিজের মধ্যে তেমন কোনো ক্লাসিক রোমাণ্টিক দ্বন্দ্ব ছিল না। আবির্ভাব-কালে রবীন্দ্রনাথ প্রায় পুরোপুরিই রোমাণ্টিক। ঠিক যে-দ্বৈততা, যে-আততি, যে-অস্থিরতা আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তায়—বিশেষ ক'রে

তাঁর সাহিত্যতত্ত্বে দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় তার সাক্ষাৎ পাই না। অন্তত উল্লেখযোগ্য পরিমাণে নয়। রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাবকালে বাংলাসাহিত্যে ক্লাসিক রোমাণ্টিক দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে' গিয়াছে এমন কথা বলি না। কিন্তু, আগেই বলেছি, সে-দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রনাথের নিজের নয়। যদি সামান্য কিছু থেকেও থাকে, তা তাঁর জীবনের প্রথম পর্বেই সীমাবদ্ধ, পরিণতি-পর্বে তার স্থান নেই। সে দ্বন্দ্ব রবীন্দ্রচিত্তে কোনো সত্যিকারের দ্বৈততার সৃষ্টি করতে পারে নি।

পরিণতি-পর্বে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় নতুন জটিলতা এসেছে, হয়তো কিছু নতুন রকমের দ্বন্দ্বেরও অবকাশ ঘটেছে। কিন্তু তার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবদ্বন্দ্বের কোনো তুলনা চলবে না।

রবীন্দ্রনাথে যে-দ্বন্দ্ব, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের। এবং সে-দ্বন্দ্ব অনেক পরবর্তীকালের ঘটনা। এ-দ্বন্দ্ব ক্লাসিকপন্থিতার সঙ্গে রোমাণ্টিকতার দ্বন্দ্ব নয়। কেননা ক্লাসিকপন্থিতা তখন কোনো গণনীয় শক্তিই নয়। এ-দ্বন্দ্ব রোমাণ্টিকতার সঙ্গে, বলা যায়, রোমাণ্টিকতা-উত্তীর্ণ রাবীন্দ্রিকতার দ্বন্দ্ব। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক সমালোচনায় এর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে না, কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বে পাওয়া যাবে। এ-দ্বন্দ্ব একেবারে বিংশ শতকের ঘটনা। পরিণতি পর্বে, বিংশ শতকের প্রথম দশকের পরে রবীন্দ্রনাথ আর সমালোচক নন। কিন্তু তখনো তিনি সাহিত্যতাত্ত্বিক। রোমাণ্টিকতাকে অতিক্রম ক'রে রাবীন্দ্রিকতায় উত্তরণ, এটা এই পর্বের, অর্থাৎ বিংশ শতকের প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের ঘটনা। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক সমালোচনার কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। পরিণতি-পর্বের রবীন্দ্রচিন্তায় যদি কোনো নতুনতরো আতিতি, নতুনতরো উৎকণ্ঠা এসে থাকে, রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক সমালোচনায় তার সাক্ষাৎ পাবো না। তার কারণ পরিণতি-পর্বে রবীন্দ্রনাথ কোনো পূর্ণাঙ্গ সমালোচনাপ্রবন্ধ রচনা করেন নি।

১০

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাসাহিত্য খুব বিস্তৃত নয়। সমালোচনা কথাটাকে যদি ব্যাপকতম অর্থেও গ্রহণ করি, যে-কোনো রকম সাহিত্যচিন্তাকেই যদি সাহিত্যসমালোচনা বলতে রাজি থাকি, তাহলেও বঙ্কিমচন্দ্রের এই জাতীয় রচনার সংখ্যা ত্রিশ ছাড়াবে না। তার মধ্যে আবার কয়েকটি রচনা আসলে মাসিকপত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধের ঈষৎ রূপান্তরিত এবং নামান্তরিত সংস্করণ। এর মধ্যে একটি প্রবন্ধই—'উত্তরচরিত'—দীর্ঘ, বাকি অধিকাংশই মাঝারি, কয়েকটি রীতিমতো ক্ষুদ্রকায়। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা-প্রবন্ধ সংখ্যায় যেমন কম, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাসাহিত্য আয়তনেও তেমনি ছোট।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনাগুলির অধিকাংশই ব্যবহারিক সমালোচনা। দু'একটি ভাষা-সংক্রান্ত প্রবন্ধ। যেহেতু তারা সাহিত্যবিষয়ক নয় সেই কারণে তাদের সমালোচনাসাহিত্য থেকে বাদ দেওয়াই যুক্তিযুক্ত। বিশুদ্ধ সাহিত্যতত্ত্বের প্রবন্ধ—সাহিত্যজিজ্ঞাসাই যার আসল লক্ষ্য, তেমন প্রবন্ধ একটিও নেই। সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের যা-কিছু বক্তব্য, কিছুই নিছক তত্ত্বজিজ্ঞাসার ফল নয়, কিছুই স্বতন্ত্রভাবে সাহিত্যতত্ত্ব-মীমাংসার স্বাধীন পথে আসে নি। সবই সমালোচনার সূত্রে এসেছে, সমালোচনার প্রয়োজনে এসেছে, বিশেষ কোনো সাহিত্যবস্তুর পরিচয়, ব্যাখ্যা বা বিচার প্রসঙ্গে এসেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধগুলি রচনার ব্যাপ্তিকাল, খুব শিথিল ভাবে যদি ধরি, তাহলে কুড়ি বছরের মতো। ১৮৭২-এ বঙ্গদর্শন প্রকাশের কাল থেকে ১৮৯২ খ্রীঃ পর্যন্ত, অর্থাৎ মৃত্যুর দু'বছর পূর্ব পর্যন্ত। সময়টাকে হয়তো খুব কম বলা চলে না। কিন্তু এই শিথিল হিসেবটা কিঞ্চিৎ ভুল ধারণার জন্ম দেয়। ভালো ক'রে লক্ষ করলে দেখতে পাবো, সাহিত্যবিষয়ক গুরুত্বপূর্ণর প্রবন্ধের প্রায় সবগুলিরই রচনাকাল বঙ্গদর্শন প্রকাশের পর থেকে প্রথম বারো-চোদ্দ বছরের মধ্যে। অর্থাৎ ১৮৭২ থেকে ১৮৮৬, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচক-জীবনের আসল ব্যাপ্তিকাল এইটেই।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তামূলক প্রবন্ধের সংখ্যা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধসংখ্যার চারগুণের কাছাকাছি যাবে। প্রবন্ধের দৈর্ঘ্য বিচার ক'রে পরিমাণ হিসেব করলে বঙ্কিমচন্দ্রের চারগুণকেও অনেক ছাড়িয়ে যাবে। এ ছাড়া চিঠিপত্রে কবিতায় ভাষণাবলীতে ভিন্ন-বিষয়ের প্রবন্ধে প্রাসঙ্গিক মন্তব্যে যে আলোচনা ইতস্তত ছড়িয়ে আছে, তা যদি ধরি, তাহলে পরিমাণের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র অনেক—অনেক পেছনে পড়ে থাকবেন।

আগেই বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো প্রবন্ধই সরাসরি সাহিত্যতত্ত্বমূলক নয়। যে-প্রবন্ধগুলিকে খানিকটা সাহিত্যতত্ত্বের প্রবন্ধ বলে মনে হয়, যেমন, 'গীতিকাব্য', 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' অথবা 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', সেগুলি পত্রিকায় প্রকাশের সময় পুরোপুরি ব্যবহারিক সমালোচনাই ছিল, পরে গ্রন্থে প্রকাশের কালে তাদের নাম বদলে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে তাদের চেহারার এবং চরিত্রেরও অল্পস্বল্প বদল ঘটেছে। রবীন্দ্রনাথে সাহিত্যতত্ত্ব এবং ব্যবহারিক সমালোচনা দুই জাতের প্রবন্ধই আছে। কোনোটিরই সংখ্যা কম নয়। তবে তুলনায় সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধেরই সংখ্যাধিক্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার ব্যাপ্তিকাল যেখানে প্রকৃত পক্ষে মাত্র বারো-চোদ্দ বছর, সেখানে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তামূলক রচনায় ব্যাপ্তিকাল সুদীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছর। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সাহিত্যচিন্তামূলক রচনা—বস্তুত রবীন্দ্রনাথের প্রথম গদ্য রচনা—প্রকাশিত হয়েছে ১৮৭৬ সালে। আর শেষ নিবন্ধের রচনা ১৯৪১ সালে, মৃত্যুর অল্প পূর্বে। পনেরো বছর বয়সে আরম্ভ আর আশি বছর বয়সে সমাপ্তি।

রচনার সংখ্যা ও পরিমাণে, অথবা রচনাকালের ব্যাপ্তিতে এই-যে প্রকাণ্ড পার্থক্য, এ-পার্থক্য যে রচনার উৎকর্ষ অনুৎকর্ষের ক্ষেত্রেও ছায়াপাত করবে, তা হয়তো স্বাভাবিক। কিন্তু এই পার্থক্য ছাড়াও বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় আরো কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে, যা নিছক পরিমাণগত ব্যাপার নয়, এমন কি উৎকর্ষগত ব্যাপারও নয়, যা রচনার চরিত্রগত ব্যাপার বা রচয়িতার স্বভাবগত ব্যাপার।

আগেই বলা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্রের আসল ঝোঁক সমালোচনায়। সমালোচনার প্রসঙ্গ ছাড়া, অথবা তরুণ লেখকদের উদ্দেশে ব্যবহারিক

উপদেশের সূত্রে ছাড়া, সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে তিনি একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি। রবীন্দ্রনাথের আসল ঝোঁক সাহিত্যতত্ত্বেই। জীবনের প্রথম সমালোচনাপ্রবন্ধেই সাহিত্যতত্ত্ব উপস্থিত, এবং এতো প্রবলভাবে উপস্থিত যে, সেখানে তত্ত্বকেই আলোচনার মুখ্য প্রেরণা বলে' মনে হয়, আর প্রবন্ধের ব্যবহারিক সমালোচনা অংশকে তত্ত্ব-অংশের অনুগামী দৃষ্টান্ত বলে' মনে হয়। শেষের দিকে এই তত্ত্বমুখী প্রবণতা আরো স্পষ্ট। সাহিত্যজীবনের শেষ পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ একটিও সমালোচনাপ্রবন্ধ লেখেন নি। চিঠিপত্রে, ভাষণে, রচনাবলীর গ্রন্থসূচনাসমূহের নির্মোহ আত্মসমালোচনায় মাঝে মাঝে চকিতের জন্য আমরা একজন সূক্ষ্মদর্শী সমালোচকের সাক্ষাৎ পাই বটে, কিন্তু সেই ক্ষণ-দর্শন তৃপ্তিদায়ক নয়, বরং পিপাসা-উদ্রেককারী। সেই সব খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত আলোচনাকে কোনো অর্থেই পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা-প্রবন্ধ বলা চলে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত সাহিত্যজিজ্ঞাসাই রচনাবিশেষের আস্বাদনের সঙ্গে, কোনো-না-কোনো গ্রন্থপাঠের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাঁর তত্ত্বে পৌঁছুবার পদ্ধতি আরোহী পদ্ধতি, যাকে বলা হয় ইন্‌ডাক্‌টিভ পদ্ধতি। বঙ্কিমচন্দ্রের তত্ত্বজিজ্ঞাসা বস্তু-আশ্রিত বা ভূমিস্পর্শী তত্ত্বজিজ্ঞাসা। বলা যেতে পারে, এম্‌পিরিসিস্টের তত্ত্বজিজ্ঞাসা।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসা কোনো রচনাবিশেষের আস্বাদনের সঙ্গে, কোনো গ্রন্থবিশেষের পাঠের অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুক্ত নয়। এমন কি এ-ও বলতে পারি যে, রসাস্বাদন ব্যাপারের সঙ্গেই তার সারাসরি সম্পর্ক কম। বরং বলা যায়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যজিজ্ঞাসা রসসৃষ্টির অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনেক ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি মূলত পাঠকের দৃষ্টি, রসগ্রাহী বিচারশীল পাঠকের, অর্থাৎ সমালোচকের দৃষ্টি। অন্য পক্ষে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি মূলত স্রষ্টার দৃষ্টি। বলতে পারি, তত্ত্বজিজ্ঞাসু স্রষ্টার দৃষ্টি।

বঙ্কিমচন্দ্রের চেষ্টা ছিল, সমালোচনাকে রসাস্বাদনভিত্তিক রেখেই তাকে যথাসম্ভব বিজ্ঞানের কাছাকাছি নিয়ে আসা। বঙ্কিমচন্দ্রের পাশ্চাত্য শিক্ষাগুরুদের মতো বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মনের গতিও এম্‌পিরিক্যাল—বস্তু-

লগ্ন মনের স্বাভাবিক গতি যে-রকম তথ্য-অভিমুখী হয়ে থাকে, সেই রকম। এই কারণেই ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ পক্ষপাত।

বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের মনের গতি অনেক বেশি তত্ত্বমুখী, অনেক বেশি স্পেকুলেটিভ। রবীন্দ্রনাথের মন অনেক বেশি তথ্য-বিমুখ, অনেক বেশি ঊর্ধ্বাকাশচারী। বলতে পারি, অনেক বেশি প্রাচ্য, অনেক বেশি ভারতীয়। বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুস্থানীয় পাশ্চাত্য এম্‌পিরিসিস্টরা যে রবীন্দ্রনাথকে একটুও আকৃষ্ট করতে পারবেন না, তা সহজেই বোঝা যায়। তত্ত্বমীমাংসার ব্যাপারে বরং জার্মান দার্শনিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মেজাজের মিল লক্ষ করা যাবে।

এক-কথায় বললে বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র পাঠক-সমালোচক এবং সমালোচক-সাহিত্যতাত্ত্বিক। রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা-সাহিত্যতাত্ত্বিক, দার্শনিক-সাহিত্যতাত্ত্বিক। আর সমালোচনার ক্ষেত্রে? সমালোচনার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কবি-সমালোচক। সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের চলন রাজকীয়, কিন্তু তাঁর পথটা সর্বসাধারণের পথ। রবীন্দ্রনাথের পথ তাঁর নিজের রচিত। সে-পথে চলার অধিকার একা তাঁরই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব

১

বাংলাসাহিত্যে যথার্থ সাহিত্যসমালোচনার পথ বঙ্কিমচন্দ্রই উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছেন। তাঁর পূর্বে যে-টুকু সমালোচনা পাওয়া যায়, তা ইতিহাসের ব্যাপার, অনেকটা পূর্বাভাসের মতো। বঙ্কিমচন্দ্রই এ-পথে প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিযাত্রী, যিনি সাহস, মৌলিকতা এবং বিশ্লেষণশক্তিতে পরবর্তী সকলেরই গুরুস্থানীয়। এ-কথা সাহিত্যতত্ত্ব ও ব্যবহারিক সমালোচনা, সাহিত্য-সমালোচনার এই দুই শাখার পক্ষেই সত্য। তবে উভয়ের পক্ষে সমান সত্য নয়। এ-কথা মানতেই হবে যে, এ-দুয়ের মধ্যে তুলনা করলে, কী পরিমাণে, কী উৎকর্ষে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বকেই কিছু ন্যূন বলে মনে হবে। মানতেই হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব অবিন্যস্ত এবং অসম্পূর্ণ।

বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে এটাকে ত্রুটি বলে ধরা যাবে না। কারণ বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই সাহিত্যতত্ত্ব রচনা করবার জন্য সাহিত্যতত্ত্ব রচনা করতে বসেন নি। তিনি সাহিত্যে উৎসাহী, কিন্তু সাহিত্যের তত্ত্বালোচনায় সমান পরিমাণে উৎসাহী নন। সাহিত্য কী, কাব্য কী, কবিত্ব কাকে বলে, এ সব প্রশ্ন স্বতন্ত্রভাবে বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই উত্থাপন করেন নি। যখন করেছেন, সমালোচনার প্রয়োজনেই করেছেন। তখনো কিঞ্চিৎ কুণ্ঠার সঙ্গেই তা করেছেন। ঈশ্বরগুপ্তের বিষয়ে প্রবন্ধে কবিত্বের প্রসঙ্গে একেবারে গোড়াতেই তিনি বলেছেন, 'পাঠক বোধ হয় আমার কাছে এমন প্রত্যাশা করেন না যে, এই কবিত্ব কী সামগ্রী, তাহা আমি বুঝাইতে বসিব। অনেক ইংরেজ বাঙালা লেখক সে চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহাদের উপর আমার বরাত দেওয়া রহিল।'[১]

---

১. বিবিধ, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শতবার্ষিক সংস্করণ, ১২৪।
বর্তমান আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত রকম উদ্‌ধৃতিই 'বিবিধ' অথবা 'বিবিধ প্রবন্ধে'র উল্লিখিত সংস্করণ থেকে নেওয়া হয়েছে।

সম্ভব হলে সাহিত্যতত্ত্বের সমস্ত রকম মীমাংসার দায়িত্বই বঙ্কিমচন্দ্র অপর লেখকদের উপর ছেড়ে দিতেন। কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। কারণ সেদিন সাহিত্যের সমস্ত ক্ষেত্রেই পথপ্রদর্শনের দায়িত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের উপর এসে পড়েছিল।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বে মনীষার পরিচয় আছে, কিন্তু মননের সুস্থিরতা নেই, চিন্তার আনুপূর্বিকতা নেই। তার মধ্যে একটা ত্বরার ভাব, তাড়াতাড়ি স্বক্ষেত্রে ফিরে যাওয়ার উৎকণ্ঠা লক্ষ করা যায়। কিন্তু সব থেকে যা লক্ষণীয় তা হল বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বে দ্বৈততা।

এ-দ্বৈততার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগে আমাদের সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে যে পালাবদল ঘটেছে, এই দ্বৈততা বা ভাব-দ্বন্দ্বের যোগ তার সঙ্গে। এ কিন্তু কেবল ক্লাসিকপন্থিতা ও রোমান্টিকতার দ্বন্দ্ব নয়। সে-দ্বন্দ্ব তো কেবল সাহিত্যেরই ব্যাপার। মূল দ্বন্দ্বটা আরো অনেক গভীরের। মোটা কথায় একে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দ্বন্দ্ব বললে এর স্বরূপটা বোঝানো যাবে না। বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্ব বললে অযথার্থ হবে না, কিন্তু সবটা তাতেও প্রকাশ পাবে না। সেদিনের সাহিত্যিকদের সকলের মধ্যে এই দ্বিখণ্ডীকরণে স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যাবে না, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে পাওয়া যাবে। তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্রই সেদিনের সব থেকে সচেতন শিল্পী।

এই দ্বিখণ্ডীকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় এবং শিল্পসৃষ্টিতে নানা রকমের জটিল ভাব-সংকটের সৃষ্টি করেছে। এ-দ্বন্দ্ব বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেকার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবুদ্ধি আর প্রাচ্য ধর্মবুদ্ধির দ্বন্দ্ব, পাশ্চাত্য যুক্তিবাদ আর প্রাচ্য ভক্তিবাদের দ্বন্দ্ব, পাশ্চাত্য আধুনিকত্ব ও সনাতনী হিন্দুত্বের দ্বন্দ্ব, আধুনিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ ও মধ্যযুগীয় একান্নবর্তিতার দ্বন্দ্ব। এ-দ্বন্দ্ব বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেকার শিল্পীর সঙ্গে সমাজ-সংগঠকের, সমাজহিতৈষীর দ্বন্দ্ব। এর অনেকগুলোই হয়তো সাহিত্যতত্ত্বের বাইরের ব্যাপার, কিন্তু এর প্রত্যেকটিরই প্রভাব কোথাও স্থূলভাবে কোথাও সূক্ষ্মভাবে, কোথাও প্রত্যক্ষ-ভাবে কোথাও পরোক্ষভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার উপর এসে পড়েছে। সমালোচনার ক্ষেত্রে, কেন তা বলা কঠিন, এই ভাবদ্বন্দ্ব অত্যন্ত নেপথ্যচারী, প্রায় অলক্ষ্য। সাহিত্যতত্ত্বে তা স্পষ্টতর, প্রত্যক্ষতর।

আগেই বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে কোনো স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচনা করেন নি। তাঁর সাহিত্যতত্ত্ব তাঁর বিভিন্ন সমালোচনাপ্রবন্ধের মধ্যেই কোথাও সংক্ষিপ্ত ও খণ্ডিতভাবে, কোথাও-বা অপেক্ষাকৃত বিস্তৃতভাবে, কিন্তু সর্বত্রই আনুষঙ্গিক বিষয়রূপে বিবৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রবন্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যেমন, 'উত্তরচরিত', 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা', 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব'। সমালোচনা প্রবন্ধ না হলেও এই প্রসঙ্গে 'ধর্ম এবং সাহিত্য' ও 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' এই প্রবন্ধ দুটির নামও এখানে উল্লেখ করা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের মূল কথাগুলির প্রায় সবই এই প্রবন্ধ ক'টির মধ্যে ব্যক্ত হয়েছে।

আরো কয়েকটি প্রবন্ধের কথা এখানে উল্লেখ করছি। সাহিত্যতত্ত্বের প্রসঙ্গে তারাও বিশেষভাবে গণনীয়। একটি হ'লো 'গীতিকাব্য', পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের সময় যার নাম ছিল 'অবকাশরঞ্জিনী'। আর একটি হ'লো 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', বঙ্গদর্শনে যা 'মানস বিকাশ' নামে প্রকাশিত হয়েছিল। 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত', যার পূর্বনাম 'দানবদলন কাব্য', তার কথাও এখানে স্মরণ করা দরকার। এই প্রবন্ধ তিনটির মধ্যে 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধটিতে সাহিত্যতত্ত্বের, বিশেষ ক'রে কাব্যতত্ত্বের গোড়ার কথা কিছু পাওয়া যাবে। সে-আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, সুগভীর কাব্যবোধের পরিচায়ক, কিন্তু আশানুরূপ দূরগামী নয়। অপর প্রবন্ধ দুটিতে সাহিত্য-তত্ত্বের মূল কথা কিছু না থাকলেও, মূল্যবান কথা অনেক আছে।

প্রচারে প্রকাশিত 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধটির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সাহিত্যতত্ত্বের দিক থেকে খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলেও, ইতিহাসের দিক থেকে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তায় ধর্মতত্ত্বের প্রভাবপাতের দিক থেকে, তাঁর সাহিত্যচিন্তায় নব্য-হিন্দুয়ানির অনুপ্রবেশের দিক থেকে প্রবন্ধটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

আমাদের বর্তমান আলোচনার পথে এইগুলোই আকর-স্থানীয় রচনা। 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প' একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা। কিন্তু তার গুরুত্ব সাহিত্যতত্ত্ব হিসেবে নয়। তার বিষয় আরো গোড়া-ঘেঁষা। সে হ'লো

ললিতকলার তত্ত্ব বা শিল্পতত্ত্ব। এ-প্রবন্ধ বঙ্কিমসাহিত্যে প্রায় ব্যতিক্রম স্থানীয়।

২

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বকে ভাবের দিক থেকে—অর্থাৎ সাহিত্যবিষয়ক মতবাদ বা সাহিত্য-আদর্শের দিক থেকে দুটি অল্পবিস্তর পৃথক্ ধারায়—যেন দুটি সম্পূর্ণ আলাদা সাহিত্যতত্ত্ব, এইভাবে ভাগ ক'রে নেওয়া যায়। এর একটিকে বলতে পারি, ঈষৎ-রোমাণ্টিকতা-মিশ্রিত ক্লাসিকপন্থী ধারা। অপরটিকে বলতে পারি, যৎসামান্য-ক্লাসিকপন্থিতা-মিশ্রিত রোমাণ্টিক ধারা। প্রথম ধারাটি মূলত ক্লাসিকপন্থী, কিন্তু তার মধ্যে রোমাণ্টিকতার কিছু পূর্বাভাস লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয়টিতে রোমাণ্টিকতা প্রায় সুপ্রতিষ্ঠিত, তবে তার সঙ্গে ক্লাসিক মতবাদের অল্পস্বল্প জের তখনো দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

ধারাদুটিকে কালের দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের সঙ্গেও মিলিয়ে দেখা যায়। তা যদি দেখি, তাহলে' দেখতে পাবো, প্রথম ধারাটি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের প্রথম দিকের সঙ্গে—অর্থাৎ বঙ্গদর্শন-পর্বের সঙ্গে যুক্ত। আর দ্বিতীয় অর্থাৎ প্রায়-রোমাণ্টিক ধারার যোগ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার পরিণতি-পর্বের সঙ্গে। ধারাদুটিকে পাশ্চাত্য সাহিত্য-চিন্তার ইতিহাসের দুই ভিন্ন পর্বের সঙ্গেও মিলিয়ে দেখা যায়। তা যদি দেখি, তাহলে দেখতে পাবো, প্রথম ধারাটি ক্লাসিক বা নব্য-ক্লাসিক যুগের শেষ পর্বের সঙ্গে যুক্ত, আর দ্বিতীয়টির যোগ রোমাণ্টিক রিভাইভ্যালের আদি পর্বের সঙ্গে।

ধারাদুটিকে বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসপ্রবাহের সঙ্গেও মিলিয়ে দেখতে পারি। ঊনবিংশ শতকের সাহিত্যচিন্তার ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবো, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের প্রথম ধারাটি সেই কালের সঙ্গে যুক্ত যখন বাংলাসাহিত্যে ক্লাসিকপন্থিতা সুপ্রতিষ্ঠিত, যখন নিতান্ত অগ্রগামী দু-এক জন লেখক—যেমন মধুসূদন কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র—ছাড়া আর কারো রচনাতেই নতুনতর কোনো সুরের আভাসমাত্র পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয়

ধারাটির যোগ সেই কালের সঙ্গে যখন রোমান্টিকতাই বাংলাসাহিত্যের আধুনিকতা, যখন বঙ্গদর্শন পত্রিকা বিদায় নিয়েছে এবং ভারতী পত্রিকা তার শূন্য স্থান খানিকটা পূর্ণ করেছে, যখন যুবক-রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিক কবি হিসেবে সাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত।

ধারাদুটিকে যদি দুই ভিন্ন পর্বের দুটি কঠিন এবং অচল বস্তু রূপে না দেখি, তাহলে' এদের মধ্যে দিয়ে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তার একটি অনতিপ্রচ্ছন্ন ক্রমবিবর্তন লক্ষ করতে পারবো। বলা বাহুল্য, এ-বিবর্তন অবিচ্ছিন্ন ধারায় বা সরল রেখায় ঘটে নি। এর মধ্যে অনেক মিশ্রণ, অনেক দ্বিধা, অনেক জটিলতা আছে। কিন্তু, আগেই বলেছি, এই জটিলতার কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কালের—সাহিত্যচিন্তার যুগসন্ধি-কালের—সার্থক প্রতিনিধি।

তৃতীয় একটি ধারার কথাও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। কালের দিক থেকে দেখলে এটিও বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যজীবনের শেষ পর্বের সঙ্গেই যুক্ত। আমরা জানি, এই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-আদর্শ একটা প্রায়-রোমান্টিক পরিণতিতে এসে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু সেই পরিণতির সঙ্গে এই তৃতীয় ধারার কিছুমাত্র মিল নেই। একে কোনো ক্রমেই রোমান্টিকতার গোত্রে ফেলা যাবে না। ফেলতে হলে' বরং একে উল্টো গোত্রেই ফেলতে হয়। কিন্তু তাতে অতি-সরলীকরণের দোষ ঘটবে। সেই কারণেই একে একটি স্বতন্ত্র ধারা বলে' বর্ণনা করা ছাড়া উপায় নেই।

এই তৃতীয় ধারাটিকে বলা যেতে পারে, ধর্মীয়তা-প্রধান সাহিত্যচিন্তার ধারা—ধর্মভিত্তিক সাহিত্যতত্ত্বের ধারা। এই মতবাদে সাহিত্যের স্বাধিকার অস্বীকৃত। সাহিত্যের জন্য সাহিত্য নয়, সাহিত্যের কোনো বিশিষ্ট আনন্দের জন্যও সাহিত্য নয়, ধর্মের জন্যই সাহিত্য, ধর্মের বিশুদ্ধ পবিত্র স্বর্গীয় আনন্দের জন্যই সাহিত্য—এই হ'লো এ-মতবাদের মূল কথা।

বলে' রাখা ভালো যে, ক্লাসিক মতবাদের সঙ্গে এই ধর্মীয় মতবাদের কোনো তত্ত্বগত যোগ নেই। যদি কোনো যোগ থাকে তো সে ঐতিহাসিক। অথবা বলতে পারি, সে-যোগ মেজাজের যোগ। ধর্মের আদর্শ বা সমাজ-কল্যাণের আদর্শ যখন একদেশদর্শী হয়ে সংকীর্ণ পথ ধরে' অগ্রসর হয়, তখন

তার মধ্যে এই ধরনের মেজাজ দেখতে পাওয়া যায়। এ হ'লো সেই একরোখা মেজাজ, বিশেষ ক্ষেত্রের দূরদৃষ্টিই যার সাধারণ ক্ষেত্রের হ্রস্বদৃষ্টির কারণ। এ ঠিক সেই মেজাজ, বৃদ্ধ টলস্টয়ের জীবনে ও চিন্তায় যা নানান্ অসঙ্গতির হেতু হয়ে উঠেছিল।

সে যা-ই হোক, খাঁটি সাহিত্যতত্ত্ব হিসেবে, অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-চিন্তায়, এ-ধারার গুরুত্ব খুব বেশি নয়। সে দিক থেকে পূর্ব-কথিত প্রথম ও দ্বিতীয় ধারার গুরুত্বই সমধিক। তৃতীয় ধারাটিকে সাহিত্যতত্ত্ব না বলে' সাহিত্যেবিষয়ক মনোভাব বলাই সঙ্গত। মনোভাবটি অবশ্য আকস্মিক বা অহেতুক কিছু নয়। দেশকালপাত্রের বিশেষত্বের দিকে তাকালেই এর উৎস খুঁজে পাওয়া যাবে। সে উৎসসন্ধান অবশ্য এখানে আমাদের কাজ নয়। এখানে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, শুধু চিন্তার ক্ষেত্রে নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির ক্ষেত্রেও এই মনোভঙ্গীর প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের একাধিক উপন্যাসে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মিলবে।

ধারাটির আসল গুরুত্ব ঐতিহাসিক। এর মধ্যে আমরা এক দিকে দেশ-কালের খবর যেমন পাবো, অন্য দিকে তেমনি বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাজগতের আবর্তগুলিরও খানিকটা আভাস পাবো। কিন্তু সাহিত্যতত্ত্ব হিসেবে একে কিছুটা উপেক্ষা করলে বোধহয় খুব অন্যায় হবে না।

পূর্ব-কথিত প্রথম ধারাটিকে ইচ্ছা করলে আমরা ক্লাসিকে রোমান্টিকে মিশ্রিত ধারাও বলতে পারি। দুই মতবাদের মিশ্রণের ক্ষেত্র এখানে প্রধানত দুটি। তার এক ক্ষেত্রে পাবো ক্লাসিক অনুকরণবাদ আর রোমান্টিক সৃষ্টিবাদের মিশ্রণ। অপর ক্ষেত্রে পাবো প্রধানত-ক্লাসিক কল্যাণবাদের সঙ্গে প্রধানত-রোমান্টিক আনন্দবাদের মিশ্রণ। উভয় ক্ষেত্রের মিশ্রণই অল্পবিস্তর যান্ত্রিক। এবং উভয় ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্র মোটামুটিভাবে ক্লাসিক মতবাদকেই প্রাধান্য দিয়েছেন; এই কারণে এই মিশ্রিত মতবাদকে 'সংশোধিত ক্লাসিকবাদ' নামেও অভিহিত করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম সাহিত্যচিন্তামূলক রচনা 'উত্তরচরিত' (বঙ্গদর্শন, ১৮৭২) এই ধারার সব থেকে উল্লেখযোগ্য—এবং বলা যেতে পারে—প্রতিনিধিস্থানীয় প্রবন্ধ।

ধারাটি প্রধানত বঙ্গদর্শন পর্বের (১৮৭২—৮২) সঙ্গে যুক্ত হলে'ও, এর

প্রবাহ পরবর্তীকালেও অল্পবিস্তর অব্যাহত ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধটির (প্রচার, ১২৯১ মাঘ, ১৮৮৫) নাম করা যায়। প্রায়-রোমান্টিক কাল-পর্বে রচিত হ'লেও এর মধ্যে যে সাহিত্যতত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে, তৃতীয় ধারার সঙ্গে ক্ষীণভাবে যুক্ত হ'লেও, তাকে নিশ্চিতভাবে সংশোধিত ক্লাসিকবাদ বলা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের দ্বিতীয় ধারা, যাকে আমরা প্রায়-রোমান্টিক বলে' চিহ্নিত করতে চাই, তার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে প্রধানত দুটি মাত্র প্রবন্ধে, ঈশ্বরগুপ্ত ও দীনবন্ধু মিত্রের রচনার আলোচনা উপলক্ষে। এইখানেই আমরা সৃষ্টি ও কল্পনা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সুচিন্তিত ও সুপরিণত অভিমতের সাক্ষাৎ পাই। 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা'-র 'কবিত্ব'শীর্ষক সংযোজনটি (১৮৮৬) এই ধারার প্রতিনিধি-প্রবন্ধ।

তৃতীয় ধারা, যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে ধর্মের নিম্নতর সোপান বলে' এবং ধর্মকেই সাহিত্যের শেষ লক্ষ্য বলে' দাবি করেছেন, তার কাল আর দ্বিতীয় ধারার কাল প্রায় অভিন্ন। প্রচারে প্রকাশিত 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধটি (পৌষ, ১২৯২) এই ধারার উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধি।

একটা বিষয় লক্ষণীয়। ধারাগুলির ভাবগত স্বাতন্ত্র্য যেমন স্পষ্ট, কালগত পার্থক্য তেমন স্পষ্ট নয়। প্রথম ধারার 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন', দ্বিতীয় ধারার দীনবন্ধুমিত্রের কবিত্ব-বিষয়ক রচনা, তৃতীয় ধারার 'ধর্ম এবং সাহিত্য', এই তিন প্রবন্ধের মধ্যে কালের ব্যবধান যৎসামান্য। বস্তুত, ১২৯১ সাল থেকে ১২৯৩ সাল, এই আড়াই বছরের মধ্যেই তিন ভাবের তিনটি প্রবন্ধ রচিত হয়েছে।

একটা কথা এখানে বলে' রাখা প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের এই তিন ধারার সন্ধান নিতে গিয়ে আমরা যেন তিন রকম মতের তিন জন পৃথক্ বঙ্কিমচন্দ্রকে, অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের মনের তিনটি স্বতন্ত্র কুঠুরিকে কল্পনা ক'রে না বসি। ধারাগুলি তত্ত্বগতভাবে স্বতন্ত্র সন্দেহ নেই, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তারা পরস্পরের অপরিচিত নয়। ধারাগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের তিনটি স্বতন্ত্র চিন্তাপর্বের ততোটা পরিচয় দেয় না, যতোটা পরিচয় দেয় বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নানা বিরোধী শক্তির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার।

এখানে ধারাগুলিকে যে-রকম পরিচ্ছন্ন স্বাতন্ত্র্যে কল্পনা করা হয়েছে, বাস্তব ক্ষেত্রের বিবেচনায় তা হয়তো খানিকটা কৃত্রিম। কিন্তু তত্ত্বের দিক থেকে এই বিভাগ অবশ্য-প্রয়োজনীয়। তবে, বাস্তবক্ষেত্রের অপরিচ্ছন্নতাকে ও জটিলতাকেও যেন আমরা কখনো বিস্মৃত না হই।

সেই জটিলতার কথা স্মরণ রেখে অতঃপর—অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-তত্ত্বের বিস্তৃততর পরিচয় দেবার কালে—আমরা কেবল পরিচ্ছন্ন বিভাগের কথাটাই স্মরণ রাখবো না, সেই সঙ্গে কালানুক্রমের কথাটাও যথাসম্ভব স্মরণ রাখবো। তবে সে-কাজে অগ্রসর হওয়ার আগে, বর্তমান আলোচনার আলোকে ক্লাসিক ও রোমান্টিক সাহিত্য-আদর্শের মূল সূত্রগুলিকে একটু গুছিয়ে এবং অনুধাবন ক'রে নেওয়া দরকার। আপাতত আমরা সেই কাজেই অগ্রসর হবো।

৩

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের মূল কথাগুলির তাৎপর্য বুঝতে হলে প্রথমে সাহিত্যতত্ত্বের গোড়াকার প্রশ্নগুলিকে বোঝা দরকার। যতোক্ষণ সমস্যাগুলিকে না জানছি, ততোক্ষণ বিশেষ একজনের মীমাংসা ভাল কি মন্দ তা বোঝা সম্ভব নয়।

সাহিত্যের অনেক রকম প্রশ্নই, অনেক রকম সমস্যাই আমাদের মনকে উদ্বেজিত ক'রে থাকে। কিন্তু সব প্রশ্নই সমান গোড়া-ঘেঁষা প্রশ্ন নয়, সব প্রশ্নের তত্ত্বগত গুরুত্ব সমান নয়। যে-প্রশ্ন যতো বেশি ব্যাপক, যে-প্রশ্ন যতো বেশি রকমের সাহিত্যকে স্পর্শ করে, যে-প্রশ্ন সাহিত্যের মর্মস্থলের যতো নিকটে যায়, সেই প্রশ্নের তত্ত্বগত গুরুত্ব ততো বেশি। সাহিত্যের এই রকম গোড়া-ঘেঁষা প্রশ্নের সংখ্যা খুব বেশি নয়। আলোচনার সুবিধার জন্য এই প্রশ্নগুলিকে আমরা মোট চারিটি গুচ্ছে ভাগ ক'রে নিতে পারি।

সাহিত্য তার আনন্দকরতা দিয়ে নানা ভাবে আমাদের স্পর্শ করে, নানা দিকের কৌতূহল জাগ্রত ক'রে তোলে। আমরাও তেমনি সাহিত্যের মৌল আনন্দকরতার কথা স্মরণ রেখেই সাহিত্যকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে

পারি। যেমন, প্রথমত, খাঁটি তত্ত্বজিজ্ঞাসুর দৃষ্টিকোণ, সাহিত্যের স্বরূপলক্ষণ-সন্ধানীর দৃষ্টিকোণ। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যস্রষ্টার দৃষ্টিকোণ, লেখকের দৃষ্টিকোণ। নিজেরা লেখক না-হলেও সহানুভূতি এবং কল্পনা-বৃত্তির সাহায্যে লেখকের দিক থেকে সাহিত্য-ব্যাপারটাকে বোঝবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে অসম্ভব নয়। তৃতীয়ত, পাঠকের দৃষ্টিকোণ, ভোক্তা বা রসগ্রাহীর দৃষ্টিকোণ। চতুর্থ হ'ল সমাজের দৃষ্টিকোণ, সামগ্রিক সমাজজীবনের দৃষ্টিকোণ। যে চার গুচ্ছ প্রশ্নের কথা বলা হল, তার এক-একটি গুচ্ছ এই চার দৃষ্টিকোণের এক-একটির প্রতিনিধিত্ব করে।

প্রথম গুচ্ছের প্রশ্ন মূলত সাহিত্যের সাহিত্য-স্বভাবকে নিয়ে, কোন্ গুণে সাহিত্য সাহিত্য, তাই নিয়ে। বলতে পারি, সাহিত্যের স্বরূপলক্ষণকে নিয়ে, সাহিত্যের সংজ্ঞাকে নিয়ে। সাহিত্য কী? সাহিত্য ঠিক কোন্ জাতের, কী ধরনের বস্তু? বস্তুবিশ্বে তার স্থান কোথায়? অপরাপর বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্ক কী? তাদের সঙ্গে তার পার্থক্য কোথায়? সে কি সত্য, না সে মায়া? বিশ্বাসযোগ্য, না ছলনা? সে কি মাতৃস্তন্যের মতো আমাদের তৃপ্ত করে, পুষ্ট করে? না সে মরীচিকার মতো লুব্ধ ক'রে আমাদের মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়?

প্রশ্নগুলি সাধারণ-বুদ্ধির কাছে একটু উদ্ভট বা একটু কষ্টকল্পিত ঠেকতে পারে। তবে প্রশ্নগুলি আসলে তত্ত্বদর্শীর এবং তার্কিকের। উদ্ভটেই তাঁদের আনন্দ।

দ্বিতীয় গুচ্ছের প্রশ্ন মূলত স্রষ্টারই প্রশ্ন। এ-প্রশ্ন প্রধানত সৃজনক্রিয়াকে নিয়ে, রচনাপ্রয়াস নিয়ে, সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণাকে নিয়ে, সৃজনের ক্ষমতাকে নিয়ে, কৌশলকে নিয়ে। যে-সব শক্তির ক্রিয়ায় সৃজন-ব্যাপারটা সম্ভব হয়, তাদের রহস্যকে নিয়ে। কোন্ তাগিদে সাহিত্যিক সাহিত্যরচনায় প্রবৃত্ত হন? সাহিত্যিকের লক্ষ্য কী, উদ্দেশ্য কী? সাহিত্যরচনা সাহিত্যিককে কী দেয়? যে-ক্ষমতার বলে সাহিত্যিক সাহিত্যরচনা করেন, সেই ক্ষমতার স্বরূপলক্ষণ কী? কোন্ কারণে সৃজনক্রিয়া অনুরূপ অন্যান্য নির্মাণক্রিয়া থেকে পৃথক্?

তৃতীয় গুচ্ছের কেন্দ্রে আছেন রসগ্রাহী ভোক্তা, সহৃদয় পাঠক, আদর্শ

পাঠক। এমন, যাঁকে বিশুদ্ধ পাঠক বলা যায়। ব্যবহারিক জীবন থেকে, প্রয়োজনের জগৎ থেকে যিনি যথাসম্ভব বিবিক্ত। রসাস্বাদনে যিনি যথাসম্ভব সম্পূর্ণভাবে মগ্ন। সাহিত্যের কাছে রসগ্রাহী পাঠক কী চান এবং কী পান? যা পান, তা কেমনভাবে, কোন্ যোগাযোগের ফলে পান? যা পান, তার সঠিক পরিচয় কী? যদি বলি আনন্দ, তো সেই আনন্দের স্বরূপ কী? যদি বলি রস, তাহ'লে—কাকে বলে রস?

চতুর্থ গুচ্ছের প্রশ্ন সমাজকে নিয়ে। এ-ও পাঠককে নিয়েই প্রশ্ন, কিন্তু বিচ্ছিন্ন বা একক পাঠককে নিয়ে নয়, সমাজবদ্ধ পাঠককে নিয়ে। প্রশ্ন মানুষের সামাজিক জীবনের দিক থেকে, রাজনৈতিক জীবনের দিক থেকে, ইতিহাসের দিক থেকে, সভ্যতার দিক থেকে। সাহিত্য যদি মানুষের বৃহৎ জীবনযুদ্ধের অন্যতম হাতিয়ার হয়, তাহ'লে হাতিয়ার হিসেবে তার কার্যকারিতার দিক থেকে। সমাজে সাহিত্যের স্থান কোথায়? সমাজ সাহিত্যকে বা সাহিত্যিককে কী দেয় এবং তার বদলে সমাজের কাছে সাহিত্যিক কী প্রত্যাশা করতে পারে, কতোখানি দাবি করতে পারে? সমাজের শুভাশুভের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক কী? সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকা কী? সমাজকে আনন্দ দেওয়া, এই কি তার একমাত্র কাজ? অথবা, সমাজের কল্যাণ করা, এই কি সাহিত্যের একমাত্র লক্ষ্য? সাহিত্য কি সব সময়ই লোকহিতকর? সব সাহিত্যই? সাহিত্য কি একই সঙ্গে আনন্দকর এবং অহিতকর হতে পারে না? কোনো বিশেষ উপন্যাস, কি কবিতা, কি নাটক যদি সমাজের পক্ষে অহিতকর হয়, তাহ'লে সেই কারণেই কি সে পরিত্যাজ্য? হিতকর কি অহিতকর এটা পরিমাপ করবেনই বা কে? সাহিত্যিক নিজে? না অপর সাহিত্যিকেরা? না সমালোচক নামক অনির্দিষ্ট গোষ্ঠী? না দার্শনিক, বা রাষ্ট্রপ্রধান, বা পুলিশ, বা আদালত? প্রশ্নটাকে উল্টো দিক থেকেও আনা যায়। কোনো নাটক কি উপন্যাস যদি সমাজের পক্ষে অহিতকর হয়েও আনন্দকর হয়, তাহলে সেই কারণেই কি তা গ্রহণীয় আদরণীয় এবং বরণীয়? আর্টের দাবি জীবনের উপর কতো দূর বিস্তৃত?

এই গুচ্ছচতুষ্টয়ের প্রশ্ন দিয়ে সাহিত্যের মৌল সমস্যার সবগুলো দিককেই

মোটামুটিভাবে স্পর্শ করা যায়। কিন্তু সব দিকে সকলেরই সমান আগ্রহ নেই। প্লেটো প্রথম গুচ্ছের প্রশ্নে বেশি আগ্রহী ছিলেন কি চতুর্থ গুচ্ছের প্রশ্নে বেশি আগ্রহী ছিলেন বলা কঠিন। দার্শনিক হিসেবে তাঁর আগ্রহ প্রথম গুচ্ছে, অর্থাৎ সাহিত্যের স্বরূপ কী এই প্রশ্নে, আর আদর্শ রাষ্ট্রের পরিকল্পনাকারী হিসেবে তাঁর আগ্রহ চতুর্থ গুচ্ছে অর্থাৎ সাহিত্য সমাজের পক্ষে হিতকর কি না এই প্রশ্নে। এ্যারিস্টটল তাঁর ক্ষুদ্রায়তন পুস্তিকায় প্রায় প্রত্যেকটি গুচ্ছই অল্পবিস্তর স্পর্শ করেছেন। প্রাচীনদের মধ্যে কারো সাহিত্যতত্ত্বই এ-রকম পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যতত্ত্ব নয়। ভারতীয় রসবাদী সাহিত্য-শাস্ত্রীরা তৃতীয় গুচ্ছের প্রশ্নের মধ্যেই নিজেদের মনোযোগ যথাসম্ভব নিবদ্ধ ক'রে রেখেছিলেন। তাঁদের লক্ষ্যের কেন্দ্রস্থল হ'লো সহৃদয় পাঠকের চিত্তভূমি—ভোক্তার রসাস্বাদন। রস কী এবং রসসঞ্চার কেমন ক'রে ঘটে, এইটেই তাঁদের কাছে সাহিত্যতত্ত্বের সব থেকে বড়ো প্রশ্ন।

নিতান্ত আধুনিক কালের কথা বাদ দিলে বলা যায় যে, পাশ্চাত্য সাহিত্যশাস্ত্রীরা সাধারণভাবে তৃতীয় গুচ্ছের প্রশ্নের আলোচনায়, ভোক্তার সাহিত্যপাঠজনিত আনন্দের স্বরূপবিশ্লেষণে নিরুৎসুক। প্রাচীন কালের ক্লাসিক পণ্ডিতেরা সাহিত্যের স্বরূপ নিয়ে এবং পরবর্তীকালের রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রীরা সাহিত্যিকের মনের রহস্য নিয়ে, সৃজনক্রিয়ার রহস্য নিয়ে গভীরভাবে ব্যাপৃত ছিলেন। তৃতীয় গুচ্ছের প্রশ্নকেই তাঁরা সব থেকে বেশি অবহেলা করেছেন।

এখানে লক্ষণীয় এই যে, কী বঙ্কিমচন্দ্র, কী রবীন্দ্রনাথ, উভয়েই এ-ব্যাপারে পাশ্চাত্য সাহিত্যশাস্ত্রীদের সমধর্মী। বোধকরি ইতিহাসের দিক থেকে এঁরা পাশ্চাত্য সাহিত্যচিন্তা এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যশাস্ত্রের সঙ্গেই যুক্ত। উভয়েরই দৃষ্টি প্রথম, দ্বিতীয় এবং প্রসঙ্গত চতুর্থ গুচ্ছের প্রশ্নের দিকে নিবদ্ধ। দু'জনের কেউ-ই ভোক্তার দিকের প্রশ্নে মনোযোগী নন। দু'জনেই রস কথাটি একাধিক বার উচ্চারণ করেছেন, কিন্তু ভারতীয় রসবাদের পারিভাষিক অর্থে নয়, নিজের নিজের অর্থে। দুজনের কারোই রসবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বা সহানুভূতি নেই। দু'জনেই রস ব্যাপারটিকে স্রষ্টার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন। 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে দেখতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্র

রস বলতে বুঝেছেন রসোদ্‌ভাবন। রবীন্দ্রনাথ রস বলতে কখনো বুঝেছেন, বাক্যের অলংকরণ, কখনো বুঝেছেন অতিশয়তা—অধিকাংশ সময়ই বুঝেছেন স্রষ্টার অনুভূতির তীব্রতা। কী রসোদ্‌ভাবন, কী স্রষ্টার অনুভূতির তীব্রতা, ভারতীয় অর্থে এর কোনোটই রস নয়। ভারতীয় মতে রস হ'লো এক ধরনের অলৌকিক আনন্দ-আস্বাদন। রবীন্দ্রনাথ ক্বচিৎ আস্বাদনের কথাও বলেছেন, কিন্তু খুব গভীর অর্থে নয়, সব সময় নয়।

একটা কথা মনে রাখতে হবে। সাহিত্যতত্ত্বে ক্লাসিকপন্থী ও রোমান্টিক-দের দ্বন্দ্বে ভোক্তাকেন্দ্রিক প্রশ্নের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেই। তা যদি থাকত, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের ক্ষেত্রেই আমরা এই প্রশ্নের বিস্তৃততর আলোচনা পেতাম। তার বদলে পেয়েছি সাহিত্যের স্বরূপের প্রসঙ্গ, সৃজনরহস্যের প্রসঙ্গ এবং কল্যাণ-অকল্যাণের প্রসঙ্গ।

এর প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই ক্লাসিকপন্থী এবং রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রীদের উত্তর আলাদা, প্রায় পরস্পরের বিপরীত।

সাহিত্য কী, এই প্রশ্নের উত্তরে ক্লাসিকপন্থী বলবেন, সাহিত্য একটি নির্মাণ, ভাষা দিয়ে নির্মিত একটি বস্তু। এই বস্তু প্রকৃতির বা জগতের অনুকৃতি। এর কাজ স্বভাবের অনুকরণ করা, জগতের রূপ ও সত্যের অনুকরণ করা। রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রী বলবেন, সাহিত্য অনুকরণ নয়, সৃষ্টি। সাহিত্য অভিনববস্তুর আবির্ভাব। জগৎ ও জীবনের প্রতিকৃতি রচনা সাহিত্যিকের কাজ নয়। সাহিত্যরচয়িতা তাঁর রচনাক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে—এবং তাঁর রচিত বস্তুর মধ্যে দিয়ে নিজের অন্তরস্থিত ভাবকে প্রকাশ করেন, নিজেকে প্রকাশ করেন। সাহিত্যরচয়িতা সৌন্দর্যসৃষ্টি করেন, সৌন্দর্যসৃষ্টির মধ্যে দিয়ে আনন্দের সঞ্চার করেন।

ক্লাসিকপন্থী বলবেন, সাহিত্যের লক্ষ্য সত্য এবং এই সত্য জীবনেরই সত্য—বাস্তব সত্য। ঘটনার সত্য যদি না-ও হয়, ঘটনার অন্তর্নিহিত মর্মসত্য। রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রী বলবেন, প্রচলিত অর্থে যে-সত্যকে বুঝি তা সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। তাকে যদি সত্যই বলি, তাহ'লে তা গভীরতর অথবা উচ্চতর সত্য। তা কল্পনার সত্য, বাস্তব-জগতে তার সাক্ষাৎ মিলবে না। সাহিত্যরচয়িতার মনোভূমিই তার জন্মভূমি।

সমাজের শুভাশুভের ব্যাপারে সাহিত্যের কোনো দায়দায়িত্ব আছে কি না, এই প্রশ্নে ক্লাসিকপন্থী বলবেন, অবশ্যই আছে। ক্লাসিকপন্থীর মতে সত্য অবশ্যই কল্যাণকর। যে-সাহিত্য কল্যাণকর নয়, তা সত্য নয়, তা সাহিত্যও নয়। এ-প্রশ্নে রোমান্টিকদের মধ্যে দ্বিধা আছে। এ-প্রশ্নে রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রীরা দুই দলে বিভক্ত, এবং দুই দলের কাছ থেকে দু'রকম উত্তর পাওয়া যাবে। এক দল বেশ জোরের সঙ্গেই বলবেন, লোকহিতের সঙ্গে, সমাজের কল্যাণ-অকল্যাণের সঙ্গে সাহিত্যের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই। সাহিত্যের লক্ষ্য সুন্দর। কল্যাণ হ'লো কি হ'লো না তা নিয়ে সাহিত্যিকের কিছুমাত্র মাথাব্যথা নেই। সুন্দর যদি অকল্যাণকর হয়, তা হ'লেও তা গ্রহণীয়। সাহিত্য যদি সত্যিই সাহিত্য হয়, অর্থাৎ সাহিত্য যদি সত্যিই সুন্দর হয়, তাহ'লে অকল্যাণকর হ'লেও তা বরণীয়। সুন্দরের জন্যই সুন্দর, আর্টের জন্যই আর্ট—এর উপর আর কোনো কথা নেই।

রোমান্টিকদের অন্য দলটা এ-রকম গোঁড়া কলাকৈবল্যবাদী নন। তাঁরা একটু নরম ক'রে বলবেন, সুন্দর কখনো অকল্যাণকর হয় না। কখনো কখনো কোনো কোনো সাহিত্যকে আপাতদৃষ্টিতে অকল্যাণকর বলে' মনে হতে' পারে বটে, কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে, সেটা তার ছদ্মবেশ। সাহিত্যসৃষ্টি সৌন্দর্যসৃষ্টি বলেই তা কল্যাণেরও সৃষ্টি। সাহিত্য গূঢ় অর্থে সব সময়ই সমাজকল্যাণকর। তবে সমাজের কল্যাণটা সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। ওটা আপনা-থেকেই হয়, এবং হতে বাধ্য। সাহিত্যের লক্ষ্য সৌন্দর্য, আনন্দ, আত্মপ্রকাশ।

পূর্বে যে দ্বৈততার কথা বলা হয়েছে, সাহিত্যিকের নিজের মনের মধ্যে ক্লাসিক ও রোমান্টিকের ভাবদ্বন্দ্ব, রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব খুব বেশি দেখতে পাবো না। পরিণত রবীন্দ্রনাথে যে দ্বন্দ্ব, তা রোমান্টিকতাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার দ্বন্দ্ব। সেটা বিংশ শতকের ব্যাপার। ক্লাসিক ও রোমান্টিকের ভাবদ্বন্দ্ব বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে সুপ্রত্যক্ষ। তার মূল তখনকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার মধ্যে নিহিত। সাহিত্যের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, এখানে সাহিত্যতত্ত্ব প্রসঙ্গেও আমরা সেই কথা বলতে পারি। তিনি বলেছেন, '......সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব

মাত্র।'[২] আমরা এর সঙ্গে যোগ করতে পারি যে, সাহিত্যতত্ত্বও তাই। অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব যে অনেকখানি পরিমাণে সেদিনকার দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব তাতে সন্দেহ নাই। তবে, সাহিত্যতত্ত্ব যেহেতু জীবন থেকে দুই ধাপ দূরবর্তী—প্রথম ধাপে সাহিত্য, দ্বিতীয় ধাপে সাহিত্যতত্ত্ব—সেই হেতু সেখানে প্রত্যক্ষতা জীবনের তুলনায় অনেক কম।

৪

এইবারে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসিদ্ধান্ত। দেখতে হবে, কোন্ প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের কী উত্তর।

সাহিত্য কী? কোন্ গুণে সাহিত্য সাহিত্য হয়, কাব্য কাব্য? সাহিত্য রচনায় রচয়িতা এমন কী কাজ করেন, যা অন্য ক্ষেত্রের অন্যান্য কর্মের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্? আমরা জানি, ক্লাসিকপন্থীরা বলেন, কবি এমন একটা কিছু নির্মাণ করেন যা স্বভাবের অনুকরণ এবং এই অনুকরণের গুণেই সাহিত্য সাহিত্য, কাব্য কাব্য। অন্যপক্ষে রোমাণ্টিক সাহিত্যশাস্ত্রীরা বলেন, রচয়িতা সৃষ্টি করেন। সেই সৃষ্টিই সৌন্দর্যসৃষ্টি। রচয়িতা সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রকাশ করেন। আত্মপ্রকাশের কারণেই, সৌন্দর্যসৃষ্টির কারণেই সাহিত্য সাহিত্য, কাব্য কাব্য। এই সৃষ্টিক্ষমতারই অপর নাম কল্পনাশক্তি। কল্পনাই সাহিত্যের কারয়িত্রী শক্তি।

এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কী বলেন? কবি নির্মাণ করেন, না সৃষ্টি করেন? স্বভাবের সত্যকে প্রকাশ করেন, না সৌন্দর্যসৃষ্টি করেন? কাব্যজগৎ স্বভাবানুকারী, না স্বভাবাতিরিক্ত—সম্পূর্ণ অভিনব?

এইখানেই মুশ্‌কিল। বঙ্কিমচন্দ্র দুই-ই বলেন। কখনো এটা বলেন, কখনো ওটা বলেন, কখনো দুটোই একসঙ্গে বলেন। তাঁর মতে, কাব্য-জগৎ স্বভাবানুকারীও বটে, আবার স্বভাবাতিরিক্তও বটে। কখনো বলেন, ঈশ্বরের এই জগৎই সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠা, কবি তাকেই প্রকাশ করতে চেষ্টা

২. বিবিধ প্রবন্ধ, ৫৩

করেন। আবার কখনো বলেন, জগতে অনেক অপূর্ণতা আছে, কবি তা পূরণ ক'রে প্রকাশ করেন। কখনো বলেন, কবি এমন সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেন, যা কোথাও ছিল না, কোথাও নেই, যা কল্পনার অভিনব দান।

আমরা দেখতো পাবো, 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গোঁড়া অনুকরণবাদী। দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব বিষয়ক প্রবন্ধে তিনি খাঁটি সৃষ্টিবাদী। 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে তিনি উভয়বাদী, অর্থাৎ অল্পবিস্তর মিশ্রণপন্থী। এর মধ্যে প্রথমোক্ত প্রবন্ধের সাহিত্যতত্ত্বগত গুরুত্ব হয়তো খুব বেশি নয়, কিন্তু দ্বিতীয়োক্ত ও তৃতীয়োক্তের মধ্যে কোন্‌টি যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিতেত্ত্বের যথার্থ প্রতিনিধি, তা নির্ণয় করা কঠিন। তার কারণ, এই দুই প্রবন্ধে যে-দুই প্রবণতা প্রকাশ পেয়েছে, তার কোনোটাই বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে মিথ্যা নয়।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য তাঁর নিজের মুখে শোনাই ভাল। 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—'......যাঁহারা কবির সৃষ্ট পদার্থের লোভে সাহিত্যের অনুরক্ত, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, ঈশ্বরের সৃষ্টি অপেক্ষা কোন্ কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর। নকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না।'[৩]

এই উদ্‌ধৃতির কয়েকটা জিনিস লক্ষ করা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সৃষ্টি কথাটা ব্যবহার করেছেন বটে, কিন্তু রোমাণ্টিক ভাবানুষঙ্গে নয়। যে-কোনো রকম নির্মাণ, এমন কি অনুকরণও এখানে সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে রোমাণ্টিক সাহিত্যতত্ত্বের একটি কেন্দ্রগত প্রত্যয়কে দ্বিধাহীনভাবে নিজের সাহিত্য-সিদ্ধান্ত থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দিলেন।

দ্বিতীয় কথা সৌন্দর্য। রোমাণ্টিক মতে সৌন্দর্যসৃষ্টি কল্পনার ক্রিয়া। এ-ও একটা কেন্দ্রগত রোমাণ্টিক প্রত্যয়। কল্পনার ক্রিয়ায় কবির সৃষ্টি সুন্দর হয়, এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বলেন নি। বরং উল্টো কথাই বলেছেন। 'বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরের সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর।' অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সৌন্দর্য অর্থ স্বভাবানুকারিতার গুণ।

৩. বিবিধ প্রবন্ধ, ১৮১

সৌন্দর্য কবির দান নয়, আসলটি সুন্দর বলেই নকলটিও সুন্দর। এই সৌন্দর্যতত্ত্ব রোমান্টিক সৌন্দর্যতত্ত্বের পরিপন্থী—অন্তত সাহিত্যের ক্ষেত্রে।

'নকল কখন আসলের সমান হইতে পারে না।' —বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাক্যটিতে ক্লাসিক অনুকরণবাদের চূড়ান্ত রূপ, এ্যারিস্টট্লের নয়, প্লেটোর অনুকরণবাদের রূপ প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্লেটনিক অনুকরণবাদে সাহিত্যের প্রতি, কবির সৃষ্টিক্ষমতার প্রতি কিঞ্চিৎ অবহেলাই প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সাহিত্যপ্রেমিক ব্যক্তির কাছে এটা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। কিন্তু ইতিহাসে এরকম অপ্রত্যাশিত ঘটনা অনেক ঘটেছে। টলস্টয় এর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। স্বয়ং প্লেটোই বা নয় কেন?

'যাঁহারা কবির সৃষ্ট পদার্থের লোভে সাহিত্যে অনুরক্ত', বঙ্কিমচন্দ্র ইঙ্গিতে বলেছেন, তাঁরা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। কী আদরণীয় এবং কেন আদরণীয়, তাঁরা তা জানেন না। সাহিত্য আদরণীয় এইজন্য যে তা ধর্মমূলক। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, সত্যমূলক বলেই সাহিত্য মূল্যবান এবং সত্যের সূত্রেই সাহিত্য ধর্মমূলক। এই প্রবন্ধেরই শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষণা করেছেন, 'সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে।'[৪]

সাহিত্য সম্পর্কে শ্রদ্ধার অভাব চূড়ান্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে এ প্রবন্ধের শেষের দিকেই। প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছেন, 'কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মাত্র। অতএব কেবল সাহিত্য নহে, যে মহত্তত্ত্বের অংশ এই সাহিত্য, সেই ধর্মই এইরূপ আলোচনীয় হওয়া উচিত। সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।'[৫]

মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এর সঙ্গে তুলনা করতে পারি The Religion of An Artist-এর লেখক রবীন্দ্রনাথের অভিমতের, যিনি কখনোই বলেন না, সাহিত্য কোনো-কিছুর নিম্ন সোপান, বরং যিনি বলেন, শিল্পই ধর্ম,

৪. বিবিধ প্রবন্ধ, ১৮২

৫. তদেব, ১৮২

শিল্পীর ধর্মই তাঁর নিজেরো ধর্ম—এই ধর্মই মানুষের ধর্ম। কেননা মানুষ মাত্রেই শিল্পী।

পার্থক্যটা লক্ষ করবার মতো। রবীন্দ্রনাথের কাছে সাহিত্য—যাকে তিনি বলেছেন সাহিতত্ব অর্থাৎ মিলন, তাই হ'লো মানবধর্ম। সাহিত্য নিজেই ধর্ম—সোপান নয়, অংশ নয়, সমগ্র ধর্ম। শুধু শিল্পীর পক্ষে নয়, সমস্ত মানুষের পক্ষে। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সাহিত্য অনুশীলনধর্মের অর্থাৎ মানবধর্মের একটি ভগ্নাংশ মাত্র। সাহিত্যে কেবল চিত্তরঞ্জিনীবৃত্তির পুষ্টি। তা সমগ্র মানবত্বের বিশেষ একটি অংশ। ধর্মে সমগ্র মানবত্বের বিকাশ।

কেউ হয়তো বলতে পারেন, এটা বঙ্কিমচন্দ্রের বঙ্গদর্শনের আমলের অভিমত নয়, প্রবন্ধটি অনেক পরের দিকে প্রচারে (পৌষ ১২৯২) প্রকাশিত হয়েছে। এ-সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় ধর্মভাব এবং হিন্দুয়ানি প্রবল হয়ে উঠেছে, অন্যদিকে তেমনি তাঁর সাহিত্যতত্ত্বে ক্লাসিকপন্থী ভাবও অপেক্ষাকৃত উগ্র হয়ে উঠেছে। এই সময়ের অভিমতকে বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যতত্ত্বের প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করা অসঙ্গত।

প্রতিনিধি নিশ্চয়ই নয়, এবং হিন্দুয়ানির কথাটাও মোটামুটি ঠিক, কিন্তু ক্লাসিকপন্থিতার কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষের দিকের সমস্ত সিদ্ধান্তই যে অবিমিশ্র ক্লাসিকপন্থী, এমন বলা যায় না। মিশ্রণ বঙ্কিমচন্দ্রের সব সময়ের চিন্তার মধ্যেই আছে। 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা' প্রবন্ধের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তী কালে 'কবিত্ব' শীর্ষক যে-অংশটি যোগ ক'রে দিয়েছিলেন, তা রচিত হয়েছে ১২৯৩ সালে (১৮৮৬ খ্রীঃ), অর্থাৎ পূর্বোক্ত 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধের প্রায় এক বছর পরে। এই 'কাবত্ব' শীর্ষক সংযোজনটি কী সাহিত্যতত্ত্ব, কী সমালোচনা, দুই দিক থেকেই অসাধারণ রচনা, বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠতমের একটি। আগেই বলেছি, এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব মূলত রোমান্টিক। আরো একটা দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' প্রবন্ধটি এর এক বছর আগে, 'ধর্ম এবং সাহিত্যে'র প্রায় সমকালে রচিত। সে-প্রবন্ধের সাহিত্যতত্ত্বও মোটামুটি রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব।

ঈশ্বরগুপ্ত বিষয়ক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গোড়াতেই এ-কথা স্বীকার করেছেন

যে, শ্রেষ্ঠ কবির আসল গুণ সৃষ্টিক্ষমতা। এ-প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের রিয়ালিজ্‌মের এবং ব্যঙ্গরসের অনেক প্রশংসা করলেও, এ-কথা বলতে কুণ্ঠিত হন নি যে, যথার্থ কবিত্বের ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্ত উচ্চাসন দাবি করতে পারেন না। পারেন না, তার কারণ তাঁর সৃষ্টিক্ষমতা নেই। এর ব্যাখ্যা ক'রে এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে কথা বলেছেন, তা খাঁটি রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব। তিনি বলেছেন, 'মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই।'৬

সৌন্দর্যসৃষ্টির সম্পর্কে এই অভিমতের সঙ্গে সমকালীন 'ধর্ম এবং সাহিত্যে'র অভিমতের কিছুমাত্র মিল নেই। সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র স্বভাবকেই সুন্দর বলেছেন, ঈশ্বরের সৃষ্টি হিসেবে বাস্তবকেই সৌন্দর্যের চরম বলে দাবি করেছেন। এখানে কিন্তু তিনি যা বাস্তব তার থেকে যা আদর্শ, যা আকাঙ্ক্ষিত, যা কল্পনাগম্য, যা ধ্যানপ্রাপ্য তাকে অনেক বেশি মূল্য দিয়েছেন। বলেছেন, 'সকল বিষয়েই প্রকৃত অবস্থার অপেক্ষা উৎকর্ষ আমরা কামনা করি। সেই উৎকর্ষের আদর্শ সকল আমাদের হৃদয়ে অস্ফুট রকম থাকে। সেই আদর্শ ও সেই কামনা কবির সামগ্রী। যিনি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তাহাকে গঠন দিয়া শরীরী করিয়া আমাদের হৃদয়গ্রাহী করিয়াছেন, সচরাচর তাঁহাকেই আমরা কবি বলি।...ঈশ্বরচন্দ্র তাহা পারেন নাই বা করেন নাই...।'৭

এই উক্তির মধ্যে মনে হয় একটা ইঙ্গিত আছে যে, কবির কাজ স্বভাবকে সুন্দরতর ক'রে প্রকাশ করা, বাস্তবকে আইডিয়ালাইজ করা—আদর্শান্বিত করা, যেমন দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব প্রসঙ্গে পরে বলেছেন। তা যদি হয়, তাহ'লে এই অভিমতের সঙ্গে সপ্তদশ শতকের ঢিলে-ঢালা আধা রোমান্টিক অনুকরণবাদের কিছু হয়তো মিল পাওয়া যাবে। কিন্তু 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধের গোঁড়া অনুকরণবাদের সঙ্গে এর বিরোধ সুস্পষ্ট।

দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কিত প্রবন্ধের 'কবিত্ব' সংযোজনটি ঈশ্বরগুপ্ত-প্রবন্ধের

৬. বিবিধ, ১২৪

৭. তদেব, ১২৪

এক বছর পরে রচিত হলেও তার রোমান্টিক তত্ত্ব স্পষ্টতর ও শুদ্ধতর। কবির সৃষ্টিক্ষমতাকে এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র সর্বোচ্চ স্থান দিয়েছেন। বলেছেন, 'কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি-কৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল।'[৮]

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি কথাটার উপর আরো গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত-প্রবন্ধে সৃষ্টি কথাটার ভাবানুষঙ্গ আধা-রোমান্টিক, এখানে তা পুরো রোমান্টিক। ঈশ্বরগুপ্ত-প্রবন্ধে সৃষ্টি কথাটার অর্থ অনেকটা আদর্শায়িত বাস্তবের রচনা। এর মধ্যে বাস্তব এবং আদর্শ দুয়েরই ক্রিয়া আছে, স্বভাব এবং কল্পনা দুয়েররই দান আছে। দীনবন্ধু-প্রবন্ধে সৃষ্টি ব্যাপারে কল্পনারই একাধিপত্য।

একটা কথা এখানে বলে' রাখা প্রয়োজন। আদর্শায়িত বাস্তব (Nature Idealized) আর নব্য-ক্লাসিকপন্থীদের সুবিন্যস্ত বাস্তব (Nature Methodized) কিন্তু ঠিক এক বস্তু নয়। শেষোক্ত ব্যাপারটি ইংরেজ এবং ফরাসী নব্য-ক্লাসিকপন্থীদের একটি বহুবিঘোষিত আবিষ্কার। কিঞ্চিৎ শৃঙ্খলার আনয়ন ছাড়া এখানে কবিকল্পনার ক্রিয়া যৎসামান্য। স্বভাবের আদর্শায়ণে কিন্তু তা নয়। আদর্শ জন্মলাভ করে কবির হৃদয়ে, কবির কল্পনায়। এর মধ্যে যে-অনুকরণবাদ তা রোমান্টিকতার অনেক নিকটবর্তী। এবং সেই সঙ্গে এই সত্যটাও মনে রাখতে হবে যে, মনোভাবে এবং ভাবানুষঙ্গে অনেকটা ভিন্ন হ'লেও, নিছক তত্ত্ব হিসেবে দেখলে স্বয়ং এ্যারিস্টট্‌লের অনুকরণবাদও কিন্তু এই মতবাদ থেকে খুব বেশি দূরবর্তী নয়।

দীনবন্ধু-প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির খুব প্রশংসা করেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে বলেছেন, দীনবন্ধুর কল্পনা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে সহানুভূতিই প্রভু, কল্পনাই দাসী। কিন্তু কল্পনার প্রভুত্ব না থাকলে যথার্থ সৃষ্টি হয় না, উচ্চতম স্তরের সৃষ্টি হয় না।

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তিন রকম সৃষ্টি বা তিন রকম রচনাক্রিয়ার কথা বলেছেন। সব চেয়ে নীচের ধাপে বাস্তবের যথাযথ রূপায়ণ, রিয়ালিজ্‌ম্।

---

৮. বিবিধ, ৯২

এখানে ঈশ্বরগুপ্ত এবং দীনবন্ধু দু'জনেই পারদর্শী। মাঝখানের ধাপে আছে বাস্তবের আদর্শায়িত রূপনির্মাণ। এ-কাজে দীনবন্ধু পারদর্শী, কিন্তু ঈশ্বর-গুপ্ত নন। দীনবন্ধু প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'এটুকু গেল তাঁহার Realism, তাহার উপর Idealize করিবার ক্ষমতাও বিলক্ষণ ছিল।'[৯]

সবার উপরে তৃতীয় স্তরের সৃষ্টি, যা বিশুদ্ধ কল্পনার ক্রিয়া থেকে জন্মায়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে দীনবন্ধুর কল্পনাশক্তি খুব প্রবল ছিল না। সে কল্পনা সহানুভূতির আদেশে চালিত। সেই জন্যই তিনি রিয়ালিজম্ এবং স্বভাবের আদর্শায়ণ, এর বেশি যেতে পারতেন না। পক্ষান্তরে, যাঁর কল্পনাশক্তি প্রবল, যিনি সহানুভূতির নিয়ন্ত্রণ মানেন না, তিনি অনায়াসে অভিজ্ঞতার গণ্ডিকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারেন, অবলীলাক্রমে একটা জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত ক'রে তুলতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই বলি—

'শেক্ষপীয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত Caliban বা জীবন্ত Ariel সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলার সৃষ্টি করিয়াছেন। এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী।'[১০]

যে-কল্পনা শেক্স্পীয়ারের, যে-কল্পনা কালিদাসের, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, তা-ই হ'ল যথার্থ কবিকল্পনা। এই কবিকল্পনা যা সৃষ্টি করে, ক্যালিবান, কি উমা, কি শকুন্তলা, তা-ই হ'ল উচ্চতম স্তরের সৃষ্টি। এ ক্যালিবান, এই উমা, এই শকুন্তলা কোথাও ছিল না, কোথাও নেই। এরা কারোই অনুকরণ নয়, এরা দিব্য আবির্ভাব।

বলা বাহুল্য এ-কল্পনাতত্ত্ব, রোমান্টিক কল্পনাতত্ত্ব। সৃষ্টি সম্পর্কে—উচ্চতম স্তরের সৃষ্টি সম্পর্কে এখানে যে অভিমত ব্যক্ত হয়েছে তা খাঁটি রোমান্টিক অভিমত।

এই রকম একটা ধারণা আছে যে, প্রথম যৌবনে এবং বঙ্গদর্শনের প্রথম দিকে বঙ্কিমচন্দ্র তুলনামূলক বিচারে অধিক পরিমাণে পাশ্চাত্য-পন্থী, যুক্তিবাদী এবং সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে অধিক পরিমাণে রোমান্টিক ছিলেন। পরের দিকে, নব্য-হিন্দুয়ানির জোয়ারের কালে অংশত তারই প্রভাবে কিন্তু

৯. বিবিধ, ৯৪

১০. বিবিধ, ৯৮

প্রধানত নিজের ধর্মচিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র ক্রমেই প্রাচ্যপন্থী, ভক্তিবাদী এবং ক্লাসিকপন্থী হয়ে ওঠেন।

এ-ধারণা সম্পূর্ণ ভুল এমন বলি না। মোটামুটিভাবে খানিকটা এই ধরনেরই ব্যাপার ঘটেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু এত সরলভাবে নয়। অন্যান্য ক্ষেত্র এখানে আমাদের আলোচ্য নয়, কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বে দেখতে পাবো, মিশ্রণ আরো অনেক জটিল। স্মরণ রাখতে হবে, দীনবন্ধু-প্রবন্ধের 'কবিত্ব' শীর্ষক সংযোজনটি যে সময়ের রচনা (১৮৮৬), সেটা বঙ্গদর্শনের আমল নয়, সেটা পুরো নব্য-হিন্দুয়ানির আমল। নব্য-হিন্দুয়ানি আন্দোলনের প্রধান নেতা শশধর তর্কচূড়ামণি তার ঠিক একবছর আগে (১৮৮৫) কলকাতা এসে বক্তৃতাদি শুরু করেছেন। দু'বছর আগে (১৮৮৪) প্রচার এবং নবজীবন পত্রিকা আবির্ভূত হয়েছে এবং 'দেবীচৌধুরাণী' প্রকাশিত হয়েছে। দু বছর আগে থেকে প্রচারে (১৮৮৪, আশ্বিন ১২৯১) 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং নব জীবনে (১৮৮৪, শ্রাবণ ১২৯১) 'ধর্মতত্ত্ব' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়েছে। এই প্রবন্ধাংশ রচনার ঠিক এক বছর পরে (১৮৮৭) 'সীতারাম' এবং দু'বছর পরে (১৮৮৮) 'ধর্মতত্ত্ব' প্রকাশিত হয়। এই ঘটনাগুলির তাৎপর্য যাঁরা জানেন তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, এই সময়ই বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচেতনা একেবারে তুঙ্গ স্পর্শ করেছিল। লক্ষণীয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের রোমান্টিকতম রচনাটি ঠিক এই সময়েই প্রকাশিত হয়েছে।

৫

'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধের এক বছর আগে, ঈশ্বরগুপ্ত-প্রবন্ধের প্রায় সমকালে, প্রচার পত্রিকার প্রথম বর্ষে, ১২৯১ মাঘ সংখ্যায় (১৮৮৪) বঙ্কিমচন্দ্র 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তখনকার কালের নবীন লেখকদের উদ্দেশে সাহিত্যরচনা সংক্রান্ত পর পর বারোটি উপদেশ সূত্রাকারে প্রকাশিত করেন। সূত্রগুলিকে সাহিত্যরচনার নিয়ম বলা যেতে

পরে। সবগুলি নিয়ম সমান তত্ত্বধর্মী নয়, ব্যবহারিক সদুপদেশ, কিন্তু তার মধ্যে কয়েকটি নিয়ম সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মৌল বিশ্বাস থেকে নিঃসৃত। অর্থাৎ তারা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসিদ্ধান্তেরই ঈষৎ রূপান্তরিত সংস্করণ। দুটি, বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত তৃতীয় এবং চতুর্থ সূত্র, এই দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।'[১১]

এই সূত্রের প্রথমে বাক্যের দ্বিতীয় বিকল্পটির দিকে প্রথম দৃষ্টি দেওয়া যাক। 'যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া···সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন।' অনুমান করতে পারি, সৌন্দর্যসৃষ্টি বলতে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে স্বভাবের অনুকরণকে বুঝছেন না, কল্পনাশক্তির ক্রিয়ায় অভিনব-কিছু সৃষ্টি করাকেই বুঝছেন, অর্থাৎ কথাটাকে রোমাণ্টিক অর্থেই গ্রহণ করছেন। তা যদি হয়, তাহলে এইটেই তো রোমাণ্টিক তত্ত্বের একেবারে সারাৎসার। এইটেই কি যথেষ্ট নয়, এর সঙ্গে আবার অপর একটা বিকল্প কেন? অপর বিকল্পকে যুক্ত ক'রে দেওয়া অর্থই তো এর তত্ত্বগত গুরুত্বকে খর্ব ক'রে দেওয়া।

একটি বিকল্প সৌন্দর্যসৃষ্টি, অপর বিকল্প দেশের বা মানুষ্যজাতির মঙ্গলসাধন, আরো সোজা কথায় বললে, এক বিকল্প সৌন্দর্য, অপর বিকল্প কল্যাণ। এর মধ্যে সাহিত্যতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কোন্‌টা বেশি জরুরি? দুটোই সমান? এরা কি সত্যিই বিকল্প? যে-কোনো একটা হ'লে অপরটার দরকার নেই? হিতকর অসুন্দর আর অহিতকর সুন্দর, দুই-ই সমান গ্রহণীয়?

বঙ্কিমচন্দ্র যদি এখানে বিশেষ ক'রে সাহিত্যরচনার কথা না বলে' থাকেন, তাহ'লে অবশ্য এই সব প্রশ্ন থাকে না। কেননা নীতির ক্ষেত্রে ধর্মের ক্ষেত্রে

১১. বিবিধ প্রবন্ধ, ২০৬

জ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রে হিতকর অসুন্দর নিশ্চয়ই থাকতে পারে। কিন্তু মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ ক'রে সাহিত্যের দিকে তাকিয়েই এ-কথা বলেছেন। কারণ প্রবন্ধের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্য, বাঙ্গালার ভরসা। এই নিয়মগুলি বাঙ্গালা লেখকদিগের রক্ষিত হইলে, বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি বেগে হইতে থাকিবে।'[১২]

সাহিত্যের উন্নতির কথা থেকে বোঝা যায়, সাহিত্যই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দিষ্ট। কিন্তু সাহিত্যের একই সঙ্গে দুটো পৃথক্ লক্ষ্য থাকা সম্ভব কি? বঙ্কিমচন্দ্র এমনও বলছেন না যে, এদের দুটোকেই থাকতে হবে। তা যদি তিনি বলতে চাইতেন, তাহলে এমন একটা উচ্চতর সত্যের কথা তাঁকে বলতে হ'তো যার মধ্যে সুন্দর এবং ও কল্যাণ দুই-ই অঙ্গীভূত। বঙ্কিমচন্দ্র এমনও বলছেন না যে, সুন্দর ও কল্যাণ আপাতদৃষ্টিতে পৃথক্ হলেও মূলত একই বস্তু। আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথ সুন্দর ও কল্যাণের অভেদে বিশ্বাসী। বঙ্কিমচন্দ্রও যে অনুরূপ বিশ্বাস পোষণ করেন, তাঁর উক্তি থেকে এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দর আর হিতকর এই দুই বিকল্পের মাঝখানে যে 'অথবা' শব্দটি বসিয়েছেন, তাকে কিছুতেই অগ্রাহ্য করা যাবে না। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, যে-কোনো একটি হ'লেই চলবে। অর্থাৎ সাহিত্যের যুগপৎ সুন্দর এবং হিতকর হবার দরকার নেই, শুধু সুন্দর অথবা শুধু হিতকর হ'লেই চলবে। যুগপৎ অসুন্দর এবং অহিতকর হ'লে তবেই তা অসাহিত্য। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কি বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কাছেই অস্বস্তিকর নয়?

অসুন্দর রচনা হিতকর হ'লেই তা সাহিত্য হবে, এমন কথা কী ক্লাসিকপন্থী, কী রোমান্টিক কেউ-ই বলেন না। বঙ্কিমচন্দ্র কি তা-ই বলতে চান?

অন্যপক্ষে, অহিতকর রচনা সুন্দর হ'লেই যে তা সাহিত্য হয়ে উঠবে, এমন কথা কি কেউ বলেন? সকলে বলেন না, কেউ কেউ বলেন। বিশেষ গোত্রের রোমান্টিকরা, কলাকৈবল্যবাদীরা, যাঁরা বলেন সবার উপরে আর্টই সত্য, তাহার উপরে নাই, অথবা ইস্থেট্-রা, যাঁরা বলেন সবার উপরে সুন্দর,

১২. বিবিধ প্রবন্ধ, ২০৭

তাহার উপরে নাই, এই গোষ্ঠীর সাহিত্যশাস্ত্রীরা সকলেই এ-কথা বলতে পারেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র পারেন না। বিশেষত এই প্রবন্ধেই এর ঠিক পরের সূত্রটিতে—চার নম্বর সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন, 'যাহা অসত্য, ধর্ম-বিরুদ্ধ···সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী-ধারণ মহাপাপ।'[১৩]

'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন,' আর 'ধর্ম এবং সাহিত্য' এক বছর আগে-পরের এই দুই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। ঠিক তেমনি এর আগে এবং পরে অনেকবার এমন সব কথা বলেছেন যার সঙ্গে এর কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না, অন্তর্নিহিত ভাবের দিক থেকে যা এর বহুদূরবর্তী। ঈশ্বরগুপ্ত সংক্রান্ত প্রবন্ধ উক্ত দুই প্রবন্ধের মাঝখানে। তার সঙ্গে এ-দুয়ের কোনোটিরই বক্তব্যের মিল নেই। 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধের অল্প পরে দীনবন্ধু বিষয়ক প্রবন্ধ। এ-প্রবন্ধে দীনবন্ধুর সৃষ্টিক্ষমতা প্রশংসাকালে তিনি একবারও বলেন নি যে, তাঁর রচনা ধর্মভাবোদ্দীপক। ক্যালিবান বা এরিয়েল সৃষ্টির কথা বলে শেক্‌সৃপীয়রের প্রশংসা করেছেন, কিন্তু ধর্মভাবের কথা সেখানেও বলেন নি। আগের দিকে তাকালেও এ-রকম দৃষ্টান্ত দুর্লভ হবে না। আট-ন বছর আগের 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে (১৮৭২, জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন ১২৭৯) বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তশুদ্ধির কথা বলেছেন, কিন্তু সরাসরি ধর্মের কথা বলেন নি। পরে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তশুদ্ধি আর ধর্মের মধ্যে কোনো পার্থক্য করেন নি, বরং চিত্তশুদ্ধিকেই ধর্মের সারাৎসার বলে' বর্ণনা করেছেন।[১৪] কিন্তু সে অনেক পরে, পূর্বোক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের কাছাকাছি সময়ে। এখানে অর্থাৎ 'উত্তর চরিত' প্রবন্ধে তিনি মুখ্য বলেছেন সৌন্দর্যকেই।

১৩. তদেব, ২০৬

১৪. 'চিত্তশুদ্ধি' (প্রচার, ১৮৮৫ ফাল্গুন ১২৯২) প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'হিন্দুধর্মের সার চিত্তশুদ্ধি।...চিত্তশুদ্ধি কেবল হিন্দুধর্মেরই সার, এমত নহে, ইহা সকল ধর্মের সার।' বিবিধ প্রবন্ধ, ১৮৩

'উত্তরচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-বিষয়ক প্রথম প্রবন্ধ। বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে ষষ্ঠ সংখ্যা, এই পাঁচ কিস্তিতে প্রকাশিত। প্রথম প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা ক'রে দিলেন, '...সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।'[১৫]

বলা দরকার যে, এই উক্তির কয়েক ছত্র আগে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়ে এমন কথা বলেছেন যা এই উক্তিকে প্রায় খণ্ডন করে। সেখানে তিনি পরিষ্কার বলেছেন যে কাব্যের উদ্দেশ্য হ'লো 'মনুষ্যের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন।'[১৬] বলেছেন, সৌন্দর্য নিজে লক্ষ্য নয়, সৌন্দর্য আসল লক্ষ্যে পৌঁছুবার উপায় মাত্র। বলেছেন, 'কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা—কিন্তু নীতিব্যাখ্যার দ্বারা তাঁহারা শিক্ষা দেন না। কথাচ্ছলেও নীতিশিক্ষা দেন না। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।'[১৭]

একটু পরে এই কথাটাকেই আরো স্পষ্ট ক'রে দেবার অভিপ্রায়ে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই প্রশ্ন উত্থাপন ক'রে নিজেই তার জবাব দিয়েছেন। উদ্দেশ্য যে 'চিত্তশুদ্ধি বিধান' তা আগেই বলা হয়েছে। এইবারে উপায়ের কথা। 'কি প্রকারে কাব্যকারেরা এই মহৎ কার্য সিদ্ধ করেন? যাহা সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করিবে তাহার সৃষ্টির দ্বারা। সকলের চিত্তকে আকৃষ্ট করে, সে কি? সৌন্দর্য; অতএব সৌন্দর্য সৃষ্টিই কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।'[১৮]

মূল কথাটা ভুল বোঝার কোনো অবকাশ নেই। লক্ষ্য হলো চিত্তশুদ্ধি, আর তার উপায় হ'লো সৌন্দর্যসৃষ্টি। আশ্চর্য কথা, এই উপায়টিকেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন মুখ্য উদ্দেশ্য। আর চরম লক্ষ্য—চিত্তশুদ্ধি—তাকে তিনি বলেছেন গৌণ উদ্দেশ্য। যেমন, 'তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ

১৫. বিবিধ প্রবন্ধ, ৪২

১৬. তদেব, ৪১

১৭. তদেব, ৪১

১৮. তদেব, ৪২

সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। প্রথমোক্তটি [চিত্তশুদ্ধি বিধান] গৌণ উদ্দেশ্য, শেষোক্তটি মুখ্য উদ্দেশ্য।'১৯

কখনো কখনো উপায়টাকেও উদ্দেশ্য বলা হয় বটে। কিন্তু সে ঘরোয়াভাবে এবং আপেক্ষিক অর্থে। তাকে বলতে পারি, আশু-উদ্দেশ্য। তাকে মুখ্য উদ্দেশ্য কখনোই বলা যায় না। তেমনি, যা চরম উদ্দেশ্য, তা সুদূর উদ্দেশ্য হ'তে পারে, কিন্তু তাকে কখনোই গৌণ উদ্দেশ্য বলা যায় না। আহারের জন্য যদি কেউ মুখ-ব্যাদান করেন, তাহ'লে এ-কথা কি বলা যায় যে, আহারটা গৌণ উদ্দেশ্য, মুখ-ব্যাদানটাই মুখ্য উদ্দেশ্য? বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সেই রকমই বলেছেন।

এ-রকম বর্ণনা বিভ্রান্তিকর সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা কি কেবল ভাষা-ব্যবহারের শিথিলতা? অনুমান করি, এর মূল আরো গভীরে। এর মূল বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিধাবিভক্ত চিন্তায়। আমরা জানি, আক্ষরিক অর্থেই হোক অথবা গভীরতর অর্থেই হোক, ক্লাসিক সাহিত্যতত্ত্বে অনুকরণের স্থান আছে, অর্থাৎ সত্যের স্থান আছে, চিত্তশুদ্ধির স্থান থাকলেও থাকতে পারে, কিন্তু সৌন্দর্যসৃষ্টির আলাদা ক'রে কোনো বড়ো স্থান নেই। অন্যদিকে, রোমাণ্টিক সাহিত্যতত্ত্বে উচ্চ আসন সৌন্দর্যসৃষ্টির জন্যই সংরক্ষিত, সেখানে চিত্তশুদ্ধিরই আলাদা কোনো স্থান নেই। বঙ্কিমচন্দ্র উভয়কেই রাখতে চান। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের কথার মর্মার্থ ক্লাসিক তত্ত্বকেই সমর্থন করছে। অনেকটা যেন ক্ষতিপূরণ হিসেবে সৌন্দর্যসৃষ্টিকেই 'মুখ্য উদ্দেশ্য' নামের গৌরবটা দান করলেন। এতে, অন্তত আপাতদৃষ্টিতে, সৌন্দর্যসৃষ্টির সম্মান খানিকটা রক্ষা পেলো।

কার্যত পেলো কি না জানি না, তবে এর মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মনের দোলাচলটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এই দোলাচলের উৎসটা ইতিহাসের দোটানার মধ্যে নিহিত। এ হ'লো ঠিক সেই ধরনের দোলাচল, রোমাণ্টিক আন্দোলনের আদিপর্বে যা ক্লাসিকপন্থী বলে' পরিচিত অনেকের মধ্যেই লক্ষ

১৯. তদেব, ৪১

করা গিয়েছিল। কথাটা উল্টো দিক থেকেও বলা যায়। এ হ'লো সেই দোলাচল, নব্য-ক্লাসিক মতাদর্শের প্রথম ভাঁটার মুখে প্রি-রোমাণ্টিকদের মধ্যে যা দেখতে পাওয়া গিয়েছিল।

এই দোটানার কারণেই সৌন্দর্য সম্পর্কে, সৃষ্টি সম্পর্কে এবং সৌন্দর্যসৃষ্টি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র কখনোই পুরোপুরি মনস্থির করতে পারেন নি। ফলে, সুন্দর বলতে যে তিনি ঠিক কী বোঝেন, সেইটে ধরাই মুশ্‌কিল হয়ে পড়ে।

৭

আগেই দেখেছি, সৃষ্টি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে তিন স্তরের তিন রকম সৃষ্টির কথা পাওয়া যাবে। একটা, বাস্তবের অনুসারে সৃষ্টি। দ্বিতীয়, আদর্শায়িত বাস্তবের সৃষ্টি। আর তৃতীয় হ'লো, কল্পনার ক্রিয়ায় অভিনব একটা-কিছুর সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র এর সব কটাকেই সাহিত্যের আসরে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এদের যথাযথ সামঞ্জস্যবিধান করেন নি।

সৌন্দর্যের ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা একই রকম ঘটেছে। কিন্তু ঘটেছে আরো অনেক জটিল এবং অপরিচ্ছন্নভাবে। সৌন্দর্যের সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্রের মুখে আমরা তিন রকম ধরনের কথা শুনতে পাই—এক-এক সময় এর এক-একটা বড়ো হয়ে উঠেছে।

কখনো মনে হয়, একমাত্র ঈশ্বরের সৃষ্টিকেই অর্থাৎ বাস্তব-সত্যকেই বা স্বভাবকেই বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দর বলে দাবি করেছেন। আর সবই—সুন্দর হ'লে এরই কারণে সুন্দর—পরোক্ষভাবে সুন্দর। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, স্বভাব যেন স্বভাব বলেই সুন্দর এবং স্বভাবের অনুকরণ যেন স্বভাবের অনুকরণ বলেই সুন্দর। 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধের সেই কথা আবার এখানে স্মরণ করতে পারি: 'ঈশ্বরের সৃষ্টি অপেক্ষা কোন্ কবির সৃষ্টি সুন্দর? বস্তুতঃ কবির সৃষ্টি, সেই ঈশ্বরে সৃষ্টির অনুকারী বলিয়াই সুন্দর।'[২০]

২০. বিবিধ প্রবন্ধ, ১৮১

দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সাহিত্য স্বভাবের অনুকরণ করে, এবং যখন ঠিকভাবে করতে পারে তখন সে সুন্দর হয়। আসলটি সুন্দর বলেই নকলটি সুন্দর হয়। সৌন্দর্য সাহিত্যিকের সৃষ্টি নয়, সাহিত্যিকের দান নয়, সাহিত্যিক কেবল নকলই করেন। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের এ-সৌন্দর্য-সিদ্ধান্ত খাঁটি ক্লাসিকপন্থী অনুকরণবাদীর সৌন্দর্যসিদ্ধান্ত।

কিন্তু এইটেই তাঁর একমাত্র সৌন্দর্যসিদ্ধান্ত নয়। কখনো কখনো মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচনায় স্বভাবানুকারিতা আর সৌন্দর্য সম্পূর্ণ পৃথক্ জিনিস। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, '...কবির সৃষ্টি স্বভাবানুকারী এবং সৌন্দর্যবিশিষ্ট না হইলে, কোনো প্রশংসা নাই।'[২১] এবং এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি আরো বলেছেন, 'সৌন্দর্য এবং স্বভাবানুকারিতা এই দুইয়ের একটি গুণ থাকিলেই কবির সৃষ্টির কিছু প্রশংসা হইল বটে, কিন্তু উভয় গুণ না থাকিলে কবিকে প্রধান পদে অভিষিক্ত করা যায় না।'[২২]

এই সৌন্দর্যসিদ্ধান্তটি অভিনব সন্দেহ নেই। প্রথমত, স্বভাবানুকারী হওয়া এবং সুন্দর হওয়া পৃথক্ ব্যাপার। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যে এর যে-কোনো একটা থাকলেই মোটামুটি চলে, তবে দুটোই যদি থাকে তাহ'লে তা শ্রেষ্ঠ সাহিত্য। সুন্দর কিন্তু স্বভাবানুকারী নয়, এমন হ'লে তা সাহিত্য, কিন্তু নিকৃষ্ট সাহিত্য। স্বভাবানুকারী কিন্তু অসুন্দর, এমন হ'লে তা-ও সাহিত্য, কিন্তু তা-ও নিকৃষ্ট সাহিত্য। কিন্তু সৌন্দর্যে স্বভাবানুকারিতায় সম্পর্কটা যে ঠিক কী, তা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টভাবে বোঝাতে পারেন নি। স্বভাবানুকারী না হয়েও কেমন ক'রে সুন্দর হয়, স্বভাবানুকারী হয়েও কেমন ক'রে অসুন্দর হয়, তা-ও বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিয়ে বলেন নি। সে যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্রে এই দ্বিতীয় সৌন্দর্যসিদ্ধান্ত না রোমান্টিক, না ক্লাসিক্যাল, দু'য়ের একটি খিচুড়ি।

সৌন্দর্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের তৃতীয় অভিমতটিও 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধেই পাওয়া যাবে। তিনটি অভিমতেই 'উত্তরচরিতে' স্থান পেয়েছে বলে' এখানে উক্ত প্রবন্ধটির একটু বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে।—

তৃতীয় মতটি এই যে, স্বভাবানুকারিতা আর সৌন্দর্য সম্পূর্ণ এক নয়,

২১. তদেব, ৩৯

২২. তদেব, ৩৯

আবার সম্পূর্ণ পৃথকও নয়। স্বভাবানুকারিতা না থাকলে সৌন্দর্য থাকে না। কিন্তু যথার্থ সৌন্দর্য হতে' হ'লে আরো কিছু দরকার। সেই আরো কিছুটা যে কী তা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ক'রে বলেন নি। শুধু বলেছেন, স্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্যের একটি অপরিহার্য শর্ত, সৌন্দর্যের একটি অঙ্গ, একটি গুণ। যেমন, 'যাহা স্বভাবানুকারী নহে, তাহাতে কুসংস্কারাবিষ্ট লোক ভিন্ন কাহারও মন মুগ্ধ হয় না। এজন্য স্বভাবানুকারিতা সৌন্দর্যের একটি গুণ মাত্র—স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য জন্মে না। তবে যে আমরা স্বভাবানুকারিতা এবং সৌন্দর্য দুইটি পৃথক্ গুণ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছি, তাহার কারণ, সৌন্দর্যের অনেক অর্থ প্রচলিত আছে।'[২৩]

সৌন্দর্যের প্রচলিত অর্থগুলি কী কী, এবং তাদের মধ্যে কোন্‌টা কী কারণে পরিত্যাজ্য সে-কথা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নি। অনেক মত প্রচলিত থাকলেই বা কেন একটা অখণ্ড বস্তুকে খণ্ড ক'রে তাদের পৃথক্ বলতে হবে, তারও কোনো সন্তোষজনক ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্র দেন নি। স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্যের আর কী কী শর্ত বা গুণ আছে, তা-ও কিছু বলেন নি। এই আর-কিছু, এই বাড়্‌তি গুণ, এ কি স্বভাবের উপর আদর্শের আরোপ? এ কি তাই, পূর্বে যাকে আমরা বলেছি, স্বভাবের আদর্শায়ণ—আইডিয়ালাইজেশন? ঈশ্বরগুপ্ত-প্রবন্ধে এই আদর্শায়ণের উপর বঙ্কিমচন্দ্র খুব জোর দিয়েছিলেন। সে অবশ্য অনেকদিন পরের কথা। অনুমান করি, 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের সৌন্দর্যসিদ্ধান্তের মধ্যে তারই একটা পূর্বাভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এ-পূর্বাভাস যে খুব অস্পষ্ট এমনও বলা চলে না। বঙ্কিমচন্দ্র বার বার বলছেন, যা সুন্দর তা স্বভাবানুকারী হয়েও স্বভাবাতিরিক্ত। শুধু স্বাভাবাতিরিক্ত বললে খাঁটি রোমাণ্টিক কথা বলা হত। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৌন্দর্যতত্ত্বে কল্পনাকে ততোখানি স্বাধীনতা দেন নি। এখানে তাঁর বক্তব্য এই যে, স্বভাবের নিয়ম কল্পনাকে মানতেই হবে, 'স্বভাবানুকারিতা ছাড়া সৌন্দর্য জন্মে না।'

তা যদি হয়, তাহ'লে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের অর্থটা নির্দিষ্ট এবং সংকীর্ণ

২৩. তদেব, ৪২ *

হয়ে আসে। অর্থাৎ তাহ'লে সৌন্দর্য অর্থ দাঁড়ায় স্বভাবের সঙ্গে আদর্শের সংযোগ। স্বাভাবিক—কিন্তু একেবারে আক্ষরিকভাবে যথাযথ নয়, স্বাভাবিক হয়েও আদর্শায়িত। নেচার মেথডাইজ্‌ড তো বটেই, আরো এক ধাপ এগিয়ে, নেচার আইডিয়ালাইজ্‌ড।

স্বয়ং এ্যারিস্টট্‌লও অবশ্য আদর্শায়িত বাস্তবের কথা বলেছেন। কিন্তু সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নিরূপণের ক্ষেত্রে নয়, সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গে। কথাটা তিনি বলেছেন ট্রাজেডির নায়কের চরিত্রচিত্রণের প্রসঙ্গে—যেখানে নায়ককে সাধারণের থেকে বড়ো ক'রে দেখানোর প্রয়োজন আছে। এ্যারিস্টট্‌ল কাজটির তুলনা দিয়েছেন প্রতিকৃতি-চিত্রকরদের কাজের সঙ্গে। প্রতিকৃতি-চিত্রণে চিত্রকরেরা স্বভাবানুগ থেকেও স্বভাবকে ছড়িয়ে যান। ঠিক তেমনি ট্র্যাজেডি-রচয়িতা তাঁর বিশিষ্ট প্রয়োজনের তাগিদেই স্বভাবকে ছড়িয়ে যাবেন। লক্ষণীয় এই যে, অন্যত্র যেমন, এখানেও তেমনি, এ্যারিস্টট্‌ল আসলে মর্মসত্যের সন্ধানী, সৌন্দর্যের সন্ধানী নন। স্বভাবের উপর যেটুকু বাড়্‌তি সৌন্দর্য আরোপ করার কথা এখানে এ্যারিস্টট্‌ল বলেছেন, সেই বাড়্‌তিটুকু শেষ-লক্ষ্য নয়, তা উপায় মাত্র। শেষ-লক্ষ্য হ'লো স্বভাবের মর্মসত্য। কিন্তু এখানে আমাদের প্রশ্নটা সত্যকে নিয়ে নয়, সৌন্দর্যকে নিয়ে।

নেচার আইডিয়ালাইজ্‌ড বা আদর্শায়িত বাস্তবই সৌন্দর্যের আদর্শ, এই যে সৌন্দর্যসিদ্ধান্ত, একে বলতে পারি দোটানার সৌন্দর্যসিদ্ধান্ত, আধা-রোমান্টিক এবং আধা-ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্যসিদ্ধান্ত। এই সিদ্ধান্ত স্পষ্টতম রূপ নিয়েছে ঈশ্বরগুপ্ত প্রবন্ধে। কিন্তু এক বছর পরের দীনবন্ধুমিত্রের কবিত্ব-সংক্রান্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র একে অতিক্রম ক'রে আর-এক সৌন্দর্যসিদ্ধান্তে গিয়ে উপনীত হয়েছে। সেইটেকে বলতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের চতুর্থ সৌন্দর্য-সিদ্ধান্ত। এই চতুর্থ সিদ্ধান্তের পরিচয় আমরা পূর্বেই পেয়েছি। পুনরুক্তি হলেও বলি, এটি আধা-রোমান্টিক নয়, এটি পুরোপুরি রোমান্টিক সৌন্দর্য-সিদ্ধান্ত। এর মূলে আছে রোমান্টিক সৃষ্টি-তত্ত্ব, রোমান্টিক কল্পনাতত্ত্ব।

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে সৃষ্টি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের যে-ধারণা অভিব্যক্ত হয়েছে, সৌন্দর্যসিদ্ধান্তের মতো সে-ধারণাও আধা-রোমান্টিক। এটা

স্বাভাবিক, কারণ দুই ধারণাই—সৌন্দর্যের তত্ত্ব আর সৃষ্টির তত্ত্ব, দুই তত্ত্বই এক সঙ্গে যুক্ত। সৃষ্টি বলতে এ-প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অভিনববস্তুনির্মাণ বোঝেন নি, মুক্ত কল্পনার অবাধ লীলা বোঝেন নি, বুঝেছেন বাস্তব এবং আদর্শ উভয়ের একটা মিলিত রূপ। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, যা সৃষ্টি তাতে সত্যও থাকে আবার সত্যকে ছাড়িয়ে যাওয়াও থাকে। বলেছেন, 'যাহা সত্যর প্রতিকৃতি মাত্র নহে—তাহাই সৃষ্টি।'[২৪] আরো বলেছেন, 'যাহা প্রকৃত, তাহাতে তাদৃশ চিত্ত আকৃষ্ট হয় না। কেন না, তাহা অসম্পূর্ণ, দোষসংস্পৃষ্ট, পুরাতন, এবং অনেক সময়ে অস্পষ্ট।'[২৫]

এ পর্যন্ত যেটুকু তিনি বললেন তা হল আদর্শের যোগে বাস্তবের সংশোধন করার কথা, অর্থাৎ পূর্ব-কথিত বাস্তবের আদর্শায়ণ। কিন্তু এই বাক্যের পরেই বঙ্কিমচন্দ্র যে বাক্যটি জুড়ে দিলেন তার মধ্যে রোমান্টিকতার সুরটি স্পষ্টতর। আগে বললেন, যা প্রকৃত তা দোষসংস্পৃষ্ট, তার পরেই বললেন, 'কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন—সুতরাং সম্পূর্ণ, দোষশূন্য, নবীন এবং স্পষ্ট হইতে পারে।'[২৬]

এখানে 'কবির সৃষ্টি তাঁহার স্বেচ্ছাধীন', এই কথা যে মুক্ত-কল্পনার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে, কবির সৃষ্টি 'নবীন', এই কথাটি যে অভিনবত্বের দিকে ইঙ্গিত করে, তা অবশ্যই রোমান্টিক। কিন্তু তার এক মুহূর্ত আগেই বলেছেন, 'যাহা স্বভাবানুকারী, অথচ স্বভাবাতিরিক্ত, তাহাই কবির প্রশংসনীয় সৃষ্টি',[২৭] এই বাক্যে মুক্তি বা অভিনবত্ব কোনোটারই মর্যাদা রক্ষিত হয় নি।

পরের অনুচ্ছেদটি 'সৌন্দর্য' এবং 'সৃষ্টি', দুটি কথাকে মিলিয়ে নিয়েই শুরু হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'এইরূপ যে সৌন্দর্যসৃষ্টি কবির সর্বপ্রধান গুণ—সেই অভিনব, স্বভাবানুকারী, স্বভাবাতিরিক্ত সৌন্দর্যসৃষ্টি-গুণে, ভারতবর্ষীয় কবিদিগের মধ্যে বাল্মীকি এবং মহাভারতকার প্রধান।'[২৮]—এর

২৪. তদেব, ৪২

২৫. তদেব, ৪২

২৬, তদেব, ৪২

২৭. তদেব, ৪২

২৮. তদেব, ৪২

মধ্যে সৌন্দর্যের বিশেষণ তিনটি—অভিনব, স্বভাবানুকারী এবং স্বভাবাতিরিক্ত —এদের পাশাপাশি অবস্থানই বঙ্কিমচন্দ্রের দুই কূল রক্ষার প্রয়াসকে স্পষ্ট ক'রে তোলে।

স্বভাবানুকারী আর স্বভাবাতিরিক্ত এই দুই বিপরীত ব্যাপারকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়ে, অনুকরণকে অভিনবত্বের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র যে সংযোগ রচনা করতে চেষ্টা করেছেন তার মধ্যে এ্যারিস্টট্‌লীয় পরিচ্ছন্নতার সন্ধান মেলে না। দুই বিপরীত প্রবৃত্তির সংমিশ্রণের ফলে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে, তা প্রায় সাধারণ-বুদ্ধির অতীত। সাধারণ-বুদ্ধি বলে যে, যা অভিনব তা যা অপর কারো অনুকরণ তা অভিনব নয়। সাধারণ-বুদ্ধি বলে যে, যা মুক্ত কারো নকল নয়, তা কারো অনুগামী নয়, যা অনুগামী তা মুক্ত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সাধারণ-বুদ্ধির দাবিকে লঙ্ঘন করেছেন।

সাহিত্যের সব-কিছুই যে সাধারণ-বুদ্ধির মোটা মাপে ঘটবে এমন আশা করা যায় না। সাহিত্যের অনেক তত্ত্বেই আমরা বিপরীতের মিলন দেখতে পাবো। কিন্তু জুড়ে দিলেই হবে না, মিলন ঘটাতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র জুড়ে দিয়েছেন মাত্র, সমন্বয়সাধনের কোনো চেষ্টা করেন নি। সমন্বয়ের জন্য একটা উচ্চতর ধাপ, একটা ব্যাপকতর প্রত্যয় দরকার। এ্যারিস্টট্‌ল যখন কাব্যসত্যকে তার সার্বভৌমত্বের কারণে ইতিহাসের বিশিষ্ট সত্য থেকে— এবং খণ্ডিত বা বিশিষ্ট বাস্তব থেকে অধিকতর দার্শনিক গুরুত্বসম্পন্ন বলে', অর্থাৎ সত্যতর বলে' ঘোষণা করেন, তখন তাঁর সেই ঘোষণার মধ্যে আমরা একটি উচ্চতর প্রত্যয়ের সন্ধান পাই। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যে কোনো উচ্চতর প্রত্যয়ের আভাস নেই। সাহিত্য যে কেমন ক'রে বাস্তবাতিরিক্ত হয়েও বাস্তবের মর্মসত্যবাহী হতে পারে, অবাস্তব হয়েও বাস্তবের থেকে সত্যতর হতে পারে, সে সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ নীরব।

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পাশ্চাত্য সাহিত্যচিন্তায় যখন ক্লাসিক-পন্থিতার প্রভাব ক্ষীণ হয়ে আসছিল, কিন্তু তার বাইরের প্রতিপত্তি কমে নি, যখন রোমান্টিকতার আমদানি শুরু হয়েছে, কিন্তু তার মর্যাদার প্রতিষ্ঠা হয় নি, সেই সময় এই ধরনের জোড়াতালির চেষ্টা আমরা দেখেছি। এঁরা কবির কৃতিত্বও রাখতে চান আবার অনুকরণবাদকেও ছাড়তে চান না।

স্বভাবের আদর্শায়ণের প্রসঙ্গে এঁদের কথা আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। এঁদের কে যে ক্লাসিক কে যে রোমান্টিক নির্ণয় করা কঠিন। এই সূত্রে আমরা শার্ল বাতো (Charles Batteux) অথবা লেসিং-এর নাম উল্লেখ করতে পারি। এই সূত্রে প্রায়-ক্লাসিক রেনল্ড্‌স থেকে প্রায়-রোমান্টিক কেম্‌স পর্যন্ত অনেকের কথাই এখানে তোলা যায়। সাহিত্যতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্রও এঁদের গোত্রেই পড়েন, যদিও কয়েকটি বিরল মুহূর্তে বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি ক্লাসিকপন্থী, ঠিক যেমন অপর কয়েকটি বিরল ক্ষণে তিনি খাঁটি রোমান্টিক।

৮

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যেভাবে ভারতীয় রসবাদের সহায়তায় পাশ্চাত্য রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন, যেভাবে রসবাদকে আলগোছে স্পর্শ ক'রে রেখে অনুভূতি বা আবেগ বা চিত্তবৃত্তির বেগ ইত্যাদি রোমান্টিক প্রত্যয়ের পথে কাব্যতত্ত্ব ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন, তা বিশেষভাবে কৌতূহলোদ্দীপক।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কাব্যতত্ত্বের মূল কথাটাকে আগে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই নিবেদন করি।—

'মনুষ্যের কার্যের মূল তাহাদিগের চিত্তবৃত্তি। সেই সকল চিত্তবৃত্তি অবস্থানুসারে অত্যন্ত বেগবতী হয়। সেই বেগের সমুচিত বর্ণনদ্বারা সৌন্দর্যের সৃজন, কাব্যের উদ্দেশ্য।'[২৯]

অল্প কথায় এর মধ্যে রোমান্টিক গোত্রের কাব্যতত্ত্বের পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আমরা জানি, রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের কেন্দ্রস্থ বিষয় হল অনুভূতি, বা ভাব, বা আবেগ, বা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, চিত্তবৃত্তি। ভাবের প্রকাশই কাব্য, এই হ'লো এ-কাব্যতত্ত্বের মূল কথা। বঙ্কিমচন্দ্রও বলেছেন, চিত্তবৃত্তির সমুচিত বর্ণনাই কাব্য। কথাটার ব্যাখ্যাসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র আরো বলেছেন, বেগবতী চিত্তবৃত্তিকে ইংরেজ আলংকারিকেরা বলেন প্যাশান

২৯. তদেব, ৪৪

(passion)। সুতরাং ধ'রে নিতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্রের এই কাব্যতত্ত্ব মূলত প্যাশানেরই কাব্যতত্ত্ব। অর্থাৎ খাঁটি রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্রের সূত্রটি যে কতোটা রোমান্টিক তা অবশ্য নির্ভর করে 'সমুচিত বর্ণনদ্বারা সৌন্দর্যের সৃজন', এই কথাটার অর্থের উপরে। তিনি যদি অনুভূতি বা ভাব প্রকাশ করার কথা বলে' থাকেন, তাহ'লে সংশয়ের কিছু নেই। পরে আমরা দেখতে পাবো, 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে তিনি স্পষ্টই বলেছেন যে, হৃদয়ের অব্যক্ত বা অব্যক্তব্য ভাবকে ব্যক্ত করাই গীতিকাব্যের কাজ।[৩০] বর্তমান প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র সেই মর্মেই কথা বলছেন। তিনি যদি এখানে ভাবের সাধারণীকরণের কথা বলতেন, লৌকিক ভাব কেমন ক'রে অলৌকিক রসে পরিণত হয়, সে-কথা বলতেন, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের এই কাব্যসূত্রটিকে আমরা ভারতীয় রসবাদী কাব্যতত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তা করেন নি। তিনি এখানে লৌকিক ভাবের কথাই বলেছেন। 'সমুচিত বর্ণনদ্বারা সৌন্দর্যের সৃজন' কথাটার অর্থ, বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে, বেগবতী চিত্তবৃত্তির প্রকাশ, প্যাশানের প্রকাশ।

কাব্যে সহৃদয় পাঠকের চিত্তের বিগলন ঘটে, পাঠক স্বসংবিদানন্দ আস্বাদন করেন, কাব্যে লৌকিক ভাবের রস-পরিণাম ঘটে—এই রসবাদী তত্ত্ব আর বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যসূত্র যে, প্রবল প্যাশানের অভিব্যক্তির নাম কাব্য, এই দুই তত্ত্বের মধ্যে পার্থক্য দুস্তর। অতি ক্ষীণ একটি যোগসূত্র আছে 'ভাব' কথাটিতে। সে যোগ বাইরের। কিন্তু অন্তরের পরিচয়ে রসবাদী কাব্যতত্ত্ব এবং রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এর একটিকে দিয়ে অপরটির পরিচয় দেওয়া যায় না, একটির কাঠামোর মধ্যে অপরটিকে পুরে দেওয়া যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে মোটামুটি একটা রসবাদী কাঠামোর মধ্যে পাশ্চাত্য প্যাশান-ভিত্তিক কাব্যতত্ত্বকে পুরে দেবার চেষ্টা করেছেন এবং অবশেষে বিরক্ত হয়ে রসবাদী কাব্যতত্ত্বের প্রতি তাঁর অসন্তোষ জ্ঞাপন করেছেন।

প্যাশানের কাব্যগত প্রতিকৃতিকে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন রসোদ্ভাবন।

৩০. তদেব, ৪৪-৪৯

ভবভূতির এই ক্ষমতার—প্যাশানের কাব্যগত প্রতিকৃতি নির্মাণের ক্ষমতার প্রশংসা ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'রসোদ্ভাবনে ভবভূতির ক্ষমতা অপরিসীম। যখন যে রস উদ্ভাবনের ইচ্ছা করিয়াছেন, তখনই তাহার চরম দেখাইয়াছেন। তাঁহার লেখনী-মুখে স্নেহ উছলিতে থাকে—শোক দহিতে থাকে, দম্ভ ফুলিতে থাকে।'৩১

বলা বাহুল্য, এখানে যে-রসের কথা বলা হয়েছে, তা ভারতীয় রসশাস্ত্রের রস নয়। রসশাস্ত্রের রস দহিতেও থাকে না, ফুলিতেও থাকে না। যে-রসের আধার কবিও নয়, কাব্যও নয়, সহৃদয় পাঠকের চিত্ত, যে-রস ব্রহ্মাস্বাদসহোদর, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মোটেই সে-রসের কথা বলছেন না।

তা না বলুন, ক্ষতি নেই। কিন্তু তাহ'লে এই প্রসঙ্গে ভারতীয় আলংকারিকদের টেনে আনারও কোনো প্রয়োজন নেই। আলংকারিকদের ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দগুলিকে ব্যবহার করতে চেষ্টা করার এবং মাঝপথে তাদের সম্পর্কে বিরক্তি প্রকাশেরও কোনো প্রয়োজন ছিল না। তিনি বলেছেন, 'এ দেশীয় আলংকারিকদিগের ব্যবহৃত শব্দগুলি একালে পরিহার্য।...আমরা যাহা বলিতে চাই, তাহা অন্য কথায় বুঝাইতেছি—আলংকারিকদিগকে প্রণাম করি।'৩২

তা-ই যদি হবে, তাহ'লে 'রস' কথাটিই বা ব্যবহার করা কেন? বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য পারিভাষিক 'রস' কথাটি নয়, 'রসোদ্ভাবন' কথাটি। কিন্তু রসোদ্ভাবন'-ই কি সম্পূর্ণ অপরিভাষিক শব্দ? 'রস' পারিভাষিক হ'লে, 'রসোদ্ভাবন' অবশ্যই পারিভাষিক হবে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সেই পারিভাষিক অর্থের দিকে যান নি।

বঙ্কিমচন্দ্র কার্যত পুরোপুরি রসবাদের দিকেও যান নি, পুরোপুরি রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বেও অটল থাকতে পারেন নি, সব জড়িয়ে একটা অনির্দিষ্টতা, অনিশ্চয়তা এবং অস্পষ্টতার সৃষ্টি করেছেন।

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'সৃষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন।'৩২ কথাটার রসবাদী আর সৃষ্টিবাদী

৩১. তদেব, ৪৪
৩২. তদেব, ৪৪

উভয়ের কাছেই আপত্তিকর। রস কি একটা বিশেষ গুণ মাত্র? রস কি এমন একটা কিছু যা না উদ্ভাবিত হ'লেও কাব্য কাব্য হয়? রস কি পাঠকচিত্তের আনন্দ নয়? অন্যদিকে, সৃষ্টি কি একটা কৌশল মাত্র? তৃতীয় আপত্তি, এমন কি হতে পারে যে, সৃষ্টি হয়েছে অথচ রস নেই? কিংবা এমন কি হতে পারে যে, রস আছে কিন্তু সৃষ্টি হয় নি? তা যদি না পারে, তাহ'লে রসোদ্ভাবন আর সৃষ্টিকৌশল, এদের এ-ভাবে পৃথক্ করা যায় কি?

বঙ্কিমচন্দ্র প্রণাম সহযোগে বিদায় করেছেন বিশেষ ক'রে রসবাদীদেরই। মুখে সকল আলংকারিকদের কথা বললেও, কার্যত বাকিদের তিনি সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু রসবাদীদের প্রতিই কি তিনি সুবিচার করতে পেরেছেন? রসবাদের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তি রস-পরিণামের তত্ত্বে নয়, আপত্তি রসবাদের মনস্তত্ত্বগত ভিত্তিতে। এই মনস্তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সম্পূর্ণ বর্জনীয় বলে' মনে হয়েছে।

কিন্তু, মনে রাখতে হবে, রসবাদের প্রাণকেন্দ্র কোনো বিশেষ মনস্তত্ত্বে নয়, ভাবের রস-পরিণামের তত্ত্বে, রসের অভিব্যক্তির তত্ত্বে—সাধারণীকরণের তত্ত্বে, অলৌকিকত্বের তত্ত্বে। এ-তত্ত্ব মনস্তাত্ত্বিক নয়, এ-তত্ত্ব কোনো মানসিক তথ্য-বর্ণনা নয়, এ-তত্ত্ব দার্শনিক; বলতে পারি, কল্পনার সাহায্যে মানস-পুনর্গঠন। মনোবিদ্যার কোনো বিশেষ জ্ঞান বা কোনো বিশেষ তথ্যের উপর এর উত্থানপতন নির্ভর করে না। বলা বাহুল্য, রসবাদের একটি মনস্তাত্ত্বিক আশ্রয়ও প্রয়োজন। কিন্তু সেই আশ্রয় তার প্রাণ নয়। মনোবিদ্যার ক্ষেত্রে তথ্যজ্ঞানের নিত্যনতুন পরিবর্তন ঘটবে, সেই অনুসারে রসবাদের বাইরের চেহারারও অনেক বদল ঘটবে, এটা স্বাভাবিক। প্রশ্নটা মনস্তত্ত্ব নিয়ে নয়, প্রশ্নটা মূল-তত্ত্ব নিয়ে। সে-সম্পর্কে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র একটি কথাও উচ্চারণ করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তির কারণ কী কী? না, চিত্তবৃত্তি বা ভাব মাত্র আটটি নয়টি নয়, ভাব অসংখ্য, সুতরাং রসও অসংখ্য। কথাটা সম্পূর্ণ সত্য হতে পারে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এ আপত্তিটা রসবাদের মূলকে স্পর্শ করে না। রসবাদীরা বলতে পারেন, রস অবশ্যই আটটি নয়টি নয়, মূলত এক—আনন্দ। কিন্তু সংখ্যাটা এখানে বড়ো নয়, মূলটাই বড়ো, সেই মূল হ'লো পাঠকের

স্বসংবিদানন্দ। ভাব যদি অসংখ্য হয়ও, তাতে রসবাদের কিছুমাত্র খণ্ডন ঘটে না। কারণ মূল প্রশ্নটা হ'লো ভাবের রস-পরিণাম, রসের অলৌকিকত্ব। এই আসল জায়গাটার সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র নীরব।

বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, স্থায়িভাব আর ব্যভিচারী ভাবের মধ্যে যে-সীমানা নির্দেশ করা হয়েছে, তা অবৈজ্ঞানিক। বঙ্কিমচন্দ্রে এ-আপত্তি খুব সম্ভব সঙ্গত আপত্তি। কিন্তু তাতেই বা মূল-তত্ত্বের কতোটুকু ইতর-বিশেষ ঘটে?

বঙ্কিমচন্দ্রের অপর এক আপত্তি অতীব বিচিত্র। আপত্তিটা কী? না, রতিভাবের রস-পরিণামকে রসবাদী আলংকারিকেরা আদিরস বলে সম্মান দিয়েছেন।'...একটি কাব্যানুপযোগী কদর্য মানসিক বৃত্তি আদিরসের আকার-স্বরূপ স্থায়ী ভাবে প্রথমে স্থান পাইয়াছে।'[৩৩]

এই বিচিত্র আপত্তিকে গ্রহণ বা বর্জন করার পূর্বে এর সম্বন্ধে দু-একটি প্রশ্ন আছে। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে রতি নামক লৌকিক ভাবকেই রস বলেছেন, যা রসবাদীরা কখনোই বলবে না। শৃঙ্গার রস লৌকিক ভাব নয়। যা লৌকিক নয় তার ক্ষেত্রে কদর্যতার প্রশ্নই উঠতে পারে না। সে যাক্, কিন্তু রতি সম্পর্কেই বা বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তির আসল কারণটা কী? রতি স্বভাবতই কদর্য, এইটে? না, রতি কাব্যানুপযোগী, এইটে? প্রথম বিকল্প নিয়ে নীতিশাস্ত্রকারেরা বিচার করবেন। কিন্তু সাহিত্যের সুদীর্ঘ কালের ইতিহাস দ্বিতীয় বিকল্পকে সম্পূর্ণ খণ্ডন করে। বরং কাব্য উপন্যাস নাটকাদি থেকে দেখতে পাই, রতি বিশেষভাবেই কাব্য নাটকাদির উপযোগী। অথবা, বঙ্কিমচন্দ্রের কি এই বক্তব্য যে, রতি কদর্য বলেই তাকে কাব্যানুপযোগী ব'লে ঘোষণা করা উচিত? অথবা কি বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চান যে, আদিরস আদৌ রতির পরিণাম নয়? না কি, শৃঙ্গাররস মোটেই গুরুত্বপূর্ণ রস নয়, তা আদিরস রূপে গণনীয় নয়?

এই সব আপ্তবাক্যের প্রত্যেকটিকেও যদি মেনে নিই, তাহ'লেও, সেই পুরানো বক্তব্যটা থেকেই যায়। এ-সব আপত্তির কোনোটিই রসবাদের মূলকে স্পর্শ করে না।

৩৩. তদেব, ৪৪

অনুমান করি, রসবাদকে বঙ্কিমচন্দ্র রোমাণ্টিক কাব্যতত্ত্বেরই একটা বিকৃত প্রকাশ রূপে গণ্য করেছেন এবং সংশোধনের দ্বারা তাকে গ্রহণীয় করতে চেষ্টা ক'রে শেষ পর্যন্ত বিফলকাম হয়েছেন। বোধকরি এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের অসহিষ্ণু বিরূপতার মূল। অথবা, সম্ভবত মূল আরো গভীরে, রসবাদ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিচয়ে। যা-ই হোক, এ বিষয়ে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন, 'রসশাস্ত্রের মুখ্য প্রশ্ন হইল কেমন করিয়া লৌকিক ভাব অলৌকিক রসে নীত হয়, কেমন করিয়া কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি সহৃদয়সমাজে সাধারণীকৃত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এই আসল প্রশ্নে উপনীত হইতে পারেন নাই বলিয়া রসতত্ত্বকে বিকৃত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।'[৩৪]

৯

সাহিত্যচিন্তার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবদ্বন্দ্বের স্থূল পরিচয় হ'লো ক্লাসিক ভাব আর রোমাণ্টিক ভাবের দ্বন্দ্ব। কিন্তু এর প্রকাশটা সর্বত্র খুব স্থূল নয়, এবং নানা প্রসঙ্গে এর নানান রূপ। আমরা পূর্বেই দেখেছি, তার মধ্যে দুটিকে মোটামুটি প্রধান বলে গণ্য করা চলে। এক হ'লো অনুকরণে আর সৃষ্টিতে দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ সাহিত্য স্বভাবানুকারী এই মতের সঙ্গে, সাহিত্য স্বভাবাতিরিক্ত, এই মতের দ্বন্দ্ব। দুই হচ্ছে, সৌন্দর্যসৃষ্টি এবং চিত্তশুদ্ধির দ্বন্দ্ব। অর্থাৎ সাহিত্যের উদ্দেশ্য সৌন্দর্যসৃষ্টি করা, এই মতের সঙ্গে, সাহিত্যের উদ্দেশ্য লোককল্যাণ, এই মতের দ্বন্দ্ব।

আমরা এ-ও দেখেছি যে, বাস্তবের অনুকরণ আর মুক্ত কল্পনার শক্তিতে সৃষ্টি, এই দ্বন্দ্বে বঙ্কিমচন্দ্র উভয়কেই স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। বলেছেন, সাহিত্য স্বভাবানুকারী অথচ স্বভাবাতিরিক্ত। এবং এই সমন্বয়ের চেষ্টাই বঙ্কিমচন্দ্রকে আইডিয়ালাইজ্‌ড নেচারের তত্ত্বে, বাস্তবের আদর্শায়ণের তত্ত্বে উপনীত ক'রে দিয়েছে। সৌন্দর্যসৃষ্টি আর চিত্তশুদ্ধি বা লোককল্যাণের

৩৪. বাংলা সমালোচনা পরিচয়, ৭৮

দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রেও ঠিক অনুরূপ ব্যাপারই ঘটেছে। সুন্দর আর কল্যাণের অনুরূপ সমন্বয় চেষ্টার নিদর্শনও আমরা এই 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের মধ্যেই পাবো।

এ সমন্বয়ের চেষ্টা যে নতুন তা নয় এবং সব জাতের চেষ্টার মূলেই যে ঠিক এক ধরনের ভাবদ্বন্দ্ব তাও হয়তো বলা যায় না। অনেক কাল পূর্বে খাস ক্লাসিক যুগে হোরেস তাঁর 'আর্স পোয়েটিকা'-তে বলেছিলেন, কাব্যকে হয় হিতকর হতে হবে, না হয় আনন্দকর হতে হবে, অথবা একসঙ্গে হিতকর এবং আনন্দকর দুই-ই হতে হবে। তদবধি 'to instruct or to delight' এই সূত্রটি এবং 'to instruct and to delight', এই সূত্রটি—দুটি সূত্রই সমালোচনার ক্ষেত্রে প্রবাদবাক্যের মতো ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

এই সূত্রের ভাব-বীজ এ্যারিস্টট্‌লেই পাওয়া যাবে। প্রাচীন ক্লাসিক চিন্তা-প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে এবং পরবর্তীকালে নব্য-ক্লাসিক চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে এই বিশেষ ভাবনাটিও একই খাতে প্রবাহিত হয়ে আসছে। সিড্‌নি তাঁর 'এ্যাপলজি ফর পোয়েট্রি'তে এই যুগ্ম আদর্শের কথাই বলেছেন। বলেছেন, কবিতার কাজ যুগপৎ শিক্ষাদান ও আনন্দদান।

এই সূত্রের মধ্যে যে মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায় তার সঙ্গে ক্লাসিক মানসিকতার মিল অপেক্ষাকৃত বেশি হ'লেও, রোমান্টিক কবি ও সাহিত্য-শাস্ত্রীদের অনেকের মধ্যেই এই মানসিকতা দেখতে পাওয়া যায়, অনেকের মুখেই এই যুগ্ম আদর্শের কথা শুনতে পাওয়া যায়। ডেনিস, যাঁর কাব্যতত্ত্ব মূলত আবেগ-সঞ্চার-ভিত্তিক, তিনিও ঠিক একইভাবে যুগপৎ শিক্ষাদান ও আনন্দদানের কথা বলেছেন। শেলির মতো খাঁটি রোমান্টিক, যাঁর মুখে কেবল আনন্দের কথা শুনবো বলেই প্রত্যাশা করতে পারি, তিনিই কল্যাণের কথা সব থেকে জোর গলায় বলেছেন। তাঁর মতে কবিরা জগতের প্রচ্ছন্ন শিক্ষাগুরু, অনাগত যুগের পথপ্রদর্শক।

আমরা দেখেছি, 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের দুই বিকল্প উদ্দেশ্যের কথা বলেছিলেন। বলেছিলেন, সাহিত্যের উদ্দেশ্য হয় সৌন্দর্যসৃষ্টি, না-হয় মনুষ্যজাতির মঙ্গল, এখানে সৌন্দর্যের বদলে আনন্দ বসালেই আমরা হোরেসের সূত্রের প্রথমাংশ-কে

পেতে পারি ঃ to instruct or to delight। বঙ্কিমচন্দ্র কখনো কখনো দাবি দুটোকে সংযুক্ত ক'রেও বলেছেন। আমরা আগেই দেখেছি যে, এ-ও পূর্বসূত্রহীন কথা নয়। এ-প্রসঙ্গে আমরা ইংরেজ নব্য ক্লাসিকদের অন্যতম প্রধান নেতা ডঃ জনসনকে স্মরণ করতে পারি। ডঃ জনসন বলেছেন, 'The end of writing is to instruct ; the end of poetry is to instruct by pleasing.'[৩৫] এই প্রসঙ্গে ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রীদের কথাও বিস্মৃত হ'লে চলবে না। কাব্যপ্রকাশকার মম্মট বলেছেন, সাহিত্য (কাব্য) কান্তাসম্মিত উপদেশ। সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ বলেছেন যে, কাব্য আমাদের রামের মতো হতে প্রবৃত্তি দেয় এবং কাব্যপাঠে চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তি ঘটে। উত্তরকালের সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রীরা প্রায় সকলেই শিক্ষা ও আনন্দ এই উভয়পন্থী। বঙ্কিমচন্দ্রের কালের সাহিত্যচিন্তায় এঁদের প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না।[৩৬]

দেশি এবং বিদেশি উভয়বিধ জীর্ণ ক্লাসিকপন্থিতার প্রেক্ষাপটে রেখে এইবারে 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের সেই বহু-উদ্‌ধৃত উক্তি আবার স্মরণ করা যাক ঃ 'কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা...। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।'[৩৭]

এর মধ্যে যে আনন্দদানের কথাটা আছে, তা নিয়ে কোনো তর্ক নেই। আনন্দের আসন সব সাহিত্যতত্ত্বেই সংরক্ষিত। কিন্তু সব ক্ষেত্রে তার গুরুত্ব সমান নয়, সর্বত্র সে সমান অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী হ'লো কল্যাণ। কল্যাণকে নিয়ে মতবিরোধের অন্ত নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের সময়ে বাংলাসাহিত্যে আনন্দ ও মঙ্গলের আদর্শের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সকল লেখকের মধ্যে খুব স্পষ্টরূপে দেখতে পাওয়া যায় না।

৩৫. Johnson on Shakespeare, ed. Walter Raliegh, (Oxford, 1908), p. 16.

৩৬. ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের ক্রমিক অধোগতির এবং ঊনবিংশ শতকের বাঙালি লেখকদের উপর তার অপপ্রভাবের বিষয়ে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'বাংলা সমালোচনা পরিচয়' গ্রন্থের প্রথম ও তৃতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৩৭ বিবিধ প্রবন্ধ, ৪১

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে সে-কথা বলা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস এই দুই আদর্শের দ্বৈততার টানে প্রায় দ্বিধাদীর্ণ। সাহিত্যচিন্তাতেও আমরা সেই দ্বৈততারই ছাপ দেখতে পাই।

১০

আমরা দেখতে পাই, সাহিত্য কী, কাব্য কী ইত্যাদি ধরনের ব্যাপক প্রশ্নে, বা দার্শনিকের মতো সংজ্ঞা-নিরূপণে বঙ্কিমচন্দ্র খুব আগ্রহী নন। বঙ্কিমচন্দ্রের মনোযোগ সব সময়ই বিশেষ সাহিত্যবস্তুতে—বিশেষ কাব্যে, বিশেষ নাটকে নিবদ্ধ। বিশেষের প্রয়োজনেই বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের নানা শাখার শ্রেণীবিচারে প্রবৃত্ত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের মতো নির্বিশেষ সামান্য সত্যের টানে নয়।

তা হ'লেও সমালোচনার প্রয়োজনে যখন অপরিহার্য হয়ে পড়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র তখন গীতিকাব্য কী, মহাকাব্য কী, নাটকের কাজ কী—সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার, Literary Kinds-এর সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। বোঝা যায়, রোমান্টিকদের যেমন এদের সম্পর্কে তত্ত্বগত বিরূপতা, বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সাহিত্যর শ্রেণীবিভাগ নিয়ে তেমন কোনে তত্ত্বগত আপত্তি নেই। এই বিষয়ে তাঁর তেমন কোনো প্রবৃত্তিগত বিমুখতাও দেখতে পাই না, যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দেখি। সংক্ষিপ্ত হ'লেও এই বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দেয়। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সাহিত্যের এইসব শাখা-প্রশাখা, ক্লাসিক সাহিত্যশাস্ত্রের বহু-সমাদৃত literary kinds, রবীন্দ্রনাথ যাকে কটাক্ষ ক'রে বলেছেন সাহিত্যের জাতিকুল, অল্প বয়সে তা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা করলেও, পরিণত বয়সে তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ একটুও মাথা ঘামান নি।

নবীনচন্দ্র সেনের অবকাশরঞ্জিনীর সমালোচনা প্রসঙ্গে 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের যে পরিচয় দিয়েছেন, এবং সেই সূত্রে নাটকাদির স্বরূপলক্ষণ যে-ভাবে বিবৃত করেছেন, বাংলাসাহিত্যে তা তুলনাহীন। মননের গাঢ়বদ্ধতায়, বাক্যের বাঁধুনিতে এবং শব্দপ্রয়োগের যথাযথতায় তা এ্যারিস্টট্‌লকে স্মরণ করায়।

গীতিকাব্যের কাজ কী? বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, গীত মানুষের ভাব, মনের বেগ বা আবেগ প্রকাশ করে। '...গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের স্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।'৩৮

এ-কথার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মহাকাব্য ও নাটকের সঙ্গে গীতিকাব্যের পার্থক্য এবং সেই সঙ্গে নাটক ও মহাকাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয়ও বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বিবৃত করেছেন। 'যখন হৃদয়, কোনো বিশেষভাবে আচ্ছন্ন হয়,—স্নেহ, কি শোক, কি ভয়, কি যাহাই হউক, তাহার সমুদায়াংশ কখন ব্যক্ত হয় না। কতকটা ব্যক্ত হয়, কতকটা ব্যক্ত হয় না। যাহা ব্যক্ত হয়, তাহা ক্রিয়ার দ্বারা বা কথা দ্বারা। সেই ক্রিয়া বা কথা নাট্যকারের সামগ্রী। যেটুকু অব্যক্ত থাকে, সেটুকু গীতিকাব্যপ্রণেতার সামগ্রী। যেটুকু সচরাচর অদৃষ্ট, অদর্শনীয় এবং অন্যের অননুমেয় অথচ ভাবাপন্ন ব্যক্তির রুদ্ধ হৃদয়মধ্যে উচ্ছ্বসিত, তাহা তাঁহাকে ব্যক্ত করিতে হইবে। মহাকাব্যের বিশেষ গুণ এই যে, কবির উভয়বিধ অধিকার থাকে; ব্যক্তব্য এবং অব্যক্তব্য, উভয়ই তাঁহার আয়ত্ত। মহাকাব্য, নাটক এবং গীতিকাব্যে এই একটি প্রধান প্রভেদ বলিয়া বোধ হয়। ...সত্য বটে যে, গীতিকাব্য লেখককেও বাক্যের দ্বারাই রসোদ্ভাবন করিতে হইবে। নাটককারেরও সেই বাক্য সহায়। কিন্তু যে বাক্য ব্যক্তব্য, নাটককার কেবল তাহাই বলাইতে পারেন। যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।'৩৯

কী নাটক, কী মহাকাব্য, কী গীতিকাব্য, তিনই হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করে। কিন্তু এর মধ্যে নাটক আর গীতিকাব্য পরস্পরের বিপরীত ধরনের ভাব প্রকাশ করে, এবং তা করে বিপরীত উপায়ে। যে-ভাব পাত্রপাত্রীর ক্রিয়ার দ্বারা অথবা পাত্রপাত্রীর কথোপকথনের দ্বারা ব্যক্ত হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে বলেছেন 'ব্যক্তব্য'। তাঁর মতে এই 'ব্যক্তব্য'-ই নাটকের বিষয়। অন্যপক্ষে, যে-সব ভাব পাত্রপাত্রীর ক্রিয়ার দ্বারা বা তাদের কথোপকথনের

৩৮. বিবিধ প্রবন্ধ, ৪৮
৩৯. তদেব, ৪৮-৪৯

দ্বারা ব্যক্ত হয় না, বঙ্কিমচন্দ্র তাদের বলেছেন' 'অব্যক্তব্য'। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে এই 'অব্যক্তব্য' ভাবই গীতিকাব্যের বিষয়।

অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, যেখানে ভাবপ্রকাশের সমস্ত দায়িত্ব পাত্র-পাত্রীদের নিজেদেরই—তাদের ক্রিয়া, তাদের কথোপকথন, যেখানে রচয়িতা সম্পূর্ণ নেপথ্যে, তাই হ'লো নাটক। গীতিকবিতা ঠিক এর বিপরীত। এখানে পাত্রপাত্রীর কিছু করবার নেই, তাদের উপস্থিত থাকবারও কোনো প্রয়োজন নেই। এখানে যে-ভাব প্রকাশিত হয়, তা ঘটনা বা ক্রিয়া বা কথোপকথনের অপেক্ষা রাখে না। গীতিকবিতায় স্বয়ং রচয়িতাই পাঠকের সামনে উপস্থিত। গীতিকবিতায় কাল্পনিক কোনো ঘটনা, পাত্রপাত্রী বা বহির্বস্তু অনাবশ্যক। গীতকবিতায় শুধু কবির নিজের কণ্ঠই শোনা যায়। সে যেন অনেকটা কবিরই স্বগতোক্তি।

নাটকের অব্‌জেক্‌টিভিটি এবং গীতিকবিতার সাব্‌জেক্‌টিভিটি বঙ্কিমচন্দ্র একটি মাত্র বাক্যে অত্যন্ত স্পষ্ট ক'রে তুলে ধরেছেন: 'সহজেই অনুমেয় যে, যাহা ব্যক্তব্য, তাহা পর সম্বন্ধীয় বা কোন কার্যোদ্দিষ্ট, যাহা অব্যক্তব্য, তাহা আত্মচিত্ত সম্বন্ধীয়, উক্তি মাত্র তাহার উদ্দেশ্য।'৪০

'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র কাব্য ও নাটকের পার্থক্যের প্রসঙ্গ তুলেছেন। কিন্তু নাটকের মুখ্য অবলম্বন যে পাত্রপাত্রীর ক্রিয়া, কথোপকথন ইত্যাদি এবং তারই ফলে নাটকে যে বেগ ও গতির সঞ্চার হয়, এ-কথা এই প্রবন্ধে স্পষ্ট ক'রে বলা হয় নি, খানিকটা ধরে নেওয়া হয়েছে। কাব্যে এই ক্রিয়া, এই বেগ নেই। কাব্য ও নাটকের এই মৌল পার্থক্যের ভিত্তিতেই কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রবন্ধের মূল বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন এবং দৃশ্যকাব্যের নায়িকা শকুন্তলার সঙ্গে যথার্থ নাটকের নায়িকা দেস্‌দিমোনার তুলনা করেছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না। উভয় দেশীয় নাটক দৃশ্যকাব্য বটে, কিন্তু ইউরোপায় সমালোচকেরা নাটকার্থে আর একটু অধিক বুঝেন। ...সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত

৪০. তদেব, ৪৯

শকুন্তলা...নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য ; কিন্তু নাটক নহে।... ইউরোপীয় সমালোচকদিগের মতে নাটকের যে লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে।...ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেস্‌দিমোনা-চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই...।

'শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না ; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট।'[৪১]

১১

নানা দিক থেকে অনেক পার্থক্য থাকলেও, মেজাজের বিশেষ একটা দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্র ব্রিটিশ এম্‌পিরিসিস্ট দার্শনিকদের সগোত্র—তাঁর মন বিশেষে সংসক্ত, বস্তুঘেঁষা, কার্যকারণবাদী। সম্ভবত এই মেজাজের কারণেই বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনাকে যথাসম্ভব বিজ্ঞানের কাছাকাছি আনতে চেয়েছিলেন। সমাজের ক্রমবিবর্তনের ক্ষেত্রে, ইতিহাসের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তব কার্যকারণে বিশ্বাসী। ঠিক তেমনি সাহিত্যের ইতিহাসের ক্ষেত্রেও বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যিক কার্যকারণের পেছনে নেপথ্যচারী বাস্তব কার্যকারণে বিশ্বাসী। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আস্থাশীল। এ-ব্যাপারে তিনি বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক তেইন্‌-এর অনুগামী। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এ-প্রসঙ্গে বাক্‌ল্‌-এর নাম উল্লেখ করেছেন।

এখানে বলে' রাখা ভালো যে, ইতিহাসের বা সাহিত্যের বস্তুভিত্তিক ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী বলেই যে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বকে বা সমালোচনাকে মার্কস্‌বাদী বলে' চিহ্নিত করা যাবে, তা নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যদি শ্রেণী-সংগ্রামে বিশ্বাস করতেন, যদি তিনি সাহিত্যকে শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার বলে' মনে করতেন, এবং শ্রেণীসংগ্রামের হাতিয়ার হিসেবে যোগ্যতা-অযোগ্যতার মাপকাঠি দিয়ে যদি সাহিত্যবিচার করতেন, তাহ'লে তাঁকে অবশ্যই মার্কস্‌পন্থী সমালোচকও বলা চলতো।

৪১. তদেব, ৮৮

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বস্তুভিত্তিক সাহিত্যসমালোচনার মূল তত্ত্বটিকে অল্প কথায় সুন্দর ক'রে বুঝিয়ে দিয়েছেন। এখানে তিনি বাংলাসাহিত্যে গীতিকবিতার বাহুল্য এবং প্রাধান্য সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'সকলই নিয়মের ফল। সাহিত্যও নিয়মের ফল। বিশেষ বিশেষ কারণ হইতে, বিশেষ বিশেষ নিয়মানুসারে, বিশেষ বিশেষ ফলোৎপত্তি হয়। ...তেমনি সাহিত্যও দেশভেদে, দেশের অবস্থাভেদে, অসংখ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া রূপান্তরিত হয়। সেই সকল নিয়ম অত্যন্ত জটিল, দুর্জ্ঞেয়, সন্দেহ নাই; এ পর্যন্ত কেহ তাহার সবিশেষ তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারেন নাই।...তবে ইহা বলা যাইতে পারে যে, সাহিত্য দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র। যে সকল নিয়মানুসারে দেশভেদে, রাজবিপ্লবের প্রকারভেদ, ধর্মবিপ্লবের প্রকারভেদ ঘটে, সাহিত্যের প্রকারভেদ সেই সকল কারণেই ঘটে।'[৪২]

'সাহিত্য দেশের অবস্থা ও জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র'—এই সূত্রকে প্রয়োগ ক'রে এ-প্রবন্ধের প্রথমাংশে বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবর্ষীয় সাহিত্যের গতি অনুসরণ করেছেন। প্রথমে বিজয়ী বীর আর্য জাতির জাতীয় চরিত্রের ফল—রামায়ণ। তারপর আর্য পৌরুষের চরম অবস্থায় আভ্যন্তরিক বিবাদের সূত্রপাত—এবং তার চিত্র মহাভারত। তারপর সুখ ও সমৃদ্ধির কাল। তারপর ধর্মমোহ। 'এই ধর্মমোহেরই ফল পুরাণ। কিন্তু যেমন একদিকে ধর্মের স্রোতঃ বহিতে লাগিল, তেমনি আর এক দিকে বিলাসিতার স্রোতঃ বহিতে লাগিল। তাহার ফল কালিদাসের কাব্য নাটকাদি।'[৪৩]

অতঃপর এই পথ অনুসরণ বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদেশের সাহিত্যপ্রসঙ্গে এসে উপনীত হলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথাতেই বলি।—

'ভারতবর্ষীয়েরা শেষে আসিয়া একটি এমন প্রদেশ অধিকার করিয়া বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন যে, তথাকার জলবায়ুর গুণে তাঁহাদিগের স্বাভাবিক তেজ লুপ্ত হইতে লাগিল। তথাকার তাপ অসহ্য, বায়ু জল বাষ্পপূর্ণ, ভূমি নিম্না এবং উর্বরা, এবং তাহার উৎপাদ্য অসার, তেজোহানিকারক ধান্য।

৪২, তদেব, ৫৩
৪৩, তদেব, ৫৪

সেখানে আসিয়া আর্যতেজ অন্তর্হিত হইতে লাগিল, আর্যপ্রকৃতি কোমলতা-ময়ী, আলস্যের বশবর্তিনী, এবং গৃহসুখাভিলাষিণী হইতে লাগিল। সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, আমরা বাঙ্গালার পরিচয় দিতেছি। এই উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের অনুকরণে এক বিচিত্র গীতিকাব্য সৃষ্ট হইল। সেই গীতিকাব্যও উচ্চাভিলাষশূন্য, অলস, ভোগাসক্ত, গৃহসুখপরায়ণ। সে কাব্যপ্রণালী অতিশয় কোমলতাপূর্ণ, অতি সুমধুর, দম্পতীপ্রণয়ের শেষ পরিচয়। অন্য সকল প্রকারের সাহিত্যকে পশ্চাতে ফেলিয়া, এই জাতিচরিত্রানুকারী গীতিকাব্য সাত আট শত বৎসর পর্যন্ত বঙ্গদেশে জাতীয় সাহিত্যের পদে দাঁড়াইয়াছে।'[৪৪]

এই প্রবন্ধে বাংলা গীতিকবিতা সম্পর্কে যে বক্র কটাক্ষ আছে, তা সেদিনকার বাঙালী নবীন গীতিকবিতাকারদের কাছে যে খুব প্রীতিকর ঠেকবে না তা সহজেই বোঝা যায়। এই প্রবন্ধ প্রকাশের কালে (১২৮০ পৌষ) রবীন্দ্রনাথ বারো তেরো বছর বয়সের বালক মাত্র ; তখনো তিনি এ-প্রবন্ধের উত্তর দেবার বয়সে উপনীত হন নি। কিন্তু এর অল্প কাল পরেই রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনায় গীতিকবিতার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের এই কটাক্ষপাতের প্রচ্ছন্ন ও অনতিপ্রচ্ছন্ন প্রতিবাদ দেখতে পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের এ-প্রবন্ধের আসল গুরুত্ব অবশ্য গীতিকবিতার প্রতি কটাক্ষপাতে নয়, এর আসল গুরুত্ব সাহিত্যের বাস্তববাদী ব্যাখায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, সাহিত্যের এই যে বস্তুভিত্তিক কার্যকারণ-আশ্রিত ব্যাখ্যা, নব্য ক্লাসিকপন্থী গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মধ্যেই এর উৎস। ইতিহাসের দিক থেকে দেখলে তেইন্‌-এর সাহিত্যসমালোচনার ধারাকে রোমান্টিক আন্দোলনেরই একটি বিশিষ্ট উপশাখা বলে গণ্য করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এম্‌পিরিক্যাল-পজিটিভিস্ট মতাদর্শ এবং তাঁর রোমান্টিক প্রবণতা, এই উভয় সূত্র ধরেই তেইন্‌-পন্থিতার পথে পদার্পণ করেছেন।

কিন্তু অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে যে-রকম, এখানেও ঠিক তাই, বঙ্কিমচন্দ্রের রোমান্টিকতা মধ্যপথেই এসে থেমে গিয়েছে। সাহিত্য যদি জাতীয় চরিত্রের

৪৪ তদেব, ৫৪-৫৫

প্রতিবিম্বই হয়, আর কিছু হওয়ার যদি তার সাধ্যই না থাকে, তাহ'লে তাকে ধর্মের সোপান ক'রে নেওয়া যাবে কী উপায়ে ? বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যকে নিয়মবদ্ধও বলতে চান, আবার তাকে অন্তত ততোটুকু স্বাধীনও বলতে চান, যতোটুকু স্বাধীন না হ'লে সে ধর্মের সোপান হতে পারে না। স্বভাবের আদর্শায়ণের তত্ত্বের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁর ক্লাসিক সাহিত্যতত্ত্বকে কিছু সংশোধিত ক'রে নিয়ে রোমাণ্টিকতার সঙ্গে একটা কাজ-চলা রফায় উপনীত হতে পেরেছিলেন, এখানে সে-রকম কোনো রফা দেখতে পাই না।

স্বভাবের সঙ্গে আদর্শের সংযোজনের তত্ত্বটি—এইটেই বোধকরি বঙ্কিমচন্দ্রের পুরোপুরি মনের মতো তত্ত্ব। কেবল 'উত্তরচরিত' বা ঈশ্বর গুপ্ত-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধে নয়, নানা উপলক্ষে নানা প্রবন্ধে এ-কথা ঘুরে ঘুরে এসেছে। বাইরে কিছুটা অমিল থাকলেও, স্বভাবের আদর্শায়ণের সঙ্গে ক্লাসিক অনুকরণবাদের অন্তরের মিল সুগভীর। উভয়েরই ভিত্তি এই স্বীকৃতিতে যে, সাহিত্য তার বহিঃস্থিত কোনো-একটা আদর্শের অনুকৃতি। সেই হিসেবে স্বভাবের আদর্শায়ণের তত্ত্বকে আমরা অনায়াসে সংশোধিত অনুকরণবাদ নামে অভিহিত করতে পারি। সংশোধন অবশ্য নিতান্ত নগণ্য নয়। কেননা আদর্শায়ণের মধ্যে পরোক্ষভাবে হ'লেও মনের ক্রিয়াকে—মনের শক্তিকে অনেকখানিই স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে।

'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' প্রবন্ধে এই সংশোধিত অনুকরণবাদ খুব স্পষ্ট-ভাবে বিবৃত হয়েছে। একটু ভালো ক'রে লক্ষ করলেই বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যেকার অনতিপ্রচ্ছন্ন অনুকরণবাদের স্বরূপ স্পষ্ট অনুধাবন করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'কাব্যরসের সামগ্রী মানুষের হৃদয়। যাহা মনুষ্যহৃদয়ের অংশ, অথবা যাহা তার সঞ্চালক, তদ্ব্যতীত আর কিছুই কাব্যোপযোগী নহে।'[৪৫] এ-প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, '...যাহা মনুষ্যচরিত্রানুকারী নহে, তাহার সঙ্গে মনুষ্য লেখক বা মনুষ্য পাঠকের সহৃদয়তা জন্মিতে পারে না।'[৪৬]

এখানে একটা প্রশ্ন উঠতে পারে। মনুষ্যচরিত্রানুকারীই যদি হতে হবে,

---

৪৫. তদেব, ৫০

৪৬. তদেব, ৫০

তাহ'লে কবিরা তাঁদের কাব্যে অতিপ্রকৃতের—দেবদেবী-চরিত্রের অবতারণা করেন কেন? করেন যে, তার বিশেষ একটা উদ্দেশ্য আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, শ্রেষ্ঠ কবিরা দেবদেবীকে মনুষ্যচরিত্রানুকারী করেই এঁকেছেন। তারপর তাঁরা সেই সব চরিত্রের উপর কাল্পনিক আদর্শের আরোপ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্রের উল্লেখ করেছেন। 'মানবচরিত্রগত এমন একটি উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি নাই যে, তাহা ভাগবতকারকৃত শ্রীকৃষ্ণচরিত্রে অঙ্কিত হয় নাই। এই মানুষিক চরিত্রের উপর অতিমানুষ বল এবং বুদ্ধির সংযোগে চিত্রের কেবল মনোহারিত্ব বৃদ্ধি হইয়াছে; কেন না, কবি মানুষিক বলবুদ্ধিসৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজন করিয়াছেন। কাব্যে অতিপ্রকৃতের সংস্থানের উদ্দেশ্য এবং উপকার এই এবং তাহার নিয়ম এই যে, যাহা প্রকৃত, তাহা যে নিয়মের অধীন, কবির সৃষ্ট অতিপ্রকৃতও সেই সকল নিয়মের অধীন হওয়া উচিত।'[৪৭]

সংশোধিত অনুকরণবাদে মূল ক্লাসিক সাহিত্য-আদর্শের উপর রোমান্টিক সৌন্দর্যতত্ত্বের খানিকটা আরোপ ঘটেছে। কিন্তু দু'য়ের সংযোগ সর্বত্র খুব পাকা নয়; অন্তত বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে তা মোটেই পাকা নয়। কখনো কখনো বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি ক্লাসিক অনুকরণবাদের পাশাপাশি শোধিত অনুকরণবাদকে স্থাপিত ক'রে, কাব্যের দ্বিবিধ আদর্শ এবং তদনুযায়ী দুই শ্রেণীর কাব্যের কথাও বলেছেন। এটা দুই আদর্শের সংযোগের দুর্বলতারই পরিচায়ক।

'ঋতুবর্ণন, (বঙ্গদর্শন, বৈশাখ ১৮৮২) প্রবন্ধে এই রকম কাব্যের দ্বিবিধ উদ্দেশ্য এবং দুই শ্রেণীর কবির কথা বঙ্কিমচন্দ্র বেশ স্পষ্ট ক'রে বুঝিয়ে বলেছেন। কথাটা তাঁর মুখেই শোনা যাক।—

'কাব্যের দুইটি উদ্দেশ্য; বর্ণন ও শোধন।

'এই জগৎ শোভাময়।...এ জগৎ যেমন দেখি, তেমনি যদি লিখিতে পারি, যদি ইহার যথার্থ প্রতিকৃতির সৃষ্টি করিতে পারি, তাহা হইলেই সুন্দরকে কাব্যে অবতীর্ণ করিতে পারিলাম। অতএব কেবল বর্ণনা মাত্রই কাব্য।'[৪৮]

৪৭. তদেব, ৫০-৫১

৪৮. বিবিধ, ৩৪৮

এইখানেই যদি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বক্তব্য শেষ করতেন, তাহ'লে তাঁর কাব্যতত্ত্বকে পুরোপুরি অনুকরণবাদী কাব্যতত্ত্ব এবং তাঁর সৌন্দর্যসিদ্ধান্তকে পুরোপুরি ক্লাসিকপন্থী সৌন্দর্যসিদ্ধান্ত বলে' গণ্য করতে পারতাম। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এইখানে তাঁর বক্তব্যকে শেষ করেন নি।—

'সংসার সৌন্দর্যময়, কিন্তু যাহা সুন্দর নহে, তাহারও অভাব নাই। পৃথিবীতে···বহুতর কুৎসিত সামগ্রী আছে, এবং অনেক বস্তু এমনও আছে যে, তাহাতে সৌন্দর্যের ভাব বা অভাব কিছুই লক্ষিত হয় না। ইহাও কি কাব্যের সামগ্রী? অথচ ঐ সকলের বর্ণনাও ত কাব্যমধ্যে পাওয়া যায়—এবং অনেক সময় যাহা অসুন্দর, তাহারই সৃজন কবির মুখ্য উদ্দেশ্যস্বরূপ প্রতীয়মান হয়। কারণ কি?'[৪৯]

বঙ্কিমচন্দ্র কাব্যে অসুন্দরেরও যে একটা নিজস্ব অধিকার থাকতে পারে তা স্বীকার করেন নি। সে স্বীকৃতি আমরা রবীন্দ্রনাথে পাবো। বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য এই যে, অসুন্দর লক্ষ্য নয়, অসুন্দর উপায়। সুন্দরই লক্ষ্য, সুন্দরের জন্যই অসুন্দরের প্রয়োজন। তিনি বলেছেন, 'আদৌ সুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য। কিন্তু জগতে সুন্দর অসুন্দর মিশ্রিত; অনেক সুন্দরের বর্ণনার নিতান্ত প্রয়োজনীয় অঙ্গ, অসুন্দরের বর্ণনা; অনেক সময়ে আনুষঙ্গিক অসুন্দরের বর্ণনায় সুন্দরের সৌন্দর্য স্পষ্টীকৃত হইয়া থাকে। এজন্য অসুন্দরের বর্ণনা বর্ণনাকাব্যে স্থান পাইয়াছে···।

'অতএব সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত বর্ণনাকাব্যের উদ্দেশ্য—স্বরূপ বর্ণনা। জগৎ যেমন আছে, ঠিক তার প্রকৃত চিত্রের সৃজন করিতে এ শ্রেণীর কবিরা যত্ন করেন।'[৫০]

স্বরূপবর্ণনাই যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে সুন্দর-অসুন্দর তুল্যমূল্য। একটা লক্ষ্য, আর একটা উপায় নয়, দুই-ই লক্ষ্য। যথার্থ রিয়ালিজমের এইটেই আসল বক্তব্য। বোঝা যাচ্ছে, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে রিয়ালিজমের স্বরূপ ঠিক-ভাবে উপলব্ধি করতে পারেন নি। রিয়ালিজ্‌ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনে যতোই বিরুদ্ধতা থাক, তাঁর পরিণত বয়সের সাহিত্যতত্ত্বে সেই বলিষ্ঠতর সৌন্দর্যভাবনার অর্থাৎ যথার্থ রিয়ালিজমের—যেখানে তথাকথিত সুন্দর আর

৪৯. তদেব, ৩৪৮-৯

৫০. তদেব, ৩৪৯

তথাকথিত অসুন্দর, দুই-ই রূপ, দুই-ই মূল্যবান,—যেখানে সত্য ও সুন্দরে অভেদ, সেই উচ্চতর সৌন্দর্যভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যথার্থ স্বরূপবর্ণনার বা পরিণত সমৃদ্ধ বাস্তববাদের পরিচয় দিতে পারেন নি। যে সাহিত্যচেষ্টার পরিচয় তিনি এখানে দিয়েছেন, তা এক ধরনের দুর্বল, দরিদ্র এবং অ-যথার্থ বাস্তববাদ। অবশ্য অন্যদিক থেকে তাকে বলতে পারি, তা এক ধরনের ক্লাসিকপন্থী অনুকরণবাদী সাহিত্যচেষ্টা। এই বিশেষ গোত্রের সাহিত্যের পরিচয় দিয়ে, অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র অপর গোত্রের সাহিত্যের সামনে এসে উপনীত হলেন। এই রকম অনুমান করাই স্বাভাবিক যে, বঙ্কিমচন্দ্র এবার রোমান্টিক সাহিত্যের কথা, রোমান্টিক কাব্যের কথা বলবেন। কার্যত কিন্তু দেখতে পাই, বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনায় এই অপর গোত্রের পরিচয়ের মধ্যে রোমান্টিক কাব্যতত্ত্ব এবং আধা-রোমান্টিক কাব্যতত্ত্বের এক বিচিত্র মিশ্রণ ঘটেছে।—

'আর এক শ্রেণীর কবিদিগের উদ্দেশ্য আবিকল স্বরূপ বর্ণনা নহে। অপ্রকৃত বর্ণনাও তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহারা প্রকৃতির সংশোধন করিয়া লয়েন—যাহা সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাছিয়া লইয়া, যাহা অসুন্দর, তাহা বহিষ্কৃত করিয়া কাব্যের প্রণয়ন করেন। কেবল তাহাই নহে। সুন্দরেও যে সৌন্দর্য নাই, যে রস, যে রূপ, যে স্পর্শ, যে গন্ধ কেহ কখন ইন্দ্রিয়গোচর করে নাই, 'যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই,' সেই আত্মচিত্তপ্রসূত উজ্জ্বল হৈম কিরণে সকলকে পরিপ্লুত করিয়া, সুন্দরকে আরও সুন্দর করেন—সৌন্দর্যের অতিপ্রকৃত চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি করেন। অতিপ্রকৃত, কিন্তু অপ্রকৃত নহে। তাঁহাদের সৃষ্টিতে অযথার্থ, অভাবনীয়, সত্যের বিপরীত, প্রাকৃতিক নিয়মের বিপরীত কিছুই নাই, কিন্তু প্রকৃতিতে ঠিক তাহার আদর্শ কোথাও দেখিবে না। ইহাকেই আমরা প্রবন্ধারম্ভে শোধন বলিয়াছি।'[৫১]

একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কাব্যের দুটিমাত্র উদ্দেশ্যের কথা—এক স্বভাবানুকারী, অর্থাৎ সুন্দরে অসুন্দরে মিলিয়ে জগৎ যেমনটি, তার যথাযথ রূপায়ণ, আর স্বভাবাতিরিক্ত, অর্থাৎ বাস্তব সত্যকে

৫১. তদেব, ৩৪৯

অতিক্রম করে যাওয়া, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মাত্র এই দুই উদ্দেশ্যের কথাই বলছেন না। স্বভাবাতিরিক্ত শাখার মধ্যে একাধিক স্বতন্ত্র গোত্র আত্মগোপন ক'রে আছে। যেমন, এক, বেছে বেছে জগতের সুন্দর জিনিসগুলিরই রূপায়ণ। দুই, আদর্শের সহযোগে জগতের অপূর্ণতার সম্পূরণ ক'রে নেওয়া, জগতের অসুন্দরগুলোকে সংশোধন ক'রে নেওয়া, পূর্বে যাকে বলা হয়েছে বাস্তবের আদর্শায়ণ। তিন, কল্পনার সাহায্যে এমন-কিছুর সৃষ্টির আদর্শ কোথাও নেই, কোথাও ছিল না, যা সম্পূর্ণ অভিনব।

স্বীকার করি, এই তৃতীয় গোত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি থেকে খুব সুনিশ্চিত হওয়া কঠিন। কেননা, বঙ্কিমচন্দ্র তাকে অতিপ্রকৃত বললেও অপ্রকৃত বলতে আপত্তি করেছেন। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যায় যে, অনুকরণ-বাদ এবং শোধিত অনুকরণবাদ এই দুটোই এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের আসল লক্ষ্য। তবু, '…যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই', বঙ্কিমচন্দ্র যখন 'সেই আত্মচিত্তপ্রসূত উজ্জ্বল হৈম কিরণে'র কথা বলেন, যখন বুঝতে পারি, বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীন কল্পনাশক্তির সৃজনলীলার দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করছেন, তখন বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির অন্তর্নিহিত রোমাণ্টিকতা খুব গোপন থাকে নি।

স্বভাবের যথাযথ এবং সামগ্রিক রূপায়ণ, স্বভাব থেকে অংশবিশেষের নির্বাচন, স্বভাবের সংশোধন, এবং 'যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নাই', ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থের সেই—

The light that never was on sea or land,
The consecration, and the Poet's dream—,[৫২]

বঙ্কিমচন্দ্র এই সব বিরোধী আদর্শকে পাশাপাশি গেঁথে দিয়েছেন। যে উচ্চতর প্রত্যয় এদের সমন্বয় করবে তার অভাবে, এরা কেবল পরস্পরকে অর্থহীন এবং দুর্বলই ক'রে দিয়েছে।

দৃষ্টান্ত হিসেবে সৌন্দর্য কথাটিকে গ্রহণ করা যেতে পারে। সৌন্দর্য কথাটিকে বঙ্কিমচন্দ্র নানাভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন, সংজ্ঞা দিতে চেষ্টা করেছেন, কিন্তু সামনে কোনো সুনির্দিষ্ট প্রত্যয় না থাকাতে, সৌন্দর্যের

৫২. Nature And The Poet, W. Wordsworth.

প্রতিশব্দের বাইরে কোনো ভাবনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। ফলে সুন্দরের সংজ্ঞা চক্রাকারে আবর্তিতই হয়েছে, কোনো নতুন ধারণা দিতে পারে নি। সুন্দর কী? 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে পর পর অনেকগুলি প্রত্যয়কে উপস্থাপিত করার পর শেষ পর্যন্ত এ-বিষয়ে যা বলেছেন তা হ'লো এই যে, সুন্দর হ'লো তা যা স্বভাবানুকারী, এবং স্বভাবাতিরিক্ত, এবং সৃষ্টিকৌশল-সম্পন্ন—এবং যা সৌন্দর্যবিশিষ্ট! যা সৌন্দর্যবিশিষ্ট তা-ই সুন্দর, এবং সুন্দর তা-ই যা সৌন্দর্যবিশিষ্ট, এ-রকম উক্তি বঙ্কিমচন্দ্রের মতো কুশাগ্রবুদ্ধি নৈয়ায়িকের মুখে একেবারেই অপ্রত্যাশিত। বলা বাহুল্য, এটা বঙ্কিমচন্দ্রের বুদ্ধির দুর্বলতার প্রমাণ নয়। এ হ'লো দুই বিষম শক্তির প্রচণ্ড দোটানায় সহজ সমাধান খোঁজার পরিণাম।

এ-রকম সমাধান সম্ভব নয়। সাহিত্যতত্ত্বে শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রকে ক্লাসিক মতাদর্শের দিকেই ঝুঁকতে হয়েছে, উভয় কূল রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। সাহিত্যতত্ত্বে যা-ই হোক না কেন, ব্যবহারিক সমালোচনায় কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কোনো রকম দ্বিধা বা দুর্বলতার, কোনো দোটানার, কোনো অনিশ্চয়তা বা অস্থিরতার পরিচয় দেন নি। অথবা বলি, খুব কমই দিয়েছেন। সমালোচনায়, মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর স্বক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠিত। সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে আমাদের প্রাপ্তির ঋণ অনেকখানি। অভিযোগ যদি কিছু থাকে, তাহ'লো প্রধানত তা সমালোচনার পরিমাণের স্বল্পতা নিয়ে।

তৃতীয় অধ্যায়

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা

১

আমরা জানি, সাহিত্য জীবনকে নানা রকমভাবে স্পর্শ করে। জীবনের দিক থেকে তার প্রতিক্রিয়াও নানা ক্ষেত্রে নানা রকমের। সেই কারণে সাহিত্যের আলোচনাও কখনোই একই ধারায় হুবহু এক রকমের হতে পারে না। আমরা জানি, সাহিত্য-আলোচনার নানা প্রসঙ্গক্ষেত্র, নানান্ প্রয়োজন, সাহিত্য-আলোচনার নানা পদ্ধতি, নানা শাখা-প্রশাখা, নানান্ ধরন।

এই সব বিভিন্ন ধরনের, বিভিন্ন চরিত্রের আলোচনার কোনোটিকেই অবৈধ বলা যাবে না। নিজ নিজ প্রসঙ্গক্ষেত্রে, নিজ নিজ প্রয়োজনের এলাকায় এর প্রত্যেকটাই মূল্যবান। কিন্তু তা হ'লেও এর সবগুলোকেই সাহিত্যসমালোচনা বলা যায় না। এর মধ্যে ঠিক কোন্ ধরনের, বা কোন্ কোন্ ধরনের আলোচনাকে সাহিত্যসমালোচনা বলা যাবে, প্রত্যেক সমালোচকের কাছে এইটেই একেবারে গোড়াকার প্রশ্ন। অন্তত তা-ই হওয়া উচিত।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখতে পাই, অধিকাংশ সময়ই তা হয় না। সমালোচনা কী তা নিয়ে সমালোচকেরা খুব বেশি মাথা ঘামান না। সমালোচক হিসেবে তাঁর করণীয় কী, দায়িত্ব কী, পাঠককে তিনি কী দিতে চান এবং কেন, এটা যেন কোনো প্রশ্নই নয়। অধিকাংশ সমালোচকই ধরে' নেন, পাঠককে তিনি যা দিচ্ছেন অবিকল সেই বস্তুই সাহিত্যসমালোচনা। যেন সমালোচনা নিয়ে মতান্তরের কোনো অবকাশই নেই, যেন সমালোচনা বলতে সবাই এক জিনিসই বুঝে থাকেন। অথচ সমালোচনার জগতে প্রবেশ করলে দেখতে পাই, মতান্তর সাহিত্যের এই দিকটা নিয়েই সব থেকে বেশি। দেখতে পাই, কোনো দুজন সমালোচকেরই সমালোচনা সম্বন্ধে ধারণা হুবহু

এক নয়। শুধু তা-ই নয়, দেখতে পাই, একই সমালোচক বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সেই সঙ্গে এও দেখতে পাই যে, একই সমালোচক বিভিন্ন সময়ে সমালোচনা বিষয়ে সম্পূর্ণ বিভিন্ন রকমের মত প্রকাশ করেছেন।

শেষ বাক্যটির দৃষ্টান্ত খুঁজতে গেলে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথের নাম মনে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যসমালোচনাকে কখনো বলেছেন বিচার, কখনো বলেছেন ব্যাখ্যা, আবার কখনো বলেছেন পরিচয়। কখনো কখনো তিনি সাহিত্যবিচারকেই বলেছেন সাহিত্যব্যাখ্যা। ব্যাখ্যা কী তা বলতে গিয়ে বলেছেন, ব্যাখ্যা হ'লো সাহিত্যবিষয়ের ব্যক্তির পরিচয়। ব্যক্তি কী তা বলতে গিয়ে বলেছেন, স্বকীয় বিশেষত্বের মধ্যে যা ব্যক্ত, তা-ই ব্যক্তি (সাহিত্য-বিচার, সাহিত্যের পথে)। এ যেমন বলেছেন, তেমনি আবার ক্ষেত্রবিশেষে একেবারে অন্য রকমও বলেছেন। বলেছেন যে, যথার্থ সমালোচনা হ'লো পূজা—সমালোচক পূজারি পুরোহিত, তাঁর কাজ মূল সাহিত্যিকের প্রশস্তি গান (রামায়ণ, প্রাচীন সাহিত্য)।

বর্তমান প্রসঙ্গে আমাদের প্রশ্ন বঙ্কিমচন্দ্রকে নিয়ে। সমালোচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা কী, সমালোচনার কী-কেন নিয়ে তাঁর অভিমত কী? পারিভাষিক কথা দিয়ে বললে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাতত্ত্বটি কী?

'সমালোচনা কী এবং কী নয়, সমালোচকের কাজ কী হওয়া উচিত, কী হওয়া উচিত নয়, এ-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র খুব অল্প কথাই বলেছেন। সাহিত্য-তত্ত্বের মতো বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাতত্ত্বও অতিরিক্ত রকমের স্বল্পভাষী। বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে এটা অবশ্য খানিকটা স্বাভাবিক।' বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাতত্ত্বের এই অতি-সংক্ষিপ্ততা আমাদের ক্ষুব্ধ করতে পারে, কিন্তু খুব বেশি বিস্মিত করে না। আমরা জানি, সমালোচনাতত্ত্বের স্থান সাহিত্যতত্ত্ব ও ব্যবহারিক সমালোচনা এ-দুয়ের মধ্যস্থলে। সমালোচনা-তত্ত্বের জন্য একদিকে যেমন ব্যবহারিক সমালোচনার নিজস্ব তাগিদ আছে, ঠিক তেমনি তার মধ্যে সাহিত্যতত্ত্বের উত্তরাধিকারও অবশ্যস্বীকার্য। মনে রাখতে হবে যে, সমালোচনাতত্ত্ব আসলে সাহিত্যতত্ত্বেরই ব্যবহারিক সূত্রাবলী, সাহিত্যতত্ত্বেরই প্রয়োগমুখী নির্দেশাবলী। বুঝতে পারি, 'সাহিত্যতত্ত্বে

বঙ্কিমচন্দ্রের আপেক্ষিক অনাগ্রহই তাঁর সমালোচনাতত্ত্বকে এতো সংক্ষিপ্ত ক'রে রেখেছে। তবু, যেহেতু বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহারিক সমালোচনায় অত্যন্ত উৎসাহী, সেই কারণেই তাঁর কাছে আর-একটু বিস্তৃততর সমালোচনাতত্ত্ব প্রত্যাশিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সে প্রত্যাশা পূরণ করেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্ব অনেক বিস্তৃত এবং অনেক গভীর। বঙ্কিমচন্দ্রের মন তত্ত্ববিমুখ আর রবীন্দ্রনাথের মন তত্ত্বমুখী, এইটেই যে এর একমাত্র কারণ, এ-রকম মনে করলে কিন্তু ভুল হবে। বঙ্কিমচন্দ্র যে সমালোচনার থিয়োরি নিয়ে প্রায় নীরব আর রবীন্দ্রনাথ যে ওই বিষয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিয়েছেন, এমন কি বিষয়ান্তরের আলোচনার সময়ও যে রবীন্দ্রনাথ বার বার সমালোচনার প্রসঙ্গ এনে, সমালোচনার লক্ষ্য, সমালোচকের যোগ্যতা, সমালোচকের অধিকারের সীমানা, লেখক বনাম সমালোচক—ইত্যাদি নিয়ে কথা বলেছেন, তার অন্যতম প্রধান কারণ দুজনের দেশকালগত পরিবেশের মধ্যে, দুজনের নিজের নিজের সাহিত্যজীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যেই নিহিত ছিল।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, সৃজনশীল লেখক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যজীবনের প্রায় গোটা সময়টাই তাঁর কালের সাহিত্যজগতের উপর অপ্রতিহত প্রতাপে রাজত্ব ক'রে এসেছেন। একেবারে সূচনাপর্বে ছাড়া তাঁর কখনোই কোনো উল্লেখযোগ্য প্রতিপক্ষ ছিল না। রবীন্দ্রনাথ কোনো কালেই ঠিক সেই প্রতিপত্তি পান নি, এমন কি নোবেল-প্রাইজ পাওয়ার পরেও নয়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় ধরেই নিয়েছিলেন যে, তিনি নিজে সমালোচনা নাম দিয়ে যে-বস্তুকে পাঠকদের সামনে তুলে ধরবেন, পাঠক-সাধারণ বিনা বাক্যব্যয়ে তাকেই সমালোচনা বলে' মেনে নেবে। রবীন্দ্রনাথ এমন সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলেন না। সমালোচনা ব্যাপারটিকে নিয়ে তাঁকে অনেক ভাবতে হয়েছে।

সাহিত্যজগতে বঙ্কিমচন্দ্রের একচ্ছত্র আধিপত্যের কালে তাঁর নিজের উপন্যাসসমূহ যে-সমস্ত সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিল, তার সবই প্রায় বঙ্কিম-অনুসারী সমালোচনা। এবং তার মধ্যে বিরূপ সমালোচনা প্রায় নেই বললেই হয়। কোনো সমালোচনাই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে সমালোচকের

যোগ্যতা-অযোগ্যতা বা অধিকার-অনধিকার সম্পর্কিত প্রশ্নকে জাগ্রত ক'রে দেয় নি।[১] রবীন্দ্রনাথকে জীবনে অনেকবার অনেক রকম বিরূপ সমালোচনার এবং সমালোচনা-নামে পরিচিত অনতি-প্রচ্ছন্ন আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কখনো প্রথম যৌবনে কালিপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ বা সুরেশ সমাজপতি প্রমুখ প্রাচীন ও প্রাচীনপন্থীদের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ, কখনো হিন্দুসমাজের রক্ষণশীল গোষ্ঠীর মুখপাত্রদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রতিকূলতা, কখনো মধ্যবয়সে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রমুখ আধা-ক্লাসিকপন্থীদের আনা অস্পষ্টতার অভিযোগ, দুর্নীতির অভিযোগ, দাম্ভিকতার অভিযোগ, কখনো-বা আরো পরিণত বয়সে দেশবন্ধু বিপিনচন্দ্র প্রমুখ দেশকর্মী-সমাজকর্মীদের আনা সমাজবিমুখতার অভিযোগ, উন্নাসিকতা ও বিজাতীয়তার অভিযোগ, অবাস্তবতা ও অলস স্বপ্নচারিতার অভিযোগ, কখনো-বা সুপরিণত বয়সে শনিবারের চিঠির রক্ষণ-শীল দল এবং অন্যদিকে তখনকার দিনের অতি-আধুনিক প্রগতিপন্থী তরুণ লেখকের দল—এক সঙ্গে এই দুই বিপরীত দলের অসন্তোষ ও মৃদু আক্রমণ, আবার কখনো-বা জীবনের একেবারে গোধূলিলগ্নে অতি-বাম যান্ত্রিক-বামপন্থীদের সমুচ্চ ধিক্কার, স্পর্শকাতর কবিকে সারা জীবন ধরে' বার বার এই সব বিড়ম্বনা ভোগ করতে হয়েছে। সেই কারণে সমালোচনা যে কী নয় এ-কথা রবীন্দ্রনাথকে বার বার বুঝিয়ে বলতে হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের এ-রকম কোনো তাগিদ ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনাকে দেখেছেন খানিকটা সমালোচক হিসেবে, বেশিটাই সাহিত্যের অভিভাবক হিসেবে।[২] রবীন্দ্রনাথ সমালোচনাকে দেখেছেন সামান্যই সমালোচক হিসেবে, প্রায় পুরোপুরিই সমালোচনার দ্বারা আক্রান্ত লেখক হিসেবে। ফলে রবীন্দ্রনাথকে অনেক কথাই বলতে হয়েছে, আর বঙ্কিমচন্দ্রের যা বক্তব্য তা বঙ্গদর্শন পত্রিকার একটি সংখ্যার ছোট একটু সম্পাদকীয় মন্তব্যের মধ্যেই তিনি শেষ ক'রে দিয়েছেন।

সকলেই জানেন বঙ্গদর্শনের প্রথম ছ'টি সংখ্যায় কোনো গ্রন্থসমালোচনা ছিল না। সপ্তম সংখ্যা (১২৭৯ কার্তিক, ১৮৭২) থেকে বঙ্গদর্শনে গ্রন্থ-সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে। পুস্তকসমালোচনা সাময়িক পত্রিকার একটি সুপ্রচলিত প্রথা। বঙ্গদর্শনের প্রথম ছ' সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র সেই প্রথাকে

কেন লঙ্ঘন করেছিলেন, পত্রিকার সপ্তম সংখ্যায় তিনি তার একটি সম্পাদকীয় কৈফিয়ৎ দিয়েছেন।[১] এই সংক্ষিপ্ত কৈফিয়তের মধ্যে সমালোচনা সম্বন্ধে কিছু সাধারণ উক্তি আছে। ঠিক কোন্ ধরনের আলোচনাকে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা বলে' মনে করন, তার সম্পর্কে একটি স্বল্পায়তন কিন্তু স্পষ্ট-উচ্চারিত ঘোষণা এইখানে পাওয়া যায়।

এই সম্পাদকীয় কৈফিয়তে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'আমরা প্রথামত প্রাপ্ত পুস্তকাদির সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় এ পর্যন্ত প্রবৃত্ত হই নাই। ইহার কারণ এই যে, আমাদিগের বিবেচনায় এরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় কাহারও কোন উপকার নাই। এইরূপ সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় গ্রন্থের প্রকৃত গুণদোষের বিচার হইতে পারে না। তদ্দ্বারা, গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা ভিন্ন অন্য কোন কার্যই সিদ্ধ হয় না। কিন্তু গ্রন্থকারের প্রশংসা বা নিন্দা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে।'[১]

সমালোচনা কী এবং কী নয়, সে-সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের তিনটি বক্তব্য এর মধ্যে বেশ স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। এক, যাতে কারো কোনো উপকার নেই, তা যথার্থ সমালোচনা নয়, যে-কারণে পত্রিকার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থসমালোচনা প্রকৃত সমালোচনা হ'য়ে উঠবার অবকাশ পায় না। দুই, গ্রন্থকারের নিন্দা বা প্রশংসা যথার্থ সমালোচনা নয়—সমালোচনার লক্ষ্য গ্রন্থকার নয়, সমালোচনার লক্ষ্য গ্রন্থ। তৃতীয় বক্তব্যটাই অবশ্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ। সমালোচনা যে আসলে কী তা এইখানেই বলা হয়েছে। গ্রন্থবিশেষের গুণদোষের বিচার, এই হ'লো যথার্থ সাহিত্যসমালোচনা।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বক্তব্যকে এই একটি কথাতেই শেষ ক'রে দেন নি, আরো একটু এগিয়ে সমালোচনার উদ্দেশ্য কী বা সমালোচকের কাজ কী তার একটি তালিকাও এইসঙ্গেই দিয়ে দিয়েছেন।[১] আগের কথার সূত্র ধরেই তিনি বলেছেন, 'গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা, যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে

১. নূতন গ্রন্থের সমালোচনা, বিবিধ, ৩০৫

পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা ; এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য।'[২]

আগের উদ্‌ধৃতির প্রথম অংশে যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থের গুণদোষ বিচারের কথা বলেছেন, সেখানকার কথা থেকে পাঠকের এমন ধারণা হওয়া অন্যায় নয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিশ্চয়ই গ্রন্থের সাহিত্যিক গুণদোষের কথাই বলছেন, সমালোচকের এ-বিচার অবশ্যই নান্দনিক বিচার, অন্য কোনো রকম বিচার নয়। কিন্তু পরের উদ্‌ধৃতিতে যেখানে বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনার উদ্দেশ্য কী কী তার তালিকা দিয়েছেন, সেইখানে—সেই তালিকা থেকে এ-ব্যাপারে একটু খট্‌কার সৃষ্টি হয়।

এই তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচকের তিনটি কাজের কথা বলেছেন। এক, পাঠকের সুখলাভের সহায়তা করা। দুই, পাঠকের গ্রন্থপাঠজনিত জ্ঞানলাভে সহায়তা করা। তিন, অনিষ্টকারী গ্রন্থের অনিষ্টকারিতাকে—এবং সম্ভবত ইষ্টকারী গ্রন্থের ইষ্টকারিতাকে—পাঠকের সামনে প্রতীয়মান ক'রে তোলা। অর্থাৎ পাঠকের ইষ্টলাভে সহায়তা করা। কিন্তু এর মধ্যে সাহিত্যিক গুণদোষ বিচারের কথা কোথায়?

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র যে বিশেষ তিনটি কাজের কথা বলেছেন, তার তিনটি তিন রকমের। প্রথমটির লক্ষ্য পাঠকের সুখ বা আনন্দ। দ্বিতীয়টির লক্ষ্য পাঠকের জ্ঞান। তৃতীয়টির লক্ষ্য পাঠকের কল্যাণ। এর প্রথমটি যদিও আনন্দধর্মী বা সম্ভোগাত্মক ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত, তা হ'লেও ক্রিয়াটি নিজে আনন্দধর্মী নয়, নিজে সম্ভোগাত্মক নয়। পাঠককে সম্ভোগের জন্য তৈরী ক'রে দেওয়া, এ-কাজ আসলে গুরুগিরি। বড়ো জোর বলতে পারি, কাজটা প্রত্যক্ষভাবে শিক্ষামূলক এবং পরোক্ষভাবে নান্দনিক। বাকি দুটির কোনোটিই এমন কি পরোক্ষভাবেও আনন্দের সঙ্গে যুক্ত নয়। দ্বিতীয় কাজটি সরাসরি জ্ঞানাত্মক বা শিক্ষাধর্মী। আর তৃতীয়টি সামাজিক ক্ষেত্রের কাজ, খাঁটি নীতিধর্মী ক্রিয়া।

দেখা যাচ্ছে, এই তিন কাজের কোনোটিই খাঁটি সাহিত্যবিচার নয়,

২. তদেব, ৩০৫

কোনেটিই সাহিত্যের দোষগুণের আলোচনা নয়, কোনোটিই সাহিত্যের নান্দনিক মূল্যায়ন নয়। খুব সম্ভব একেবারে গোড়াতে যে তিনি গুণদোষ বিচারের কথা বলেছেন, তা অন্য গুণদোষ নয়, তা সাহিত্যিক গুণদোষ। এবং তাঁর মতে এটি—অর্থাৎ এই মূল্যায়ন-ক্রিয়াটি সমালোচকের চতুর্থ কাজ। চতুর্থ না ধরে' একে প্রথমও ধরে' নিতে পারি। কেননা এর কথা প্রথমেই বলা হয়েছে। তা যদি ধরেও নিই, তা হ'লেও মানতে হবে যে, পরে এই যে সম্পূর্ণ বিজাতীয় একটি তালিকা বঙ্কিমচন্দ্র এর সঙ্গে যুক্ত ক'রে দিলেন, তাঁর ফলে তাঁর সমালোচনা সম্পর্কিত অভিমতটি একটু জটিলই হয়ে দাঁড়ালো।

সে যা-ই হোক, দুই উদ্‌ধৃতিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত ক'রে তাহ'লে আমরা এই রকম একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে সমালোচনার উদ্দেশ্য চতুর্বিধ। প্রথম, গ্রন্থের সাহিত্যিক মূল্যায়ন। দ্বিতীয়, পাঠকের রসাস্বাদনে সহায়তা করা। তৃতীয় এবং চতুর্থ যথাক্রমে পাঠকের জ্ঞানলাভে এবং পাঠকের ইষ্টলাভে সাহায্যতা করা।

এদের মধ্যে কোনটির গুরুত্ব বেশি তা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নি। এদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ ঘটলে, সমালোচক কাকে ফেলবেন, কাকে রাখবেন, তা-ও তিনি বলেন নি। জটিলতা এইখানেই। এমন অনেক গ্রন্থ আছে যা সুখ দেয়, কিন্তু জ্ঞানও দেয় না এবং সম্ভবত ইষ্টলাভও ঘটায় না। তেমনি অনেক জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ আছে, অনেক নীতি-উপদেশাত্মক গ্রন্থ আছে, সুখ যাদের ত্রিসীমানাতেও ঘেঁষতে পারে না। যে-গ্রন্থ সুখ দেয়, কিন্তু জ্ঞান দেয় না, অথবা সুখ দেয় কিন্তু দুর্নীতি ছড়ায়, তাকে কীভাবে গ্রহণ করতে হবে? যে-গ্রন্থ জ্ঞান দেয় কিন্তু আনন্দ দেয় না, যে-গ্রন্থ উচ্চ নৈতিকতার প্রতিষ্ঠা করে অথবা অন্যবিধ ইষ্টসাধন করে কিন্তু আনন্দ দেয় না, তার ক্ষেত্রে সমালোচক কী বলবেন? বঙ্কিমচন্দ্রের কৃপণ সূত্রগুলির মধ্যে এ-সব প্রশ্নেরও কোনো উত্তর নেই।

তাছাড়া, সমালোচক কি এই চারটি দায়িত্বকেই একসঙ্গে পালন করবেন, না এর যে-কোনো একটিকেই পালন করলেই তাঁর কাজকে যথার্থ সাহিত্য-সমালোচনা বলে' গণ্য করা যাবে? এ-সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র নীরব। শুধু উচ্চারিত বাক্য থেকেই যদি বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাতত্ত্বকে ধরতে চাই, তা

হ'লে অবশ্যই দেখতে পাবো যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাতত্ত্ব যেমন অসম্পূর্ণ তেমনি অনিশ্চিত।

এ-ক্ষেত্রে অবশ্য শুধু উচ্চারিত সূত্রসমূহের উপর নির্ভর ক'রে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। ভুললে চলবে না যে, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে সমালোচক। প্রত্যেক সমালোচকের সমালোচনাতত্ত্ব যতো-না তাঁর মুখের কথায়, তার থেকে অনেক বেশি সত্য তাঁর নিজের সমালোচনাকর্মে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাতত্ত্বের আসল পরিচয় তাঁর সমালোচনার মধ্যে। ঘোষণার মধ্যে নয়, আসলে সেইখানেই খুঁজে দেখতে হবে, কোন্ কাজকে তিনি তাঁর যথার্থ দায়িত্ব বলে' বেছে নিয়েছেন।

সমালোচনা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোষণা এবং তাঁর ব্যবহারিক সমালোচনা-কর্ম, এই দুয়ের মধ্যে খুব যে মারাত্মক বিরোধ আছে, তা হয়তো নয়। তবে এ-দুয়ের মধ্যে হুবহু মিলও পাওয়া যাবে না: ঝোঁকের তফাৎ অনেকখানি। সেদিক থেকে বলতে পারি, ঘোষণায় বঙ্কিমচন্দ্র আধা-ক্লাসিকপন্থী, কিন্তু কার্যকালে তিনি মোটামুটি রোমাণ্টিক গোত্রেরই সমালোচক।

একটা বড়ো মিল অবশ্য গোড়াতেই স্বীকার ক'রে নিতে হবে। সে হ'লো বিচার নিয়ে। ঘোষণায় বঙ্কিমচন্দ্র মূল্যায়নের—সম্ভবত সাহিত্যিক মূল্যায়নেরই কথা বলেছেন। সাহিত্যিক মূল্যায়ন বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় সর্বত্রই উপস্থিত। এই ব্যাপারে ঘোষণায় আর কাজে পুরোপুরি মিল আছে। কিন্তু এই মিলটাকে বাদ দিলে, এখানকার তালিকার আর কিছুই বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এখানে, এই তালিকা রচনায় তিনি যে-পরিমাণ জ্ঞানবাদী এবং যে-পরিমাণ নীতিবাদী, কার্যকালে অর্থাৎ নিজের সমালোচনায় তিনি মোটেই তা নন।

এই ঘোষিত তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের সুখলাভে সহায়তা করার কথা বলেছেন। কিন্তু সমালোচক কীভাবে পাঠককে সুখলাভে সহায়তা করতে পারেন? নিশ্চয়ই পাঠকের ঘুমন্ত রসবোধকে জাগ্রত ক'রে? তা হ'লে, মূল রচনা যে-ঘুমন্তকে জাগাতে পারলো না, সমালোচকের কাজ হ'লো সেই ঘুমন্তকে জাগ্রত করা। কাজটা যদি আদৌ সম্ভব হয়, তা হ'লে তার পথ কী? রসবোধকে জাগাতে হ'লে রসের পথ ছাড়া গতি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র কি

এখানে সমালোচনাকে সেই পথেই যেতে বলছেন? আমরা জানি, বিচারের পথ রসের পথ নয়, ব্যাখ্যার পথও রসের পথ নয়, রসসৃষ্টির পথই রসের পথ। অর্থাৎ রস-পথের পথিক যে-সমালোচনা, তা নিজেই রসাত্মক। সমালোচকের শেষ লক্ষ্যটা যখন মূল গ্রন্থেরই রস, তখন একে আমরা অনায়াসে রসপরিচয়মূলক সমালোচনা বলতে পারি। সৃজনধর্মী সমালোচনা, কাব্যধর্মী সমালোচনা, ইম্প্রেশনিস্টিক সমালোচনা, এরা সব এই গোত্রেই পড়ে। তাহ'লে কি বঙ্কিমচন্দ্র এখানে এই জাতীয় সমালোচনারই প্রবক্তা হয়ে দাঁড়িয়েছেন? হতে পারেন, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যাবে, এই জাতীয় ভাবধর্মী সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র নিজে খুব কমই প্রবৃত্ত হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত সমালোচনাই বুদ্ধিপ্রধান। বলা বাহুল্য, সৃজন সেখানেও আছে, কিন্তু সে কেবল সহকারী হিসেবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকাংশ সমালোচনাই বহুলাংশে ব্যাখ্যামূলক। আমরা জানি, ব্যাখ্যা মূলত জ্ঞানাত্মক ক্রিয়া, ব্যাখ্যা জ্ঞানলাভের সহায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর তালিকায় পাঠকের জ্ঞানলাভে সহায়তা করার কথা বলেছেন সহজেই মনে হতে পারে যে, পাঠকের জ্ঞানলাভে সহায়তা করাই বোধকরি বঙ্কিমচন্দ্র-আচরিত ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা। মনে হতে পারে যে, এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার কথাই বলেছেন।

এ-রকম মনে করলে কিন্তু ভুল হবে। মনে রাখতে হবে, ব্যাখ্যামূল সমালোচনার ব্যাখ্যা নিছক জ্ঞানলাভের সহায় নয়, আনন্দলাভের সহায়। যখন তার অব্যবহিত লক্ষ্য জ্ঞান, তখনো তার শেষ লক্ষ্য আনন্দ। আরো মনে রাখতে হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যে-জ্ঞানের কথা বলেছেন, তা 'গ্রন্থ পাঠ করিয়া' পাঠকের যে-জ্ঞান সেই জ্ঞান, অর্থাৎ গ্রন্থকার-প্রদত্ত জ্ঞান। ব্যাখ্যামূলক সমালোচক সাহিত্যবস্তুর তাবৎ রহস্যের ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেন, কিন্তু সেই চেষ্টার সঙ্গে গ্রন্থকার-প্রদত্ত জ্ঞানের কোনো সম্পর্ক নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের আচরিত ব্যাখ্যামূলক সমালোচনার কোনোটাই গ্রন্থকার-প্রদত্ত জ্ঞানের স্পষ্টীকরণ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যে-জ্ঞানের কথা বলেছেন, সাহিত্যের কোনো শাখাই প্রত্যক্ষভাবে—অর্থাৎ সাহিত্য হিসেবে সে-জ্ঞানের কারবারী নয়। ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা পাঠককে জ্ঞান দেয় বটে, কিন্তু

সে-জ্ঞান মূল গ্রন্থে বিধৃত জ্ঞানের অঙ্গ নয়। সে-জ্ঞান সমালোচক-প্রদত্ত জ্ঞান। এ-জ্ঞান কখনো বিচারের কখনো-বা রসপরিচয়ের সহায়ক। নিজের সমালোচনাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র সেই রকম জ্ঞানচর্চাই করেছেন। এখানে, এই সম্পাদকীয় কৈফিয়তে যার কথা বলেছেন, তা করেন নি। অর্থাৎ আদৌ গ্রন্থকার-প্রদত্ত জ্ঞানের ব্যাখ্যা করেন নি।

এখানকার এই কৈফিয়তে বঙ্কিমচন্দ্র অনিষ্টকারী গ্রন্থের অনিষ্টকারিতাকে সাধারণের কাছে পরিস্ফুট ক'রে দেওয়াকে সমালোচকের দায়িত্ব বলে' বর্ণনা করেছেন। গোঁড়া নীতিবাদী বলে' একালে আমাদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের বেশ খানিকটা দুর্ণাম আছে। প্রবন্ধে বেশির ভাগ সময়ই বঙ্কিমচন্দ্র কঠোর নীতিবাদী। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের অনেক উক্তিই অনমনীয় রকমের নীতিবাদী-সাহিত্যতাত্ত্বিকের উক্তি। সমালোচনাতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্রের বর্তমান উক্তিটিও অনেকটা যেন বঙ্কিমচন্দ্রের সেই দুর্ণামকেই সমর্থন করে।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে আমরা কী দেখি? বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাসাহিত্যে? যেখানে তিনি যথার্থ সাহিত্যসমালোচনা করছেন সেখানে তাঁর চেহারাই আলাদা। বাহ্য বাগাড়ম্বরে না ভুলে' ভিতরের দিকে তাকালেই দেখতে পাবো, বঙ্কিমচন্দ্রের সব সমালোচনাই অভ্রান্তভাবে মূল রচনার সাহিত্যিক মূল্যের সন্ধান, কোনো সমালোচনাই খাঁটি নীতিবাদীর সমালোচনা নয়—সুনীতি-দুর্নীতি দিয়ে তিনি কখনোই সাহিত্যবিচার করেন নি। এমন কি, ক্ষেত্রবিশেষে, তথাকথিত অশ্লীলতাকে বা রুচির দোষকে, ঠিক সমর্থন নয় বটে, কিন্তু সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা ও ব্যাখ্যা করেছেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে ঈশ্বরগুপ্ত ও দীনবন্ধু সংক্রান্ত তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ দুটির কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি।

/সাহিত্যতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র চিত্তশুদ্ধিবাদী, অথবা বলতে পারি কল্যাণবাদী। মাঝে মাঝে অবশ্য তিনি কল্যাণ ও আনন্দ এই দ্বৈত আদর্শের কথাও বলেছেন। এটা কারো অজানা নয় যে, আনন্দের কথা মুখে বললেও, তত্ত্বের ক্ষেত্রে তাঁর মেজাজটা কল্যাণবাদীর মেজাজ—সোজাসুজি বলতে গেলে নীতিবাদীরই মেজাজ। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে? কার্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র এর প্রায়

বিপরীতপন্থী। অপরপক্ষে, সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি আনন্দবাদী, আপোষহীন অপ্রয়োজনবাদী। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে? সমালোচনার ক্ষেত্রে এর প্রায় বিপরীত জিনিসই দেখতে পাই। সেখানে দেখি, রবীন্দ্রনাথের অনেক সমালোচনাই রীতিমতো নীতি-সচেতন সমালোচনা, রীতিমতো নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সাহিত্যসমালোচনা। সংকীর্ণ অর্থে সেই নীতিকে নীতিশাস্ত্রের বিধি বললে হয়তো ভুল হবে, কিন্তু তাকে গভীর অর্থে জীবন-নীতি বললে একটুও ভুল হবে না। যেমন 'প্রাচীন সাহিত্যে'র একাধিক সমালোচনা।

সমালোচনা যে বিজ্ঞানধর্মী ব্যাপার, এমন কথা বঙ্কিমচন্দ্র মুখে কখনোই স্পষ্ট ক'রে বলেন নি। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর মন অনেকটা বৈজ্ঞানিকের মনের মতোই তথ্যসন্ধানী—এবং ব্যাখ্যাপ্রবণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, মূল্যায়নের কারণে তথ্যসন্ধান আর খাঁটি বৈজ্ঞানিক তথ্যসন্ধান পৃথক্ ধরনের কাজ। যতোই অনুসন্ধানী হোন, যতোই ব্যাখ্যাপ্রবণ হোন, শেষ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র মূল্যায়নে বিশ্বাসী। যিনিই মূল্যায়নে বিশ্বাসী, তথ্যানুসন্ধান এবং তথ্যব্যাখ্যা কখনোই তাঁর সমালোচনা শেষ কথা পারে না।

সাহিত্যব্যাখ্যার কালে অনেক সময় বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক বা সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যব্যাখ্যার পথে অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু কতো দূর? সেইটেই প্রশ্ন।

সাহিত্যতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করেন, সকলই নিয়মের ফল, সাহিত্যও তাই। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি বস্তুবাদী। সাহিত্য যদি সত্যিই বাস্তব ঘটনার, বাস্তব কার্যকারণের ফল হয়, সাহিত্য যদি সত্যিই বস্তুজগতের নিয়মশৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়, সাহিত্য যদি সত্যিই দেশকালের দ্বারা, সমাজশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, তাহ'লে শুধু ব্যাখ্যাবাদী কেন, সকল সমালোচকেরই অন্যতম প্রধান কাজ এই নিয়ন্ত্রণের গতি-প্রকৃতি আবিষ্কার করা। তেইন্ প্রমুখ ঊনবিংশ শতকের পাশ্চাত্য সাহিত্যসমালোচকেরা অনেকেই এই পথের পথিক। তত্ত্বগতভাবে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও এই পথের কথা জোর দিয়ে বলেছেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি নিজে এই পথে খুব বেশি দূর অগ্রসর হন নি।

বরং রবীন্দ্রনাথ, যিনি সাহিত্যকে মুক্ত আনন্দ বলে' জানেন, যিনি

সাহিত্যের ঐতিহাসিকতার সম্পর্কে বার বার অনাস্থা জ্ঞাপন করেছেন, সাহিত্য যে ইতিহাসের দ্বারা বা সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে, তত্ত্বের ক্ষেত্রে এ-কথা যিনি কিছুতেই বিশ্বাস করতে ইচ্ছুক নন—সেই রবীন্দ্রনাথই কিন্তু বঙ্কিম-প্রস্তাবিত পথে বঙ্কিমচন্দ্রকে ছাড়িয়ে অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর কবিগান সম্পর্কিত আলোচনা, গ্রাম্যসাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, তাঁর বাংলাসাহিত্যের ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনা, তাঁর রামায়ণ-ব্যাখ্যা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। বলা নিষ্প্রয়োজন, রবীন্দ্রনাথের অনেক সমালোচনাই খাঁটি নান্দনিক সমালোচনা। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে রবীন্দ্রনাথ যেমন বিনা দ্বিধায় নান্দনিকের সীমানাকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্র তেমন কখনোই যান নি।

২

সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র যে সমালোচনা-প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন সেগুলি ছাড়া তাঁর সমস্ত উল্লেখযোগ্য সমালোচনাই বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। বস্তুত বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭২) 'উত্তরচরিত'-এর প্রথম কিস্তি থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচক-জীবনের সূত্রপাত।

কেবল ব্যবহারিক সমালোচনাকেই যদি ধরি, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা-প্রবন্ধের সংখ্যা মোট দশ-বারোটির বেশি হবে না। বঙ্গদর্শনের কয়েকটি গ্রন্থসমালোচনা পরে পুস্তক প্রকাশের কালে বর্জিত হয়েছে, কয়েকটি রূপান্তরিতও হয়েছে। সেগুলো ধরলে এই সংখ্যা বেড়ে সতেরো-আঠারোর কাছাকাছি দাঁড়াবে।

সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র যে চারটি প্রবন্ধ রচনা করেছেন, কালের দিক থেকে এগুলি বঙ্গদর্শন-আমলের অনেক পরবর্তী। এগুলি বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচকজীবনের একেবারে শেষের দিকের রচনা। এর মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধটিতে সমালোচনা নেই বললেই চলে, বাকি তিনটিই খাঁটি সাহিত্যসমালোচনা। এই তিনটির মধ্যে একটি—'বাঙ্গালা

সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্র'—জীবনীভিত্তিক সমালোচনা নয়। অপর দুটির একটি ঈশ্বরগুপ্ত বিষয়ে এবং দ্বিতীয়টি দীনবন্ধু মিত্র বিষয়ে। এই দুই প্রবন্ধই জীবনীভিত্তিক সাহিত্যসমালোচনা। দুটি প্রবন্ধই বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা-সাহিত্যের দুটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন।

এইবারে বাকি প্রবন্ধের—অর্থাৎ বঙ্গদর্শন আমলের প্রবন্ধের কথা। এর মধ্যে তিনটি প্রবন্ধ প্রাচীনসাহিত্য বিষয়ক। এক, 'উত্তরচরিত', দুই, 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' এবং তৃতীয় হ'লো 'দ্রৌপদী—প্রথম প্রস্তাব'। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটিকে প্রাচীনসাহিত্য বিষয়ক বলে' গণ্য করায় কিছু বাধা আছে। প্রথমত কবিদ্বয় যথেষ্ট পরিমাণে প্রাচীন নন, শেক্‌স্‌পীয়ারের তুলনায় প্রাচীন হ'লেও, ব্যাস বা কালিদাস বা ভবভূতির তুলনায় নিতান্তই অর্বাচীন। দ্বিতীয় বাধা এই যে, প্রবন্ধটি মূলত মানস বিকাশ নামে একটি আধুনিক কাব্যের সমালোচনা হিসেবেই প্রকাশিত হয়েছিল। বিদ্যাপতি বা জয়দেব এ-প্রবন্ধে দৃষ্টান্ত মাত্র।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন সাহিত্যের সমালোচনা, যা বঙ্গদর্শনে গ্রন্থ-সমালোচনা নামে প্রকাশিত হয়েছিল, তার অধিকাংশই ১৮৮৭-এ প্রকাশিত 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে পরিত্যক্ত হয়। উল্লেখযোগ্য তিনটি গ্রন্থসমালোচনা তাদের নাম, রূপ এবং চরিত্র পরিবর্তিত ক'রে 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থে স্থান পায়। নবীনচন্দ্রের অবকাশরঞ্জিনী কাব্যের সমালোচনা 'অবকাশরঞ্জিনী' (বঙ্গদর্শন ১২৮০ বৈশাখ), রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের দানবদলন কাব্যের সমালোচনা 'দানবদলন কাব্য' (বঙ্গদর্শন, ১২৮০ জ্যৈষ্ঠ) এবং দীনেশচরণ বসুর মানসবিকাশ কাব্যের সমালোচনা 'মানস বিকাশ' (বঙ্গদর্শন, ১২৮০ পৌষ), এই তিনটি প্রবন্ধ থেকে সমালোচনা-অংশ ছাঁটাই ক'রে তত্ত্ব-অংশ রেখে বঙ্কিমচন্দ্র এদের যথাক্রমে 'গীতিকাব্য', 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত' এবং 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' নামে 'বিবিধ প্রবন্ধে' প্রকাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের গ্রহণ-বর্জনকে মূল্য দিলে—যখন দেখি, 'বৃত্রসংহার', 'পলাশির যুদ্ধ', 'কল্পতরু', 'ঋতুবর্ণন', 'কিঞ্চিৎ জলযোগ', সবই 'বিবিধ প্রবন্ধে' পরিত্যক্ত হয়েছে—যখন দেখি বঙ্গদর্শন-আমলের কোনো সমকালীন সাহিত্য-সমালোচনাই বঙ্কিমচন্দ্রের মনোনীত নয়, তখন বলতেই হবে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের

সমকালীন সাহিত্যসমালোচনার পরিসর অত্যন্ত শীর্ণ। সম্পাদিত গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে রচিত ঈশ্বরগুপ্ত, প্যারীচাঁদ, দীনবন্ধু, এই তিন জনের বিষয়ে তিনটি প্রবন্ধের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ।

এ-কথা বুঝতে খুব হিসেব করার প্রয়োজন হয় না যে, সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্রের খ্যাতির ভিত্তি পরিমাণ হয়, নিছক গুণ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচক হিসেবে প্রতিষ্ঠার প্রধান অবলম্বন মাত্র পাঁচটি প্রবন্ধ। ঈশ্বরগুপ্ত, প্যারীচাঁদ, দীনবন্ধু, এই তিনজনকে নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ এবং 'উত্তরচরিত' আর 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসদিমোনা', এই দুটি প্রবন্ধ।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনা-জাতীয় রচনার তালিকাতে আরো দুটি বিশেষ ধরনের রচনার কথা উল্লেখ করা দরকার। একটি হ'লো 'Bengali Literature' নামে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকাতে (১৮৭১, নং ১০৪) প্রকাশিত দীর্ঘ ইংরেজি প্রবন্ধ। ইংরেজী বলে' তা আমাদের বিষয়-পরিধির বাইরে। দ্বিতীয় 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থ। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' গ্রন্থের বঙ্কিমচন্দ্রকৃত যে-সমালোচনাটি 'কৃষ্ণচরিত্র' নামে বঙ্গদর্শন পত্রিকায় (১২৮১ চৈত্র) প্রকাশিত হয়েছিল, সেই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটি এখানে আমাদের উদ্দিষ্ট নয়। এখানে আমাদের উদ্দিষ্ট বঙ্কিম-মনীষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি মহাগ্রন্থ 'কৃষ্ণচরিত্র'। এ-কথা সত্য যে, 'কৃষ্ণচরিত্র' ঠিক সাহিত্য-সমালোচনার গ্রন্থ নয়, বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক গবেষণা বা ইতিহাস-সমালোচনা হিসেবেই দেখেছেন। আমরাও গ্রন্থটিকে আমাদের বিষয়-পরিধির অন্তর্ভূ'ত করি নি। মানতেই হবে যে, মহাভারতের সাহিত্যগত দিকটি এ-গ্রন্থে আদৌ বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু সাহিত্যের যে-ধরনের তথ্যাশ্রিত ব্যাখ্যামূলক সমালোচনা আজকাল সুদূর পশ্চিমের বিশ্ববিদ্যালয় মহলে সুসমাদৃত, সেই জাতের সাহিত্যসমালোচনা 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে নিতান্ত কম নেই। মনে রাখতে হবে যে, যিনি যুগপৎ ইতিহাস-গবেষক এবং দক্ষ সাহিত্যসমালোচক, এমন ব্যক্তি ছাড়া কারো পক্ষেই 'কৃষ্ণচরিত্রে'র মতো গ্রন্থরচনা সম্ভব ছিল না।

বঙ্গদর্শনের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধটিও অবশ্য নানা কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বস্তুত, এই বীজ থেকেই 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের জন্ম। প্রবন্ধটিকে খাঁটি

সাহিত্যসমালোচনা বলা চলে না। তবে, বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের এবং তাঁর সমালোচনাতত্ত্বের একটি মূল সূত্র এখানে পরিচ্ছন্নভাবে পুনরুক্ত হয়েছে। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে আভাসে এবং 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে স্পষ্টভাবে এই সূত্রের সাক্ষাৎ আমরা এর পূর্বেই পেয়েছি। এ হ'লো ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক সমালোচনার একেবারে গোড়াকার প্রত্যয়। এর মধ্যে দিয়ে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের তথ্যাশ্রয়ী, এম্‌পিরিসিস্ট মনের, তাঁর প্রত্যক্ষবাদী, বিজ্ঞানমুখী মনের বিশিষ্ট প্রবণতার পরিচয় পেতে পারি।

'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধের প্রারম্ভেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে মানসবিকাশের সমালোচনায় কথিত হইয়াছে যে, যেমন অন্যান্য ভৌতিক, আধ্যাত্মিক বা সামাজিক ব্যাপার নৈসর্গিক নিয়মের ফল, কাব্যও তদ্রূপ। দেশভেদে ও কালভেদে কাব্যের প্রকৃতিগত প্রভেদ জন্মে। ভারতীয় সমাজের যে অবস্থার উক্তি রামায়ণ, মহাভারত সে অবস্থার নহে। মহাভারত যে অবস্থার উক্তি, কালিদাসাদির কাব্য সে অবস্থার নহে...বঙ্গীয় গীতিকাব্য, বঙ্গীয় সমাজের কোমল প্রকৃতি, নিশ্চেষ্টতা এবং গৃহসুখনিরতির ফল।'[৩]

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন, মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্র, শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণচরিত্র, জয়দেবের কৃষ্ণচরিত্র, বিদ্যাপতি ও তদনুবর্তী বৈষ্ণব কবিদের কৃষ্ণচরিত্র—এই সব কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে প্রভেদ আছে কি না। যদি থাকে, তো সে প্রভেদ কী? 'যাহা প্রভেদ বলিয়া দেখা যায়, তাহার কি কিছু কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে? সে প্রভেদের সঙ্গে, সামাজিক অবস্থার কি কিছু সম্বন্ধ আছে?'[৪]

এ প্রশ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের উত্তর সকলেরই সুবিদিত। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের সমাজগত কার্যকারণে—মূলত বস্তুগত কার্যকারণে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করেন, সাহিত্যও নৈসর্গিক নিয়মের ফল। বিখ্যাত ফরাসী সমালোচক তেইন্‌-এর পরিবেশতত্ত্বের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমতের সুগভীর মিলের কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন। তেইন্‌-প্রমুখ যে-সব সমালোচক সাহিত্যের বস্তুভিত্তিক ঐতিহাসিকতায় গভীরভাবে আস্থাশীল, তাঁদের মতের সঙ্গে

৩. বঙ্গদর্শন, ১২৮১ চৈত্র, পৃ ৫৪৭-৫৪

৪. তদেব

বঙ্কিমচন্দ্রের মতের মিলের কথাটা অস্বীকার করি না। কিন্তু একটা জায়গায় যে তাৎপর্যপূর্ণ একটা পার্থক্যও আছে, সে সম্বন্ধেও আমাদের অবহিত থাকা প্রয়োজন। সে পার্থক্য লেখকের ব্যক্তিস্বভাবের বৈশিষ্ট্যকে নিয়ে। তেইন্ সাহিত্যের গতি-প্রকৃতির ক্ষেত্রে তিনটি শক্তির উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন ঃ জাতি, সামাজিক বা গোষ্ঠীগত পরিমণ্ডল এবং কাল (race, milieu, and moment)। স্রষ্টা নিজে এই ত্রিশক্তির টানা-পোড়েনেরই ফল, সে নিজে কোনো স্বতন্ত্র শক্তি নয়। তেইন্ সামাজিক ভাবপরিমণ্ডলের কথা বলেছেন, moral temperature এর উপর জোর দিয়েছেন, কিন্তু তিনি স্রষ্টার আত্মস্বভাবের স্বাতন্ত্র্যের দিকটা, ব্যক্তিমনের হিসেব-হারা রহস্যের দিকটা উপেক্ষা করেছেন। তিনি মানুষের বন্ধনের দিকটাই মাত্র দেখেছেন, মুক্তির দিকটা দেখেন নি। বঙ্কিমচন্দ্র তা করেন নি। বিভিন্ন কৃষ্ণচরিত্রের প্রভেদের প্রসঙ্গে তিনি সামাজিক অবস্থার ভিন্নতার কথা বলেছেন, কিন্তু সেই সঙ্গে স্রষ্টার আত্মস্বভাবের স্বাতন্ত্র্যের কথাও সমান জোর দিয়েই বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'প্রথমে বক্তব্য, প্রভেদ থাকিলেই তাহা যে সামাজিক অবস্থাভেদের ফল, আর কিছু নহে, ইহা বিবেচনা করা অকর্তব্য। কাব্যে কাব্যে প্রভেদ নানাপ্রকারে ঘটে। যিনি কবিতা লিখেন, তিনি, জাতীয় চরিত্রের অধীন; সামাজিক বলের অধীন; এবং আত্মস্বভাবের অধীন। তিনটিই তাঁহার কাব্যে ব্যক্ত হইবে। ভারতবর্ষীয় কবি মাত্রেরই কতকগুলিন বিশেষ দোষ গুণ আছে যাহা ইউরোপীয় বা পারসিক ইত্যাদি জাতীয় কবির কাব্যে অপ্রাপ্য। সেগুলি তাহাদিগের জাতীয় দোষ গুণ। প্রাচীন কবি মাত্রেরই কতকগুলি দোষ গুণ আছে যাহা আধুনিক কবিতে অপ্রাপ্য। সেইগুলি তাঁহাদিগের সাময়িক লক্ষণ। আর কবি মাত্রের শক্তির তারতম্য এবং বৈচিত্র্য আছে। সেগুলি তাঁহাদিগের নিজগুণ।

'অতএব, কাব্যবৈচিত্র্যের তিনটি কারণ—জাতীয়তা, সাময়িকতা, এবং স্বাতন্ত্র্য। যদি চারি জন কবি কর্তৃক গীত কৃষ্ণচরিত্রে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারই থাকিবার সম্ভাবনা।'[৫]

---

৫. তদেব

বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের ঐতিহাসিক এবং বস্তুবাদী ব্যাখ্যায় বিশ্বাসী, কিন্তু সে-ঐতিহাসিকতা গোঁড়া জড়বাদীর ঐতিহাসিকতা নয়, সে-বস্তুবাদ যান্ত্রিক বস্তুবাদ নয়। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাস করেন যে, সাহিত্য নিয়মের ফল। কিন্তু সে-নিয়ম যথেষ্ট বিস্তৃত, যথেষ্ট উদার, তার মধ্যে শিল্পীর আত্মস্বভাবের স্বাধীনতার অবকাশ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, মানুষের মন নিয়মের অধীন, কিন্তু সে-নিয়ম যন্ত্রের নিয়ম নয়, জড়বস্তুর নিয়ম নয়। শিল্পীর আত্মস্বভাব কেবল তার স্বভাবের, তার অন্তঃপ্রকৃতির নিয়মেরই অধীন। সাহিত্যরচনা বৃষ্টিপাত বা ভূমিকম্পের মতো সংকীর্ণ ও যান্ত্রিক অর্থে নৈসর্গিক ঘটনা নয়। সাহিত্য জড়বস্তু নয়। তা-ই যদি হ'তো, তাহ'লে সাহিত্যের ভালোমন্দে রচয়িতার খ্যাতি-অখ্যাতির কিছু থাকতো না। সাহিত্য যদি নিছক জড়-পদার্থই হ'তো, তাহ'লে তার পরিমাণগত বিচার ছাড়া, মাত্রাগত মাপজোক ছাড়া আর কোনো রকম বিচার সম্ভব হ'তো না। সাহিত্য গূঢ় অর্থে নৈসর্গিক নিয়মের অধীন হতে পারে, কিন্তু সে-নিসর্গের সবটাই যন্ত্র নয়, তার মধ্যে মনেরও স্থান আছে, তার মধ্যে শিল্পীর আত্মস্বভাবের আপন নিয়মেরও অবকাশ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র জানেন, সাহিত্য সর্বতোভাবে বাইরের নিয়ন্ত্রণের অধীন নয়। যা সর্বতোভাবে বাইরের নিয়মের, বাইরের নিয়ন্ত্রণের অধীন, তার সমালোচনা অর্থহীন। আমরা বৃষ্টিপাত বা ভূমিকম্পের সমালোচনা করি না। বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসমালোচনাকে, সাহিত্যবিচারকে কখনোই অর্থহীন বলে' মনে করেন নি। লীলাবাদী সাহিত্যতাত্ত্বিক সাহিত্যকে পুরোপুরিই শিল্পীর আত্মস্বভাবের লীলা বলে' মনে করেন, সাহিত্যকে সম্পূর্ণভাবে দেশকালের ঊর্ধ্বে বলে' মনে করেন। বঙ্কিমচন্দ্র তা মনে করেন না। খাঁটি জড়বাদীরা শিল্পীর আত্মস্বভাবের অধিকারকে মানেন না; খাঁটি লীলাবাদীরা দেশকালের অধিকারকে, ইতিহাসের অধিকারকে স্বীকার করেন না। বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ের অধিকারকেই স্বীকার করেন। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র যান্ত্রিক-জড়বাদী অপেক্ষা বরং মার্ক্‌সবাদীদেরই বেশি সন্নিকটবর্তী। অবশ্য এ কথা মানতে হবে যে, তুলনায় নিকটতর হ'লেও কার্যত খুব নিকট নয়। আসল দূরত্ব শ্রেণী-সংগ্রামের তত্ত্বে।

৩

আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প (বঙ্গদর্শন, ১২৮১ভাদ্র) প্রবন্ধটি শ্যামাচরণ শ্রীমাণির 'সূক্ষ্ম শিল্পের উৎপত্তি ও আর্যজাতির শিল্পচাতুরী-'র সমালোচনা উপলক্ষে রচিত। সূক্ষ্ম শিল্প অর্থ এখানে Fine Arts, বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় সৌন্দর্য-জনিকা বিদ্যা। এ-প্রবন্ধে সমালোচনা কিছুই নাই, আছে বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পতত্ত্ব বা Theory of Fine Arts—বিশিষ্ট অর্থে একে সৌন্দর্যতত্ত্ব বা নন্দনতত্ত্বও বলা যায়।

বিষয়টি বাংলাসাহিত্যে নতুন। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যবহারিক সমালোচনার সঙ্গে এর কোনো যোগ নেই। তা হ'লেও একটি সংক্ষিপ্ত অংশ এখানে উদ্ধারযোগ্য।—

'অতএব সৌন্দর্য সৃজনের জন্য এই কয়টি সামগ্রী—বর্ণ, আকার, গতি, রব ও অর্থযুক্ত বাক্য।

'যে সৌন্দর্যজননী বিদ্যার বর্ণমাত্র অবলম্বন, তাহাকে চিত্রবিদ্যা কহে।

'যে বিদ্যার অবলম্বন আকার, তাহা দ্বিবিধ। জড়ের আকৃতিসৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম স্থাপত্য : চেতন বা উদ্ভিদের সৌন্দর্য যে বিদ্যার উদ্দেশ্য, তাহার নাম ভাস্কর্য।

'যে সৌন্দর্যজনিকা বিদ্যার সিদ্ধি গতির দ্বারা, তাহার নাম নৃত্য।

'রব যাহার অবলম্বন, সে বিদ্যার নাম সঙ্গীত।

'বাক্য যাহার অবলম্বন, তাহার নাম কাব্য।'[৬]

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বঙ্কিমচন্দ্র-নির্দেশিত শিল্পের এই শ্রেণীবিভাগ সম্পূর্ণভাবে এ্যারিস্টট্‌ল-অনুসারী। এ-ও সর্বজনবিদিত যে, এই ধরণের বিশ্লেষণ, সূক্ষ্ম শ্রেণীবিভাগ ও নিপুণ প্রভেদ-নির্দেশই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের সত্যিকারের শক্তির দিক।

'কিঞ্চিৎ জলযোগ'-এর (বঙ্গদর্শন, ১২৭৯চৈত্র) সমালোচনা হিসেবে খ্যাতি থাকবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এই ক্ষুদ্রকায় রচনাটির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র

৬. বিবিধ প্রবন্ধ, ৫৯-৬০

প্রহসন সম্পর্কে, সাহিত্যে ব্যঙ্গের স্থান ও ক্ষেত্র সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছেন তা অত্যন্ত মূল্যবান। তিনি বলেছেন, '…পুণ্য, পাপ, বা ভ্রান্তি, কেহই ব্যঙ্গের যোগ্য নহে। পুণ্য প্রতিষ্ঠার যোগ্য, তৎপ্রতি ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য। পাপ, ভর্ৎসনা, দণ্ড, বা শোচনার যোগ্য, তৎপ্রতিও ব্যঙ্গ অপ্রযুজ্য।…তদ্রূপ, ভ্রান্তিও ব্যঙ্গের যোগ্য নহে—উপদেশ তৎপ্রতি প্রযুজ্য।

'নিষ্ফল ক্রিয়ার প্রতি অবস্থাবিশেষে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। ক্রিয়া যে নিষ্ফল হয়, তাহার সচরাচর কারণ এই যে উদ্দেশ্যের সহিত অনুষ্ঠানের সঙ্গতি থাকে না। যেখানে অনুষ্ঠানে উদ্দেশ্যে অসঙ্গত, সেইখানে ব্যঙ্গ প্রযুজ্য। বাঙ্গালার কথার অপ্রতুল হেতু ইহাকেও প্রমাদ বলিতে হয়, কিন্তু প্রথমোক্ত ভ্রান্তির সহিত ইহার বিশেষ প্রভেদ আছে। ইংরাজি ভাষায় দুইটির জন্য পৃথক্ পৃথক্ নাম আছে। একটিকে Error বলে, আর একটিকে Mistake বলে। Error ব্যঙ্গের যোগ্য নহে, Mistake ব্যঙ্গের যোগ্য।

'ক্রিয়া সম্বন্ধে যেরূপ, ক্রিয়ার অপরিণত মনের ভাব সম্বন্ধেও সেইরূপ। …যে চিত্তবৃত্তি হইতে প্রমাদ জন্মে, তাহা ব্যঙ্গের যোগ্য।…Mistake যেরূপ ব্যঙ্গের যোগ্য, Folly-ও তদ্রূপ।'[৭]

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই চিন্তাধারা এবং এই পরিচ্ছন্ন বিশ্লেষণ পাঠকমাত্রকেই এ্যারিস্টট্‌লের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে।

'বৃত্রসংহার' ও 'পলাশির যুদ্ধ', এই প্রবন্ধ দুটি গ্রন্থে পরিত্যক্ত হ'লেও সমকালীন সমালোচনার নিদর্শন বলেই আমাদের বিশেষ কৌতূহলের স্থল। যিনি কেবল সমালোচকই নন, যিনি নিজে সৃজনশীল শিল্পী, যিনি শিল্পী হিসেবে নিজের কালের শিল্পীসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, তাঁর পক্ষে সমকালীন সাহিত্যের নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষ বিচার অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিশেষত যেখানে নিরাসক্ত ও নিরপেক্ষ সাহিত্যবিচারের কোনো ঐতিহ্য গড়ে' ওঠে নি, যেখানে নিন্দা প্রায়ই অপ্রিয়সত্যকথনের ছদ্মবেশ ধারণ করে এবং অপ্রিয়সত্য সব সময়ই নিন্দা বলে' গণ্য হয়। তাছাড়া সমকালের সাহিত্যরুচির নিজস্ব কুহকও কিছু কম বিভ্রম ছড়ায় না। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো

৭. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী বিবিধ, ৩১৫

বিবিক্ত স্থিতধী সমালোচকও এই বিভ্রমের হাত সম্পূর্ণ এড়াতে পারেন নি। উদাহরণ স্বরূপ 'বৃত্রসংহার' এবং 'পলাশির যুদ্ধ' প্রবন্ধ দুটির—এবং হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের অতি-প্রশংসার উল্লেখ করা যেতে পারে। 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রকাশিত হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যিনি উক্ত কাব্যগ্রন্থের তরুণ কবিকে নতুন কালের নতুন প্রতিভা বলে' তাঁর গলায় মালা পরিয়ে দিতে পেরেছিলেন, তাঁর রসবোধ ও সাহিত্যিক দূরদৃষ্টি প্রশ্নাতীত। ভাবলে অবাক হতে হয়, কেমন ক'রে তিনি হেমচন্দ্রের উচ্চপ্রশংসায় মুখর হয়ে উঠতে পারেন, নবীনচন্দ্রকে বায়রনের সঙ্গে তুলনা ক'রে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে পারেন!

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাচীনসাহিত্য সমালোচনার প্রথম প্রবন্ধ 'উত্তরচরিত' বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় থেকে ষষ্ঠ সংখ্যায় (১২৭৯ জ্যৈষ্ঠ—আশ্বিন) পাঁচ কিস্তিতে প্রকাশিত। প্রবন্ধটি ভবভূতির উত্তরচরিতের একটি বঙ্গানুবাদের সমালোচনা হিসেবে রচিত। তা হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধটি সম্পূর্ণভাবে ভবভূতির গ্রন্থেরই সমালোচনা, অনুবাদের গুণাগুণ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র প্রায় কিছুই বলেন নি।

বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত প্রবন্ধের প্রথম দিকের কিছু অংশ পরে বর্জিত হয়েছে। এই অংশে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে কিছু বক্রোক্তি আছে। বিদ্যাসাগর তাঁর 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে' ভবভূতিকে কবিত্বশক্তি অনুসারে কালিদাসের পরেই স্থান দেন নি। তাঁর বিবেচনায় ভবভূতির স্থান মাঘ, ভারবি, শ্রীহর্ষ ও বাণভট্টের পরে। এ সিদ্ধান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে মোটেই শ্রদ্ধেয় বলে মনে হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে কালিদাসের পরেই কবিত্বশক্তিতে ভবভূতির স্থান। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটি যুক্তি ও দৃষ্টান্ত সহযোগে ভবভূতির স্থান-নির্ণয়ের প্রয়াস।

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটির গঠন নির্দোষ নয়। বক্তব্য বিষয়ের তুলনায় প্রবন্ধটি অতিরিক্ত দীর্ঘ। মাঝে মাঝে সুদীর্ঘ সংস্কৃত উদ্ধৃতি সমালোচনার মসৃণ গতিতে বাধার কারণ ঘটিয়েছে। সাময়িক পত্রে কিস্তিতে কিস্তিতে প্রকাশিত হওয়ার জন্যেই হোক, অথবা অন্য যে-কোনো কারণেই হোক, প্রবন্ধটিতে সংহতি ও ঐক্যের অভাব লক্ষ করা যায়।

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধটিকে তিনটি স্বতন্ত্র ভাগে বিভক্ত করে নেওয়া যায়।

ভাগগুলির প্রত্যেকটির ভাবভূমি ও বিষয়বস্তু ভিন্ন। ভাবভূমির এই ভিন্নতাই বক্তব্য বিষয়কে নিবিড় ঐক্যে সংবদ্ধ হতে দেয় নি।

প্রবন্ধটির প্রথম ভাগ সুদীর্ঘ, গোটা প্রবন্ধের পাঁচ ভাগের চার ভাগ। এই অংশটিকে বলতে পারি পরিচয়মূলক—বিষয়ের পরিচয়, কাহিনীর পরিচয়, চরিত্রের পরিচয়—এবং বিশেষভাবে রসের পরিচয়, আস্বাদের পরিচয়। অঙ্কের পর অঙ্ক ধ'রে ধ'রে নাটকের ঘটনার বর্ণনা এবং এইভাবে ধাপে ধাপে সমগ্র কাহিনীর সংক্ষিপ্তসারের উপস্থাপনা। শুধু তাই নয়, রোমান্টিক সমালোচনায় অনেক সময় যেরকম হয়ে থাকে, ঘটনার ধারাবিবরণীর ফাঁকে ফাঁকে শিল্পসম্মতভাবে কাহিনীর অংশবিশেষের পুনর্গঠন, সুযোগ্য মঞ্চশিল্পীর মতো যথাযোগ্য আলোকসম্পাত, যথোপযোগী আবহসঞ্চার—মূল গ্রন্থের ভাবপরিমণ্ডলের পুনঃসংস্থাপন। সেই সঙ্গে এখানে ওখানে কিছু-কিছু ব্যাখ্যা, কিছু-কিছু বিশ্লেষণ। কাহিনীর পুনর্গঠনের কৌশলে, পাঠকের রসবোধকে উদ্দীপিত করার দক্ষতায় প্রবন্ধের এই অংশটি সার্থক রোমান্টিক সমালোচনার একটি সুন্দর নিদর্শন। কিন্তু সমগ্র প্রবন্ধ সম্বন্ধে সে-কথা বলা চলে না।

প্রবন্ধের দ্বিতীয় অংশটি আকারে মাঝারি। ভাবে এবং বক্তব্য বিষয়ে প্রথমাংশের সঙ্গে এই অংশ খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত নয়। এই অংশটি অনায়াসে স্বতন্ত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রবন্ধের বিষয় হতে পারতো। এই অংশটি বিশুদ্ধ সাহিত্যতত্ত্ব। ব্যবহারিক সমালোচনার পথে চলতে চলতে অকস্মাৎ সমালোচনা বন্ধ রেখে এইখানে এসে বঙ্কিমচন্দ্র যেন সম্পূর্ণ অভাবিতভাবে তত্ত্বের রাজ্যে গিয়ে প্রবেশ করলেন। তত্ত্ব অবান্তর নয়, কিন্তু তার মেজাজ এত পৃথক্‌, তার সুর এত ভিন্ন যে, উত্তরচরিতের রসগ্রাহী আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ একে সম্পূর্ণ এক ভিন্ন জগতের অধিবাসী বলে মনে হয়। প্রবন্ধের এই অংশে এসে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যের কয়েকটি গোড়াকার তত্ত্বমূলক প্রশ্নের মীমাংসায় ব্যাপৃত হয়েছেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য কী, সৃষ্টি কাকে বলে, সৌন্দর্যসৃজন ব্যাপারটা কী, সাহিত্য স্বভাবানুকারী না স্বভাবাতিরিক্ত, সাহিত্যের সঙ্গে নীতিশিক্ষা ও নীতিজ্ঞানের সম্পর্ক কী—এই সব মৌল প্রশ্নের হাতে-হাতে মীমাংসা ক'রে নিয়ে তারপর প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে পা বাড়াবেন, এই অংশের তত্ত্ব-মীমাংসাকে পরবর্তী অংশে সাহিত্য-

সমালোচনার সূত্র হিসেবে প্রয়োগ করবেন, এই হ'লো বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায়। এতে ক'রে প্রবন্ধের সুর যে বারবার কেটে যেতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্র যে-সম্বন্ধে খুব অবহিত ছিলেন না।

সাহিত্য যে একই সঙ্গে স্বভাবানুকারী এবং স্বভাবাতিরিক্ত, এবং যুগপৎ সৃষ্টিচাতুর্যসম্পন্ন এবং সৌন্দর্যবিশিষ্ট—বঙ্কিমচন্দ্রের এই আধা-ক্লাসিক আধা-রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গে এইখানেই আমাদের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জানান যে, 'কবিরা জগতের শিক্ষাদাতা।... তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন।'[৮] এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের জানান যে, 'সৃষ্টি-কৌশল কবির প্রধান গুণ। কবির আর একটি বিশেষ গুণ রসোদ্ভাবন।'[৯] —এই রসোদ্ভাবন কথাটির সূত্রে এইখানে এসে বঙ্কিমচন্দ্র হঠাৎ প্রাচীন রসবাদীদের সঙ্গে কিছু কলহেও প্রবৃত্ত হয়েছেন। ততোক্ষণ উত্তরচরিত সমালোচনা স্থগিত আছে।

'উত্তরচরিত' প্রবন্ধের তৃতীয় অংশটি ক্ষুদ্রতম। এই অংশে দ্বিতীয় অংশের সাহিত্যসূত্রের প্রয়োগ, এবং উত্তরচরিতের সামগ্রিক মূল্যবিচার। এই তৃতীয় অংশটিকেই বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রকৃত সমালোচনা' বলেছেন, প্রথম অংশকে বলেন নি। প্রথম অংশে তিনি 'পাঠকের সহিত আনুপূর্বিক নাটক পাঠ করিয়া যেখানে যেখানে ভাল লাগিয়াছে, তাহাই দেখাইয়া' দিয়েছেন।[১০] আমরা জানি, পাঠকের সঙ্গে ইচ্ছাসুখে আনন্দে সমালোচ্য বিষয়ের উপর পরিক্রমা করা, রোমান্টিক সমালোচনার এটি একটি অন্যতম প্রধান ধারা। যদিও বঙ্কিমচন্দ্র একে প্রকৃত সমালোচনা বলেন নি, তাহলেও প্রবন্ধের বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে বঙ্কিমচন্দ্র এই কাজই করেছেন এবং প্রবন্ধের এই প্রথমাংশটাই পাঠকের কাছেও সব থেকে উপভোগ্য।

প্রবন্ধের তৃতীয় অংশটি উত্তরচরিতের দোষগুণের তালিকা। প্রথমাংশের উপভোগ্য বিষয়-পরিক্রমা এবং দ্বিতীয় অংশের বিতর্কিত তত্ত্বালোচনার বদলে,

৮. বিবিধ প্রবন্ধ, ৪২

৯. তদেব, ৪৩

১০. তদেব, ৩৭

দ্রুত এবং সংক্ষিপ্ত মূল্যায়ন। এখানে আলোচনার পদ্ধতি প্রায় পুরোপুরিই ক্লাসিকপন্থী। এই অংশকেই বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রকৃত সমালোচনা' বলে ঘোষণা করেছেন। প্রথমাংশের শেষে তিনি বলেছেন যে, সমালোচ্য গ্রন্থকে খণ্ড খণ্ড ক'রে আলোচনা যথার্থ সমালোচনা নয়, সমগ্র গ্রন্থকে একসঙ্গে দেখা এবং দেখানো, এইটেই সমালোচকের আসল কাজ। তিনি বলেছেন, 'আমরা [এতক্ষণ—অর্থাৎ প্রথম অংশে] উত্তরচরিত নাটকের প্রকৃত সমালোচনা করি নাই।...গ্রন্থের প্রত্যেক অংশ পৃথক্ পৃথক্ করিয়া পাঠককে দেখাইয়াছি। এ রূপে গ্রন্থের প্রকৃত দোষগুণের ব্যাখ্যা হয় না।...যেমন অট্টালিকার সৌন্দর্য বুঝিতে গেলে সমুদয় অট্টালিকাটি এককালে দেখিতে হইবে, সাগরগৌরব অনুভূত করিতে হইলে তাহার অনন্তবিস্তার এককালে চক্ষে গ্রহণ করিতে হইবে, কাব্য নাটক সমালোচনাও সেইরূপ।'[১১] —সমগ্রকে দেখার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ ক'রেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমাংশের আলোচনা-রীতি পরিত্যাগ ক'রে তৃতীয়াংশে ভিন্নতর পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, কিন্তু উত্তরচরিত নাটককে সমগ্রভাবে দেখা তৃতীয়াংশেও সম্ভব হয় নি। মনে রাখতে হবে, গোটা নাটকটির গুণাগুণ সম্পর্কে পাইকারী উক্তি এক জিনিস আর গোটা নাটকটিকে তার রূপরসের সমগ্রতায় দেখা সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। সমগ্র নাটকের ভাব-গৌরব রূপ-গৌরব অর্থ-গৌরবকে একসঙ্গে অনুভব করার কথা মুখে বললেও এখানে তিনি কার্যত তা করেন নি, এখানে তিনি নিছক দোষগুণের তালিকাই রচনা করেছেন।

প্রবন্ধের গোড়ার দিকে কিছু ব্যাখ্যামূলক তুলনা আছে। যেমন, বাল্মীকির সঙ্গে ভবভূতির তুলনা, অথবা পূর্বসূরীদের সঙ্গে শেক্স্পীয়ারের যে-সম্পর্ক আর বাল্মীকির সঙ্গে ভবভূতির যে-সম্পর্ক, এই উভয় সম্পর্কের তুলনা। কালিদাসের সঙ্গেও তুলনা আছে। সেই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন 'কালিদাসের বর্ণনা তাঁহার অতুল উপমাপ্রয়োগের দ্বারা অত্যন্ত মনোহারিণী হয়। ভবভূতির উপমাপ্রয়োগ অতি বিরল...। কালিদাস, একটি একটি করিয়া বাছিয়া বাছিয়া সুন্দর সামগ্রীগুলি একত্রিত করেন ;...ভবভূতি বাছিয়া বাছিয়া

১১. তদেব, ৩৭-৩৯

মধুর সামগ্রী সকল একত্রিত করেন না; যাহা বর্ণনীয় বস্তুর প্রধানাংশ বলিয়া বোধ করেন, তাহাই অঙ্কিত করেন। দুই চারিটা স্থূল কথায় একটা চিত্র সমাপ্ত করেন—কালিদাসের ন্যায় কেবল বসিয়া বসিয়া তুলি ঘসেন না। কিন্তু সেই দুই চারিটা কথায় এমন একটু রস ঢালিয়া দেন যে, তাহাতে চিত্র অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, কখন মধুর, কখন ভয়ংকর, কখন বীভৎস হইয়া পড়ে। মধুরে কালিদাস অদ্বিতীয়—উৎকটে ভবভূতি।'[১২]

সাহিত্যের ঐতিহাসিক ও সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের আস্থার কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম সমালোচনাপ্রবন্ধেই সেই আস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। রামায়ণের নায়ক রামের সঙ্গে উত্তরচরিতের নায়ক রামের তুলনা ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, '...সর্বত্রই, রামায়ণের রামচন্দ্র হইতে ভবভূতির রামচন্দ্র অধিকতর কোমলপ্রকৃতির। ইহার এক কারণ এই, উভয় চরিত্র গ্রন্থ রচনার সময়োপযোগী। রামায়ণ প্রাচীন গ্রন্থ। কেহ কেহ বলেন যে, উত্তর কাণ্ড বাল্মীকিপ্রণীত নহে। তাহা হউক বা না হউক, ইহা যে প্রাচীন রচনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। তখন আর্যজাতি বীরজাতি ছিলেন। আর্যগণ রাজগণ বীরস্বভাবসম্পন্ন ছিলেন। রামায়ণের রাম মহাবীর, তাঁহার চরিত্র গাম্ভীর্য এবং ধৈর্যপরিপূর্ণ। ভবভূতি যৎকালে কবি—তখন ভারতবর্ষীয়েরা আর সে চরিত্রের নহেন; ভোগাকাঙ্ক্ষা, অলসাদির দ্বারা, তাঁহাদের চরিত্র কোমলপ্রকৃত হইয়াছিল। ভবভূতির রামচন্দ্রও সেইরূপ। তাঁহার চরিত্রে বীরলক্ষণ কিছুই নাই। গাম্ভীর্য এবং ধৈর্যের বিশেষ অভাব। তাঁহার অধীরতা দেখিয়া কখন কখন কাপুরুষ বলিয়া ঘৃণা হয়।...রামায়ণের রাম ক্ষত্রিয়, মহোজ্জ্বলকুলসম্ভূত, মহাতেজস্বী। তিনি পৌরাপবাদ শ্রবণে, ক্ষুদ্বিদ্ধ সিংহের ন্যায় রোষে দুঃখে গর্জন করিয়া উঠিলেন। ভবভূতির রামচন্দ্র তৎপরিবর্তে স্ত্রীলোকের মত পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিলেন।'[১৩]

ভবভূতির রামচরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই কঠোর মন্তব্য কতোদূর সমীচীন তা বিবেচনা ক'রে দেখবার মতো। কিন্তু তার পূর্বে সংশ্লিষ্ট আর

১২. তদেব, ৮
১৩. তদেব, ১০-১৪

একটি প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করি। ভবভূতির নাটকের তৃতীয় অঙ্কে জনস্থানে রাম ও ছায়ারূপিনী সীতার ক্ষণমিলন। এ অঙ্কটি রাম সীতার প্রেমের প্রগাঢ়তার একটি মর্মস্পর্শী চিত্র; সমস্ত অঙ্কটি বেদনায় মন্থর, অশ্রুবাষ্পে বিহ্বল। বঙ্কিমচন্দ্র এই অঙ্কের কাব্যগুণের প্রভূত প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও বলেছেন যে, এই তৃতীয় অঙ্কটি নাটকের পক্ষে নিতান্ত অনাবশ্যক, কেননা নাটকের মূল ব্যাপারের সঙ্গে—'নাটকের যাহা কার্য, বিসর্জনান্তে রাম সীতার পুনর্মিলন, তাহার সঙ্গে কোনো সংস্রব নাই।'১৪ বঙ্কিমের বক্তব্য এই যে, অঙ্কটি যদি কাব্যাংশে অত্যুৎকৃষ্ট না হ'তো, তাহ'লে নাটকমধ্যে এর সন্নিবেশ বিশেষ রসভঙ্গের কারণ হ'তো।

রামচরিত্র সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্তব্য করেছেন, তার সঙ্গে নাটকের তৃতীয় অঙ্ক সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির সূক্ষ্ম ভাবগত যোগ আছে। কিন্তু তৃতীয় অঙ্ক সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তি কতোদূর যথার্থ? সত্যি কি তৃতীয় অঙ্কটি নিতান্ত অনাবশ্যক? সমগ্র নাটকটির সম্বন্ধে যে-ধারণা বা যে-বোধের ভিত্তিতে এই ধরনের উক্তি করা যায়, সেই ধারণা, সেই বোধ কতোদূর যথাযথ?

তৃতীয় অঙ্কের মূল ভাবটি কী? স্বপ্ন ও জাগরণে জড়িত, স্মৃতি ও বাস্তবে মিশ্রিত এই মায়াময়, ছায়াময় বিহ্বল দৃশ্যের মূল রসটি কি বিপ্রলম্ভের রস নয়? সুগভীর প্রেম এবং গভীরতর বিরহ, প্রেম এবং প্রেমের অসহায়তার কারুণ্য, এই হ'লো এই অঙ্কের মূল সুর। শুধু তাই নয়, আরো একটু স্থানকাল-পরিবেশগত জটিলতাও আছে। বাসন্তীর সঙ্গে রামের সংক্ষিপ্ত কিন্তু ভাবগর্ভ কথোপকথন অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ অশুভ-শক্তির দিকেও অঙ্গুলিনির্দেশ করে। সে হ'লো জনশ্রুতি ও লোকাপবাদের শক্তি। এই অন্ধ মূঢ় নির্মম অশুভ-শক্তির সামনে বলশালী পুরুষও যে কতো দুর্বল, এর সামনে প্রেম যে কতো নিরুপায়, কতো অসহায়, এই ভাবটি তৃতীয় অঙ্কে সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। কিন্তু এই ভাব কি শুধু তৃতীয় অঙ্কেই সীমাবদ্ধ? তৃতীয় অঙ্কের এই ভাবটি কি নাটকের মূল ভাবের সঙ্গেই সঙ্গত নয়, তার সঙ্গেই গভীরভাবে যুক্ত নয়?

১৪. তদেব, ২৯

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, এ-নাটকের আসল বিষয়বস্তু, 'নাটকের যাহা কার্য' তা হ'লো রাম সীতার পুনর্মিলন। তাই যদি হয়, তাহলে তৃতীয় অঙ্ক নিশ্চয়ই অনাবশ্যক, নিশ্চয়ই তা নাটকের রসভঙ্গের কারণ। কিন্তু যদি প্রেম ও সমাজশক্তির বা লোকাপবাদ শক্তির দ্বন্দ্ব, অথবা প্রেম ও প্রজানুরঞ্জনকামনার দ্বন্দ্ব এবং তজ্জনিত বেদনাই এ-নাটকের আসল বিষয়বস্তু হয়, তাহ'লে তৃতীয় অঙ্কের গুরুত্ব অবশ্যস্বীকার্য।[১৫] প্রশ্ন এইখানেই। রামসীতার পুনর্মিলন, বঙ্কিমচন্দ্র যাকে নাটকের 'কার্য' বলেছেন, সেইটেই কি নাটকের কেন্দ্রস্থ ঘটনা, এর নাট্যিক শিখরচূড়া? পুনর্মিলনের প্রসন্ন পরিতৃপ্তিই কি উত্তরচরিত নাটকের অঙ্গীরস?

এখানে বিপ্রলম্ভ শৃঙ্গারের রস ও করুণ রসকে পৃথক্ করার উপায় নেই। মিলনের আনন্দ নয়, করুণে-বিপ্রলম্ভে মিলিত রসই এ-নাটকের অঙ্গীরস। বিদ্যাসাগর তাঁর 'সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যশাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাবে' বলেছেন যে, এ-নাটক করুণরসাশ্রিত। বঙ্কিমচন্দ্র কার্যত তা অস্বীকার করেন নি। তিনিও বলেছেন, 'রাম জানিতেন যে, তিনি প্রজারঞ্জনরূপ কুলধর্মের রক্ষার্থই সীতাবিসর্জনরূপ মর্মচ্ছেদী কার্য করিয়াছেন।'[১৬]—এখানে লোকাপবাদের প্রতিবিধান বা নিবৃত্তিই কুলধর্মের রূপ নিয়েছে। অর্থাৎ লোকাপবাদই কুলধর্মের দাবিকে নিষ্ঠুর করে তুলেছে, এরই কারণে পত্নীপ্রেমের সঙ্গে কুলধর্মের বিরোধ ঘটেছে। একদিকে প্রজারঞ্জন, বা কুলধর্ম বা লোকাপবাদ আর অন্যদিকে পত্নীপ্রেম, পরিণামে 'সীতাবিসর্জনরূপ মর্মচ্ছেদী কার্য,' এই হ'লো নাটকের নাট্যশক্তি—এর কারুণ্যই উত্তরচরিত নাটকের রসের উৎস। এ-কথা বঙ্কিমচন্দ্রের অগোচর নয়। সম্ভবত রামের যে অসহায় অবস্থা ভবভূতির নাট্যরসের আশ্রয়, আধুনিক সমালোচকের কাছে তা খুব অবধারিত ঠেকে নি, এর মধ্যে তিনি রামচরিত্রের কোনো মহিমা উপলব্ধি করতে পারেন নি। সম্ভবত রামচরিত্রের প্রতি সহানুভূতির অভাবের কারণেই তিনি ভবভূতির দৃষ্টির প্রতিও সহানুভূতিশীল হতে পারেন নি।

১৫. এই প্রসঙ্গে 'বাংলা সমালোচনা পরিচয়', ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, পৃঃ ৭৫—৭৭ দ্রষ্টব্য।

১৬. বিবিধ প্রবন্ধ, ২৬

সে যাই হোক, যে কারুণ্য উত্তরচরিতের অঙ্গীরস, তার সঙ্গে রাম সীতার পুনর্মিলনের সংযোগ যে খুব নিবড় নয়, অনিবার্য নয়, তা উত্তরচরিতের পাঠকমাত্রকেই স্বীকার করতে হবে। সকলেই জানেন, নাটকের বিষয়বস্তু ও অঙ্গীরস অচ্ছেদ্য, তারা পরস্পর পরস্পরকে সৃষ্টি করে, পুষ্ট করে, সত্য করে। যা অঙ্গীরসের অবলম্বন, তা-ই নাটকের আসল বিষয়বস্তু, নাটকের আসল 'কার্য।' সেই কারণেই—অর্থাৎ এ-নাটকের সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত বিরহ ও বেদনাবিহ্বলতার সঙ্গে অন্তিম পুনর্মিলন ঘটনার অনিবার্য যোগ নেই বলেই, পুনর্মিলন-ঘটনাটিকে উত্তর চরিতের নাট্যিক 'কার্য' বলে গ্রহণ করা যায় না। এ সম্বন্ধে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মন্তব্য বিশেষ প্রণিধান যোগ্য। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'বঙ্কিমচন্দ্র নাটকের সামগ্রিক তাৎপর্য উপলব্ধি করিতে পারেন নাই বলিয়াই দুর্মুখের সংবাদ শুনিয়া রাম যে বিলাপ করিয়াছেন, তৎসম্পর্কে এইরূপ টিপ্পনী করিয়াছেন 'ইহা আর্যবার্যপ্রতিম মহারাজ রামচন্দ্রের মুখ হইতে নির্গত না হইয়া, আধুনিক কোন বাঙ্গালি বাবুর মুখ হইতে নির্গত হইলে উপযুক্ত হইত।' '[১৭]

নাটকের রসসত্যের দিকে বা নাটকের সামগ্রিক তাৎপর্যের দিকে যদি বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ মনোযোগ থাকতো, তাহলে নাটকের অশ্রুবাষ্পসিক্ত ভাবপরিমণ্ডল নিয়ে তিনি ঠিক এ-ভাবে আ[...]ত্ত করতে পারতেন না। কিন্তু মনে হয়, তাঁর দৃষ্টি বাল্মীকির কাল ও ভবভূতির কাল, এই দুই কালের জীবন-পরিবেশগত পার্থক্যের দিকেই নিবদ্ধ, কেননা তাঁর মতে দুই রামচন্দ্রের আচরণের পার্থক্যের হেতু লেখকদ্বয়ের জীবন-পরিবেশের পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত। তাঁর ধারণা, ভবভূতির কালে ক্রন্দনপরায়ণ রামই অনিবার্য। বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র এই অনিবার্যতাকে খুব স্থূল এবং খুব যান্ত্রিক দৃষ্টিতেই দেখেছেন। ভবভূতির রাম কেন যে কয়েক শতাব্দী ডিঙিয়ে এসে আধুনিক বাঙালি বাবুর মতো হলেন, তার কিন্তু কোনো ব্যাখ্যা তিনি দেন নি।

নাটকের নিজেরই যে-একটা স্বতন্ত্র দাবি আছে, যাকে বলতে পারি নাটকের রসসত্যের দাবি, নাটকের পাত্র-পাত্রীর চরিত্র বা আচরণ যে এই

১৭. 'বাংলা সমালোচনা পরিচয়', ৭৭

দাবি মানতে বাধ্য—তারা যে রসপরতন্ত্র, নাট্যকারের সামাজিক পরিবেশের স্থূল সত্যটাই যে একমাত্র কথা নয়, এই কথাটি বঙ্কিমচন্দ্রের নজর এড়িয়ে গিয়েছে। সন্দেহ নেই যে, নাট্যকারের ভাবদৃষ্টির উপরেও, তাঁর রস-কল্পনার উপরেও তাঁর দেশকালের প্রভাব পড়তে পারে। কিন্তু সে-প্রভাব স্থূল নয়, অব্যবহিত নয়, মাঝখানে অনেকখানি ব্যবধান, গাছের মূলে আর ফুলে যেমন অনেকখানি ব্যবধান। তাছাড়া, সে-প্রভাব একান্তও নয়। দেশের প্রভাব, কালের প্রভাব যেমন সত্য, তেমনি কবির আত্মস্বভাবের প্রভাবও কিছু কম সত্য নয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে বকিমচন্দ্র নিজেই তো কবির আত্মস্বভাবের স্বাতন্ত্র্যের কথা জোর দিয়ে এবং পরিষ্কার ক'রে বলেছেন।

৪

'উত্তরচরিতে' তুলনা আছে বটে, কিন্তু তুলনা এর প্রধান কথা নয়, সমগ্রভাবে দেখলে একে তুলনামূলক সমালোচনা বলা চলে না। 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধটি (বঙ্গদর্শন, ১২৮২ বৈশখ, ১৮৭৫) সম্পূর্ণভাবেই তুলনামূলক। এ-তুলনার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য বিষয়ের ব্যাখ্যা এবং পরিচয়। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে এই ব্যাখ্যা এবং পরিচয়ের মধ্যেই বিচার অনুস্যূত আছে।

'উত্তরচরিতে'র সঙ্গে আরো একটা বড়ো ব্যাপারে এই প্রবন্ধের লক্ষণীয় পার্থক্য আছে। 'উত্তরচরিতে' নাটকের পাত্রপাত্রীর চরিত্র বা আচরণবৈশিষ্ট্যের হেতু হিসেবে নাট্যকারের কাল বা নাট্যকারের সমাজের কথা বলা হয়েছে। 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে দেশকালের সঙ্গে সঙ্গে কবিস্বভাবের স্বাতন্ত্র্যের কথাও বলা হয়েছে। এই প্রবন্ধে সাহিত্যবস্তুর বিশেষত্বের হেতু হিসেবে, পাত্রপাত্রীর চরিত্র বৈশিষ্ট্যের হেতু হিসেবে আর-একটি নতুন বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। তাকে বলতে পারি, সাহিত্যের গোত্রগত ধর্মের নিয়ন্ত্রণ, শ্রেণীগত বিশেষত্বের দাবির নিয়ন্ত্রণ। কথাটা একটু খুলে বলা দরকার।

সাহিত্যের মধ্যে মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি বিভিন্ন গোত্রের বা জাতিকুলের ভেদ আছে। এই জাতিগুলিকে বলা হয়

'literary kinds', সাহিত্যগত শ্রেণী। প্রত্যেক শ্রেণীর সাহিত্যবস্তুর—কী মহাকাব্য কী গীতিকাব্য কী নাটক—প্রত্যেকের নিজস্ব শ্রেণীগত চরিত্রধর্ম আছে, নিজস্ব রূপবৈশিষ্ট্য আছে, এবং সেই চরিত্রধর্ম ও রূপবৈশিষ্ট্যের নিজস্ব দাবিও আছে। নাটককে নাটকই হতে হবে, কাব্যকে কাব্যই। শুধু তাই নয়, নাটকের পাত্রপাত্রীকে নাটকের পাত্রপাত্রীই হতে হবে। কাব্যে যদি পাত্রপাত্রী থাকে, তাহ'লে তাদের কাব্যেরই পাত্রপাত্রী হতে হবে। এ দাবি সাহিত্যগত শ্রেণীর নিজস্ব চরিত্রধর্মের দাবি। সাহিত্যবস্তু এই দাবিকে লঙ্ঘন করতে পারে না। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রচয়িতার দেশকালের উপর জোর দিয়েছেন, 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র রচনার শ্রেণীগত চরিত্রধর্মের উপর জোর দিয়েছেন।

'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধটি তুলনামূলক। তুলনা নাটকে নাটকে ততোটা নয় যতোটা এই তিন নাটকের পাত্রীতে পাত্রীতে। পাত্রীদের মধ্যে শকুন্তলাই লক্ষ্য, শকুন্তলার চরিত্রকে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যেই তার সঙ্গে একবার টেম্পেস্টের মিরন্দার এবং একবার ওথেলোর দেস্‌দিমোনার তুলনা করা হয়েছে।

প্রবন্ধের প্রথমাংশে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, শকুন্তলার পরিবেশে—কালিদাসের পরিবেশ নয়—শকুন্তলার আশ্রম-পরিবেশে, যেখানে সমাজপ্রদত্ত সংস্কারের প্রবেশপথ উন্মুক্ত, সেখানে কালিদাস-অঙ্কিত লজ্জাশীলা অথচ ঈষৎ অগ্রগামিনী শকুন্তলাই স্বাভাবিক, আবার মিরন্দার পরিবেশে—বলা বাহুল্য শেক্‌স্‌পীয়ারের পরিবেশে নয়—মিরন্দার সমাজহীন দ্বীপ-পরিবেশে সংস্কারবিহীনা, লজ্জাহীনা, অথচ যে পবিত্রতা লজ্জার সারভাগ সেই পবিত্রতায় ভূষিতা মিরন্দাই স্বাভাবিক। স্বাভাবিক অর্থ এখানে সুসঙ্গত, প্রত্যাশিত, ঔচিত্যসম্পন্ন। এ-ঔচিত্য নাটকের ঔচিত্য, কিন্তু তলিয়ে দেখলে তা জগৎ-সংসারেরই ঔচিত্য, জীবনেরই ঔচিত্য। এর অর্থ শকুন্তলা এবং মিরন্দা উভয়েই বিশ্বাসযোগ্য, যথাযথ, সত্য—বলতে পারি, বাস্তব।

এই সমালোচনা যে মূলত জীবনের যথার্থ প্রতিকৃতির মানদণ্ড অনুসরণ ক'রে, অর্থাৎ মূলত অনুকরণবাদের সূত্র অনুসরণ ক'রেই অগ্রসর হয়েছে, তা বোধকরি উল্লেখ করাই বাহুল্য। তপোবনের শকুন্তলার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র

যেখানে রাজসভার শকুন্তলার তুলনা করেছেন, সেখানেও এই একই মানদণ্ড, একই সূত্র প্রযুক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, 'দুষ্মন্তের চরিত্র গৌরবে ক্ষুদ্র শকুন্তলা এখানে [কণ্বের তপোবনে] ঢাকা পড়িয়া গিয়াছে। ফার্দিনান্দ বা রোমিও ক্ষুদ্র ব্যক্তি, নায়িকার প্রায় সমবয়স্ক, প্রায় সমযোগ্য অকৃতকীর্তি —অপ্রথিতযশাঃ, কিন্তু সসাগরা পৃথিবীপতি মহেন্দ্রসখ দুষ্মন্তের কাছে শকুন্তলা কে?…এ প্রণয়সম্ভাষণ নহে—রাজক্রীড়া, পৃথিবীপতি কুঞ্জবনে বসিয়া সাধ করিয়া প্রেম করারূপ খেলা খেলিতে বসিয়াছেন; মত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শকুন্তলা-নলিনীকোরককে শুণ্ডে তুলিয়া, বনক্রীড়ার সাধ মিটাইতেছেন, নলিনী তাহাতে ফুটিবে কি?'[১৮] এই হ'লো তপোবনের শকুন্তলা। আর রাজসভায় শকুন্তলা? 'যখন শকুন্তলা সভাতলে পরিত্যক্তা, তখন শকুন্তলা পত্নী, মাতৃপদে আরোহণোদ্যতা, সুতরাং শকুন্তলা তখন রমণী; এখানে তপোবনে—তপস্বিকন্যা রাজপ্রসাদের অনুচিত অভিলাষিণী, —এখানে শকুন্তলা কে? করিশুণ্ডে পদ্মমাত্র।'[১৯]

এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি উক্তি করেছেন যা তাঁর সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যব্যাখ্যাকে, রচয়িতার দেশকাল ও বাস্তব জীবন-পরিবেশ দিয়ে সাহিত্যব্যাখ্যাকে অনেকখানি দুর্বল করে দেয়। তিনি বলেছেন, 'ক্ষুদ্রাশয় সমালোচকেরাই বুঝেন না যে, দেশভেদে বা কালভেদে কেবল বাহ্যভেদ হয় মাত্র; মনুষ্যহৃদয় সকল দেশেই সকল কালেই ভিতরে মনুষ্যহৃদয়ই থাকে।'[২০]

দেস্‌দিমোনার সঙ্গে শকুন্তলার তুলনার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি আর উভয় নায়িকার পরিবেশসাম্য বা পরিবেশভেদের দিকে নিবদ্ধ নয়। এখানে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ সাহিত্যবস্তুর—অভিজ্ঞান শকুন্তল ও ওথেলো নাটকের নিজ নিজ রূপ-রহস্যের দিকে, নিজ নিজ শ্রেণীগত চরিত্রধর্মের দিকে। প্রবন্ধের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেস্‌দিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।'[২১] শকুন্তলা কোথায় এবং কেন দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনীয় তা

১৮. বিবিধ প্রবন্ধ, ৮৪

১৯. তদেব

২০. তদেব

এরপর পরে, কোথায় এবং কেন শকুন্তলা দেস্‌দিমোনার সঙ্গে তুলনীয় নয়, বঙ্কিমচন্দ্র সেই দিকটিতে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এই দিকটিই সাহিত্যবস্তুর শ্রেণীগত চরিত্রধর্মের দিক। নাটক ও কাব্য যে কেবল রূপে নয়, অন্তশ্চরিত্রেও ভিন্ন—নাটকের পাত্রপাত্রী যে কাব্যের পাত্রপাত্রী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে চিত্রিত এবং এই ভিন্নতার উৎস যে দেশকালে নয়, কাব্য বা নাটকের নিজ নিজ শ্রেণীস্বভাবে, এইটেই এখানে প্রধান লক্ষণীয় বিষয়।—'... দেস্‌দিমোনা শকুন্তলায় তুলনীয় নহে। ভিন্ন জাতীয়ে তুলনীয়া নহে। ভিন্ন জাতীয় কেন বলিতেছি, তাহার কারণ আছে।

'ভারতবর্ষে যাহাকে নাটক বলে, ইউরোপে ঠিক তাহাকেই নাটক বলে না।... এমন অনেক কাব্য আছে—যাহা দৃশ্যকাব্যের আকারে প্রণীত, অথচ প্রকৃত নাটক নহে।...সেক্ষপীয়রের টেম্পেষ্ট এবং কালিদাসকৃত শকুন্তলা, সেই শ্রেণীর কাব্য, নাটকাকারে অত্যুৎকৃষ্ট উপাখ্যান কাব্য; কিন্তু নাটক নহে।... ইউরোপীয় সমালোচকদের মতে নাটকের যে সকল লক্ষণ, এই দুই নাটকে তাহা নাই। ওথেলো নাটকে তাহা প্রচুর পরিমাণে আছে। ওথেলো নাটক—শকুন্তলা এ হিসাবে উপাখ্যান কাব্য। ইহার ফল এই ঘটিয়াছে যে, দেস্‌দিমোনা চরিত্র যত পরিস্ফুট হইয়াছে—মিরন্দা বা শকুন্তলা তেমন হয় নাই। দেস্‌দিমোনা সজীব, শকুন্তলা ও মিরন্দা ধ্যানপ্রাপ্য।...

'শকুন্তলার দুঃখের বিস্তার দেখিতে পাই না, গতি দেখিতে পাই না, বেগ দেখিতে পাই না; সে সকল দেস্‌দিমোনায় অত্যন্ত পরিস্ফুট। শকুন্তলা চিত্রকরের চিত্র, দেস্‌দিমোনা ভাস্করের গঠিত সজীবপ্রায় গঠন। দেস্‌দিমোনার হৃদয় আমাদিগের সম্মুখে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত এবং সম্পূর্ণ বিস্তারিত: শকুন্তলার হৃদয় কেবল ইঙ্গিতে ব্যক্ত।'[২২]

প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,'...ভিতরে দুই এক।' অর্থাৎ রমণী হিসেবে, অন্তশ্চরিত্রে শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনায় বিশেষ পার্থক্য নেই। কিন্তু যেহেতু একজন উপাখ্যান কাব্যের পাত্রী এবং অপর জন নাটকের, সেই হেতু নায়িকা হিসেবে—প্রকাশরূপে এরা সম্পূর্ণ ভিন্ন, সম্পূর্ণ অতুলনীয়।

২১. তদেব. ৮৮

২২. তদেব, ৮৭—৮৮

আমরা দেখলাম, 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নায়ক রামের চরিত্রব্যাখ্যার সূত্র হিসেবে ভবভূতির দেশকালের উপর জোর দিয়েছেন, আর 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে শকুন্তলা ও দেস্‌দিমোনার চরিত্র্যবৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যার সময় নাটক এবং আখ্যানকাব্যের নিজ নিজ শ্রেণীধর্মের দাবির উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু 'দ্রৌপদী—প্রথম প্রস্তাব' প্রবন্ধে (বঙ্গদর্শন, ১২৮২ ভাদ্র) দ্রৌপদীর চরিত্রবৈশিষ্ট্যের আলোচনাকালে উক্ত দুই সূত্রের কোনোটিরই উল্লেখ করেন নি। বরং এমন দুএকটি কথাই বলেছেন যার তাৎপর্য প্রথমোক্ত সূত্রের, অর্থাৎ রচয়িতার দেশকালের প্রভাব-সম্পর্কিত সূত্রের অল্পবিস্তর বিরোধী।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ভারতীয় কাব্যে—হিন্দুকাব্যে নায়িকাচরিত্র বাল্মীকির কালেও যা, এখনও তাই। 'কি প্রাচীন, কি আধুনিক, হিন্দুকাব্য সকলের নায়িকাগণের চরিত্র এক ছাঁচে ঢালা দেখা যায়। পতিপরায়ণা, কোমলপ্রকৃতিসম্পন্না, লজ্জাশীলা, সহিষ্ণুতা গুণের বিশেষ অধিকারিণী—ইনিই আর্যসাহিত্যের আদর্শস্থলাভিষিক্তা। এই গঠনে বৃদ্ধ বাল্মীকি বিশ্বমনোমোহিনী জনকদুহিতাকে গড়িয়াছিলেন। সেই অবধি আর্য নায়িকা সেই আদর্শে গঠিত হইতেছে। শকুন্তলা, দময়ন্তী, রত্নাবলী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নায়িকাগণ—সীতার অনুকরণ মাত্র।...

'ইহার কারণও দুরনুমেয় নহে। প্রথমতঃ সীতার চরিত্রটি বড় মধুর, দ্বিতীয়তঃ এই প্রকার স্ত্রীচরিত্রই আর্যজাতির নিকট বিশেষ প্রশংসিত, এবং তৃতীয়তঃ আর্যস্ত্রীগণের এই জাতীয় উৎকর্ষই সচরাচর আয়ত্ত।

'একা দ্রৌপদী সীতার ছায়াও স্পর্শ করেন নাই। এখানে মহাভারতকার অপূর্ব নূতন সৃষ্টি প্রকাশিত করিয়াছেন। সীতার সহস্র অনুকরণ হইয়াছে। কিন্তু দ্রৌপদীর অনুকরণ হইল না।'[২৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাগুলি হয়তো সবই সত্য। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তির সঙ্গে তাঁর পূর্ব-কথিত সমালোচনা-সূত্রের কতোটা সঙ্গতি রক্ষিত হয়েছে। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, বাল্মীকির

২৩. বিবিধ প্রবন্ধ, ৬২

কালের জীবনপরিবেশ আর ভবভূতির কালের জীবনপরিবেশ ভিন্ন বলেই রামায়ণের রামচন্দ্র মহাতেজস্বী বীর নায়ক আর উত্তরচরিতের রামচন্দ্র কোমলচিত্ত ক্রন্দনপরায়ণ নায়ক। তাই যদি হবে, তাহলে জীবন পরিবেশের পরিবর্তন সীতাচরিত্রকে, কিংবা অন্যান্য ভারতীয় নায়িকার চরিত্রকে স্পর্শ করলো না কেন? উত্তরে বলা যেতে পারে যে, এ-প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কালের বদলকে অগ্রাহ্য করেছেন, জোর দিয়েছেন জাতীয় চরিত্রের ঐক্যের উপর। বলেছেন, সীতা-চরিত্রই আর্যহিন্দুদের কাছে আদর্শ-চরিত্র এবং সীতার গুণাবলীই আর্যহিন্দু রমণীদের সচরাচর আয়ত্ত।

সীতার ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা যদি বা মেনে নেওয়া যায়, দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা—কী কাল সংক্রান্ত ব্যাখ্যা, কী জাতীয় চরিত্র সংক্রান্ত ব্যাখ্যা, উভয় ব্যাখ্যাই সম্পূর্ণ অপ্রযোজ্য হয়ে পড়ে। দ্রৌপদী যে সীতার ছায়াও স্পর্শ করে নি, এর মধ্যে কালেরও কোনো প্রভাব নেই, জাতীয় স্বভাবেরও কোনো প্রভাব নেই। বরং উভয় প্রভাবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেই দ্রৌপদী এমন স্বতন্ত্র এবং এমন অভিনব হয়ে উঠেছে।

তাহ'লে কি অপর সূত্রটি—'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে সাহিত্যবস্তুর শ্রেণীগত চরিত্রধর্মের সূত্রের কথা বলেছেন, সেই সূত্রটিই দ্রৌপদীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? মহাকাব্যের নায়িকা বলেই কি দ্রৌপদী এমন অনমনীয়া, এমন প্রবলা, এমন তেজস্বিনী? তা কেমন করে বলা যায়? পৃথিবীর সমস্ত মহাকাব্যের নায়িকাই কি দ্রৌপদীর মতো শক্তিমতী, দ্রৌপদীর মতো প্রচণ্ড তেজস্বিনী? দ্রৌপদীর যেমন 'দুর্দমনীয় গর্ব নিঃসংকোচে বিস্ফারিত'[২৪] হয়, সব মহাকাব্যের নায়িকারই কি সে-রকম হয়? সীতাও তো মহাকাব্যের নায়িকা, অথচ বঙ্কিমচন্দ্র তো নিজেই বলেছেন, 'সীতা রাজ্ঞী হইয়াও প্রধানতঃ কুলবধূ, দ্রৌপদী কুলবধূ হইয়াও প্রধানতঃ প্রচণ্ড তেজস্বিনী রাজ্ঞী।'[২৫]

দ্রৌপদী যে এমন স্বতন্ত্র এবং অভিনব, তার কারণ দেশকাল নয়, জাতীয়

২৪. তদেব ৬৩

২৫. তদেব, ৬২

স্বভাব নয়, মহাকাব্যের শ্রেণীগত চরিত্রধর্মও নয়, তার কারণ রচয়িতার প্রতিভার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে, রচয়িতার আত্মস্বভাবের স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে নিহিত। দ্রৌপদী যে অভিনব, দ্রৌপদী যে দ্রৌপদী, তার মূলে আছে রচয়িতার অভিনববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞা, রচয়িতার স্বাধীন কল্পনাশক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র রচয়িতার আত্মস্বভাবের কথাটাই বলেছেন, ইচ্ছা করলে আমরা অন্য দিক থেকেও কথাটাকে অন্যভাবে বলতে পারি। বলতে পারি—রচয়িতার জীবনবোধ, রচয়িতার জীবনদৃষ্টি। দেশ কাল জাতি ইত্যাদির প্রভাব যে মিথ্যা এমন বলি না। কিন্তু, আগেই বলেছি, সে-প্রভাব সব সময় স্থূল, অব্যবহিত ও প্রত্যক্ষ নয়। সমাজের ভিত্তিমূলের বাস্তব শক্তিনিচয় আর শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতি এ দু'য়ের মধ্যে অনেকগুলো ধাপের ব্যবধান। সাহিত্যে সমাজবাস্তবের হুবহু প্রতিবিম্ব খুঁজলে সাহিত্যের সত্যরূপটি চাপা পড়ে' যন্ত্র-রূপটি বড়ো হয়ে উঠবে। এ কথা ভুললে চলবে না যে প্রতিভাবান শিল্পী আপন পরিবেশের ঊর্ধ্বে উঠেই প্রতিভাকে সার্থক ক'রে তোলেন। শিল্পীর এই শক্তিকেই বঙ্কিমচন্দ্র রচয়িতার আত্মস্বভাবের স্বাতন্ত্র্য বলেছেন। এরই শক্তিতে শেক্‌স্‌পীয়ার ক্যালিবান বা এরিয়েল সৃষ্টি করেছেন, কালিদাস উমা সৃষ্টি করেছেন। কালিদাস শেক্‌স্‌পীয়ারের এই সৃষ্টিক্ষমতার বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই উল্লেখ করেছেন। তার সঙ্গে আমরা আমাদের এই মন্তব্যটুকু যোগ ক'রে দিতে পারি যে, এরই শক্তিতে বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে বসে' কপালকুণ্ডলা বা শান্তি সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সীতার দেশে বসে' অনায়াসে ভ্রমর বা শৈবলিনী সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

সে যা-ই হোক, এই প্রবন্ধে দ্রৌপদীচরিত্রের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণে যে অন্তর্দৃষ্টি ও বিচারশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তা পাঠকমাত্রেরই অকুণ্ঠিত প্রশংসা অর্জন করে। দ্রৌপদী চরিত্রে তেজ ও ধর্মের সমন্বয় প্রতিপাদন করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারত থেকে কয়েকটি দৃষ্টান্ত আহরণ ক'রে দিয়েছেন। দৃষ্টান্তগুলি কেবল রচয়িতার নয়, সমালোচকেরও অসাধারণ সাহিত্যদৃষ্টির পরিচায়ক। এই দৃষ্টান্তগুলির পরিবেশন উপলক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র মূল কাহিনীর অংশবিশেষকে যেভাবে পুনর্গঠিত ক'রে দিয়েছেন, তা বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য সংবেদনশীলতা, সৃষ্টিক্ষমতা ও রসবোধের পরিচয় দেয়।

প্রবন্ধটি অতৃপ্তিদায়করূপে সংক্ষিপ্ত এবং আংশিকতাদোষসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাসাহিত্যের একটি অত্যুজ্জ্বল রত্ন।

৫

'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধটি যদিও বঙ্গদর্শনের 'মানসবিকাশ' প্রবন্ধের (১২৮০ পৌষ) রূপান্তরিত সংস্করণ, তা হলেও 'মানসবিকাশ' প্রবন্ধটি মূলত আধুনিকসাহিত্য বিষয়ক সমালোচনা, আর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' অনতিপ্রাচীন সাহিত্যের আলোচনা। সামান্য পরিবর্তনেই উভয় প্রবন্ধের মধ্যে অনেকখানি পার্থক্য সাধিত হয়েছে। 'মানসবিকাশে' যা বঙ্কিমচন্দ্রের মূল লক্ষ্য ছিল—দীনেশচরণ বসুর মানসবিকাশ কাব্যের সমালোচনা এবং উক্ত কাব্যের গোত্রনির্ণয়, 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে তা পরিত্যক্ত হয়েছে। আর 'মানসবিকাশ' প্রবন্ধে যা ছিল ভূমিকা এবং বক্তব্যের সমর্থনে নিতান্তই দৃষ্টান্ত হিসেবে দুই বিপরীত গোত্রের দুজন কবির উল্লেখ, একজন বিদ্যাপতি, একজন জয়দেব, এ-প্রবন্ধে সেইটেই হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল বক্তব্য। সেই কারণে 'মানসবিকাশ' নামটিও পরিত্যক্ত হয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, সার্থক কবিতায় অন্তর ও বাহিরের সাযুজ্য ঘটে, সার্থক কবিতায় অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি দুই-ই সমভাবে রূপায়িত হয়। 'কাব্যে অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতির মধ্যে যথার্থ সম্বন্ধ এই যে, উভয়ে উভয়ের প্রতিবিম্ব নিপতিত হয়। অর্থাৎ বহিঃপ্রকৃতির গুণে হৃদয়ের ভাবান্তর ঘটে, এবং মনের অবস্থাবিশেষে বাহ্য দৃশ্য সুখকর বা দুঃখকর বোধ হয়—উভয়ে উভয়ের ছায়া পড়ে। যখন বহিঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন অন্তঃপ্রকৃতির সেই ছায়া সহিত চিত্রিত করাই কাব্যের উদ্দেশ্য। যখন অন্তঃপ্রকৃতি বর্ণনীয়, তখন বহিঃপ্রকৃতির ছায়া সমেত বর্ণনা তাহার উদ্দেশ্য। যিনি ইহা পারেন, তিনিই সুকবি। ইহার ব্যতিক্রমে একদিকে ইন্দ্রিয়পরতা, অপর দিকে অধ্যাত্মিকতা দোষ জন্মে। এ স্থলে শারীরিক ভোগাসক্তিকেই ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি না, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে অনুরক্তিকে ইন্দ্রিয়পরতা বলিতেছি।

ইন্দ্রিয়পরতা দোষের উদাহরণ, জয়দেব। আধ্যাত্মিকতার উদাহরণ, Wordsworth.'[২৬]

মানসবিকাশ কাব্যে যে বহিঃপ্রভৃতি ও অন্তঃপ্রকৃতির সাযুজ্য ঘটে নি, মানসবিকাশ যে অন্তঃপ্রকৃতি-সর্বস্ব—অতএব আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট কাব্য, বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধে এই সিদ্ধান্তের প্রতিপাদনই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল। 'মানসবিকাশ' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'ভারতচন্দ্রাদি বাঙালী কবি, যাঁহারা কালিদাস ও জয়দেবকে আদর্শ করেন, তাঁহাদের কাব্য ইন্দ্রিয়পর। ...আধুনিক, ইংরাজি কাব্যের অনুকারী বাঙালি কবিগণ, কিয়দংশে আধ্যাত্মিকতা দোষে দুষ্ট। মধুসূদন, যেরূপে ইংরেজি কবিদিগের শিষ্য, সেইরূপ কতকদূর জয়দেবাদির শিষ্য, এইজন্য তাঁহাতে আধ্যাত্মিকতা দোষ তাদৃশ স্পষ্ট নহে। হেমচন্দ্র নিজের প্রতিভাশক্তির গুণে নূতন পথ খনন করিতেছেন, তাঁহারও আধ্যাত্মিকতা দোষ অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট কিন্তু অবকাশরঞ্জিনীর লেখক [নবীনচন্দ্র] এবং মানসবিকাশের লেখকের এ দোষ বিলক্ষণ প্রবল। নিম্নশ্রেণীর কবিদিগের মধ্যেও ইহা প্রবল।'[২৭]

'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে মানসবিকাশের সমালোচনা সম্পূর্ণ বর্জিত। এখানে জয়দেব আর বিদ্যাপতিই—অথবা বহিঃপ্রকৃতি-প্রধান ও অন্তঃপ্রকৃতি-প্রধান এই দুই গোত্রের কাব্যই মুখ্য আলোচ্য বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে জয়দেবে বহিঃপ্রকৃতির প্রাধান্য, বিদ্যাপতিতে অন্তঃপ্রকৃতির প্রাধান্য। কিন্তু একটা কথাকে বঙ্কিমচন্দ্র যেন ঈষৎ অস্পষ্টই রেখে দিয়েছেন। বিদ্যাপতিতে আধ্যাত্মিকতা দোষ সত্যিই আছে কি না, এবং থাকলে তা কতো গভীর, সে-কথা বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্ট ক'রে বলেন নি। বরং যেভাবে আলোচনা করেছেন তা বিদ্যাপতির প্রশংসাই সূচিত করে।

বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতি সম্পর্কে নিজের বক্তব্যকে শেষ করেছেন এমন একটি বাক্য দিয়ে যা বিদ্যাপতিকে অতিক্রম ক'রে কিছু ভিন্ন দিকে এগিয়ে যায়। তিনি বলেছেন, '...যাহা বিদ্যাপতি সম্বন্ধে বলিয়াছি, তাহা গোবিন্দদাস

২৬. বিবিধ প্রবন্ধ, ৫৭

২৭. বঙ্গদর্শন, পৌষ ১২৮০

চণ্ডীদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদিগের সম্বন্ধে বেশী খাটে, বিদ্যাপতি সম্বন্ধে তত খাটে না।'২৮

তা-ই যদি হয়, কথাটা বিদ্যাপতির সম্পর্কে যদি কমই খাটে এবং চণ্ডীদাস সম্পর্কে যদি বেশিই খাটে, তাহলে এ-প্রবন্ধের নাম 'চণ্ডীদাস ও জয়দেব' না হয়ে 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' কেন হ'লো তা বোঝা গেল না। বোঝা গেল না যে, চণ্ডীদাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যখন সচেতন, তখন তাঁকেই আলোচনার কেন্দ্রে স্থাপিত করা হ'লো না কেন।

আরো বোঝা গেল না যে, বঙ্কিমচন্দ্র চণ্ডীদাসের মধ্যেও আধ্যাত্মিকতা দোষ লক্ষ করেছেন কি না। বোঝা গেল না, আধ্যাত্মিকতা ব্যাপারটাকেই বঙ্কিমচন্দ্র দোষাবহ বলে মনে করেন কি না। বোঝা গেল না, 'আধ্যাত্মিকতা দোষ' কথাটার সঠিক অর্থ কী। 'মানসবিকাশ' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ হিসেবে দুজন কবির নাম করেছেন: পোপ আর জনসন। 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে আধ্যাত্মিকতা দোষের উদাহরণ হয়েছেন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ। মনে হয় পোপ-জনসন আর ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থকে বঙ্কিমচন্দ্র মোটামুটি এক গোত্রের কবি বলেই মনে করেন। পোপ-জনসন কি সত্যিই অন্তর্মুখী কবি—চণ্ডীদাস গোত্রের? পোপ জনসন ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ চণ্ডীদাস, এঁরা সকলেই কি অল্পবিস্তর এক দোষে দুষ্ট—আধ্যাত্মিকতা?

'আধ্যাত্মিকতা দোষ' কথাটিকে বাদ দিলে, এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দেওয়া দৃষ্টান্তগুলিকে বাদ দিলে, কাব্যে অন্তর্মুখিতা ও বহির্মুখিতার সম্পর্ক বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল বক্তব্য স্পষ্ট, এবং বোধ করি অকাট্য। অন্তর ও বাহিরের অনুরূপ সংযোগ বা সহিত-ত্বের কথা রবীন্দ্রনাথও জোর দিয়ে বলেছেন। প্রবণতা অনুযায়ী অধিকাংশ কবিকেই যে মোটামুটিভাবে দুই গোত্রে ভাগ করা যায়, এও হয়তো সত্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই সাধারণ সত্যের মধ্যে তাঁর বক্তব্যকে সীমাবদ্ধ রাখেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের অপর একটি সিদ্ধান্তও বিতর্কমূলক। এই প্রবন্ধে তিনি তাঁর কালের ইংরেজিশিক্ষিত 'আধুনিক' বাঙালি কবিদের একটি তৃতীয়

২৮. তদেব, ৫৬

গোত্রে ফেলেছেন। স্বতন্ত্র গোত্র হতে হ'লে তার স্বতন্ত্র চরিত্রধর্ম থাকতে হবে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এই তথাকথিত তৃতীয় গোত্রের কবিদের কোনো মৌল বিশিষ্টতা, কোনো স্থায়ী অথচ স্বতন্ত্র চরিত্র-লক্ষণ কিছু দেখাতে পারেন নি। এঁদের বিশেষত্বের কথা যা বলেছেন, তা নিতান্তই একটি আকস্মিক বা আপতিক ব্যাপার। তিনি বলেছেন, 'তাঁহারা আধুনিক ইংরাজি গীতিকবিদিগের অনুগামী। আধুনিক ইংরাজি কবি ও আধুনিক বাঙ্গালি কবিগণ সভ্যতাবৃদ্ধির কারণে স্বতন্ত্র একটি পথে চলিয়াছেন।... এক্ষণকার কবিগণ জ্ঞানী—বৈজ্ঞানিক, ইতিহাসবেত্তা, আধ্যাত্মিকতত্ত্ববিৎ।... তাঁহাদের বুদ্ধি বহুবিষয়িণী বলিয়া তাঁহাদের কবিতা বহুবিষয়িণী হইয়াছে।... কিন্তু এই বিস্তৃতিগুণ হেতু প্রগাঢ়তাগুণের লাঘব হইয়াছে।'[২৯]

অন্তর ও বাহির ছাড়া যেখানে আর কোনো তৃতীয় ক্ষেত্রে নেই, সেখানে অন্তর্মুখিতা-প্রধান ও বহির্মুখিতা-প্রধান এই দুই শ্রেণীর বাইরে আরো শ্রেণীর কোনো অবকাশ থাকে কি? উক্ত দুই শ্রেণীই তো বিভজন-ক্ষেত্রকে নিঃশেষ করে, কিছুই অবশিষ্ট রাখে না, সেক্ষেত্রে সুকবি ছাড়া আর তৃতীয় শ্রেণীকে কোথা থেকে পাওয়া যাবে? বঙ্কিমচন্দ্রের বিভজন-সূত্র অনুসারে, আধুনিক বাঙালি গীতিকবিরা যদি অকবি না হন, তাহলে হয় অন্তর্মুখিতা-প্রধান হবেন, না হয় বহির্মুখিতা-প্রধান হবেন, আর তাও যদি না হয়, তাহ'লে সুকবি হবেন। কোন্‌টা, তা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, জ্ঞান কি কবিতার শত্রু? জ্ঞানবৃদ্ধিতে, সভ্যতার প্রসারে কি কবিতার প্রসার হ্রাস পায়, কবিতার প্রগাঢ়তা নষ্ট হয়? পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বে এই রকম একটা অভিমতের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় বটে—পীকক থেকে মেকলে অনেকেই কবিতার সঙ্গে জ্ঞানবিজ্ঞানের, কাব্যের সঙ্গে সভ্যতার অহি-নকুল সম্পর্কের কথা বলেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গুণী, যিনি একই সঙ্গে জ্ঞানবাদী এবং কাব্যরসিক, যিনি একই সঙ্গে জ্ঞানী এবং শিল্পী, তাঁর মুখে এই ধরনের উক্তি বিস্ময়কর ঠেকে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম বয়সের একাধিক প্রবন্ধ, যেমন 'নীরব কবি

২৯. তদেব, ৫৬

ও অশিক্ষিত কবি,' কিংবা 'কাব্যের অবস্থা পরিবর্তন', এই অভিমতের প্রবল প্রতিবাদ।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, বিস্তৃতির ফলে আধুনিক বাঙালি কবিদের প্রগাঢ়তার অভাব ঘটেছে। বিষয়টির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে কবিত্বশক্তির হ্রাস হয় বলিয়া যে প্রবাদ আছে, ইহা তাহার একটি কারণ। যে জল সংকীর্ণ কূপে গভীর, তাহা তড়াগে ছড়াইলে আর গভীর থাকে না।'৩০

উদাহরণটি নির্দিষ্ট-পরিমাণ জড় বস্তুর পক্ষেই সত্য, মানসিক বৃত্তি বা মানসিক শক্তির পক্ষে—কল্পনাশক্তি বা সৃজনশীলতার পক্ষে ততোটা সত্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সংকীর্ণতা-গভীরতার সূত্রে সাধারণ সত্যতা কিছু-পরিমাণে থাকতে পারে, কিন্তু সৃষ্টির ক্ষেত্রে—বিশেষত স্রষ্টা যদি প্রতিভবান হন, তাহ'লে তাঁর ক্ষেত্রে এই সূত্রের যান্ত্রিক প্রয়োগ কখনোই সম্ভবপর হয় না।

সকলেই জানেন, প্রগাঢ়তার অভাব বিস্তৃতি ছাড়াও আরো অনেক কারণে ঘটতে পারে। ঠিক তেমনি, বিস্তৃতি সত্ত্বেও প্রগাঢ়তার দৃষ্টান্ত সাহিত্যের ইতিহাসে খুব কম নেই। সুপ্রাচীনদের কথা ছেড়ে দিচ্ছি, কিন্তু লেওনার্দো দা ভিঞ্চি কি দান্তে বা শেক্‌স্‌পীয়ার কি গ্যেটের দৃষ্টান্তও তো বিস্মৃত হবার মতো নয়। বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাঙালি কবিদের দিকে তাকিয়ে এই সিদ্ধান্ত করেছিলেন, তখন তাঁর সামনে ছিলেন মধুসূদন আর হেম-নবীন, বড়ো জোর বালক-রবীন্দ্রনাথ। তিনি যদি পরিণত রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃতি ও প্রগাঢ়তার সঙ্গে পুরোপুরি পরিচিত হবার সুযোগ পেতেন, তাহলে এ-সিদ্ধান্ত অবশ্যই পরিত্যাগ করতেন।

৬

সচরাচর সমালোচনা বলতে যা বোঝায়, 'বাঙ্গলা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' প্রবন্ধটি (১৮৯২) ঠিক সে বস্তু নয়। সাহিত্যিক হিসেবে প্যারীচাঁদের কোনো বিশিষ্টতার অথবা প্যারীচাঁদের কোনো রচনার উৎকর্ষ

৩০. তদেব, ৫৬

অনুৎকর্ষের বিচার এ-প্রবন্ধে পাওয়া যাবে না। 'আলালের ঘরের দুলাল' সম্পর্কে সাধারণ মন্তব্য আছে, তার বিষয়বস্তুর বাঙালিত্ব নিয়ে এবং তার ভাষার সরলতা নিয়ে। কিন্তু গ্রন্থটি উপন্যাস হিসেবে কেমন, তা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে প্যারীচাঁদের স্থান কোথায়, তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোথায়, সাহিত্যের ইতিহাসকারের মতো বঙ্কিমচন্দ্র সেইটেই এ-প্রবন্ধে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্র প্যারীচাঁদের কালের, অর্থাৎ উনবিংশ শতকের মধ্যপর্বের বাংলা সাহিত্যের দুটি বিপদের কথা বলেছেন। দুটি বিপদই গুরুতর। এক বিপদ ভাষার ক্ষেত্রে। দ্বিতীয় বিপদ সাহিত্যের বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে। সে-কালের বাংলা গদ্য সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে এমন আড়ম্বরপূর্ণ উৎকট ও কৃত্রিম হয়ে উঠেছিল যে, সাধারণ পাঠকের পক্ষে তার অর্থবোধ অতি দুষ্কর। ভাবের আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সেদিন তা একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। সরল সহজ-বোধ্য বাংলা গদ্যের প্রচলন ক'রে প্যারীচাঁদ এই অচল অবস্থার থেকে বাংলা সাহিত্যকে মুক্তি দেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই বলি।—

'আমি এমন বলিতেছি না যে "আলালের ঘরের দুলালে"র ভাষা আদর্শ ভাষা। উহাতে গাম্ভীর্য এবং বিশুদ্ধির অভাব আছে এবং উহাতে অতি উন্নত ভাবসকল সকল সময়ে পরিস্ফুট করা যায় কি না সন্দেহ। কিন্তু উহাতেই প্রথম এ বাঙ্গালা দেশে প্রচারিত হইল যে, যে বাঙ্গালা সর্বজনমধ্যে কথিত এবং প্রচলিত, তাহাতে গ্রন্থ রচনা করা যায়, সে রচনা সুন্দরও হয়, এবং যে সর্বজন-হৃদয়-গ্রাহিতা সংস্কৃতানুযায়িনী ভাষার পক্ষে দুর্লভ, এ ভাষার তাহা সহজ গুণ। ...বাঙ্গালা ভাষার এক সীমায় তারাশঙ্করের কাদম্বরীর অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল"। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালে"র পর হইতে বাঙ্গালী লেখক জানিতে পারিল যে, এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয়-ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাঙ্গালা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।'[৩১]

বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত দ্বিতীয় বিপদ—বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রের বিপদ আরো

৩১. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, বিবিধ, ২৪৬

গুরুতর। 'সাহিত্যের ভাষাও যেমন সংকীর্ণ পথে চলিতেছিল, সাহিত্যের বিষয়ও ততোধিক সংকীর্ণ পথে চলিতেছিল। যেমন ভাষাও সংস্কৃতের ছায়া মাত্র ছিল, সাহিত্যের বিষয়ও তেমনই সংস্কৃতের এবং কদাচিৎ ইংরাজির ছায়া মাত্র ছিল। সংস্কৃত বা ইংরাজি গ্রন্থের সারসংকলন বা অনুবাদ ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্য আর কিছুই প্রসব করিত না।'৩২

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে প্যারীচাঁদই এই বিপদ থেকে বাংলা সাহিত্যকে উদ্ধার করেন। '...তিনিই প্রথম ইংরাজি ও সংস্কৃতের ভাণ্ডারে পূর্বগামী লেখকদিগের উচ্ছিষ্টাবশেষ অনুসন্ধান না করিয়া, স্বভাবের অনন্ত ভাণ্ডার হইতে আপনার রচনার উপাদান সংগ্রহ করিলেন। ...তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে,—তাহার জন্য ইংরাজি বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না।'৩৩

প্যারীচাঁদের দুই 'অক্ষয় কীর্তি'র পরিচয় দিয়ে অবশেষে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, "আলালের ঘরের দুলাল" বাঙ্গালা ভাষায় চিরস্থায়ী ও চিরস্মরণীয় হইবে। উহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ তৎপরে কেহ প্রণীত করিয়া থাকিতে পারেন অথবা ভবিষ্যতে কেহ করিতে পারেন, কিন্তু "আলালের ঘরের দুলালে"র দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উপকার হইয়াছে, আর কোন বাঙ্গলা গ্রন্থের দ্বারা সেরূপ হয় নাই এবং ভবিষ্যতে হইবে কি না সন্দেহ।'৩৪-৩৫

এই বাক্যের 'উপকার' কথাটাকে যদি খুব সংকীর্ণ অর্থে না ধরি, যদি গভীর এবং স্থায়ী উপকার বুঝি, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বাক্য যে কিছুটা অতিশয়োক্তি, সে কথা মানতেই হবে। কিন্তু এ-অতিশয়োক্তি নিন্দনীয় নয়: "আলালের ঘরের দুলাল" চিরস্থায়ী হবে কি না সে-তর্ক নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই গ্রন্থ যে ভাষা এবং বিষয় উভয় কারণেই চিরস্মরণীয়, তাতে সন্দেহ নেই।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা-বিষয়ক সিদ্ধান্তের কারণে আলোচ্যমান প্রবন্ধটিও কিন্তু বাংলা সাহিত্যে চিরস্মরণীয় হবার যোগ্য। এই প্রবন্ধে বাংলা গদ্যের প্রকৃতি

৩২. তদেব, ১৪৫

৩৩. তদেব, ১৪৫-৪৬

৩৪-৩৫. তদেব, ১৪৫

এবং আদর্শ সম্পর্কে, এবং সাহিত্যরচনায় ভাষার ভূমিকা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের যে অভিমতের সাক্ষাৎ পাই তা ভাষাবিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সুগভীর অন্তর্দৃ'ষ্টির পরিচয় দেয়। শুধু তাই নয়, যে-বঙ্কিমীগদ্য প্রসারে এবং গভীরতায়, প্রাঞ্জলতা এবং বলিষ্ঠতায়, দীপ্তিতে এবং দৃঢ়তায়, গতিতে এবং গাম্ভীর্যে—অসামান্য স্থিতিস্থাপকতাগুণে বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বিস্ময়, সেই বঙ্কিমীগদ্যের কাঠামো যে কী, তার ইঙ্গিতও এই প্রবন্ধে মিলবে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে স্পষ্ট ক'রে না বললেও পাঠক সহজেই এ-কথা বুঝতে পারেন যে, একদিকে তারাশঙ্করের কাদম্বরী অনুবাদের ভাষা, অন্যদিকে প্যারীচাঁদের আলালী ভাষা, এই দুই ভাষার উপযুক্ত সমাবেশের উপরেই বঙ্কিমীগদ্যের ভিত্তিভূমি নির্মিত হয়েছে।

সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিনিবেশ নতুন নয়। এই প্রবন্ধের দীর্ঘ চোদ্দ বৎসর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটির (বঙ্গদর্শন ১২৮৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৮৭৮) প্রকাশিত হয়। ভাষা বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমতের মূল কথাটি 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধেই পাওয়া যায়।—

'বলিতে গেলে, কিছু কাল পূর্বে দুইটি পৃথক্ ভাষা বাঙ্গালায় প্রচলিত ছিল। একটির নাম সাধুভাষা; অপরটির নাম অপর ভাষা [বর্তমান নাম 'চলিত ভাষা']। ...গদ্য গ্রন্থাদিতে সাধুভাষা ভিন্ন আর কিছু ব্যবহার হইত না। তখন পুস্তকপ্রণয়ন সংস্কৃত ব্যবসায়ীদিগের হাতে ছিল।...যেমন গ্রাম্য বাঙ্গালী স্ত্রীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক, ওজনে ভারি সোনা অঙ্গে পরিলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুর্বোধ্য সংস্কৃতবাহুল্য থাকিলেই রচনার গৌরব হইল।

'এইরূপ সংস্কৃতপ্রিয়তা এবং সংস্কৃতানুকারিতা হেতু বাঙ্গালা সাহিত্য অত্যন্ত নীরস, শ্রীহীন, দুর্বল এবং বাঙ্গালা সমাজে অপরিচিত হইয়া রহিল। টেকচাঁদ ঠাকুর [প্যারীচাঁদ মিত্র] প্রথমে এই বিষবৃক্ষের মূলে কুঠারাঘাত করিলেন। ...সেই দিন হইতে বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি।'[৩৬]

প্রবন্ধের উপসংহারে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত পাঠকের সামনে উপস্থাপিত করেছেন। দীর্ঘ হ'লেও তা বিস্তৃতভাবে উদ্ধৃতির যোগ্য।—

৩৬. বিবিধ প্রবন্ধ, ৩৭৮-৯

'অতএব ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইতেছে যে, বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে, এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা।'[৩৭]

বঙ্কিম-নির্দেশিত সূত্র প্রয়োগ করলেই বুঝতে পারবো যে, উদ্‌ধৃত অনুচ্ছেদের শেষের বাক্যটিই 'সর্বোৎকৃষ্ট রচনা'-র একটি চমৎকার নিদর্শন। কিন্তু সব রকম রচনার আদর্শ যে হুবহু এক হতে পারে না, সে-সম্পর্কেও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ সচেতন। তিনি নিজেই সেই প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন।—

'তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য, সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য—সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়।'[৩৮]

বঙ্কিমচন্দ্র 'একটু অসাধারণতা'-র কথা বলেছেন। কাব্যের ভাষার ক্ষেত্রে আমরা হয়তো অনেকখানি অসাধারণতারই দাবি করবো। এটা কেবল মাত্রার কথা, কিন্তু বক্তব্যের নিজস্ব প্রয়োজন সম্বন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ সজাগ।—

'প্রথমে দেখিবে, তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষার তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট এবং সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদি বা হুতোমি ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু-প্রদর্শিত সংস্কৃতবহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা এবং সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই ভাষায় আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে; প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই—নিষ্প্রয়োজনেই আপত্তি। বলিবার কথাগুলি পরিস্ফুট করিয়া বলিতে হইবে—যতটুকু বলিবার আছে, সবটুকু বলিবে—তজ্জন্য ইংরেজি, ফার্সি,

৩৭. তদেব, ৩৮৬

৩৮. তদেব

আরবি, সংস্কৃত, গ্রাম্য, বন্য, যে ভাষার শব্দ প্রয়োজন, তাহা গ্রহণ করিবে, অশ্লীল ভিন্ন কাহাকেও ছাড়িবে না।'[৩৯]

প্রয়োজনে—যথার্থ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অশ্লীলেও যে বঙ্কিমচন্দ্রে খুব আপত্তি আছে, এমন মনে হয় না। প্রসঙ্গত ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্ত বিষয়ক প্রবন্ধে অশ্লীলতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত স্মরণ করা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র অশ্লীলতার বিরোধী সন্দেহ নেই। কিন্তু প্রথমত তা যথার্থ অশ্লীল হ'লে তবেই, দ্বিতীয়ত তা সাহিত্যের দিক থেকে যথার্থ অপ্রয়োজনীয় হ'লে তবেই।

সংস্কৃতানুগ ও প্রচলিত, এই দুই ভাষার তুলনা এবং ব্যবহার সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্তের সারাৎসার শেষের দিকে দুটি মাত্র বাক্যেই নিবেদন করা যায়।—

'আমরা দেখিয়াছি, সরল প্রচলিত ভাষা অনেক বিষয়ে সংস্কৃতবহুল ভাষার অপেক্ষা শক্তিমতী। কিন্তু যদি সে সরল ভাষায় সে উদ্দেশ্য [ভাবপ্রকাশ] সিদ্ধ না হয়, তবে কাজে কাজেই সংস্কৃতবহুল ভাষার আশ্রয় লইতে হইবে।'[৪০]

এই অবকাশে আরো একটা কথা এখানে উল্লেখ করতে চাই। কথাটি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ভাষাবোধ ও ভাষাসিদ্ধান্তের মৌল ঐক্যের বিষয়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান' প্রবন্ধের আট বছর পরে রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধটি (১৯০০) রচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধে সংস্কৃতানুসারী বাংলা গদ্যের আড়ম্বর ও কৃত্রিমতা সম্পর্কে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্যের সাক্ষাৎ পাই, তার সঙ্গে 'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ খোদ সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কেই যে-সব দুঃসাহসী মন্তব্য করেছেন, তা মিলিয়ে দেখবার মতো। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সংস্কৃতপ্রেমিক, সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে উভয়েরই অধিকার মোটামুটি দূর-বিস্তৃত, রামায়ণ-মহাভারত এবং কালিদাসের কাব্য-নাটকাদিতে উভয়েই আকণ্ঠ নিমজ্জিত, সর্বোপরি সংস্কৃতানুগ বাংলা গদ্য যে উৎকর্ষের কোন্ সমুচ্চ শিখর স্পর্শ করতে পারে, উভয়ের রচনাতেই তার উৎকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া

৩৯. তদেব

৪০. তদেব, ৩৮৬-৭

যাবে, কিন্তু এই সব ব্যক্তিগত বিবেচনা দুজনের কারোই সাহিত্যদৃষ্টিকে কিছুমাত্র আচ্ছন্ন করতে পারে নি। সাহিত্যের ভাষা যে প্রাণের ভাষা, জীবনের ভাষা, নিদ্রায়-জাগরণে-স্বপ্নে যে-ভাষা বিরাজমান সেই ভাষা, চৈতন্যে অবচেতনায় এবং অচৈতন্যে যে-ভাষা পরিব্যাপ্ত সেই ভাষা, যে-ভাষার স্তন্যপানে মানুষ দেহে মনে-প্রাণে মানুষ হয়ে ওঠে সেই ভাষা, এ বোধ বঙ্কিমচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়ের ক্ষেত্রেই সমান সত্য। দৃষ্টিভঙ্গী উভয়েরই এক; কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য সাহিত্যের ভাষাসমস্যাকে আরো মূলে গিয়ে স্পর্শ করে—রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অধিকতর দূরপ্রসারী এবং গভীরতর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের তত্ত্বগত তাৎপর্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ উক্ত তাৎপর্যকে ব্যাখ্যা করবার অবকাশ পান নি। 'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধে তাঁর মূল বিষয় কাদম্বরী-কাহিনী এবং বিশেষভাবে তারই ভাষা; সাধারণভাবে সংস্কৃত ভাষাও নয়, কথ্য ভাষাও নয়। সেই জন্য—প্রসঙ্গচ্যুতির আশঙ্কায় সেখানে ভাষা বিষয়ে তাঁর সাধারণ-বক্তব্যকে তিনি বেশি দূর অগ্রসর করেন নি। ব্যবহারিক উপযোগিতার দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের গুরুত্ব অনেক বেশি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধে সমকালের ও ভাবী কালের বাঙালি লেখকদের পথনির্দেশ করেছেন। 'কাদম্বীর চিত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের সে-সুযোগ ছিল না। কিন্তু আপাতত সে-প্রসঙ্গ থাক।

৭

কবির ব্যক্তিগত জীবন আর তাঁর কাব্য, এ-দুয়ের যোগ যেমন ঘনিষ্ঠ, তেমনি এদের মধ্যে যে একটা ব্যবধান আছে, তা-ও সত্য। এই ব্যবধানের জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কবিরে পাবে না তাহার জীবন চরিতে'।

কবির জীবনচরিতের মধ্যে কবিকে খোঁজা এবং কবির ব্যক্তি-জীবনের তথ্যাবলীর সাহায্যে তাঁর কাব্যকে বুঝতে চেষ্টা করা, জীবনী-ভিত্তিক সমালোচনার এই হচ্ছে মূল লক্ষ্য। জীবনীভিত্তিক সমালোচনা ঐতিহাসিক সমালোচনার সগোত্র, এ-সমালোচনা তথ্যাশ্রিত এবং ব্যাখ্যামূলক। তথ্য সাহিত্যগত নয়, ঘটনাগত; ব্যাখ্যার সূত্রও সাহিত্যগত নয়, জীবনগত।

যোগ্য সমালোচকের ক্ষেত্রে জীবনী-ভিত্তিক সমালোচনার যে সাফল্য ও সার্থকতার পরিচয় পাওয়া যায় তাকে স্বীকার করতেই হবে। কিন্তু জীবনী-ভিত্তিক সমালোচনার দুর্বলতার দিকগুলিও সুস্পষ্ট। প্রথম দুর্বলতা তত্ত্বগত। কবির ব্যক্তিজীবন ও তাঁর কাব্য, এ দুয়ের মধ্যে ব্যবধান কখনোই সম্পূর্ণ ঘোচানো যায় না। সমালোচক তো দূরের কথা, কবি নিজেও সব সময় খুশি মতো এ-ব্যবধান পার হতে পারেন না। দ্বিতীয় কথা, জীবনী-ভিত্তিক সমালোচনা যদি নিছক জীবনী-ভিত্তিকই হয়, তাহলে তার মধ্যে মূল্যায়নের কোনো অবকাশ থাকে না।

এ-ছাড়া কয়েকটি ব্যবহারিক বাধাও আছে। জীবন থেকে কাব্যে, এবং কাব্য থেকে জীবনে, পুনরায় জীবন থেকে কাব্যে—এইভাবে বিচরণের মধ্যে একটি চক্রক-দোষের সম্ভাবনা নিহিত থাকে। কার্যক্ষেত্রে অনেক সমালোচকই তাকে এড়াতে পারেন না। দ্বিতীয় বাধা সমালোচকের কল্পনাদৈন্য, উপযুক্ত সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির অভাব। আরো বড়ো বাধা সমালোচকের কল্পনাবিলাস, সমালোচকের অতি-কাল্পনিকতা। সব থেকে বড়ো বাধা তথ্যজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা। মানুষের জীবন—ব্যাপারটাই এমন যে, এখানে তথ্যজ্ঞান কখনোই সম্পূর্ণ বা চূড়ান্ত হতে পারে না।

তবু, সমালোচক যদি যথেষ্ট পরিমাণে তথ্য-সন্ধানী এবং তথ্যনিষ্ঠ হন, যথেষ্ট পরিমাণে সংবেদনশীল ও সহানুভূতিসম্পন্ন হন, সমালোচক যদি যথার্থ কল্পনাশক্তির অধিকারী হন, সুলভ কাল্পনিকতার আশ্রয় না নেন, তাহ'লে জীবনীভিত্তিক সমালোচনা যে তার ব্যবহারিক দুর্বলতাগুলিকে অনেকখানি অতিক্রম করতে পারে, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যে এই গোত্রের সার্থক সমালোচনার নিদর্শন বঙ্কিমচন্দ্রের 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' (বাংলা ১২৯২ সাল, ১৮৮৫ খ্রীঃ) এবং 'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরেরর জীবনী ও গ্রন্থাবলী সমালোচনা'-প্রবন্ধের 'কবিত্ব' শীর্ষক সংযোজন (১৮৮৬ খ্রীঃ)।

সমালোচনার অন্যান্য অনেক ধারার মতো জীবনীভিত্তিক ধারাতেও বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রই পথপ্রদর্শক। শুধু পথপ্রদর্শকই নন, এ-ধারাতে এখন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রই শ্রেষ্ঠতম। প্রবন্ধ দুটিকে প্রচলিত অর্থে সৃজনশীল

সমালোচনা বলা চলে না, কিন্তু শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের সৃজনী-কল্পনা, শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিকের অন্তর্দৃষ্টি, ভাবগ্রাহিতা ও জীবনবোধ এই প্রবন্ধ দুটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান সহায়।

প্রবন্ধ দুটির কোনোটিই অবশ্য একান্তভাবে জীবনীভিত্তিক নয়, তথ্যাশ্রিত ব্যাখ্যা কোনোটিরই শেষ কথা নয়। উভয় প্রবন্ধেই ব্যাখ্যা উপায় হিসেবে গৃহীত, সাহিত্যিক মূল্যায়নই শেষ লক্ষ্য। প্রচলিত জীবনীভিত্তিক সমালোচনার সুপরিচিত দুর্বলতাগুলির কোনোটিই বঙ্কিমচন্দ্রকে স্পর্শ করে নি।

ঈশ্বর গুপ্ত এবং দীনবন্ধু, উভয়ের কারো ক্ষেত্রেই বঙ্কিমচন্দ্রের তথ্যজ্ঞানে কোনো ফাঁক ছিল না। প্রথম জনের তিনি শিষ্যস্থানীয়, দ্বিতীয় জনের তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। উভয়ের সঙ্গেই তাঁর সমবেদনার সংযোগ ছিল। উভয়েরই অদৃশ্য অন্তর্জীবনকে বঙ্কিমচন্দ্র যেন তাঁর কল্পনাদৃষ্টিতে একেবারে প্রত্যক্ষ দেখতে পেয়েছিলেন। সমালোচক যেখানে যুগপৎ বাইরের থেকে এবং ভিতরের থেকে কবির বহির্জীবন-অন্তর্জীবনকে ঘনিষ্ঠভাবে, অভ্রান্তভাবে জানতে পারেন, সমালোচক যেখানে কবির কবিসত্তাকে নিজের মনের মধ্যে যুগপৎ আবিষ্কার এবং সৃজন ক'রে নিতে পারেন, সেইখানে—এবং মাত্র সেইখানেই জীবনীভিত্তিক সমালোচনার শুভযোগ। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ দুটি এই শুভযোগেই রচিত হয়েছে।

'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত বয়সের (৪৭), তাঁর সাহিত্য-জীবনের শেষ পর্যায়ের রচনা। ব্রাহ্মসমাজের তরুণ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত প্রবল বিতর্কের ঠিক পরের বছর এই প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধে দ্বিতীয় বাক্যটি, ঈশ্বর গুপ্তের সমালোচনা হিসেবে নয়, অন্য কারণে, পূর্বোক্ত বিতর্কের প্রেক্ষাপটে, বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বাংলা সাহিত্যে যে উৎকৃষ্ট কবিতার অভাব নেই, এই কথার সমর্থনে এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, '...বিদ্যাপতি হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক সুকবি বাংলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।'[৪১]—এই বাক্যে শ্রেষ্ঠ সুকবির নাম দুটির শেষেরটি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। আজকের

৪১. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, বিবিধ, ১০০

পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের এ কথার মধ্যে চমকপ্রদ কিছু নেই। আজকে আমরা ভালোভাবেই জানি যে, বিদ্যাপতির নামের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নাম যুক্ত করার দ্বারা রবীন্দ্রনাথে এমন কিছু গৌরববৃদ্ধি করা হচ্ছে না। এখন হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বিস্মৃতপ্রায়, এমন কি মধুসূদনকেও আমরা অনেকটা যেন কর্তব্যের খাতিরেই স্মরণ রাখতে চেষ্টা করি। এই পশ্চাৎ-জ্ঞান বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। স্মরণ রাখতে হবে, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধরচনার কালে (১৮৮৫) রবীন্দ্রনাথের বয়স মাত্র ২৪ বছর। স্মরণ রাখতে হবে, তখন সবে 'ছবি ও গান' (১৮৮৪) প্রকাশিত হয়েছে এবং 'কড়ি ও কোমলে'র কবিতা প্রকাশিত হচ্ছে, 'মানসী' তখনো সুদূর ভবিষ্যতের গর্ভে। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতার সমাজে কবি হিসেবে সুপরিচিত, কিন্তু প্রতিভার বিকাশে তখনো বহু বিলম্ব। সেই সময় বিদ্যাপতির সঙ্গে তাঁর নাম যিনি এক নিশ্বাসে উচ্চারণ করতে পারেন, সমালোচক হিসেবে তাঁর দূরদৃষ্টি অসাধারণ। ঈশ্বর গুপ্ত ও রবীন্দ্রনাথ অনেকটা বিপরীত কোটির কবি এবং তখনকার বাঙালি পাঠক, ঠিক ঈশ্বর গুপ্তের না হলেও, খানিকটা ঈশ্বর গুপ্তের ধরনের কবিতাতেই সমধিক অভ্যস্ত। হেমচন্দ্র তখন প্রায় কবিসম্রাট, নবীনচন্দ্রও নিতান্ত কম খ্যাতিসম্পন্ন নন। তখন, রবীন্দ্র-সাহিত্যের সেই অস্ফুট উষালগ্নে যিনি রবীন্দ্রনাথকে এইভাবে আবিষ্কার করতে পারেন, পাঠক হিসেবে তিনি যে কোন্ স্তরের তা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। রসগ্রাহী, সচেতন, নিরপেক্ষ এবং বিচারশীল পাঠকের সাহিত্যগত প্রতিক্রিয়াই যদি যথার্থ সমালোচনা হয়, তাহলে যথার্থ সমালোচকের প্রায় সবগুলি গুণই আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে দেখতে পাব।

ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমচন্দ্রের গুরুস্থানীয় হতে পারেন, ঈশ্বর গুপ্তকে তিনি প্রভূত শ্রদ্ধাও করতে পারেন, 'খাঁটি বাঙালি কবি' বলে', হারানো কালের প্রতিনিধি বলে' ঈশ্বর গুপ্ত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মনে অনেকখানি দুর্বলতাও থাকতে পারে—ঈশ্বর গুপ্তের এক-কালের কবিখ্যাতি গগনস্পর্শীও হতে পারে, কিন্তু এ সবের কিছুই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যবিচারকে স্পর্শ করতে পারে নি। ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্বশক্তি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত মনোভাব কী, তা তাঁর প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই তিনি স্পষ্ট ক'রে বলেছেন। তিনি বলেছেন,

'আমার এই মাত্র বক্তব্য যে, সে অর্থে [যথার্থ কবিত্বশক্তির অধিকারী, এই অর্থে] ঈশ্বর গুপ্তকে উচ্চাসনে বসাইতে সমালোচক সম্মত হইবেন না।'[৪২] বলা বাহুল্য, সমালোচকের অসম্মতি অর্থ এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজেরই অসম্মতি।

এই অসম্মতির কারণ কী? সে বিষয়েও বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য সুস্পষ্ট। এই কারণ প্রসঙ্গে 'উত্তরচরিত' এবং 'গীতিকাব্য'—বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রবন্ধ দুটিকে এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। প্রথম প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, 'কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টি ক্ষমতা।'[৪৩] আরো বলেছেন, '...সৌন্দর্যসৃষ্টি কবির সর্বপ্রধান গুণ'।[৪৪] দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, হৃদয়ের অব্যক্ত এবং অব্যক্তব্য ভাবকে প্রকাশ করাই গীতিকবিতার কাজ।[৪৫] আরো বলেছেন, 'বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।'[৪৬] এখানেও তাঁর বক্তব্য এই সূত্র দুটিকে অনুসরণ করেছে। তাঁর মতে, ঈশ্বর গুপ্তের সেই শক্তি ছিল না, যাকে গীতিকবির বিশিষ্ট শক্তি বলা যায়। ঈশ্বর গুপ্তে সৃষ্টিক্ষমতাও ছিল না, তিনি যথার্থ স্রষ্টা নন। প্রবন্ধের গোড়াতেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'মনুষ্য-হৃদয়ের কোমল, গম্ভীর, উন্নত, অস্ফুট ভাবগুলি ধরিয়া তাহাকে গঠন দিয়া, অব্যক্তকে তিনি ব্যক্ত করিতে জানিতেন না। সৌন্দর্যসৃষ্টিতে তিনি তাদৃশ পটু ছিলেন না। তাঁহার সৃষ্টিই বড় নাই।'[৪৭]

এইখানেই শেষ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে ঈশ্বর গুপ্তের রচনা স্বভাবানুকারী, কিন্তু স্বভাবাতিরিক্ত নয়। ঈশ্বর গুপ্ত বাস্তবকে আদর্শায়িত করতে পারতেন না। যে-সব আদর্শ বাস্তবের অপূর্ণতাকে পূরণ করে, তাদের সম্পর্কে ঈশ্বর গুপ্তের কোনো সচেতনতা ছিল না। উৎকর্ষের যে আদর্শ আমাদের

৪২. তদেব, ১২৪

৪৩. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, বিবিধ প্রবন্ধ, ৭৯

৪৪. তদেব, ৫২

৪৫. তদেব, ৪৮

৪৬. তদেব

৪৭. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, বিবিধ, ১২৪

হৃদয়ে অস্ফুটভাবে থাকে, কবি যাকে হৃদয়ঙ্গম করেন, কবি যাকে 'গঠন দিয়া শরীরী করিয়া হৃদয়গ্রাহী'[৪৮] করেন, ঈশ্বর গুপ্ত সে আদর্শের রূপকার নন।

লক্ষ করতে হবে যে, এই নির্মম, কঠিন মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত সমাপ্ত করেন নি। কথাটা আরো একটু এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আবার স্বভাবানুকারিতার প্রসঙ্গে ফিরে গিয়েছেন। 'তাঁহার কাব্যে সুন্দর, করুণ, প্রেম, এ সব সামগ্রী বড় বেশী নাই। কিন্তু তাঁহার যাহা আছে, তাহা আর কাহারও নাই। আপন অধিকারের ভিতর তিনি রাজা।'[৪৯]

এর পরেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রশ্ন তুলেছেন, 'যাহা আদর্শ, যাহা কমনীয়, যাহা আকাঙ্ক্ষিত, তাহা কবির সামগ্রী। কিন্তু যাহা প্রকৃত, যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা প্রাপ্ত, তাহাই বা নয় কেন? তাহাতে কি কিছু রস নাই? কিছু সৌন্দর্য নাই। আছে বৈ কি। ঈশ্বর গুপ্ত সেই রসে রসিক, সেই সৌন্দর্যের কবি। যাহা আছে, ঈশ্বর গুপ্ত তাহার কবি। তিনি এই বাঙ্গালা সমাজের কবি। তিনি কলিকাতা সহরের কবি। তিনি বাঙ্গালার গ্রাম্য দেশের কবি।'[৫০]

চিন্তার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে কিছু পরিমাণে অনমনীয় মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রসবোধের পরিধি অভাবিত রকমের বিস্তৃত, তাঁর সাহিত্যরুচি আশ্চর্য রকমের উদার। বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবাতিরিক্ততে রস পান, রোমান্সে রস পান, আদর্শে রস পান, কল্পনায় অভিনববস্তুনির্মাণে রস পান, রোমান্টিকতায় রস পান, যে আলোক জলে স্থলে কোথাও নেই, সেই আলোকের উদ্‌ভাসে পুলকিত হন। হন বলেই তিনি যথাসময়ের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। আবার ঠিক তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবেও রস পান, যা তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর তাতেও রস পান, তিনি কলকাতা শহরের কবিতায় রস পান, বাংলার গ্রাম্য দেশের কবিতায় রস পান, পৌষপার্বণের পিঠেপুলির কবিতায় পুলকিত হন। হন বলেই তিনি লিখতে পারেন, 'ঈশ্বর গুপ্তের কাব্য চালের কাঁটায়, রান্নাঘরের ধুঁয়ায়,

৪৮. তদেব

৪৯. তদেব

তদেব, ১২৫

নাটুরে মাঝির ধ্বজির ঠেলায়, নীলের দাদনে, হোটেলের খানায়, পাঁটার অস্থি-স্থিত-মজ্জায়।'৫১

বঙ্কিমচন্দ্র সত্যের ললিত-রূপেও মুগ্ধ, আবার সত্যের কঠিন-রূপেও মুগ্ধ। তাই তিনি বলতে পারেন, 'তোমরা সুন্দরীগণকে পুষ্পোদ্যানে বা বাতায়নে বসাইয়া প্রতিমা সাজাইয়া পূজা কর, তিনি [ঈশ্বর গুপ্ত] তাহাদের রান্নাঘরে, উনুন-গোড়ায় বসাইয়া শাশুড়ী ননদের গঞ্জনায় ফেলিয়া, সত্যের সংসারের এক রকম খাঁটি কাব্যরস বাহির করেন।'৫২

সত্যের সংসার বিচিত্র, তার কাব্যরস নানারকমের। বঙ্কিমচন্দ্র নানা রসেরই রসিক। তাই শুধু যথাযথ বাস্তবতা নয়, ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গরসও তাঁকে মুগ্ধ করে। ঈশ্বর গুপ্তের শক্তি ও দুর্বলতা উভয়ের সম্পর্কেই তিনি অবহিত। দুর্বলতার কথা তিনি আগেই বলেছেন। এইবারে শক্তির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ ক'রে মন্তব্য করলেন, '...ঈশ্বর গুপ্ত Realist এবং ঈশ্বর গুপ্ত Satirist। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্য, এবং ইহাতে তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যে অদ্বিতীয়।'৫৩

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ স্থূল কিন্তু বিদ্বেষপ্রসূত নয়। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথম বঙ্গ সাহিত্যে আনয়ন করেন।'৫৪ বঙ্কিমের পূর্বে হাস্যরসই হোক আর ব্যঙ্গরসই হোক, 'শ্রাব্য অশ্রাব্য ভাষায় ভাঁড়ামি করিয়া সভাজনের মনোরঞ্জন' করাই তার কাজ ছিল।৫৫ বলা বাহুল্য, ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গরস নির্মলও নয়, শুভ্রও নয়, সংযতও নয়। ঈশ্বর গুপ্তকে ব্যঙ্গরসে অদ্বিতীয় বলার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র কি পরোক্ষভাবে ঈশ্বর গুপ্তের স্থূলতার এবং অশ্লীলতার সমর্থন করেন নি?

ঈশ্বর গুপ্তের স্থূল রঙ্গ-ব্যঙ্গকে বঙ্কিমচন্দ্র সমর্থন করেন নি, আবার তাকে নির্বিচারে ধিক্কৃতও করেন নি। প্রথমত তিনি এই স্থূলত্বের কারণ-নির্দেশ করেছেন। সচরাচর যাকে সাহিত্যের বাস্তব ব্যাখ্যা বলা হয়, বঙ্কিমচন্দ্রের

৫১. তদেব

৫২. তদেব

৫৩. তদেব, ১২৬

৫৪।৫৫. র।১৩।৮৯৬

এই আলোচনার মধ্যে তার অত্যন্ত সুন্দর নিদর্শন পাওয়া যাবে। সাহিত্যিকের উপর দেশকালের প্রভাবের—অথবা আরো ব্যাপকভাবে বললে, সাহিত্যের উপর দেশকালপাত্রের প্রভাবের প্রকৃতি নিরূপণই এই ব্যাখ্যার প্রধান লক্ষ্য। সাহিত্যবস্তুর বৈশিষ্ট্যের পেছনে যে অনেক রকম স্থূল-সূক্ষ্ম বাস্তব কার্য কারণের ক্রিয়া থাকে, এই দিকটিকে অবহেলা করলে সমালোচকের সাহিত্যদৃষ্টি যে আংশিকতার দ্বারা খণ্ডিত হয়ে পড়ে এবং তাঁর সাহিত্যবিচার যে অনধিকারীর স্পর্ধায় পরিণত হয়, বাংলা সাহিত্যের কম সমালোচকই এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সচেতন। সাহিত্য যে সমাজ সম্পর্কবিহীন শূন্যে অমূল আকাশকুসুমের মতো আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে থাকে না, সাহিত্যবিচার যে স্থানকালপাত্র-বিস্মৃত জীবনবিস্মৃত অবচ্ছিন্ন নান্দনিকতা নয়, এ সত্য, কেবল এই প্রবন্ধে নয়, বিভিন্ন সমালোচনাপ্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, প্রথমত, অনেক সময় ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা ক্রোধসম্ভূত, এবং কোনো সময়ই তা লালসা-সম্ভূত নয়। '…ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতা প্রকৃত অশ্লীলতা নহে। যাহা ইন্দ্রিয়াদির উদ্দীপনার্থ, বা গ্রন্থকারের হৃদয়স্থিত কদর্য্য ভাবের অভিব্যক্তির জন্য লিখিত হয়, তাহাই অশ্লীলতা। তাহা পবিত্র সভ্য ভাষায় লিখিত হইলেও অশ্লীল। আর যাহার উদ্দেশ্য সেরূপ নহে, কেবল পাপকে তিরস্কৃত বা উপহাসিত করা যাহার উদ্দেশ্য, তাহার ভাষা রুচি এবং সভ্যতার বিরুদ্ধ হইলেও অশ্লীল নহে। ঋষিরাও এরূপ ভাষা ব্যবহার করিতেন। সেকালের বাঙালীদিগের ইহা এক প্রকার স্বভাবসিদ্ধ ছিল।…

'ঈশ্বর গুপ্ত ধর্মাত্মা, কিন্তু সেকেলে বাঙ্গালী। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা অশ্লীল।'[৫৬]

মেকির উপর ঈশ্বর গুপ্তের যথার্থ রাগ ছিল। সংসার সমাজ তাঁকে আসলের বদলে অনেক মেকি জিনিস দিয়েছে। 'সংসারের উপর, সমাজের উপর, ঈশ্বর গুপ্তের রাগের অনেক কারণ ছিল।…সেকেলে বাঙ্গালির ক্রোধ

৫৬. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, বিবিধ, ১২৮-২৯

কদর্য্যের উপর কদর্য্য ভাষাতেই অভিব্যক্ত হইত।...এইরূপে ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতায় অশ্লীলতা আসিয়া পড়িয়াছে।'[৫৭]

সেকেলে বাঙালির বাচনিক অভ্যাস, এবং ঈশ্বর গুপ্তের বাল্য ও যৌবনের সংসার কর্তৃক প্রবঞ্চনার অভিজ্ঞতা, এছাড়াও আরো একটা কারণের উপর বঙ্কিমচন্দ্র জোর দিয়েছেন। সে হ'লো তখনকার কলকাতা শহরের কলুষিত নৈতিক আবহাওয়া। এই আবহাওয়ার প্রভাব এড়িয়ে চলা ঈশ্বর গুপ্তের পক্ষে সম্ভব ছিল না। 'তখন পূজা-পার্বণ অশ্লীল—উৎসবগুলি অশ্লীল—দুর্গোৎসবের নবমীর রাত্রি বিখ্যাত ব্যাপার। যাত্রার সঙ হইলেই লোক-রঞ্জক হইত। পাঁচালি, হাফ-আখড়াই অশ্লীলতার জন্যই রচিত। ঈশ্বর গুপ্ত সেই বাতাসে জীবন প্রাপ্ত ও বর্ধিত।'[৫৮]

অতঃপর অশ্লীলতা বা তথাকথিত অশ্লীলতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যে-কথা বলেছেন, সমস্ত সাহিত্য সমালোচকেরই সে-কথা মনে রাখা কর্তব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথার মধ্যে ঐতিহাসিক সমালোচনার একটি প্রধান সূত্র নিহিত আছে। দেশভেদে সমাজভেদে সাহিত্যের রূপ যেমন ভিন্ন, সামাজিক ভালো-মন্দের আদর্শ যেমন ভিন্ন, সামাজিক শালীনতা ও সাহিত্যিক শালীনতার মাপকাঠিও তেমনি ভিন্ন। 'এমন অনেক কথা আছে, যাহা ইংরেজেরা অশ্লীল বিবেচনা করেন, আমরা করি না। আবার এমন কথা আছে, যাহা আমরা অশ্লীল বিবেচনা করি, ইংরেজেরা করেন না।'[৫৯] আমরা পাশ্চাত্য সাহিত্য দেশি মাপকাঠিতে বিচার করি না, কিন্তু প্রাচ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য রুচির আইন প্রয়োগ করতে দ্বিধা বোধ করি না। ঈশ্বর গুপ্তকে উপলক্ষ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের এই বিচারবিভ্রাটের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেছেন। 'আমাদের দেশের অনেক প্রাচীন কবি, এইরূপ বিলাতী রুচির আইনে ধরা পড়িয়া বিনাপরাধে অশ্লীলতা অপরাধে অপরাধী হইয়াছেন। স্বয়ং বাল্মীকি, কি কালিদাসেরও অব্যাহতি নাই।...

৫৭. তদেব, ১২৯

৫৮. তদেব, ১৩০

৫৯. তদেব, ১৩০

'অন্যের ন্যায় ঈশ্বর গুপ্তও হাল আইনে অনেক স্থানে ধরা পড়েন। সে সকল স্থানে আমরা তাঁহাকে বেকসুর খালাস দিতে রাজি।'৬০

এই পর্যন্ত ব্যাখ্যা ; সমর্থন যদি বলি তো তাও এই পর্যন্তই। এর পরেই যে কথা বলে' বঙ্কিমচন্দ্র এই প্রসঙ্গ শেষ করেছেন, তা যেমন ঋজু তেমনি তীক্ষ্ণ। 'অনেক স্থানে তাঁহার [ঈশ্বর গুপ্তের] রুচি বাস্তবিক কদর্য্য, যথার্থ অশ্লীল, এবং বিরক্তিকর। তাহার মার্জনা নাই।'৬১

প্রবন্ধের সূচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ঈশ্বর গুপ্ত খাঁটি বাঙালি কবি। কথাটার সোজা অর্থ এই যে, ঈশ্বর গুপ্ত আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত কবি নন এবং ইংরেজি-শিক্ষিতের কবিও নন, তিনি অনাধুনিক কবি, ইংরেজ-পূর্ব বাংলা দেশের কবি, মধ্য যুগের কবি। কথাটা যে সর্বাংশে সত্য নয়, একথা আজ প্রায় সকলেরই সুবিদিত। কিন্তু কথাটার মধ্যে যে একটি নিহিত বেদনা আছে, তা সর্বাংশে সমূলক, সর্বাংশে সত্য। তা হ'লো এই যে, আধুনিক বাংলাসাহিত্য ছিন্নমূল সাহিত্য, দেশের সর্বজনের সাহিত্য নয়, জাতীয় সাহিত্য নয়, কেবল ইংরেজি-শিক্ষিতের সাহিত্য।

এ-কথা যে কেবল আধুনিক বাংলাসাহিত্য সম্পর্কেই সত্য নয়, আমাদের একালের সংস্কৃতির সর্ব শাখা সম্পর্কেই—ঊনবিংশ শতকের গোটা রেনেসাঁস সম্পর্কেই যে বহুলাংশে সত্য, সে সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলেন না। তবে এ-সম্পর্কে একালীন চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রে প্রত্যাশিত নয়। শিক্ষিত বাঙালির সাংস্কৃতিক বিচ্ছিন্নতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের চেতনা ততোটা বুদ্ধি-আশ্রিত নয় যতোটা হৃদয়-আশ্রিত। সেই জন্যই বোধকরি তার কারুণ্য আমাদের বেশি ক'রে মুগ্ধ করে। বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি উদ্‌ধৃত করি।—

'...আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্যবিশিষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময় বোধহয়—হোক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙ্গালী কথায়, খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাই না।...মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালার কবি। এখন আর খাঁটি

---

৬০. তদেব, ১৩১

৬১. তদেব

বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার জো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালার অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না। আমরা "বৃত্রসংহার" পরিত্যাগ করিয়া "পৌষপার্বণ" চাই না। কিন্তু তবু বাঙ্গালার মনে পৌষপার্বণে যে একটা সুখ আছে—বৃত্রসংহারে তাহা নাই। ...সে জিনিসটা একেবারে ছাড়িলে চলিবে না; দেশ শুদ্ধ জোন্‌স, গমিসের তৃতীয় সংস্করণে পরিণত হইলে চলিবে না।'[৬২]

বঙ্কিমচন্দ্রের মতো প্রখর শালীনতাবোধ ও সুরুচিবোধ সম্পন্ন লেখক কেন যে ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতাকে বিনা বাক্যব্যয়ে ধিক্কৃত করতে পারেন নি, তার আসল রহস্য এইখানে। ঈশ্বর গুপ্ত সেকেলে বাঙালি, তাঁর স্থূল রসিকতা সেকেলে বাঙালির নিজস্ব রসিকতা। হোক স্থূল, তবু বঙ্কিমচন্দ্রের মনে তার মধ্যেও একটা সুখ আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র যে ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার প্রশংসা করেছেন তার মধ্যেও এই ভাবটি অনতিপ্রচ্ছন্ন। 'যে ভাষায় তিনি পদ্য লিখিয়াছেন, এমন খাঁটি বাঙ্গালায়, বাঙ্গালীর এমন প্রাণের ভাষায় আর কেহ পদ্য কি গদ্য কিছুই লেখে নাই।...এমন বাঙ্গালীর বাঙ্গলা ঈশ্বর গুপ্ত ভিন্ন আর কেহ লেখে নাই—আর লিখিবার সম্ভবনাও নাই।'[৬৩]

কথাটার এইখানেই শেষ নয়। পূর্বে বাঙালি-ভাবের প্রসঙ্গে যা বলেছেন, ভাষার প্রসঙ্গেও তা বলা যায়ঃ আর লিখিবার জো নাই—লিখিয়া কাজ নাই। তবু, হারানো অতীতের জন্য যে বেদনা, সে বেদনা থাকবেই। শুধু তা-ই নয়, হারানো আত্মতার জন্য যে বেদনা, এখানে তা-ও এসে যুক্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই বলি।—

'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-প্রচারের জন্য আমরা যে উদ্‌যোগী, তাহার বিশেষ কারণ, তাঁহার ভাষার এই গুণ। খাঁটি বাঙ্গালা আমাদিগের বড় মিঠে লাগে—ভরসা করি, পাঠকেরও লাগিবে। এমন বলিতে চাই না যে, ভিন্ন ভাষার সংস্পর্শে ও সংঘর্ষে বাঙ্গালা ভাষার কোনো উন্নতি হইতেছে না, বা হইবে না; হইতেছে ও হইবে। কিন্তু বাঙ্গালা ভাষা যাহাতে জাতি

৬২. তদেব, ১০১

৬৩. তদেব, ১৩৭–৩৮

হারাইয়া, ভিন্ন ভাষার অনুকরণ-মাত্রে পরিণত হইয়া পরাধীনতা-প্রাপ্ত না হয়, তাহাও দেখিতে হইবে।'৬৪

ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের মধ্যে যে অতিশয়োক্তি, তাকে সংযত করার কোনো প্রয়োজন তিনি অনুভব করেন নি। এই মন্তব্য ঈশ্বর গুপ্তের ভাষার যত-না পরিচয় দেয়, তার থেকে অনেক বেশি পরিচয় দেয় বঙ্কিমচন্দ্রের হৃদয়ের, অনেক বেশি পরিচয় দেয় আমাদের সাংস্কৃতিক সংকট সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ণ না হোক অন্তত আংশিক সচেনতার।

প্রবন্ধটির প্রধান গুরুত্ব তার বিচ্ছিন্ন মন্তব্যসমূহে নয়, তার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গীতে। প্রবন্ধটি অংশত জীবনী, অংশত সমালোচনা। এবং এর সমালোচনাঅংশেরও দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা জীবনীভিত্তিক সমালোচনার দৃষ্টিভঙ্গী। এই প্রবন্ধে অল্প কথায় বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি তত্ত্ব বিবৃত করেছেন, যাকে জীবনীভিত্তিক সমালোচনার মূল সূত্র বলে'—অন্তত তার খুব কাছাকাছি বস্তু বলে' গ্রহণ করা যায়। তা হ'লো কবিজীবনের তথ্যের সাহায্যে কাব্যব্যাখ্যা এবং কাব্যের আলোকে কবিজীবনের মর্মগ্রহণ।

বঙ্কিমচন্দ্র মুখে জীবন থেকে কাব্যে যাওয়া এবং কাব্য থেকে জীবন-ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হওয়া—দু'য়ের কথাই বলেছেন বটে, কিন্তু কার্যত জীবন থেকে কাব্যেই গিয়েছেন, কাব্য থেকে জীবনে গিয়ে, কাব্যের সহায়তায় জীবন-ব্যাখ্যার কাজে প্রায় কখনোই প্রবৃত্ত হন নি। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্রের সূত্রটি কী, তা আগে লক্ষ ক'রে দেখা দরকার।

প্রথমে জীবনী ; এবং তৎপরে সাহিত্য আলোচনার মাঝামাঝি এসে হঠাৎ বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বহু-আলোচিত তত্ত্বটিকে বিবৃত করেছেন। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার দোষগুণ আলোচনা করার পর তিনি বলেছেন, 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিত্ব কি প্রকার, তাহা বুঝিতে গেলে, তাঁহার দোষ গুণ দুই-ই বুঝাইতে হয়। শুধু তাহাই নয়। তাঁহার কবিত্বের অপেক্ষা আর একটা বড় জিনিস পাঠককে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। ঈশ্বর গুপ্ত নিজে কি ছিলেন, তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতেছি।'৬৫

৬৪. তদেব, ১৩৮

৬৫. তদেব, ১৭১

এ পর্যন্ত যা বলেছেন, তা অতি স্পষ্ট, তার মধ্যে কোনো তত্ত্ব বা কোনো সমালোচনার সূত্র নেই। কিন্তু এর পরেই তিনি বলেছেন, 'কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে, কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। কবিতা দর্পণ মাত্র—তাহার ভিতর কবির অবিকল ছায়া আছে। দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব।'[৬৬]

এইখানেই তত্ত্ব এবং এইখানেই প্রশ্ন। কাব্য থেকে জীবনে যাওয়া—কবিতা দিয়ে জীবনের ব্যাখ্যা কি সত্যিই সম্ভব? তা যদি বা সম্ভব হয়, অন্যের পক্ষে যা-ই হোক না কেন, যিনি জীবনের তথ্য দিয়ে—দেশকালপাত্র দিয়ে কাব্য ব্যাখ্যা করেন, তাঁর পক্ষে এটা চক্রক-দোষ। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যের কুরুচি ও অশ্লীলতার প্রসঙ্গে বলেছেন, 'এখানে দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া দেখিতে হইবে। তাই আমি দেশের রুচি বুঝাইলাম, কালের রুচি বুঝাইলাম এবং পাত্রের রুচি বুঝাইলাম। বুঝাইলাম যে, পাত্রের রুচির অভাবের কারণ, (১) পুস্তকদত্ত সুশিক্ষার অল্পতা, (২) মাতার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৩) সহধর্মিনী, অর্থাৎ যাহার সঙ্গে একত্র ধর্ম শিক্ষা করি, তাঁহার পবিত্র সংসর্গের অভাব, (৪) সমাজের অত্যাচার, এবং তজ্জনিত সমাজের উপর কবির জাতক্রোধ। যে মেঘে প্রভাকরের তেজোহ্রাস করিয়াছিল, এই সকল উপাদানে তাহার জন্ম।'[৬৭]

ঠিক এইটুকুই খাঁটি জীবনীভিত্তিক সমালোচনার অভীষ্ট। কাব্য থেকে জীবনব্যাখ্যা তার অভিপ্রায়ের অন্তর্গত নয়। তবু যে অনেক সময় তার মধ্যে কাব্য থেকে জীবনে যাওয়ার একটা প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তার মূল সমালোচকের রোমান্টিকতায়—কাব্য ও জীবন যে অভিন্ন, কাব্য যে কবিরই অবিকল ছায়া, এই বিশ্বাসে।

কার্যক্ষেত্রে যা-ই ক'রে থাকুন না কেন, অনেকটা এই রোমান্টিক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'দর্পণ বুঝিয়া কি হইবে? ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব। কবিতা, কবির কীর্তি—তাহা ত

৬৬. তদেব

৬৭. তদেব, ১৩২

আমাদের হাতেই আছে—পড়িলেই বুঝিব। কিন্তু যিনি এই কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তিনি কি গুণে, কি প্রকারে এই কীর্তি রাখিয়া গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে। তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান শিক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।'[৬৮]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাগুলো স্বভাবতই কতকগুলি প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে। কবিতা কি সত্যিই দর্পণ মাত্র? জীবনী ও সমালোচনা কি এক? তাদের উদ্দেশ্য কি অভিন্ন? জীবনীই হোক, সমালোচনাই হোক, তা কি প্রধানত শিক্ষামূলক বস্তু? সমালোচকের লক্ষ্য কোন্‌টা—কবি, না তাঁর কাব্য?

এই প্রবন্ধের তের বছর আগে বঙ্গদর্শনের একটি সম্পাদকীয় কৈফিয়তে (১২৭৯ কার্তিক, ১৮৭২) সমালোচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র যা বলেছেন, তা আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। প্রয়োজনীয় অংশটি আবার উদ্ধৃত করি: '...গ্রন্থকারের নিন্দা বা প্রশংসা সমালোচনার উদ্দেশ্য নহে।...গ্রন্থ পাঠ করিয়া পাঠক যে সুখলাভ বা যে জ্ঞানলাভ করিবেন, তাহা অধিকতর স্পষ্টীকৃত বা তাহার বৃদ্ধি করা; গ্রন্থকার যেখানে ভ্রান্ত হইয়াছেন, সেখানে ভ্রম সংশোধন করা; যে গ্রন্থে সাধারণের অনিষ্ট হইতে পারে, সেই গ্রন্থের অনিষ্টকারিতা সাধারণের নিকট প্রতীয়মান করা; এইগুলি সমালোচনার উদ্দেশ্য।'[৬৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই অভিমতকে যদি গ্রহণ করি, তাহলে জীবনী ও সমালোচনার অভিন্নতা বা উভয়ের উদ্দেশ্যের অভিন্নতা স্বীকার করা যায় না। সমালোচনা যে নিছক শিক্ষামূলক তা-ও মানা যায় না। এবং এই কথাই স্পষ্ট ক'রে বলতে হয় যে, সমালোচনার লক্ষ্য কবি নন, সমালোচনার একমাত্র লক্ষ্য কাব্য।

এইবারে দর্পণের প্রসঙ্গ। কবিতা কি সত্যিই দর্পণ? ক্লাসিকপন্থীরা এই রকম বলেন বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আধা-রোমান্টিক বা প্রায়-রোমান্টিকও কি সেই কথা বলবেন? বঙ্কিমচন্দ্রের কথার মর্ম বুঝতে হ'লে দর্পণে কী প্রতিবিম্বিত হচ্ছে, সেইটে বুঝে দেখতে হবে। রোমান্টিকরা

---

৬৮. তদেব, ১৩১

৬৯. নূতন গ্রন্থের সমালোচনা, বিবিধ, ৩০৫

সাধারণভাবে কাব্যকে বা আর্টকে দর্পণ বলেন না বটে, কিন্তু তাঁদের কোনো কোনো শাখা ইচ্ছে করলে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অর্থে কাব্যকে আর্টকে দর্পণ বললেও বলতে পারেন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে কাব্যকে সেই অর্থেই দর্পণ বলেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের যে-মতের সঙ্গে আমরা এর পূর্বেই পরিচিত হয়েছি, তার সঙ্গে এ-মতের সঙ্গতি নেই।

ক্লাসিকপন্থীরা বলেন, কবিতা প্রকৃতির অনুকরণ, জগৎ ও জীবনের অনুকরণ—স্বভাবের দর্পণ। ছায়া যদি বলতে হয়, তাহলে স্বভাবের ছায়া। রোমান্টিকেরা বলেন, কবিতা স্বভাবানুকারী নয়, কবিতা স্বভাবাতিরিক্ত—স্বাধীন কল্পনার অভিনব সৃষ্টি। কোনো কোনো রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রী বলেন, কবিতা কবির হৃদয়স্থ ভাবের প্রকাশ। গীতিকাব্যের আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও অনেকটা এই রকম বলেছেন। রোমান্টিকেরা অনেক সময় আরো একটা কথা বলেন। তাঁরা বলেন, কবিতা কবির আত্ম-প্রকাশ—কবির যথার্থ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, কবিসত্তার আত্মপ্রকাশ। ছায়া যদি বলতে হয়, তাহ'লে বলতে হবে, কবিতা কবিরই ছায়া। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সেই অর্থেই কবিতাকে দর্পণ বলেছেন।

এর পূর্বে, যেমন 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে, এ-বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের যে অভিমতের পরিচয় আমরা পেয়েছি, তা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। কবিতা যে-কবির আত্মপ্রকাশ, কবিতা যে স্বয়ং কবির ছায়া—অবিকল কবিরই ছায়া, এমন কথা 'উত্তরচরিতে' অথবা অন্য কোথাও বঙ্কিমচন্দ্র আগে কখনোই বলেন নি।

এমন কথা কি বঙ্কিমচন্দ্র সত্যিই বলতে চান যে, কবিতামাত্রেই কবির ছবি, 'বিবিজান চলে যান লবেজান ক'রে'—এই কবিতা ঈশ্বর গুপ্তের যথার্থ প্রতিকৃতি?

কবিতাকে যদি কবির ছায়া বলে স্বীকার ক'রেও নিই, তাতে জীবনী-কারের আনন্দ, সমালোচকের কোনো লাভ-ক্ষতি নেই। কারণ সমালো-চকের প্রথম এবং শেষ লক্ষ্য ওই তথাকথিত ছায়াটাই—কবি নয়, কবিতাই। সৌভাগ্যের কথা, বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর এই প্রবন্ধে ছায়া থেকে কায়ার সন্ধানে যাত্রা করেন নি। কবিজীবনের তথ্যকে তিনি কবিতা-ব্যাখ্যার কাজে

ব্যবহার করেছেন, কিন্তু কবিতার দ্বারা বা কাব্যমধ্যগত কোনো উক্তির দ্বারা তিনি কবিজীবনের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন নি। তাঁর প্রবন্ধের জীবনী-অংশের লক্ষ্য জীবন, সমালোচনা-অংশের লক্ষ্য সমালোচনা। দুয়েরই লক্ষ্য এক—কার্যত এ-তত্ত্ব তিনি মানেন নি। 'ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দেখিয়া তাহাকে বুঝিব'—এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করতে চেষ্টা করেন নি।

৮

'রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা' যদিও ঈশ্বর গুপ্ত বিষয়ক প্রবন্ধের মতোই ভূমিকা-জাতীয় রচনা, তাহ'লেও কার্যত এ-রচনাটি দুটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের মিলিত রূপ। ঈশ্বর গুপ্ত বিষয়ক প্রবন্ধের মতো এরও প্রথম অংশ জীবনী, দ্বিতীয় অংশ সমালোচনা। কিন্তু এখানে অংশ দুটি সম্পূর্ণ পৃথক, একের সঙ্গে অপরের সম্পর্ক যৎসামান্য। বস্তুত, কোনো আভ্যন্তরীণ যোগই নেই। দুই অংশের রচনাকালের মধ্যেও দশ বছরের ব্যবধান। জীবনী-অংশটি রচিত হয়েছে বাংলা ১২৮৩ সালে (১৮৭৭ খ্রীঃ), দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলীর প্রথম সংস্করণের জন্য, ঈশ্বর গুপ্ত বিষয়ক প্রবন্ধের আট নয় বছর আগে। 'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব' শীর্ষক সমালোচনাটি লিখেছেন জীবনী-অংশের প্রায় দশ বছর পরে, বাংলা ১২৯৩ সালে (১৮৮৬ খ্রীঃ) ঈশ্বর গুপ্ত বিষয়ক প্রবন্ধেরও বৎসরাধিক কাল পরে, দীনবন্ধু-গ্রন্থাবলীর পূর্ণতর একটি সংস্করণের জন্য। সেই সংস্করণে পূর্বের জীবনী-অংশ এবং 'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব' শীর্ষক সংযোজন একসঙ্গে প্রকাশিত হয়।

'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব' শীর্ষক এই সংযোজনটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সমালোচনা-প্রবন্ধ। এ সমালোচনা দীনবন্ধুর জীবনের তথ্যাবলীকে ভিত্তি ক'রে রচিত হয় নি। সে দিক থেকে একে খাঁটি জীবনীভিত্তিক সমালোচনা বলা যায় না। কিন্তু জীবনের খুঁটিনাটি তথ্য না হলেও, দীনবন্ধুর রুচি, প্রবণতা—দীনবন্ধুর স্বভাবের বিশিষ্টতা এ-প্রবন্ধের অন্যতম প্রধান অবলম্বন। সে দিক থেকে, শিথিল অর্থে একে জীবনীভিত্তিক সমালোচনার আত্মীয় বলে' গণ্য করা যেতে পারে।

'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব' বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাসাহিত্যের অত্যুজ্জ্বল রত্নসমূহের একটি—আমাদের বিবেচনায় এইটেই উজ্জ্বলতম। শুধু বঙ্কিম-সাহিত্যে নয়, রবীন্দ্রনাথের 'মেঘদূত', 'রাজসিংহ' বা 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র মতো নিতান্ত দু একটি প্রবন্ধ, যা সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের বলেই এর সঙ্গে তুলিত হবার মতো নয়, তাদের কথা বাদ দিলে, সমগ্র বাংলা সমালোচনাসাহিত্যেও এ-প্রবন্ধ অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

দীনবন্ধুর সহানুভূতির প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, সহানুভূতির গভীরতা ও ব্যাপ্তির কারণে—তীব্র সহানুভূতির কারণে 'তিনি [দীনবন্ধু] নিমচাঁদ দত্তের ন্যায় বিশুষ্ক-জীবন-সুখ, বিফলীকৃতশিক্ষা, নৈরাশ্য-পীড়িত মদ্যপের দুঃখ বুঝিতে পারিতেন ;······গোপীনাথের ন্যায় নীলকরের আজ্ঞাবর্তিতার যন্ত্রণা বুঝিতে পারিতেন।···এ সহানুভূতি কেবল দুঃখের সঙ্গে নহে ; সুখ দুঃখ রাগ দ্বেষ সকলেরই সঙ্গে তুল্য সহানুভূতি। আদুরীর বাউটি পৈঁছার সুখের সঙ্গে সহানুভূতি, তোরাপের রাগের সঙ্গে সহানুভূতি, ভোলাচাঁদ যে শুভ কারণবশতঃ শ্বশুরবাড়ী যাইতে পারে না, সে সুখের সঙ্গেও সহানুভূতি। সকল কবিরই এ সহানুভূতি চাই।'[৭০]

এ সহানুভূতি বঙ্কিমচন্দ্রেরও ছিল। শুধু তা-ই নয়, দীনবন্ধুর সহানুভূতিকে প্রত্যক্ষ করার, সশরীরী করার মতো কল্পনাশক্তিও বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল। এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'সহানুভূতি প্রধানতঃ কল্পনাশক্তির ফল। আমি আপনাকে ঠিক অন্যের স্থানে কল্পনার দ্বারা বসাইতে পারিলেই তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি জন্মে।'[৭১]—দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে যা-ই হোক না কেন, বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাশক্তি অতি প্রবল, সহানুভূতি তাঁর কল্পনার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন। এই কল্পনা সৃজনশীল কল্পনা। সৃজনীকল্পনার সাহায্য ভিন্ন সার্থক সমালোচনা সম্ভব নয়।

তা হ'লেও, সমালোচনায় সৃজনীকল্পনার সাহায্য গ্রহণ, আর সমগ্র সমালোচনাকে সৃজনধর্মী ক'রে তোলা এক কথা নয়। 'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব' বিশিষ্ট অর্থে সৃজনশীল সমালোচনা নয়। 'মেঘদূত', 'রাজসিংহ'

৭০. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, বিবিধ, ৯৪-৫

৭১. তদেব, ৯৫

বা 'কাব্যের উপেক্ষিতা'-র শক্তির উৎস সমালোচ্য গ্রন্থের সৃজনধর্মী পুনর্গঠনে, সমালোচ্য গ্রন্থকে অবলম্বন ক'রে স্বাধীন রসসৃষ্টিতে। 'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব' সম্পর্কে সে-কথা বলা যাবে না। সৃজনে তার শক্তির উৎস নয়। তার আসল লক্ষ্য ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, বিচার।

এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বক্তব্য বিষয় কয়েকটি পর্যায়ে বিন্যস্ত ক'রে নিয়েছেন। সেই পর্যায় অনুসারে অগ্রসর হওয়াই এখানে আমাদের পক্ষে সুবিধাজনক।

প্রথমেই কালের প্রসঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দিষ্ট কাল হল ১৮৫৯/৬০ খ্রীষ্টাব্দ। ১৮৫৯-এ ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু। সেই বছরই মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' কাব্য প্রকাশিত হতে আরম্ভ হয়। তার পরের বছর দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। এই প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'সেই ১৮৫৯/৬০ সাল বাঙ্গালা সাহিত্যে চিরস্মরণীয়—উহা নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। পুরান দলের শেষ কবি ঈশ্বরচন্দ্র অস্তমিত, নূতনের প্রথম কবি মধুসূদনের নবোদয়। ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙ্গালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। দীনবন্ধু ইহাদের সন্ধিস্থল। বলিতে পারা যায় যে, ১৮৫৯/৬০ সালের মত দীনবন্ধুও বাঙ্গালা কাব্যের নূতন পুরাতনের সন্ধিস্থল।'[৭২]

বঙ্কিমচন্দ্রের কথাগুলির সাধারণ সত্যতা প্রশ্নাতীত, কিন্তু আক্ষরিকভাবে নিলে অনেক কথাতেই আপত্তি হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, ঈশ্বরচন্দ্র খাঁটি বাঙালী, মধুসূদন ডাহা ইংরেজ। খাঁটি বাঙালী অর্থ যদি হয় সম্পূর্ণ অনাধুনিক, খাঁটি মধ্যযুগীয়, তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের এ-উক্তি সর্বাংশে সত্য নয়। ডাহা ইংরেজ অর্থ যদি হয় সর্বাংশে আধুনিক, তাহ'লে মধুসূদন সম্পর্কে এ-কথায় আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু ডাহা ইংরেজ অর্থ যদি হয় সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য-ভাবাপন্ন, ভারতীয় সংস্কৃতিধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, তাহ'লে এ-উক্তিও বহুলাংশে ভ্রান্ত।

বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, দীনবন্ধু নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থল। এ-কথাই কি সর্বাংশে সত্য? দীনবন্ধু যদি কেবল কবিতাই রচনা করতেন বা কেবল স্থূল

৭২ তদেব, ৯১

রঙ্গরসেই নিঃশেষিত হয়ে যেতেন, তাহলে তাঁকে নূতন ও পুরাতনের সন্ধিস্থল বললে ভুল হ'তো না, কারণ এই সব ক্ষেত্রে তিনি অনেকখানি পরিমাণে ঈশ্বর গুপ্তেরই অনুগামী ছিলেন, অথচ কিছু নতুনত্বও, কিছু একালীনত্বও তার মধ্যে ছিল। কিন্তু বাংলাসাহিত্যে দীনবন্ধুর পরিচয় তাঁর কবিতাতেও নয়, মোটা রঙ্গরসেও নয়, বাংলাসাহিত্যে তাঁর পরিচয় শক্তিশালী এবং দোসরহীন নাট্যকীর্তি 'নীলদর্পণে', যন্ত্রণাবহ বেদনাগর্ভ কমেডি 'সধবার একাদশী'-তে। কাব্যের ক্ষেত্রে 'মেঘনাদবধ' যতোখানি অভিনব, 'কুলীনকুলসর্বস্ব' বা 'শর্মিষ্ঠা'র নাট্যধারায়, এবং 'পদ্মাবতী'র সমবয়স্ক হিসেবে নাটকের ক্ষেত্রে 'নীলদর্পণ'ও, ঠিক ততোখানি না হোক, তার থেকে নিতান্ত কম অভিনবত্বের দাবি করে না। সেই সঙ্গে মনে রাখতে হবে, 'সধবার একাদশী' নূতন-পুরাতনের সন্ধিস্থল নয়, 'সধবার একাদশী' ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগের আধুনিকতম নাটক এবং তার আধুনিকত্ব আজও সম্পূর্ণ ফুরিয়ে যায় নি। মনে রাখতে হবে, নিমচাঁদ কোনো কোনো দিক থেকে একালের অনেক বিশুষ্ক-জীবন-সুখ, বিফলীকৃত-শিক্ষা নায়কের আদি-পুরুষ এবং আমাদের গৌরবোজ্জ্বল রেনেসাঁসের অন্তরস্থ অন্ধকারের দিকে নির্ভুল অঙ্গুলিনির্দেশ।

আগেই বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির মর্মসত্য অবশ্যস্বীকার্য। ঈশ্বর গুপ্তের তুলনায় মধুসূদন অনেক বেশি আধুনিক; দীনবন্ধুর তুলনায় মধুসূদন অনেক বেশি পাশ্চাত্য ভাবে পুষ্ট; মধুসূদনের তুলনায় দীনবন্ধুর রচনায়—বিশেষত তাঁর স্বল্পখ্যাত রচনাগুলিতে প্রাচীনের জের অনেক বেশি পরিমাণে লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় পর্যায় গুরু-শিষ্য সংবাদ: রুচিতে, হাস্যরসে, প্রাত্যহিক জীবনের খুঁটিনাটির বর্ণনাযুক্ত কবিতায় দীনবন্ধু ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যশিষ্য, এবং গুরুর কবি-স্বভাবের অধিকারী। দীনবন্ধুর ব্যঙ্গ ও রসিকতা অনেকটা ঈশ্বর গুপ্তের মতো—বা সেকেলে বাঙালীর মতো মোটা-ব্যঙ্গ, মোটা-রসিকতা। সে বস্তু আজ আর নেই। এখন সুক্ষ্ম ব্যঙ্গ, সূক্ষ্ম রসিকতার যুগ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে শুচিশুভ্র হাস্যরসের, সূক্ষ্ম ও মার্জিত ব্যঙ্গের পক্ষপাতী। রবীন্দ্রনাথের 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধের সাক্ষ্য থেকে জানতে পারি, 'নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথম বঙ্গসাহিত্যে আনয়ন করেন।'[৭৩] অথচ যা-কিছু সেকেলে

৭৩. বা।১৩।৮৯৬

বাঙালীর ঐতিহ্যবাহী, তার প্রতিই বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর মমতা। ব্যাপারটা বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে খানিকটা উভয় সঙ্কটের মতো। ঈশ্বর গুপ্তের অশ্লীলতার প্রসঙ্গেও আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের এই উভয়-সঙ্কটের পরিচয় পেয়েছি। এই উভয়-সঙ্কটের যে দ্বৈত-সত্তার বিড়ম্বনা আছে, তাকে না-বুঝলে ঊনবিংশ শতকের রেনেসাঁসের অনেকখানিই আমাদের না-বোঝা থেকে যাবে।

এইবারে আসল বিষয়—সৃষ্টিক্ষমতার কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষাতেই বলি।—

'কবির প্রধান গুণ, সৃষ্টিকৌশল। ঈশ্বর গুপ্তের এ ক্ষমতা ছিল না। দীনবন্ধুর এ শক্তি অতি প্রচুর পরিমাণে ছিল।...তবে, যাহা সূক্ষ্ম, কোমল, মধুর, অকৃত্রিম, করুণ, প্রশান্ত—সে সকলে দীনবন্ধুর তেমন অধিকার ছিল না। ...কিন্তু যাহা স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ত, তাহা তাঁহার ইঙ্গিত মাত্রেরও অধীন। ওঝার ডাকে ভূতের দলের মত স্মরণমাত্র সারি দিয়া আসিয়া দাঁড়ায়।'৭৪

যা মধুর, যা কোমল তাতে কেন-যে দীনবন্ধুর অধিকার ছিল না, কেন-যে দীনবন্ধুর অধিকার স্থূল-অসংলগ্ন-অসঙ্গততে সীমাবদ্ধ, এ-প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে। একটু পরে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যে সূত্র দিয়েছেন, তা থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, মধুর কোমল, করুণ, প্রশান্ত, অকৃত্রিমের বিষয়ে দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা ছিল না, তাঁর সমস্ত অভিজ্ঞতাই স্থূল, অসঙ্গত, অসংলগ্ন, বিপর্যস্ততে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এখানে, প্রবন্ধের এই পর্যায়ে, এ-রকম কোনো ব্যাখ্যা বঙ্কিমচন্দ্র দেন নি। দীনবন্ধুর জীবনের কোনো তথ্যকে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে ব্যাখ্যার সূত্র হিসেবে পরিবেশন করেন নি। ঈশ্বর গুপ্তের রুচির স্থূলতার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র দেশ ও কাল সম্পর্কিত তথ্য দিয়েছেন। একে ঐতিহাসিক সমালোচনার নিদর্শন বলে' গ্রহণ করা যায়। তিনি পাত্র সম্পর্কেও মূল্যবান তথ্য পরিবেশন করেছেন: শিক্ষার অভাব, মাতার সংসর্গের অভাব, সহধর্মিণীর পবিত্র সংসর্গের অভাব, সমাজের অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া। একে— এই অংশকে জীবনীভিত্তিক সমালোচনারূপে, ঐতিহাসিক সমালোচনার একটি

৭৪. বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী, বিবিধ, ৮২

বিশেষ শাখারূপে গ্রহণ করা যায়। কিন্তু দীনবন্ধুর সাহিত্যে ভূতের দলের প্রাদুর্ভাব দীনবন্ধুর কোন্ অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত তা বঙ্কিমচন্দ্র বলেন নি। সেই কারণে এই প্রবন্ধকে—অন্তত প্রবন্ধের এই অংশকে আমরা জীবনীভিত্তিক কি ঐতিহাসিক সমালোচনার নিদর্শন বলে' গণ্য করতে পারি না।

দশ বছর আগে রচিত 'জীবনী' অংশের মূল লক্ষ্য যদিও জীবনী এবং যদিও বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে স্পষ্ট বলেছেন যে, দীনবন্ধুর গ্রন্থসমালোচনা তাঁর প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, তাহলেও সে অংশে ইতস্তত অনেক সমালোচনা-জাতীয় উক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। সেইগুলিকে বরং জীবনীভিত্তিক সমালোচনার অতি-সংক্ষিপ্ত নমুনা হিসেবে ধরা যেতে পারে।

জীবনী-অংশে কিন্তু এমন একটিও ইঙ্গিত নেই যা থেকে স্থূল বা অসঙ্গত বা বিপর্যস্ত বা কর্কশের প্রতি দীনবন্ধুর আকর্ষণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কোমল ও মধুরের যে-সংস্পর্শ থেকে ঈশ্বর গুপ্ত বঞ্চিত, দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা সে-ক্ষেত্রে বরং সম্পূর্ণ বিপরীত। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই বলেছেন, 'একটি দুর্লভ সুখ দীনবন্ধুর কপালে ঘটিয়াছিল। তিনি সাধ্বী স্নেহশালিনী পতিপরায়ণা পত্নীর স্বামী ছিলেন।...দীনবন্ধু চিরদিন গৃহসুখে সুখী ছিলেন।[৭৫]

এ থেকে বোধ করি এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, জীবনীভিত্তিক সমালোচনা সহজসাধ্য নয়—সকলের জন্য নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের মতো সংবেদনশীল, শক্তিশালী অথচ সংযত কল্পনাশক্তির অধিকারী, আশ্চর্য অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন, বিচারশীল এবং দীনবন্ধু-বিষয়ে তথ্যজ্ঞ সমালোচকও জীবনীভিত্তিক ব্যাখ্যাকে খুব বেশি দূর প্রশ্রয় দেন নি।

সমালোচক যতোক্ষণ জীবনীকার বা ঐতিহাসিক রূপে কবিজীবনের প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী না দিচ্ছেন, সমালোচক যতোক্ষণ শিক্ষিত পেশাদার মনোবিজ্ঞানী রূপে, মনোরোগের বিশেষজ্ঞ বা স্বীকৃত চিকিৎসক রূপে কবিজীবনের তথ্যের সঙ্গে কবির মানস-প্রতিক্রিয়ার এবং সেই সূত্রে তাঁর রচনার কার্যকারণ সংযোগ নিশ্চিত ভাবে প্রমাণ ক'রে না দিচ্ছেন, ততোক্ষণ আমরা ধ'রে নেব, জীবনীভিত্তিক বা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার বহুবিতর্কিত এবং বিপজ্জনক

৭৫. তদেব, ৯১

ভূমিকে সমালোচক আদৌ তাঁর স্বক্ষেত্র বলে' মনে করেন না। ততোক্ষণ আমরা ধ'রে নেব যে, সমালোচকের মতে, কবিস্বভাবভেদনিবন্ধনই কোনো কবির রচনায় কোমলের প্রাধান্য, কোনো কবির রচনায় কঠোরের প্রাধান্য, আবার কোনো কবির রচনায় ভূতপ্রেতের বাহুল্য।

এইবারে দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির প্রসঙ্গ। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে জীবনের কোনো ঘটনাবিশেষের কথা বা কোনো তথ্যবিশেষের কথা বলছেন না। সাধারণভাবে অভিজ্ঞতার বিস্তারের কথাই বলছেন। আর সহানুভূতি তো আদৌ তথ্য নয়, সহানুভূতি একটি প্রবণতা বা বৃত্তি—একটি চারিত্রিক গুণ। বঙ্কিমচন্দ্র-কথিত অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতির সূত্র ব্যাখ্যার সূত্র বটে, কিন্তু তা মোটেই ঘটনাভিত্তিক বা তথ্যভিত্তিক নয়। বরং তাকে কবিস্বভাবের বিশেষত্ব-ভিত্তিক ব্যাখ্যা বলতে পারি।

সেদিনের বাংলা সমাজ সম্বন্ধে দীনবন্ধুর বহুদর্শিতা বঙ্কিমচন্দ্রের বিস্ময় উদ্রেক করেছে। 'ক্ষেত্রমণির মত গ্রাম প্রদেশের ইতর লোকের কন্যা, আদুরীর মত গ্রাম্যা বর্ষীয়সী, তোরাবের মত গ্রাম্য প্রজা, রাজীবের মত গ্রাম্য বৃদ্ধ, নশীরাম ও রতার মত গ্রাম্য বালক, পক্ষান্তরে নিমচাঁদের মতো সহুরে শিক্ষিত মাতাল, অটলের মত নগরবিহারী গ্রাম্য বাবু, কাঞ্চনের মত মনুষ্যশোণিতপায়িনী নগরবাসিনী রাক্ষসী ..উড়ে বেহারা, দুলে বেহারা, পেঁচোর মা কাওরাণীর মত লোকের পর্যন্ত তিনি নাড়ীনক্ষত্র জানিতেন। তাহারা কি করে, কি বলে, তাহা ঠিক জানিতেন। কলমের মুখে তাহা ঠিক বাহির করিতে পারিতেন,—আর কোন বাঙ্গালী লেখক তেমন পারে নাই।...এটুকু গেল তাঁহার Realism, তাহার উপর Idealize করিবার বিলক্ষণ ক্ষমতা ছিল। সম্মুখে জীবন্ত আদর্শ রাখিয়া, আপনার স্মৃতির ভাণ্ডার খুলিয়া, তাহার ঘাড়ের উপর অন্যের গুণ দোষ চাপাইয়া দিতেন। যেখানে যেটি সাজে, তাহা বসাইতে জানিতেন।'[৭৬]

অভিজ্ঞতার বহুলতা ও বৈচিত্র্যের ফলেই দীনবন্ধুর সৃষ্টিতে এতো বহুলতা ও বৈচিত্র্য এসেছে। দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতার ঐশ্বর্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা

৭৬. তদেব, ৯৩-৪

অনুমান-লব্ধ নয়, দীনবন্ধুর রচনাবলী পাঠ করার ফল নয়, এ ধারণার উৎস দীনবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং ঘনিষ্ঠ পরিচয়। তা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্র এখানে বিষয়টাকে একটু উল্টো দিক থেকেও দেখতে চেষ্টা করেছেন। তিনি তিনি বলেছেন, 'এই সকল সৃষ্টির বাহুল্য ও বৈচিত্র্য বিবেচনা করিলে, তাঁহার [দীনবন্ধুর] অভিজ্ঞতা বিস্ময়কর বলিয়া বোধ হয়।'৭৭

এর পরই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'কিন্তু কেবল অভিজ্ঞতায় কিছু হয় না, সহানুভূতি ভিন্ন সৃষ্টি নাই। দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাই বিস্ময়কর নহে—তাঁহার সহানুভূতিও অতিশয় তীব্র।...সকল শ্রেণীর লোকের সঙ্গেই তাঁহার তীব্র সহানুভূতি।...কেবল গরীব দুঃখীর সঙ্গে নহে; ইহা সর্বব্যাপী।'৭৭ক —দীনবন্ধুর সৃষ্ট বিভিন্ন ধরণের চরিত্রের দৃষ্টান্ত দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, অভিজ্ঞতার বিস্তার, সহানুভূতির তীব্রতা, এই হ'লো দীনবন্ধুর শক্তির উৎস।

এর পরেই, সাহিত্যতত্ত্বগত যে ভিত্তিভূমির উপর প্রবন্ধটি দাঁড়ানো তার প্রসঙ্গ। অর্থাৎ সহানুভূতি ও কল্পনার সম্পর্কের প্রসঙ্গ। অথবা বলতে পারি বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাতত্ত্ব।

বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা থেকে মনে হয়, তাঁর মতে সার্থক সাহিত্যরচনার জন্য সাহিত্যিকের তিনটি জিনিসের প্রয়োজন। এক, অভিজ্ঞতা। দুই, সহানুভূতি। তিন, কল্পনাশক্তি। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, দীনবন্ধুর প্রথম দুটি খুব প্রবল, তৃতীয়টি, অর্থাৎ কল্পনাশক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল।

এর পরেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, 'সহানুভূতি প্রধানতঃ কল্পনাশক্তির ফল।'৭৮—এই বাক্যটিতে এবং এই বাক্যের 'প্রধানতঃ' কথাটিতে বেশ খানিকটা জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। যদি বলতেন, সহানুভূতি সম্পূর্ণভাবে কল্পনাশক্তির ফল, তাহলে কোন জটিলতা থাকতো না। কিন্তু সে ক্ষেত্রে—কাব্যসৃষ্টির পক্ষে তিনটি নয়, দুটি জিনিসের প্রয়োজন বললেই চলতো। সহানুভূতি যেহেতু কল্পনারই অঙ্গ, তার নাম আলাদা ক'রে উল্লেখ বাহুল্য।'

৭৭. তদেব, ৯৪, (উদ্‌ধৃত উক্তিটিকে সাহিত্য থেকে জীবনে পৌঁছুবার একটি দৃষ্টান্ত হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।)

৭৭ক. তদেব

৭৮. তদেব, ৯৫

সার্থক কাব্যসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন অভিজ্ঞতার আর কল্পনাশক্তির—এই কথা বললেই যথেষ্ট হ'তো।

বঙ্কিমচন্দ্র তা বলেন নি। উদ্‌ধৃত বাক্যের 'প্রধানতঃ' শব্দটির ইঙ্গিত এই যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে সহানুভূতি কল্পনাশক্তির ফল নয়। তার ক্ষেত্র নির্দেশ করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, 'কিন্তু আবার এমন শ্রেণীর লোকও আছেন, যে, দয়া প্রভৃতি কোমল বৃত্তি সকল তাঁহাদের স্বভাবে এত প্রবল, যে, সহানুভূতি তাঁহাদের স্বতঃসিদ্ধ, কল্পনার সাহায্যের অপেক্ষা করে না।'৭৯—বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য স্বীকার করেছেন যে, মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মতে, সমস্ত সহানুভূতির পেছনেই কল্পনার ক্রিয়া আছে, কোথাও তা প্রকাশ্য, কোথাও তা প্রচ্ছন্ন—অর্থাৎ সহানুভূতি ও কল্পনাশক্তি সম্পূর্ণ অচ্ছেদ্য। মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের এই অভিমত মুখে স্বীকার করলেও, কার্যত একে খুব গুরুত্ব দেন নি। কল্পনা ও সহানুভূতি যে সর্বক্ষেত্রেই অচ্ছেদ্য, হৃদয়বৃত্তি যে সর্বক্ষেত্রেই কল্পনানির্ভর, এ-কথা বঙ্কিমচন্দ্র, অন্তত কার্যক্ষেত্রে, বিশ্বাস করেন না। তাই তিনি মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের মত উল্লেখ করায় পরও অনায়াসে বলতে পেরেছেন, 'তাই না হয় হইল, তথাপিও একটা প্রভেদ হইল। প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোকের [যাঁদের কল্পনা-শক্তি হৃদয়বৃত্তি অপেক্ষা প্রবলতর] সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের [যাঁদের হৃদয়বৃত্তি কল্পনা অপেক্ষা প্রবলতর] সহানুভূতি তাঁহাদের ইচ্ছাধীন নহে, তাঁহারাই সহানুভূতির অধীন। এক শ্রেণীর লোক যখন মনে করেন, তখনই সহানুভূতি আসিয়া উপস্থিত হয়, নহিলে সে আসিতে পারে না; সহানুভূতি তাঁহাদের দাসী। অপর শ্রেণীর লোকেরা নিজেই সহানুভূতির দাস, তাঁহারা তাকে চান বা না চান, সে আসিয়া ঘাড়ে চাপিয়াই আছে, হৃদয় ব্যাপিয়া আসন পাতিয়া বিরাজ করিতেছে।'৮০

এই উক্তিতে কল্পনা ও সহানুভূতির মধ্যে যে সূক্ষ্ম বিরোধের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে, এবং এর মধ্যে চরিত্রধর্মের দিক থেকে মনুষ্যজাতিকে যেরকম পরিপাটি দুটি পৃথক্ শ্রেণীতে ভাগ ক'রে দেওয়া হয়েছে, সেইখানেই দীনবন্ধুর সাহিত্য সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যের তত্ত্বগত ভিত্তি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের

৭৯. তদেব, ৯৫

৮০. তদেব, ৯৫

এই কল্পনাতত্ত্বে বঙ্কিমচন্দ্র কি কল্পনার ক্রিয়াকে অযথা সংকীর্ণ ক'রে দেখছেন না? মনুষ্যজাতিকে এইভাবে দ্বিখণ্ডিত করার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র কি অকারণ কৃত্রিমতার সৃষ্টি করছেন না?

একটু লক্ষ করলেই দেখতে পাবো, বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনায় রবীন্দ্রনাথের কল্পনাতত্ত্ব অনেক প্রশস্ততর। দুজনের সাহিত্যতত্ত্বের মৌলিক ভেদের স্বরূপটি উভয়ের কল্পনাসম্পর্কিত ধারণার মধ্যে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে প্রায় প্রথমাবধিই সহানুভূতি আর কল্পনার নিবিড় সংযোগ—সংযোগ না বলে বরং ঐক্য বলাই সংগত, কল্পনা ও সহানুভূতির ঐক্য একটি মূল সূত্র রূপে গৃহীত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচ্যমান প্রবন্ধের চার বছর পূর্বে, রবীন্দ্রনাথের একুশ বছর বয়সে রচিত 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে (ভারতী, ১২৮৮ ফাল্গুন, ১৮৮২) রবীন্দ্রনাথ এই ঐক্যের কথাটি খুব জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন। সেখানে তিনি সহানুভূতি, কল্পনা ও কবিত্ব, এই তিনের মধ্যে একটুও ভেদ করেন নি। তিনি বলেছেন, 'নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব।...মর্মের মধ্যে প্রবেশ করিবার জন্য যে কল্পনা আবশ্যক করে তাহাই কবির কল্পনা।'[৮১]

বাংলা সাহিত্যে খাঁটি—অমিশ্র রোমান্টিক কল্পনাতত্ত্বের এই বোধকরি প্রথম অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশ। চার বছর পরে উচ্চারিত হলেও এর তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাতত্ত্বের রোমান্টিকতা অনেক দ্বিধাগ্রস্ত।

তর্কস্থলে যদি ধরেও নিই যে, কল্পনা আর সহানুভূতি আলাদা, তাহলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো, তাদের পরস্পরবিরোধী বলে' ধরে নেবার কোনো কারণ নেই। যদি আলাদা হয়ও, তারা যে পরস্পরকে পুষ্ট করে তাতে সন্দেহ নেই। বরং এই কথাই মানতে হবে যে, সাহিত্যসৃষ্টিতে এদের সংযোগ অপরিহার্য। লৌকিক অনুভূতি হিসেবে সহানুভূতি সাহিত্যসৃষ্টির পূর্বশর্ত—অপরিহার্য পূর্বশর্ত। কিন্তু নিছক লৌকিক অনুভূতির স্তরে সাহিত্যরচনা সম্ভব নয়। অন্যদিকে, লৌকিক অনুভূতির প্রাথমিক ধাপটি না থাকলে—বিষয়ের সঙ্গে

৮১. চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি, সমালোচনা, র।১৩।৬২৭

গভীর মমত্বের যোগ না ঘটলে, নিবিড় একাত্মতা না ঘটলে, নির্বস্তুক মহাশূন্যে কল্পনা বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যায়। সহানুভূতির ভূমিকা নৈকট্যস্থাপনের ভূমিকা, কল্পনার ভূমিকা দূরত্বরচনার ভূমিকা—বন্ধনমুক্তির ভূমিকা। প্রত্যেক শিল্পকর্মে দুয়ের সংযোগ ঘটে। যেখানে ক্রৌঞ্চমিথুনের দুঃখে বাল্মীকি ব্যক্তিগতভাবে শোকার্ত, সেটা সহানুভূতির স্তর। সেখানে সহানুভূতিই প্রভু, কল্পনা নেপথ্যচারী, আপাতত সে অপ্রধান। যেখানে যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টি, যেখানে শোক ব্যক্তিসংস্পর্শ-বিচ্ছিন্ন হয়ে করুণ রসে পরিণত হয়েছে, যেখানে মন স্থূল বাস্তবের প্রত্যক্ষ মাধ্যাকর্ষণ থেকে মুক্তি পেয়েছে, সেটা কল্পনার স্তর। সেখানে কল্পনাই প্রভু, সেখানে সহানুভূতির স্থান রঙ্গমঞ্চের বাইরে। এই দিক থেকে দেখলে, যুক্তির ক্ষেত্রে এই স্তর দুটো পৃথক্।

বিরোধের তত্ত্ব হয়তো পুরোপুরি গ্রহণীয় নয়, কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বে একাত্মতা ও বিবিক্ততার ধাপের, নৈকট্য ও দূরত্বের ধাপের অন্তত আপেক্ষিক ভিন্নতা অবশ্যস্বীকার্য। এই ভিন্নতা আদর্শ-ক্ষেত্রের ভিন্নতা, সব সময় কার্যক্ষেত্রের নয়। কল্পনা ও সহানুভূতি—কার্যক্ষেত্রে এদের সমন্বয় অপরিহার্য। এর যে-কোন একটি অতিরিক্ত রকমের প্রবল হয়ে উঠলে সাহিত্যের ক্ষতি। অতিদূরত্বে সাহিত্য শীর্ণ, রক্তহীন ও অসত্য হয়ে পড়ে। অতি-নৈকট্যে—লৌকিক ভাবের অত্যাচারে—সাহিত্য অসাহিত্য হয়ে পড়ে।

দীনবন্ধু এই শেষোক্ত বিপদ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। তাঁর নাটকে লৌকিকের অনধিকার প্রবেশ পাঠকমাত্রেই অনুভব করতে পারবেন। প্রসঙ্গত বলি, 'নীলদর্পণে'র অভিনয় প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চটিজুতো ছোঁড়ার সে-কাহিনীটি আছে, তা অমূলক হতে পারে, কিন্তু গূঢ় সত্যের ইঙ্গিতবাহী। এই কারণেই বোধকরি, দীনবন্ধুর বাস্তবতায় একটা দম-আট্‌কানো ভাব আছে। যদি বঙ্কিমচন্দ্রের কথার এইটেই অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত হয়, তাহলে তা আমরা বিনা তর্কে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি। কিন্তু কল্পনা ও সহানুভূতির সমন্বয় সম্পর্কে আমাদের যে সিদ্ধান্ত, তা বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করবেন না, তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র মনে করেন, শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে কল্পনারই একাধিপত্য, যথার্থ সৃষ্টি কল্পনারই কাজ। দীনবন্ধু স্বভাবকে অনুসরণ

করতে পারেন, কিন্তু সহানুভূতির শাসনে তিনি স্বভাবকে অতিক্রম ক'রে যেতে পারেন না; স্বভাবাতিরিক্ত সৃষ্টিতে তিনি অক্ষম। বঙ্কিমচন্দ্র বাস্তবধর্মী সাহিত্যের বিরোধী নন। তার প্রমাণ ঈশ্বর গুপ্ত সংক্রান্ত এবং দীনবন্ধু সংক্রান্ত দুই প্রবন্ধেই পাওয়া যাবে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অধিকতর মুগ্ধতা কালিদাসের উমাতে, শেক্‌স্‌পীয়ারের এরিয়েল বা ক্যালিবানে। তাঁর বিশ্বাস, উমা বা এরিয়েল বাস্তবানুকারী হয়েও সম্পূর্ণ বাস্তবাতিরিক্ত সৃষ্টি। তিনি মনে করেন, এই সব ক্ষেত্রগুলি কল্পনার একাধিপত্যের ক্ষেত্র। তিনি মনে করেন, কালিদাস বা শেক্‌স্‌পীয়ার দীনবন্ধুর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির কবি। তাঁদের 'সহানুভূতি কল্পনার অধীনা, স্বাভাবিকী নহে।'৮২

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, বাস্তব-অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রের মধ্যে দীনবন্ধু অত্যন্ত শক্তিশালী। সেখানে তাঁর সহানুভূতি পূর্ণমাত্রায় সক্রিয়। কিন্তু বাস্তব-অভিজ্ঞতার বাইরে তাঁর সহানুভূতি নিষ্ক্রিয়। সে সব ক্ষেত্রে অনেক সময় তিনি ইংরেজি বা সংস্কৃত পুস্তক থেকে রচনার আদর্শ গ্রহণ করেন। 'জীবন্ত আদর্শ সম্মুখে নাই, কাজেই সে সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও সেখানে নাই। কেন না, সর্বব্যাপিনী সহানুভূতিও জীবন্ত ভিন্ন জীবনহীনকে ব্যাপ্ত করিতে পারে না। ...এখানে পাঠক দেখিলেন যে, দীনবন্ধুর সামাজিক অভিজ্ঞতাও নাই—স্বাভাবিক সহানুভূতিও নাই। এই দুইটি লইয়াই দীনবন্ধুর কবিত্ব। কাজেই এখানে কবিত্ব নিষ্ফল।'৮৩ বঙ্কিমচন্দ্রের বিবেচনায় যাঁরা সার্থক স্রষ্টা, এইখানে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের সঙ্গে দীনবন্ধুর তুলনা ক'রে বলেছেন, 'পক্ষান্তরে ভিন্ন প্রকৃতির কবি অর্থাৎ যাঁহাদের সহানুভূতি কল্পনার অধীনা, স্বাভাবিকী নহে, তাঁহারা এমন স্থলে কল্পনার বলে সেই জীবনহীন আদর্শকে জীবন্ত করিয়া, সহানুভূতিকে জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বসাইয়া, একটা নবীনমাধব বা লীলাবতীর চরিত্রকে জীবন্ত করিতে পারিতেন। শেক্ষপীয়র অবলীলাক্রমে জীবন্ত Caliban বা জীবন্ত Ariel সৃষ্টি করিয়াছেন, কালিদাস অবলীলাক্রমে উমা বা শকুন্তলা সৃষ্টি করিয়াছেন।

৮২. তদেব, ৯৮

৮৩. তদেব, ৯৭

এখানে সহানুভূতি কল্পনার আজ্ঞাকারিণী।'[৮৪] বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্র নিজের নাম করেন নি। কিন্তু আমরা এই সঙ্গে অনায়াসে জুড়ে দিতে পারি— 'যেমন অবলীলাক্রমে বঙ্কিমচন্দ্র কপালকুণ্ডলা সৃষ্টি করিয়াছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, যেহেতু দীনবন্ধুর কল্পনা দুর্বল, যেহেতু তিনি সহানুভূতির দাস, সেইহেতু বাস্তব-অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তুকে তিনি পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা পরিবর্জন কিছুই করতে পারতেন না। 'তোরাপের সৃষ্টিকালে তোরাপ যে ভাষায় রাগ প্রকাশ করে তাহা বাদ দিতে পারিতেন না। আদুরীর সৃষ্টিকালে আদুরী যে ভাষায় রহস্য করে, তাহা বাদ দিতে পারিতেন না; নিমচাঁদ গড়িবার সময়ে, নিমচাঁদ যে ভাষায় মাতলামি করে, তাহা ছাড়িতে পারিতেন না।'[৮৫] বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, বর্জনের অক্ষমতার কারণে দীনবন্ধুর সাহিত্য অনেক স্থূলত্ব, অনেক আবিলতা, অনেক রুচিহীনতা প্রবেশ করেছে। এতে দীনবন্ধুর সাহিত্যের ক্ষতি হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু দীনবন্ধুর মতো কল্পনাদুর্বল লেখকের পক্ষে ইচ্ছানুরূপ গ্রহণ-বর্জন অসম্ভব। তাঁর পক্ষে বাদ না দেওয়াই ভালো হয়েছে। 'তাই আমরা একটা আস্ত তোরাপ, আস্ত নিমচাঁদ, আস্ত আদুরী দেখিতে পাই। রুচির মুখ রক্ষা করিতে গেলে, ছেঁড়া তোরাপ, কাটা আদুরী, ভাঙ্গা নিমচাঁদ পাইতাম।'[৮৬]

এইভাবে বিশ্লেষণ, দৃষ্টান্ত ও ব্যাখ্যার সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে, যেদুটি গুণ—সামাজিক অভিজ্ঞতার বিস্তার এবং তীব্র সহানুভূতি—দীনবন্ধুর সমস্ত শক্তির উৎস, সমস্ত উৎকর্ষের হেতু, ঠিক সেই দুটি গুণই আবার দীনবন্ধুর ত্রুটির কারণ, সমস্ত দুর্বলতার আকর। কল্পনার সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত প্রাধান্য না থাকলে গুণ যে কী ভাবে দোষে পরিণত হয়, দীনবন্ধুর ক্ষেত্রে এই রহস্যের উদ্‌ঘাটনে বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্য সাহিত্যিক সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন।

এ-প্রবন্ধের মূল্য নীলদর্পণ বা সধবার একাদশীর সমালোচনা হিসেবে নয়। এ-প্রবন্ধের আসল মূল্য স্রষ্টা-দীনবন্ধুর মনোজগতের রহস্য-উদ্‌ঘাটনে।

৮৪. তদেব, ৯৮

৮৫. তদেব, ৯৫-৯৬

৮৬. তদেব, ৯৬

একটি বিষয় এখানে লক্ষ করবার মতো। তা হ'লো নীলদর্পণের সাহিত্যমূল্যবিচার নিয়ে। এ-প্রবন্ধে অনেকবার নীলদর্পণের কথা এসেছে, তার অংশবিশেষের অকুণ্ঠ প্রশংসাও বঙ্কিমচন্দ্র করেছেন। কিন্তু সমগ্র নাটকটির শিল্পমূল্যের কথা—নীলদর্পণের সামগ্রিক নাট্যমূল্যের কথা তিনি খুব স্পষ্ট ক'রে বলেন নি। তিনি নাটকটির সামাজিক-রাজনৈতিক আবেদনের কথা বলেছেন, তিনি এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা বলেছেন, একে তিনি আংকল টম্‌স কেবিনের সঙ্গে তুলিতও করেছেন। সন্দেহ নেই, নাটকটির অসাধারণ শক্তি সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ সচেতন। কিন্তু এই শক্তিই কি নাটকটির শিল্পমূল্য? শক্তির প্রসঙ্গে এক-কথায় তিনি এই নাটকের কাব্যগুণেরও উল্লেখ করেছেন। তা হ'লে নাটকের এই শক্তিকেই কি তিনি এর কাব্যগুণ বলে' মনে করেন? প্রবন্ধে এ-বিষয়ে যে ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তা খুব স্পষ্ট নয়।

এই অস্পষ্টতার উৎস সম্ভবত বঙ্কিমচন্দ্রের মনের কোনো মৌলিক দ্বৈততায়। চিন্তার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সামাজিক মূল্যই সর্বাগ্রগণ্য। সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁর কাছে শিল্পমূল্যেরই অগ্রাধিকার। কিন্তু অল্পবিস্তর দোটানা উভয় ক্ষেত্রেই উপস্থিত। নীলদর্পণ যতই প্রশংসনীয় হোক, শিল্পগুণ যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যাপার, দীনবন্ধুর মৃত্যুর পরে রচিত এই প্রবন্ধে তা বলতে বঙ্কিমচন্দ্র বোধ করি কুণ্ঠা বোধ করেছিলেন। সেই কারণে শিল্পগুণের প্রসঙ্গটাকে তিনি খানিকটা এড়িয়েই গিয়েছেন।

অনুমান করি, ঐতিহাসিক বা সামাজিক বা অপর কোনো মূল্যকে শিল্প-মূল্যের আসনে বসাতে সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্রের মনে, চেতনে হোক অবচেতনে হোক, নিশ্চয়ই কোথাও কোনো বাধা ছিল। পরিণত বয়সে এই বাধার অনেকটা তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু সবটা পারেন নি। নীলদর্পণের শক্তির প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, দীনবন্ধুর গভীর ও সুপরিব্যাপ্ত সহানুভূতিই এই নাটকটির কাব্যগুণের হেতু। কিন্তু এই বাক্যটুকুই কি যথেষ্ট? সহানুভূতির দোষগুণ প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধেই একটু আগে তিনি যা বলেছেন, তাতে সহানুভূতির উপর এতোখানি গুরুত্ব আরোপ করতে হ'লে নতুন রকমের ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। সে ব্যাখ্যা তিনি দেন নি। কাব্যগুণের কথাটা

তিনি অনেকটা আপ্তবাক্যের মতো ক'রেই উচ্চারণ করেছেন। যে-নাটক একে প্রচারধর্মী, তায় কল্পনা-দীন, তা কেবল সহানুভূতির কারণে কী ক'রে কাব্যগুণের অধিকারী হতে পারে তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে বলা দরকার।

প্রথম যৌবনে ক্যালকাটা রিভিউ-এর 'Bengali Literature' (১৮৭১) প্রবন্ধে নীলদর্পণ বিষয়ে বিরূপ মন্তব্য ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'We should give it a very low place as a work of art. The importance [নীলদর্পণের] was political, not literary.' এখন যদি তিনি নতুন ক'রে এর কাব্যগুণের কথা বলতেই চান, তা হ'লে পূর্বের অভিমতকে তাঁর খণ্ডন করতে হবে। তা তিনি করেন নি। দ্রুত-উচ্চারণে কাব্যগুণের কথা বলেই তিনি প্রবন্ধ সমাপ্ত ক'রে দিয়েছেন।

এর একটা কারণ হয়ত এই যে, এখানে তাঁর আসল লক্ষ্য নীলদর্পণ নয়, এখানে তাঁর আসল লক্ষ্য দীনবন্ধু স্বয়ং, আসল লক্ষ্য সৃষ্টির কারখানাঘর। কিন্তু এইটেই সব নয়। গূঢ় কারণও কিছু আছে। মনে হয়, সামাজিক মূল্য আর শিল্পমূল্য এ-দুয়ের আপেক্ষিক গুরুত্ববিচার বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে কিছু অস্বস্তিকর। এ-ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্রের মন আর মুখ এক নয়। মুখে তিনি যা-ই বলুন না কেন, খাঁটি সাহিত্যমূল্যের প্রশ্নে পূর্বের অভিমতের আমূল পরিবর্তন হয়তো পরিণত বয়সেও তাঁর ঘটে নি। মুখে যা-ই বলুন, শিল্পে শিল্পমূল্যই যে সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে চরম, কাব্যগুণ বিষয়ে দ্রুত-উচ্চারিত আপ্তবাক্য খুব সম্ভব সেই দিকেই অঙ্গুলিনির্দেশ করে।

৯

'বাংলা সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রথম পথপ্রদর্শক বললে ইতিহাসের দিক থেকে হয়তো একটু ভুল হবে, কিন্তু প্রধান পথপ্রদর্শক বললে কিছুমাত্র ভুল বলা হবে না। শুধু পথপ্রদর্শক নয়, অনেক দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রকে পথনির্মাতাও বলা চলে। যিনি পথনির্মাতা ও পথপ্রদর্শক, তাঁর কাছ থেকে সাধারণত আমরা তুঙ্গস্পর্শী সাফল্য আশা করি না। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্র বলেই তাঁর কাছে আমাদের প্রত্যাশাও অনেক বড়ো

মাপের। সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সেই বড়ো মাপের প্রত্যাশাকেও অনেকখানি ছাড়িয়ে গিয়েছেন। একমাত্র রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিলে বাংলা সমালোচনায় তাঁর কোনো সমকক্ষ নেই, কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী নেই। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যকে সম্পূর্ণ স্মরণ রেখেও একথা বলা যায় যে, সাহিত্যতত্ত্বে না হোক, অন্তত ব্যবহারিক সমালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রকে অতিক্রম ক'রে আজ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য খুব বেশি দূর অগ্রসর হতে পারে নি।

অনেকে বলেন, সমালোচক যদি নিজে শিল্পী না হন, তাহলে তিনি সমালোচনার যথার্থ অধিকারী হতে পারেন না। কথাটার মধ্যে যে অনেকখানি সত্যতা আছে তা অস্বীকার করা যায় না। কল্পনাহীন সমালোচক যে আদৌ রসগ্রাহী সমালোচক নন, এমন কি সমালোচকই নন, এ-কথা মানতেই হবে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-ও মানতে হবে যে, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, শিল্পী-সমালোচকদের সাহিত্যিক অন্তর্দৃষ্টি একটা বিশেষ সীমানার মধ্যেই ক্রিয়াশীল, তার বাইরে তাঁরা অন্ধ, অনেক সময় স্বেচ্ছা-অন্ধ। শিল্পী-সমালোচকের রসবোধ বিশেষভাবে আপন স্রষ্টৃ-ভূমিকার সঙ্গে, স্রষ্টা হিসেবে নিজে প্রবণতা ও রুচির সঙ্গে যুক্ত। অন্যত্র তাঁদের ভুল বুঝবার ক্ষমতাও সীমাহীন। সমালোচককে কল্পনাহীন হলে চলে না, কিন্তু শিল্পীর কল্পনা ও সমালোচকের কল্পনা হুবহু এক জাতের জিনিস নয়।

সে যাই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পী এবং বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচক, কিন্তু তিনি ঠিক শিল্পী-সমালোচক নন। শিল্পী-সমালোচকের সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত অপ্রতিহত-প্রতাপ সৃজনশীলতা তাঁর সমালোচনায় নেই। কিন্তু সেখানে শিল্পীসুলভ অন্তর্দৃষ্টির অভাব নেই, কল্পনাশক্তির অভাব নেই। তবে স্রষ্টা হিসেবে নিজের বিশিষ্ট রুচির স্বাধিকারপ্রমত্ততা বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় কদাচিৎই প্রশ্রয় পেয়েছে। রসসিদ্ধ হয়েও তিনি মোটামুটি জ্ঞানপন্থী।

জ্ঞান এবং রস, এদের যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করা, উভয়ের ভারসাম্য রক্ষা করা, এইটেই বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যসমালোচনার সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের কাছে আমরা সাধারণত যে-সব গুণ প্রত্যাশা করি, তার অনেক গুণেরই সাক্ষাৎ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রে পেয়ে থাকি।

কিন্তু তার কোনোটিই অপর কোন গুণকে আবৃত করে নিজে প্রধান হয়ে উঠতে চেষ্টা করে নি। শিল্পী-সমালোচক, কবি-সমালোচক যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে এইখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান পার্থক্য। একদিকে অসামান্য সাহিত্য-প্রীতি ও রসগ্রাহিতা, অন্যদিকে সুবিস্তৃত ও সুগভীর সাহিত্যজ্ঞান—শুধু সাহিত্যজ্ঞান নয়, সংশ্লিষ্ট বিবিধ বিষয়ের জ্ঞান, একদিকে অসামান্য অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তি, অন্যদিকে মার্জিত রুচি, পরিশীলিত মন, পক্ষপাতহীন বিচারশীলতা, একদিকে সাহিত্যপাঠের আনন্দ, অন্যদিকে সাহিত্যিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক দায়িত্ববোধ, একদিকে বৈজ্ঞানিকের তথ্যানুসন্ধান-প্রবণতা ও তথ্য-নিষ্ঠা, অন্যদিকে শিল্পীর প্রকাশক্ষমতা—প্রকাশের ক্ষেত্রেও দেখি, একদিকে নৈয়ায়িকের শৃঙ্খলা, পরিপাট্য, পারিচ্ছন্নতা ও সুনির্দিষ্টতা, অন্যদিকে ইঙ্গিতে ভঙ্গীতে রূপকল্পে ভাবে সুরে রূপদ্রষ্টার ব্যঞ্জনাগর্ভ অপরূপ ভাষা-শৈলী,—এবং সর্বোপরি অসাধারণ সংযম ও পরিমিতিবোধ বঙ্কিমচন্দ্রকে আজ পর্যন্ত বাংলাসাহিত্যে আদর্শ সমালোচকের আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখেছে। রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার ক্ষেত্রে পথনির্মাতা বা পথপ্রদর্শক নন, তাঁর পথ একান্তভাবে তাঁরই পথ। তিনি শ্রেষ্ঠ সমালোচক হতে পারেন, কিন্তু আদর্শ-সমালোচক নন। বঙ্কিমচন্দ্রও ভিন্নতর মানদণ্ডের বিচারে শ্রেষ্ঠ সমালোচক। যদি শ্রেষ্ঠ না-ও হন, শ্রেষ্ঠের খুবই কাছাকাছি। যেটা আরো তাৎপর্যপূর্ণ কথা, তিনি আদর্শ-সমালোচক, তিনি পথপ্রদর্শক।

অলংকারশাস্ত্র-নির্দেশিত দোষ-গুণের তালিকা-নির্মাণ অথবা নিছক অলংকারের সংখ্যা-গণনা যে প্রকৃত সাহিত্যসমালোচনা নয়, একথা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিলেন। সমালোচনা যে নিছক ভাবোচ্ছ্বাস নয়, তা-ও তাঁর দৃষ্টান্ত থেকেই আমরা ঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম।

সাহিত্যতত্ত্বে ও সমালোচনাতত্ত্বে উচ্চকণ্ঠ নীতিবাদী হ'লেও, ব্যবহারিক সমালোচনার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অভাবিত মুক্ত মনের পরিচয় দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সব সমালোচনাই সাহিত্যিক সমালোচনা। মুখে যা-ই বলুন না কেন, সমালোচ্য বিষয়কে কখনোই তিনি নীতিবাদীর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন নি।

বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলাসমালোচনার ক্ষেত্রে প্রথম, যিনি সমালোচনায় তথ্যানুসন্ধান এবং তথ্যগত ব্যাখ্যার গুরুত্ব উপলব্ধি করেছিলেন। সমালোচনার বিজ্ঞানধর্মী দিকটিকে তিনিই প্রথম যথোপযুক্ত গুরুত্ব দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অনেকে এমনও বলবেন যে, বাংলাসাহিত্যে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানপন্থী সমালোচক।

আমরা আগেই দেখেছি, এ-রকম মনে করার কোনো কারণ নেই। বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনায় বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়েছেন, কিন্তু গোটা সমালোচনাকে বিজ্ঞানপন্থী ক'রে তোলেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বা কবিজীবনের তথ্যভিত্তিক ব্যাখ্যা শেষ পর্যন্ত ব্যাখ্যাতেই পরিসমাপ্ত নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনার মূল্যায়নে বিশ্বাসী। সমালোচনাকে বিজ্ঞান বলে' দাবি করা তাঁর পক্ষে আত্মবিরোধ। সে রকম দাবি তিনি কোথাও করেন নি।

সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে আমাদের একটিই মাত্র অভিযোগ। সে হ'লো তাঁর রচনার রচনার স্বল্পতা, তাঁর প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ততা। সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্র কি 'নীলদর্পণে'র একটি পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা আমাদের জন্য রেখে যেতে পারতেন না? যিনি নিমচাঁদকে অমন ভিতরের থেকে বুঝতে পারেন, তিনি কেন 'সধবার একাদশী'র জন্য একটি পূর্ণ প্রবন্ধও ব্যয় করতে পারবেন না? স্বেচ্ছায় কি অনিচ্ছায় জানিনা, সম্ভবত স্বেচ্ছায় নয়, সম্ভবত তাঁর জীবন-পরিবেশের কারণেই—সে যে কারণেই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র যে তাঁর সমালোচক-প্রতিভার প্রতি সুবিচার করেন নি, বা করতে পারেন নি, এ-কথা মানতেই হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব*

১

বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমত এবং প্রধানত সমালোচক এবং সেই সমালোচনার প্রয়োজনেই তিনি সাহিত্যতাত্ত্বিক। সমালোচনার জন্য যতোটুকু প্রয়োজন মাত্র ততোটুকুই সাহিত্যতাত্ত্বিক। তত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ তাঁর মোটেই তীব্র নয়, তাঁর আসল আকর্ষণ বিশেষ সাহিত্যগ্রন্থ বা বিশেষ সাহিত্যিক। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সে-কথা বলা যাবে না।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব কোনো বিশেষ দর্শনপ্রস্থানের উপর ভিত্তি ক'রে দাঁড়ায় নি, তার উপর কোনো বিশেষ ধরনের দর্শনচিন্তার প্রভাবও খুব উল্লেখযোগ্য নয়, কোনো বিশেষ জগৎতত্ত্বের দিকে তার পক্ষপাতও কিছু নেই। দর্শনচিন্তার সঙ্গে তার সম্পর্ক যৎসামান্য। শুধু তাই নয়, যে-কোনো খাঁটি সাহিত্যতাত্ত্বিকের তুলনায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্ব সংক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন ও অসম্পূর্ণ। সহজেই বোঝা যায়, এটা বঙ্কিমচন্দ্রের মুখ্য আলোচ্য নয়।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের অনেক মূলসূত্রকেই আমরা রবীন্দ্রনাথের জগৎতত্ত্ব ও জীবনতত্ত্বের মধ্যে—রবীন্দ্রনাথের মানব-তত্ত্বের মধ্যে খুঁজে পাবো। অথবা, কথাটাকে উল্টো দিক থেকে এ-রকমও বলা চলে যে, রবীন্দ্রদর্শনের অনেক মূলসূত্রেরই সাক্ষাৎ আমরা সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার মধ্যেই পাবো। অর্থাৎ চিন্তার একটি বৃহৎ পরিধিতে রবীন্দ্র-নাথের সাহিত্যচিন্তা ও রবীন্দ্রনাথের দর্শনচিন্তা প্রায় অভিন্ন।

দর্শনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সংযোগ ঘনিষ্ঠতর হয়েছে, প্রথম দিকে নয়, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার শেষের দিকে। রবীন্দ্রনাথের

* এই বিষয়ের বিস্তৃত আলোচনার জন্য লেখকের 'সাহিত্যতত্ত্বে রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

সাহিত্যচিন্তাকে কালক্রমের দিক থেকে যদি আমরা দুই ভাগে ভাগ করি, তাহলে প্রথমার্ধে নয়, দ্বিতীয়ার্ধে। আলোচনার সুবিধার জন্য, কালের এবং ভাবের পার্থক্যের উপর ভিত্তি ক'রে এর এক-একটি অর্ধকে আমরা দুটি করে পৃথক্ পর্বে—অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বচিন্তার সমগ্র ইতিহাসটিকে মোট চারটি পৃথক্ পর্বে ভাগ ক'রে নিতে পারি। প্রথমার্ধে উন্মেষ ও প্রস্তুতি পর্ব। দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম অংশকে বলতে পারি প্রতিষ্ঠা পর্ব। কিন্তু দ্বিতীয় অংশকে— অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের সুপরিণত বয়সের সাহিত্যতত্ত্বকে কী নাম দেবো? প্রতিষ্ঠার দিক থেকে দেখলে, এ তো বরং অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত। যাই হোক, তবু চিহ্নিত করবার জন্য একে বলতে পারি—পরিণতি পর্ব। দর্শনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এই পরিণতি পর্বেই নিবিড়তম। 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধেই তার প্রমাণ মিলবে। এই প্রসঙ্গে 'Personality' (১৯১৭), 'The Religion of Man' (১৯৩১), 'The Religion of An Artist' (১৯৫৩)—এই সব পরিণত বয়সের ইংরেজি বইগুলির নামও করা যেতে পারে।

উন্মেষ পর্ব বাল্য কৈশোর ও প্রথম-যৌবনের রচনা নিয়ে। সে-সব রচনার অধিকাংশই 'সমালোচনা' (১৮৮৭) গ্রন্থে স্থান পায় এবং পরবর্তী কালে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বর্জিত হয়। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মানলে, তাঁর সাহিত্যচিন্তার এলাকা থেকে গোটা উন্মেষ পর্বটিকে সম্পূর্ণভাবে বাদ দিয়ে দিতে হয়। বাদ দিলে, ইতিহাসের দিক থেকে ক্ষতি হতে পারে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের দিক থেকে তাতে খুব ক্ষতি হয় না।

প্রস্তুতি পর্ব প্রধানত মধ্য-যৌবন ও পরিণত-যৌবনের, যাকে বলতে পারি প্রৌঢ়ত্বের পূর্ব-সীমান্ত—এই কালের রচনা নিয়ে। পর্বটা শেষ হয়েছে রবীন্দ্রনাথের চল্লিশ বছর বয়সের উপান্তে এসে, অর্থাৎ বিংশ শতকের দরজায় পা দিয়ে। এটা একটা মোড়-ফেরার কাল। এই মোড়-ফেরার —এবং ভাব-দ্বন্দ্বের সুন্দর বিবরণ পাওয়া যায় লোকেন পালিতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপে, 'সাহিত্য' (১৯০৭) গ্রন্থের 'আলোচনা', 'সাহিত্য', 'সাহিত্যের প্রাণ' ও 'মানবপ্রকাশ', (চারটি পত্র-প্রবন্ধই ১৮৯২ সালে রচিত) এই প্রবন্ধচতুষ্টয়ে।

উন্মেষ এবং প্রস্তুতি, এই দুই পর্বের রচনাই অল্পবিস্তর অপরিণত। যেহেতু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার ক্রমবিকাশের ইতিহাস এখানে আমাদের লক্ষ্য নয়, তত্ত্বরূপটাই এখানে আমাদের মূল লক্ষ্য, সেই হেতু উন্মেষ ও প্রস্তুতি পর্বের সিদ্ধান্তসমূহের আলোচনায় আমরা এখানে বিরত থাকবো। প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি এই দুই পর্বেরই সিদ্ধান্ত তত্ত্বের দিক থেকে সুপরিণত। এই দুই পর্বের প্রবন্ধাবলীই আমাদের বর্তমান আলোচনার ভিত্তি।

প্রস্তুতি পর্বকে বাদ দেবার অর্থ কিন্তু এ নয় যে, প্রস্তুতি পর্ব সব দিক থেকেই অপরিণত। ব্যবহারিক সমালোচনার দিক থেকে দেখলে এই পর্বটাই তুঙ্গস্পর্শী। রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ সমালোচনাপ্রবন্ধের অধিকাংশই যেমন 'মেঘদূত' (১৮৯১), 'রাজসিংহ' (১৮৯৪), 'বঙ্কিমচন্দ্র' (১৮৯৪), 'কাব্যের উপেক্ষিতা' (১৯০০), এই পর্বেই রচিত হয়েছে। সুতরাং অপরিণতি ব্যবহারিক সমালোচনায় নয়, এ অপরিনতি তত্ত্বমীমাংসায়।

প্রতিষ্ঠা পর্বের সূচনা বঙ্গদর্শন প্রকাশ (১৯০১) থেকে। এ-পর্বের অপর দিকের প্রান্ত 'সাহিত্য' গ্রন্থের প্রকাশকাল (১৯০৭) পর্যন্ত। পর্বটির স্থিতিকাল এই সাত বছর।

তারপর একটা দীর্ঘ—প্রায় সাত আট বছরের ছেদ। পরের পর্বের অর্থাৎ যাকে আমরা বলছি পরিণতি পর্ব, তার সূত্রপাত সবুজপত্র প্রকাশের (১৯১৪) পর থেকে। প্রতিষ্ঠা পর্বের অধিকাংশ প্রবন্ধই যেমন 'সাহিত্য' গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে, পরিণতি পর্বের অধিকাংশ প্রবন্ধই তেমনি 'সাহিত্যের পথে' (১৯৩৬) ও 'সাহিত্যের স্বরূপ' (১৯৪৩) বই দুটিতে স্থান পেয়েছে। উল্লেখযোগ্য ইংরেজি বইগুলি—পূর্বে যাদের নাম করা হয়েছে—তারাও এই পর্বেই রচিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক দিক থেকে দেখলে উন্মেষ, প্রস্তুতি, প্রতিষ্ঠা ও পরিণতি, যথানির্দিষ্ট পারম্পর্যে এই চার পর্বকেই আমাদের বুঝতে হবে। কিন্তু পরিণত তত্ত্বের দিক থেকে বুঝতে হলে, শেষের দুই পর্বই গণনীয়, এবং একসঙ্গেই গণনীয়। দার্শনিকতার দিক থেকে এই দুই পর্বের মধ্যে যে সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে, আমাদের স্বল্পপরিসর আলোচনায় তাকে আমরা অগ্রাহ্য করতে পারি।

একটি কথা এখানে উল্লেখ ক'রে রাখা যেতে পারে। সে হ'লো এই যে, প্রতিষ্ঠা পর্বের মধ্য ভাগ থেকে শুরু করে গোটা পরিণতি পর্ব, এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ ব্যবহারিক সমালোচনার কোনো প্রবন্ধ লেখেন নি। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, যখন থেকে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যতাত্ত্বিক হিসেবে একটা প্রতিষ্ঠায় এসে পৌঁছেছেন, তখন থেকে তিনি আর সমালোচক নন, তখন থেকে তিনি কেবলই সাহিত্যতাত্ত্বিক। এই পালাবদলটি ঘটেছে বিংশ শতকের প্রথম দশকে, রবীন্দ্রনাথের চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সের মধ্যে—গীতাঞ্জলি পর্বে পা দেবার অল্পকাল আগে।

প্রথম বা উন্মেষ পর্বে যে সাহিত্যতত্ত্ব অল্পবিস্তর অবিন্যস্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল, তা খাঁটি রোমান্টিক লিরিক কবির সাহিত্যতত্ত্ব। তত্ত্বের দিক থেকে এই রোমান্টিকতা ঊনবিংশ শতকের ইংরেজ কবিদের—ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী কীট্‌সের এবং একধাপ পিছিয়ে দেখলে কোল্‌রিজের—রোমান্টিকতাকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করে। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার স্বকীয়তা এখন পর্যন্ত তেমন প্রবলভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠতে পারে নি।

আগেই বলেছি, দ্বিতীয় বা প্রস্তুতি পর্ব ভাবদ্বন্দ্বের কাল, বোঝাপড়ার কাল, নিজেকে খুঁজে পাওয়ার কাল। বাইরের দিক থেকে বর্ণনা করলে বলতে হয়, মোড়-ফেরার কাল। কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে মোড়-ফেরা? এক-কথায় উত্তর দেওয়া কঠিন। তবু বলা যায়, পাশ্চাত্য রোমান্টিকতার দিক থেকে মোড়-ফেরা। কোন্ দিকে মোড়-ফেরা? বলতে পারি, ভারতীয় বা ঔপনিষদিক রোমান্টিকতার দিকে। অথবা বলতে পারি, রোমান্টিকতার উত্তরণের দিকে। বলা বাহুল্য, পরিপূর্ণ নয়, আংশিক উত্তরণ।

তৃতীয় বা প্রতিষ্ঠা পর্বে ভারতীয়ত্ব স্পষ্টতর। এ-পর্বের কবিতা নাটক ও অন্যান্য রচনাতেও রবীন্দ্রনাথের সচেতন ভারতীয়ত্ব সুস্পষ্ট। শুধু ভারতীয়ত্ব নয়, প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের—বিশেষ ক'রে ঔপনিষদিক ব্রহ্মবাদের মাহাত্ম্য-ঘোষণা, নিজের মধ্যে সেই আদর্শের প্রতিষ্ঠা। বলা বাহুল্য, এই প্রবল ভাবপ্রবাহ থেকে সাহিত্যতত্ত্বও বাইরে থাকতে পারে নি। (এই ব্রহ্মবাদের সহায়তাতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনের বিষয়ী-সর্বস্ব বা অহং কেন্দ্রিক রোমান্টিকতাকে অনেকখানি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলেন।) কিন্তু

শুধু উপনিষদ্ নয়, রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তা—যাকে একেবারে তাঁর নিজের কণ্ঠ বলতে পারি, তা-ও এই পর্বে বেশ বলিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। স্মরণ রাখতে হবে, কালটা হ'লো বিংশ শতকের প্রথম দশক, নবপর্যায় বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদকত্বের কাল। এই কালের প্রথম দিকটাতে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ (১৯০১), মাঝের দিকে 'খেয়া' (১৯০৬), শেষের দিকে 'তপোবন' বক্তৃতা (১৯০৯)। এই কালেই ব্যবহারিক সমালোচনার কাছ থেকে তাঁর বিনা ভূমিকায় বিদায় গ্রহণ।

এর পর অনেকখানি ছেদ দিয়ে পরিণতি পর্বের আরম্ভ। পরিণতি পর্বের যথার্থ সূচনা প্রথম মহা যুদ্ধের পর থেকে। এই পর্বের রবীন্দ্রনাথ, কী সৃজনের ক্ষেত্রে, কী চিন্তার ক্ষেত্রে, অনেকখানি আধুনিক, অনেকখানি বিংশ শতকীয়। সাহিত্যতত্ত্বেও তাই। কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে এই আধুনিকত্ব অনেকটা যেন নেপথ্যচারী, অনেকটা যেন প্রচ্ছন্ন। এর মধ্যেও একটা সূক্ষ্ম ভাবদ্বন্দ্ব লক্ষ করা যায়, যার সম্যক্ নিরসন শেষ বই 'সাহিত্যের স্বরূপে'ও দেখতে পাওয়া যায় না।

আবার ব্রহ্মবাদের কথায় ফিরে আসি। পরিণতি পর্বের সাহিত্যতত্ত্বে যে ব্রহ্মবাদ তা খাঁটি রাবীন্দ্রিক ব্রহ্মবাদ। প্রাচ্যও নয়, পাশ্চাত্যও নয়, ঔপনিষদিকও নয়, হেগেলীয় নয়, তা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ব্রহ্মবাদ, শিল্পীর ব্রহ্মবাদ। শুধু শিল্পীর ব্রহ্মবাদ বললেই যথেষ্ট হ'লো না, মানবপ্রেমিক এবং জীবনরসিক শিল্পীর ব্রহ্মবাদ।

একে আদৌ ব্রহ্মবাদ বলতে পারি কি না তা চিন্তার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো মানবব্রহ্মের কথা বলেছেন। সেই কথা স্মরণ ক'রে পরিণতি পর্বকে আমরা মানবব্রহ্মবাদের পর্বও বলতে পারি। কিন্তু অনেক সময়ই মনে হবে, 'ব্রহ্ম' কথাটা একটা অনাবশ্যক লেজুড়ের মতো ঝুলে আছে, 'মানব' কথাটাই এখানে আসল কথা।

প্রতিষ্ঠা পর্বে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টিকর্তা মানুষের কথা বলেছেন। বলেছেন, মানুষের স্বধর্মই সৃষ্টি। পরিণতি পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথ শিল্পীর ধর্মের কথা বলেছেন। বলেছেন, তাঁর ধর্ম শিল্পীর ধর্ম। কিন্তু কেবল তাঁর নিজের নয়, শিল্পীর ধর্মকেই তিনি বলেছেন মানুষের ধর্ম।

প্রতিষ্ঠা পর্বের কথা আর পরিণতি পর্বের কথা আলাদা নয়। উভয় পর্বের ব্রহ্মবাদে কিছু হেরফের থাকতে পারে, কিন্তু মানব-প্রত্যয়ে—সৃষ্টিকর্তা-মানুষের তত্ত্বে কোনো হেরফের নেই। সেইজন্য উভয় পর্বকে মিলিয়েই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব।

২

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব কোন্ জাতের সাহিত্যতত্ত্ব? তার গোত্রগত পরিচয় কী, সে ক্লাসিকপন্থী, না রোমান্টিক, না অপর কোনো গোত্রের সাহিত্যতত্ত্ব? বিষয়-পরিচিতির পূর্বেই এই ধরণের জাতি-কুলের সন্ধান খুব কার্যকরী নয়। আমরা সকলেই জানি, ক্লাসিক রোমান্টিক এই ধরনের গোত্র-নামগুলি কোনো সর্বজনস্বীকৃত স্বরূপ-লক্ষণকে ভিত্তি ক'রে গড়ে ওঠে নি। পরে দেখতে পাবো, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সূক্ষ্মতা, জটিলতা, বৈচিত্র্য ও অভিনবত্বকে যথাযথ অনুধাবন করলে, ক্লাসিক রোমান্টিক ইত্যাদি স্থূল লেবেল দিয়ে তাকে চিহ্নিত করা খুব সঙ্গত নয়।

তা সত্ত্বেও প্রাথমিক কাঠামো রচনার পক্ষে স্থূল পরিচয়ের উপযোগিতাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। বিশেষ করে, গোত্র-নামের স্থূলত্ব সম্পর্কে যদি আমরা আগাগোড়া সচেতন থাকতে পারি।

আগে বলা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্যতত্ত্ব তাঁর যৌবনের রোমান্টিকতাকে পার হয়ে অনেক দূর এগিয়ে চলে এসেছে। কথাটা একেবারেই মিথ্যা নয়, কিন্তু কথাটাকে যদি আমরা একেবারে চূড়ান্ত অর্থে ধরি, তাহলে ভুল করবো। যতোই পার হয়ে আসুক, রোমান্টিকতার কতকগুলি মূল লক্ষণ—বলতে পারি, রোমান্টিকতার কতকগুলি মূল উপাদান রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে শেষ অবধি বজায় ছিল। এদের গুরুত্বকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না! সুতরাং স্থূলভাবে দেখলে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বকে, এমন কি পরিণতি পর্বেও, রোমান্টিক গোত্রের সাহিত্যতত্ত্বই বলতে হয়।

বাধা যদি কিছু থাকে তো সে সূক্ষ্ম বিচারে, এবং আপেক্ষিক ধরনের।

আমরা সকলেই জানি, কোনো মননের ক্ষেত্রেই রবীন্দ্রনাথ পুরোপুরি রোমান্টিক নন। কবিতা গান বা ছবির ক্ষেত্রে—যে-কোনো সৃজনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ যে-রকম অকুণ্ঠিত রকমের রোমান্টিক, চিন্তার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ মোটেই সে-রকম নন। সাহিত্যতত্ত্ব মননমূলক বিষয়। বিষয়টাকে রবীন্দ্রনাথ যতোই রসসাহিত্যের মতো ক'রে পরিবেশন করুন না কেন, তার যুক্তিমূলকত্ব কখনোই পুরোপুরি ঢাকা পড়ে না। সৃজনের ক্ষেত্রের অকুণ্ঠ রোমান্টিকতা আমরা এখানে প্রত্যাশাই করতে পারি না।

আসল জটিলতা অবশ্য এখানে নয়। পরে দেখতে পাবো, রবীন্দ্রনাথ রোমান্টিকতা অতিক্রম করেছেন, তাকে বর্জন ক'রে নয়, তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েই। মনে রাখতে হবে, রোমান্টিকতা কোনো বিচ্ছিন্ন প্রত্যয়ের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে প্রত্যয়সমূহের পারস্পরিক সম্পর্কের উপর, তাদের আপেক্ষিক গুরুত্বের উপর, লেখকের সামগ্রিক প্রবণতার উপর। পরিণতি পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পূর্বেকার রোমান্টিকতাকে সরাসরি বাতিল করেন নি। পূর্বেকার রোমান্টিক প্রত্যয়সমূহের প্রায় প্রত্যেকটিকেই তিনি রেখেছেন, কিন্তু প্রত্যেকেরই অনুষঙ্গ অনেকখানি বদলে দিয়েছেন। সেই সব রোমান্টিক প্রত্যয়ের পাশাপাশি প্রায় বিপরীত ধরনের বক্তব্যকে এমনভাবে স্থাপন ক'রে দিয়েছেন যে, পরস্পরের প্রভাবে তাদের দু'য়েরই মর্মগত পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে।

বিষয়টা একটু বিস্তৃত ক'রে বলা প্রয়োজন। রবীন্দ্র-সাহিত্যতত্ত্বের রোমান্টিক উপাদানগুলোই বা কী, আর তাদের পাশাপাশি স্থাপিত বিপরীতধর্মী বক্তব্যই বা কী, এবং কেমন ক'রে পরস্পরের প্রভাব পরস্পরকে পুনর্গঠিত ক'রে তুলেছে—কিছু উদাহরণ দিলেই বিষয়টি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

প্রথমত, অনুভূতির গুরুত্ব। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব অনুভূতি বা ভাবের সাহিত্যতত্ত্ব, উপলব্ধির সাহিত্যতত্ত্ব। আমরা জানি, রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বেও অনুভূতির গুরুত্ব অপরিসীম। এই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বকে আমরা অনায়াসে রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব বলতে পারি। শুধু দুটি কথা এখানে মনে রাখতে হবে। এক, উনবিংশ শতকের

রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রীদের বাইরেও আমরা নানা জাতের অনুভূতি-পন্থীর সাক্ষাৎ পাবো। দুই, ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ, বায়রন প্রমুখ রোমান্টিক কবিরা অনুভূতি বলতে যা বোঝেন, রবীন্দ্রনাথ ঠিক তা বোঝেন না। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অনুভূতি অর্থ নিছক ফীলিং নয়। অনেক গভীরতর ব্যাপার।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে সৃজনশীল কল্পনার গুরুত্ব অসামান্য। রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্বেও তাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পনাতত্ত্বকে সৃষ্টিকর্তা মানুষের তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে, একটি সার্বভৌম বৃত্তি হিসেবে কল্পনাকে এমন এক দার্শনিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন, ঊনবিংশ শতকীয় রোমান্টিকদের মধ্যে যার সন্ধান মিলবে না। কাণ্ট প্রমুখ পূর্বসূরীদের মধ্যে মিলতে পারে, খাঁটি রোমান্টিকদের মধ্যে নয়। কোল্‌রিজের মধ্যেও না।

রবীন্দ্রনাথ ভাব বা উপলব্ধিকে একটি জ্ঞানবৃত্তি রূপে, বলতে পারি, প্রজ্ঞাবৃত্তি রূপে গ্রহণ করেছেন। এই ভাব বুদ্ধিধর্মী বা যুক্তিধর্মী বৃত্তি নয়, বরং হৃদয়ধর্মী বৃত্তি—অনুভূতি-জাতীয় বৃত্তি। একে ইন্‌টুইশান বা বোধিগোত্রের বৃত্তি বলেও ধরতে পারি। রোমান্টিকেরা সাধারণত অনুভূতি বা উপলব্ধিকেই যথার্থ জ্ঞানবৃত্তি ব'লে গ্রহণ ক'রে থাকেন। এইখানে রোমান্টিকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মিল সুস্পষ্ট। রোমান্টিকেরা সাধারণত বুদ্ধি-বিরোধী। তাঁদের মতে বুদ্ধি সত্যদর্শনে শুধু অক্ষম নয়, বুদ্ধি সত্যকে সব সময় বিকৃত করে। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধিবাদী নন, কিন্তু রোমান্টিক বুদ্ধিবিরোধিতা রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত। আগেই দেখেছি, রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে ভাব অর্থ নিছক ফীলিং নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে ভাবে জানা অর্থ—'হৃদা মনীষা মনসা' উপলব্ধি করা। ভাব অর্থ সমগ্র মন, তার মধ্যে বুদ্ধিরও স্থান আছে। চূড়ান্ত ভাবপন্থী বা ফীলিং-পন্থী রোমান্টিকেরা সাধারণত সভ্যতার অগ্রগতিতে অবিশ্বাসী, তাঁরা সাধারণত বিজ্ঞান সম্পর্কে অসহিষ্ণু। রবীন্দ্রনাথ মোটেই তা নন।

রোমান্টিকেরা অনুকরণবাদ-বিরোধী, তাঁদের মতে সাহিত্য অনুকরণ নয়, সাহিত্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথও অবিকল এই কথাই বলেন। কিন্তু

রবীন্দ্রনাথের অনুকরণবাদ-বিরোধিতা যতোটা ভাষাগত, ততোটা মর্মগত নয়। তিনি বিশ্বাস করেন, সাহিত্য জগৎ ও জীবনের রূপায়ণ—অন্তত হৃদয়ে-প্রতিফলিত জগৎ-সত্যের রূপায়ণ।

পাশ্চাত্য রোমান্টিকেরা প্রকাশবাদী। রবীন্দ্রনাথও প্রকাশবাদী। কিন্তু রোমান্টিকেরা কবির অন্তরস্থিত ভাবের প্রকাশের কথা বলেন, কবির আত্মপ্রকাশের কথা বলেন। রবীন্দ্রনাথ ঠিক তা বলেন না। তিনি বলেন মানবপ্রকাশের কথা। যখন আত্মপ্রকাশের কথা বলেন, তখনো তার অর্থ মানবত্বের প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য বা শিল্পের ব্যাপারে অ-প্রয়োজনবাদী বা লীলাবাদী। তিনি শিল্পের স্বরাজ্যে—আপন ক্ষেত্রে তার পরিপূর্ণ স্বাধিকারে বিশ্বাসী। তিনি বিশ্বাস করেন, শিল্প অপর কিছুর দাসত্ব করে না, সে অপর-কিছুর জন্য নয়। রোমান্টিকেরাও সাধারণত এই কথাই বলেন। কিন্তু শিল্পের স্বাধিকারতত্ত্বকে রোমান্টিকেরা 'শিল্পের জন্য শিল্প' শ্লোগানের মধ্য দিয়ে যে বিশেষ পরিণামের দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন, তা রবীন্দ্রনাথ কখনোই সমর্থন করেন নি। তিনি উত্তর-পর্বের পাশ্চাত্য রোমান্টিকদের মতো মোটেই সৌন্দর্যবিলাসী বা কল্পনাবিলাসী ছিলেন না।

কেউ কেউ—যেমন টি. ই. হিউম—বলেন, ক্লাসিকপন্থীতে ও রোমান্টিকে প্রধান পার্থক্য তাঁদের দুই বিপরীত মানবতত্ত্বে। রোমান্টিক মতে মানুষ অনন্ত সম্ভাবনার আকর, ক্লাসিকপন্থী মতে মানুষ একটি নির্দিষ্ট চরিত্রবিশিষ্ট সীমাবদ্ধ জীবমাত্র।[১] এই মতকে গুরুত্ব দিলে রবীন্দ্রনাথ শুধু রোমান্টিক নন, রোমান্টিক-চূড়ামণি। কিন্তু রোমান্টিকেরা বলেছেন ব্যক্তিমানুষের কথা, বিশেষ ক'রে শিল্পী-মানুষের কথা। তাঁদের মতে মানুষের বিশিষ্টতার মধ্যেই তার অন্তহীন সম্ভাবনার উৎস। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথ যার অনন্ত সম্ভাবনার কথা বলেছেন, সে ব্যক্তি-মানুষ নয়। সে একলা-মানুষ নয়, সে ইতিহাসের মানুষ। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, মানবসম্মিলন, মানবসমগ্রতা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি মানব-ইতিহাসের ক্রমবিকাশের দিকে। এ পার্থক্য অত্যন্ত

১. Speculations (1936), 116

গুরুত্বপূর্ণ। মানবসমগ্রতাকে, অথবা মানব-ইতিহাসকে অনন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ ভাবার জন্য রোমান্টিক হওয়ার কোনো প্রয়োজন করে না।

রোমান্টিকেরা মানুষ ও প্রকৃতির নিবিড় আত্মীয়তায় বিশ্বাসী, মানুষ ও তার বহির্বিশ্বের ঐক্যে বিশ্বাসী। রবীন্দ্রনাথও তাই। এই দিক থেকে দেখলে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই রোমান্টিক। কিন্তু, মনে রাখতে হবে যে, প্রথমত ঐক্যতত্ত্বে রোমান্টিকদেরই একচাটিয়া অধিকার নয়; দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের ঐক্যতত্ত্ব—অন্তত কার্যত—ঈষৎ ভিন্ন প্রকৃতির। রোমান্টিক ঐক্যতত্ত্বে অহংএর প্রাধান্য। মুখে বিষয় ও বিষয়ীর ঐক্যের কথা বললেও, কার্যক্ষেত্রে তাঁরা বিষয়ীকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের ঐক্যতত্ত্বে অহং-এর প্রাধান্য নেই। রবীন্দ্রনাথের কাছে, অন্তত তাঁর পরিণত সাহিত্যতত্ত্বে, বিষয় এবং বিষয়ী তুল্য মূল্য, এরা সতত-সংযুক্ত, এর একটি ভিন্ন অপরটি অসিদ্ধ। আমি এবং না আমি-র যুগলমিলনের মধ্যেই আমিও সত্য, না আমিও সত্য।

এইভাবে আরো অনেক তথ্য আমরা আহরণ করতে পারি। সব ক্ষেত্রেই আমরা মোটামুটি এক ধরনের ব্যাপার দেখতে পাবো: প্রথমত, তরুণ বয়সে সুস্পষ্ট রোমান্টিকতা, এবং দ্বিতীয়ত, পরিণত বয়সে একদিকে পুরোনো রোমান্টিকতার আকর্ষণ, অন্য দিকে তার থেকে উত্তরণের প্রয়াস, এবং এই দুই শক্তির নিরন্তর টানা-পোড়েন।

৩

যে মৌল প্রত্যয়কে ভিত্তি ক'রে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব গ'ড়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন, আনন্দ। আনন্দ একটা বস্তু নয়, একটা নিষ্ক্রিয় অবস্থা নয়, আনন্দ একটা সক্রিয়তা—একটা সক্রিয় অনুভব। আনন্দ আর আনন্দের অনুভব আলাদা নয়। আনন্দ একটা আস্বাদনক্রিয়া, এমন যেখানে আস্বাদ থেকে ক্রিয়াকে বা ক্রিয়া থেকে আস্বাদকে মোটেই আলাদা করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আনন্দ কেবল সাহিত্যতত্ত্বেরই মূল কথা নয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনতত্ত্ব বিশ্বতত্ত্ব সবেরই মূল কথা আনন্দ। সত্তার প্রজ্বলন্ত শিখারই নাম আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্তা এবং আনন্দ সমার্থক। অর্থাৎ অস্তিত্বমাত্রেই আস্বাদ্য এবং আস্বাদনেই সে সত্য। থাকা-ব্যাপারটার একমাত্র অর্থই হ'লো আনন্দ-অনুভব-করতে-করতে-থাকা। এরই নাম রস, এরই নাম অমৃত। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার উপনিষদ্ উদ্ধৃত করেছেন। বলেছেন, 'আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি'। যা-কিছু আছে, সবই আনন্দরূপ, সবই অমৃত।

তত্ত্ব হিসেবে রবীন্দ্রনাথের এই আনন্দতত্ত্বকে খুব মৌলিক বা অভিনব বলা যায় না। রবীন্দ্রনাথ সে রকম দাবিও করেন নি। এ-ক্ষেত্রে উপনিষদের উত্তরাধিকারকে তিনি সানন্দে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। তৎসত্ত্বেও তাঁর আনন্দতত্ত্ব তাঁরই আনন্দতত্ত্ব। যা-কিছু আছে সব আনন্দরূপ, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েই রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য শেষ হয় নি। সবই আনন্দ, এ-কথা রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্যের ভূমিকা মাত্র। আনন্দের ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ উপনিষদকে পাশ কাটিয়ে নিজের পথে এতো দূরে চলে এসেছেন যে, তাঁর আনন্দভিত্তিক সাহিত্যতত্ত্বকে মৌলিক বলতে খুব আটকাবার কথা নয়।

আনন্দ কথাটা হয়তো উপনিষদের, কিন্তু তার অর্থটা রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব। রবীন্দ্রনাথের কাছে যে-কোনো অনুভূতিই আনন্দ—সুখ হোক, দুঃখ হোক, ক্রোধ হোক, ভয় হোক, প্রেম ঘৃণা বিস্ময় যা-ই হোক না কেন, জীবনের পাত্রে যতো রকমের অনুভব আছে, জীবনের পৌষ-ফাগুনের পালায় যতো রকমের কান্নাহাসি আছে, জীবনের বিপুল ভাণ্ডার থেকে যতো রকমের অভিজ্ঞতার আস্বাদ আমরা গ্রহণ করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ তাদের সবাইকেই বলেছেন আনন্দ। দুঃখও নিরানন্দ নয়, দুঃখও তীব্র আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অনুভূতিই জীবন এবং জীবনই আনন্দ। রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ জীবনবাদেরই নামান্তর। আনন্দ নামে কোনো বিশিষ্ট বা স্বতন্ত্র অনুভূতি থেকে রবীন্দ্রনাথ যাত্রা শুরু করেন নি, তিনি যাত্রা শুরু করেছেন জীবনের বহু-বিচিত্র আস্বাদ থেকে। সেই বহু-বিচিত্রকেই রবীন্দ্রনাথ আনন্দ বলেছেন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, অনুভবহীন অসাড়তাই নাস্তিত্ব। অনুভব যত তীব্র হয়, সত্তার শিখা ততোই উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে। অনুভব যতো স্তিমিত হয়,

সত্তার শিখা ততোই স্তিমিত ও ধূমাঙ্কিত হয়ে পড়ে। দুঃখ নয়, অসাড়তাই, —নাস্তিত্বই আনন্দের বিপরীত। প্রবল দুঃখ সত্তাকেই উজ্জ্বল ক'রে তোলে, জ্যোতির্ময় ক'রে তোলে। দুঃখে আমরা আমাদের অস্তিত্ব-গৌরবকে স্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারি। দুঃখ আমাদের চৈতন্যকে প্রখর করে তোলে, তার মধ্যে দিয়ে আমাদের আত্ম-আস্বাদন, আমাদের অস্তিত্বের উপলব্ধি নিবিড় হয়। এই অস্তিত্বের উপলব্ধিকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন অস্মিতাবোধ, তারই নাম আত্ম-আস্বাদন বা আত্মোপলব্ধি, তারই নাম আনন্দ। সব অনুভবেই আত্ম-আস্বাদন ঘটে। কিন্তু দুঃখে তা সুনিবিড়। এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্যের পথে'-র ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড়ভাবে অস্মিতাসূচক।'

রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের জীবন অনুভবময়। গোটা জীবনটাই একটা ছেদহীন অনুভূতি-প্রবাহ, একটা ক্ষান্তিহীন আত্মানুভব-প্রক্রিয়া, এবং সেই অর্থে, একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দধারা। সাহিত্য আমাদের আত্মানুভবকে প্রখর ও গভীর করে। সাহিত্য জীবনের ভস্ম-আচ্ছাদনকে ছিন্ন করে, জীবনের নিহিত সত্যকে জাজ্জ্বল্যমান ক'রে তোলে, সাহিত্য জীবনের নিহিত আস্বাদকে পরিপূর্ণ ক'রে তোলে—সত্য ও সার্থক ক'রে তোলে। এইখানেই সাহিত্যের আনন্দকরতা।

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য জীবনের রস-বিচিত্র পরিচয়কে আমাদের সামনে মেলে ধরে, জীবনের তুচ্ছ ও মহৎ, স্থূল ও সূক্ষ্ম, গভীর ও অগভীর সমস্ত রকম অভিজ্ঞতাকে—জীবনের সুখদুঃখআনন্দবেদনাময়, ভয়ক্রোধবিস্ময় ঘৃণায়-উদ্‌বেলিত, আশানিরাশায় দোলায়িত, প্রেমপ্রীতিঈর্ষাহিংসায় পরিপূর্ণ অজস্রতাকে, জীবনের সমস্ত সমারোহসম্ভারকে অনাবৃত ক'রে দেয়। জীবনের এই অকুণ্ঠ ও পরিপূর্ণ স্বীকৃতির কারণেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বকে আমরা জীবনবাদী সাহিত্যতত্ত্ব বলে অভিহিত করতে পারি। আনন্দবাদ কথাটা অবশ্য মোটেই মিথ্যা নয়। কিন্তু সমুচ্চ একটা তাত্ত্বিক ভূমি থেকে এবং একটা বিশেষ ধরনের দার্শনিক অর্থেই মাত্র একে আমরা আনন্দবাদী বলতে পারি, সাধারণ অর্থে নয়। সাধারণ সাহিত্যজিজ্ঞাসুর কাছে জীবনবাদী নামটাই বোধকরি বেশি স্বাভাবিক বলে' মনে হবে। কিছু-একটা বলতেই

যদি হয়, তাহলে বলবো, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব জীবনরসিকের সাহিত্যতত্ত্ব।

রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রগাঢ়ভাবে অনুভব করা অর্থ 'হৃদয় মনীষা মনসা' উপলব্ধি করা। বোঝা যাচ্ছে, এ অনুভূতি নিছক আবেগাত্মক ব্যাপার নয়, নিছক বেদনা নয়, অর্থাৎ নিছক ফীলিং নয়। এ হ'লো ভাবনা বেদনা বাসনার সমগ্রতা। তা যদি না হ'তো, জীবনের পূর্ণতাকে অনুভূতি দিয়ে ধরা যেতো না, এবং রবীন্দ্রনাথ জীবনের বদলে যে-রকম অনায়াসে অনুভূতি কথাটাকে ব্যবহার করেছেন, তা করা যেতো না।

অনুভূতি কথাটাকে রবীন্দ্রনাথ খুব গভীর অর্থে গ্রহণ করেছেন। অনুভূতি ভাবনা-বেদনা-এষণায় সম্পূর্ণ সমগ্র চৈতন্যের একটি অনবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা। তা একাধারে জ্ঞানময়, সক্রিয় এবং আস্বাদনধর্মী। রবীন্দ্রনাথ আস্বাদনের উপরেই হয়তো বেশি জোর দিয়েছেন। কিন্তু মনের অপর বৃত্তিগুলিকেও অস্বীকার করেন নি।

রবীন্দ্রনাথের মতে, অনুভূতি একটা সক্রিয় যোগসাধন, মেলা এবং মেলানো, হয়ে-ওঠা এবং গড়ে'-তোলা। রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি, 'অনুভব শব্দের ধাতুগত অর্থের মধ্যে আছে অন্য কিছুর অনুসারে হয়ে ওঠা; শুধু বাইরের থেকে সংবাদ পাওয়া নয়, অন্তরে নিজেরই মধ্যে একটা পরিণতি ঘটা।'[২]

এই পরিণতি কী? এর মধ্যে দিয়ে বিষয়ী অর্থাৎ অনুভবকারী অনুভবের বিষয়ের সঙ্গে এক হয়ে যান, বিষয়ের মধ্যে অনুভবকারী নিজেকে উপলব্ধি করেন, বিষয় হয়ে গিয়ে তারই মধ্যে বিষয়ী নিজের নতুন পরিচয় লাভ করেন। 'আমরা যাকে বলি সাহিত্য, বলি ললিতকলা, তার লক্ষ্য এই উপলব্ধির আনন্দ, বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর এক হয়ে যাওয়াতে যে আনন্দ।'[৩] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ আরো বলেছেন, 'মানুষও নানা জরুরি কাজের দায় পেরিয়ে চায় আপন আকাশমণ্ডল, সেখানে তার অবকাশ, যেখানে বিনা প্রয়োজনের লীলায় আপন সৃষ্টিতে আপনাকে প্রকাশই তার চরম লক্ষ্য—

২. সাহিত্যতত্ত্ব, সাহিত্যের পথে, র।১৪।৩৫৩

৩. তদেব

যে সৃষ্টিতে জানা নয়, পাওয়া নয়, কেবল হওয়া। পূর্বেই বলেছি, অনুভব মানেই হওয়া। বাহিরের সত্তার অভিঘাতে সেই হওয়ার বোধে বান ডেকে এলে মন সৃষ্টিলীলায় উদ্‌বেল হয়ে ওঠে।'৪

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, নানাবিধ স্বার্থের আবরণে, নানাবিধ ছাঁচে-ঢালা অবচ্ছিন্নতার বা এ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শনের বহু বিস্তৃত নীহারিকায় মানুষের হৃদয়ের জগতের সত্যতা আবৃত থাকে, 'তাদের রূপহীনতার কুহেলিকায় ব্যক্তিগত মানবের বেদনাময় বাস্তবতা আচ্ছন্ন' থাকে।৫ এই কুহেলিকার কারণেই রূপের বাস্তবতা চাপা পড়ে' যায়। 'মানবচিত্তের এই সকল বিরাট অসাড়তার নীহারিকাক্ষেত্রে বেদনাবোধের বিশিষ্টতাকে সাহিত্য দেদীপ্যমান ক'রে তুলেছে। রূপে সেই সকল সৃষ্টি সসীম, ব্যক্তিপুরুষের আত্মপ্রকাশে সীমাতীত।...এই সকল রূপসৃষ্টিতে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা।'৬

এই যে ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের একাত্মতা, এটা একটা নিরবচ্ছিন্ন ক্রিয়াশীলতা। এর মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিও ব্যক্তি হয়ে ওঠে, বিশ্বও বিশ্ব হয়ে ওঠে। ব্যক্তি বা বিশ্ব কোনোটাই তৈরি-হয়ে যাওয়া বস্তু নয়, রেডিমেড পদার্থ নয়। দুই-ই প্রতিনিয়ত হয়ে-হয়ে উঠছে। আলাদাভাবে নয়, একসঙ্গে। দুটো আলাদা হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া নয়, একটাই হয়ে-ওঠা। এই হয়ে-ওঠার মধ্যে আমিও নিষ্ক্রিয় নই, বিশ্বও নিষ্ক্রিয় নয়—উভয়েই উভয়কে গড়ে' তুলছে।

রবীন্দ্রনাথের কাছে এই হয়ে-ওঠাটাই সত্য। এরই নাম সৃজনশীলতা। এর মধ্যে দিয়ে আমরা হয়েও উঠি, গড়ে'ও তুলি। নিজেকেও গড়ি, নিজের বিশ্বকেও গড়ি। মানুষ একই হয়ে-ওঠার মধ্যে দিয়ে যুগপৎ আত্মসৃজনশীল এবং বিশ্বসৃজনশীল। আমরা শুধু নিজেকে রচনা করি না, সেই একই সঙ্গে আমাদের সমাজকে সংসারকে, আমাদের জীবনকে, আমাদের বিশ্বজগৎকেও রচনা করি। মানুষ মাত্রেই স্রষ্টা, মানুষ মাত্রেই আর্টিষ্ট, মানুষ মাত্রেই সাহিত্যিক।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমি আছি এবং আর-সমস্ত আছে, আমার

৪. তদেব, ৩১৫

৫. তদেব, ৩৬৪

৬. তদেব, ৩৬৪-৫

অস্তিত্বের মধ্যে এই যুগলমিলন।'[৭] কিন্তু এইটেই শেষ নয়। আমার মধ্যে যেমন না-আমি মিশে আছে, না-আমির মধ্যেও তেমনি আমি মিশে আছি। আমি যে যুগলমিলনের ফল, আমার বিশ্বজগৎও সেই একই যুগল-মিলনের ফল।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমার বাইরে কিছুই যদি অনুভব না করি তবে নিজেকেও অনুভব করি নে।'[৮] অর্থাৎ আমার আত্মবোধ আমার বিশ্ব-বোধের উপর নির্ভরশীল। এ-ও যেমন সত্য, এর উল্টোটাও তেমনি সত্য। আমার বিশ্ববোধ আমার আত্মবোধের উপর নির্ভরশীল। আমি না থাকলে আমার বিশ্বজগৎও থাকে না। আমাদের বিশ্বজগৎ আমাদেরই সৃষ্টিকরা বিশ্বজগৎ, মানবিক বিশ্বজগৎ। এই মানবিক সৃষ্টিক্রিয়ার বাইরে সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, সম্পূর্ণ অমানবিক কোনো জগৎকে আমরা জানি না, জানতে পারি না, জানতে চাই না। তেমন কোনো জগৎ থাকলেও তা আমাদের পক্ষে সত্য নয়। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, 'মানুষের হৃদয় ছড়িয়ে আছে, মিলিয়ে আছে, পৃথিবীর আলোয় ছায়ায়—তার গন্ধে, তার গানে। অতীত কালের সংখ্যাতীত মানুষের প্রেমে পৃথিবী যেন ওড়না উড়িয়ে আছে; বায়ুমণ্ডলে যেমন তার বাষ্পের উত্তরীয়, এ তেমনি তার চিন্ময় আবরণ; এর মধ্যে দিয়ে মানুষ রঙ পায়, সুর পায় আপন চিরন্তন মনের।'[৯] পরিণত বয়সে এই কথাটাই আরো গভীরতর তাৎপর্যে, আরো দার্শনিক গুরুত্বে অকুণ্ঠভাবে উচ্চারণ করেছেন। মধ্য বয়সে এক সময় বলেছিলেন, '......হৃদয়বৃত্তির রসে জারিয়া তুলিয়া আমরা বাহিরের জগৎকে বিশেষরূপে আপনার করিয়া লই।'[১০]—এই কথার মধ্যেও একটা দ্বৈততা রয়ে গিয়েছে, যেন দুটো আলাদা জগৎ, একটা বাইরের, আর একটা হৃদয়ের। পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ এই দ্বৈততা সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, হৃদয়ের জগৎ-ই একমাত্র জগৎ। তার বাইরে অপর কোনো জগতের সঙ্গে

৭. তদেব, ৩৫২

৮. তদেব

৯. নানাকথা, বিচিত্রপ্রবন্ধ, র।১৪।৭১৭

১০. সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্য, বা।১৩।৭৩৭

আমাদের সম্পর্ক নেই, আমাদের কাছে তার অস্তিত্বও নেই। আইন্‌স্টাইনের কথোপকথনের কালেও (Religion of Man, Appendix II দ্রষ্টব্য) রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাকে খুব জোর দিয়ে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন।

এইখানেই থেমে থাকলে এই ব্যক্তিভিত্তিক শীর্ণ ভাববাদ নিয়ে আমাদের খুব বেশি কৌতূহলের কিছু থাকতো না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে থামেন নি। এর উল্টো দিকের কথাটাকেও তিনি সমান জোর দিয়েই বলেছেন। বলেছেন যে, না-আমি ছাড়া আমি সিদ্ধ নয়, না-আমির বাইরে আমি সত্য নয়। বহির্বিশ্বই মানবব্যক্তিত্বকে গড়ে তোলে। কিন্তু বহির্বিশ্বকে বহির্বিশ্ব বলা ভুল। মানববিশ্বই এক এবং অদ্বিতীয় বিশ্ব। ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের সমস্ত উপাদান—সমস্ত 'কন্টেন্ট্' এই মানববিশ্ব দিয়ে গড়া। 'If this world were taken away, our personality would lose all its content.[১১]

সৃষ্টি কথাটার একটা যেমন বিশিষ্ট, সংকীর্ণ এবং প্রচলিত প্রয়োগ আছে, তেমনি তার একটা ব্যাপক অর্থে, গভীর অর্থে প্রয়োগও আছে। প্রচলিত প্রয়োগে যিনি কবিতা লেখেন, ছবি আঁকেন, মূর্তি গড়েন, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই আর্টিস্ট। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রত্যেক মানুষই স্রষ্টা, তা সে কবিতা লিখুক বা না-ই লিখুক, ছবি আঁকুক বা না-ই আঁকুক। মানুষের জীবনই তার শিল্প, মানুষের ইতিহাসই মানুষের শিল্প। শিল্পী না হয়ে মানুষের উপায় নেই, কারণ সৃষ্টি তার স্বধর্ম। স্বধর্মপালনের তাগিদেই মানুষ সভ্যতার নির্মাতা, ইতিহাসের স্রষ্টা, আবার সাহিত্যেরও রচয়িতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আর্টিস্টের ধর্মই মানুষের আপন ধর্ম। মানুষ মানুষ বলেই সে আর্টিস্ট, এবং আর্টিস্ট বলেই সে মানুষ। আর্টেই মানুষ মুক্ত, অন্যত্র সে বদ্ধ।

কিন্তু এই আর্ট কোন্ আর্ট? সব মানুষ তো কবি নয়, চিত্রকর নয়, ভাস্কর নয়? যারা নয় তাদের মুক্তি কোথায়? জীবনশিল্পে। সে-ও আর্ট, কিন্তু ব্যাপকতর অর্থে। রবীন্দ্রনাথের কাছে দুই আর্ট পৃথক্ নয়।

১১ What is Art ?—Personality, 14

যে সৃজনশীলতায় মানুষ তার জীবনকে গড়ে—কান্নাহাসির ঘর গড়ে, দেওয়া-নেওয়ার সমাজ গড়ে, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথ দিয়ে ইতিহাস রচনা করে, ঠিক সেই সৃজনশীলতাতেই মানুষ ইলিয়াড রচনা করে, রামায়ণ রচনা করে, মেঘদূত রচনা করে, হ্যাম্‌লেট সৃষ্টি করে। সাহিত্যে ললিতকলায় মানুষের সার্বভৌম সৃজনশীলতারই বাধাহীন প্রকাশ ঘটে। বাধাহীন, সুসংহত, এবং সুপরিস্রুত। বাধাহীন, কেননা তা কল্পনার জগৎ, প্রয়োজনের জগৎ নয়। সুসংহত, কেননা জীবনের বিশৃঙ্খল বহুবিধতা, অবিন্যস্ত বিচিত্রতা সেখানে রূপের বন্ধনে আবদ্ধ, তাৎপর্যের ঐক্যে গ্রথিত। সুপরিস্রুত এই জন্য যে, তার মধ্যে থেকে রচয়িতার ক্ষুদ্র আত্মতা, আসক্তির সমস্ত আবর্জনা উৎসর্জিত।

আসক্তিবর্জন, নিজত্বের উৎসর্জন, সৃষ্টির প্রসঙ্গে এই বিষয়টির উপর রবীন্দ্রনাথ খুব জোর দিয়েছেন। তিনি সাহিত্যকে বলেছেন আত্মপ্রকাশ, কিন্তু তা রচয়িতার নিজত্বের প্রকাশ নয়। তা হ'লো রচয়িতার মধ্যেকার মানবত্বের প্রকাশ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় মানবপ্রকাশ। যে-আমি আসক্তির দ্বারা চালিত, যে-আমি প্রয়োজনের ক্রীতদাস, তাকে বর্জন করতে না পারলে বৃহৎ মানবত্বকে অর্জন করা যায় না। সাহিত্যে ললিতকলায় মানুষ নিজের মধ্যেকার সঙ্কীর্ণ নিজত্বকে বিসর্জন দিয়ে যথার্থ মানবত্বকে অর্জন করে। সাহিত্যের জগৎকে আর্টের জগৎকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের অপ্রয়োজনের জগৎ, লীলার জগৎ, মানুষের মুক্তির জগৎ।

স্বধর্মাচরণেই মুক্তি, তাই আর্টের জগতে মানুষ মুক্ত। আর্টের জগতেই মানুষের আত্মসৃজন ও আত্মলাভ অবাধ, কেননা আর্টের জগতেই মানুষের আত্মবিস্তার বাধাহীন, মানুষ ও বিশ্বজগতের যুগলমিলন বাধাহীন।

৪

মানুষের সকল কর্মেই মানুষ কোন-না-কোনোভাবে কম-বেশি পরিমাণে বিশ্বজগতের সঙ্গে যোগযুক্ত হয়। কিন্তু সব মিলনে মিলনটাই চরম লক্ষ্য থাকে না। সেই কারণে সব মিলনে মানবপ্রকাশ অবারিত

নয়। যতোক্ষণ প্রয়োজনের কর্তৃত্ব, যতোক্ষণ জৈবতার প্রাধান্য, ততোক্ষণ মানবত্ব স্তিমিত, মলিন, মেঘাবৃত। আবরণভঙ্গে মানবস্বভাব মেঘমুক্ত সূর্যের মতো দীপ্তি পায়, নিজেকে অবাধে প্রকাশ করে। সেই প্রকাশেই মিলন সিদ্ধ হয়। এইটেই সাহিত্যের কাজ।

সাহিত্য কথাটার ব্যুৎপত্তিতে যে 'সহিত' শব্দটি আছে, যার অর্থ মিলন, সেই মিলনকে অবলম্বন ক'রে কোনো কোনো প্রাচীন আলংকারিক বলেছেন, সাহিত্য হ'লো শব্দ আর অর্থের মিলন। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যুৎপত্তিকে গ্রহণ করেছেন, কিন্তু তাঁর ব্যাখ্যা ভিন্নতর। তিনি যে-মিলনের কথা বলেছেন তা গভীর, বিস্তৃত এবং মূলগত।

'সাহিত্যের তাৎপর্য' প্রবন্ধে (সাহিত্যের পথে) রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সাহিত্যের সহজ অর্থ যা বুঝি সে হচ্ছে নৈকট্য অর্থাৎ সম্মিলন। মানুষকে মিলতে হয় নানা প্রয়োজনে, আবার মানুষকে মিলতে হয় কেবল মেলবারই জন্যে, অর্থাৎ সাহিত্যেরই উদ্দেশ্যে।...

'এর থেকে বুঝতে পারি, ভাষার ক্ষেত্রে সাহিত্য শব্দের তাৎপর্য কী। তার কাজ হৃদয়ের যোগ ঘটানো, যেখানে যোগটাই শেষ লক্ষ্য।'

(র/১৪/৩৬৬)

মিলন ঘটায় বলে' এবং মিলনটাই শেষ লক্ষ্য বলে সাহিত্য সাহিত্য। প্রয়োজনের মিলন জৈব মিলন। মিলনই তার শেষ লক্ষ্য নয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রের মিলন হৃদয়ের মিলন, প্রেমের মিলন, মিলনের জন্যই মিলন। এ মিলন ভোগের নয়, প্রেমের অথচ অনাসক্তির।

কিন্তু কার সঙ্গে কার মিলন? এ মিলন সর্বতোমুখী। প্রথমত তা লেখকের সঙ্গে তাঁর বহির্বিশ্বের, ব্যক্তির সঙ্গে বিশ্বের মিলন।

দ্বিতীয়ত, লেখকের সঙ্গে তাঁর রচনার—তাঁর সৃষ্টির মিলন। এর মধ্যে দিয়ে বাল্মীকি রামের সঙ্গে রাম হয়েছেন, রাবণের সঙ্গে রাবণ হয়েছেন, হনুমানের সঙ্গে হনুমান হয়েছেন, দুঃখের সঙ্গে দুঃখ হয়েছেন। সাহিত্যে শিল্পে—অর্থাৎ কল্পনার জগতে মানুষের এই মিলনপ্রয়াস বাধাহীন। 'কল্পনার জগতে চায় সে হতে নানাখানা—রামও হয় হনুমানও হয়, ঠিকমত হতে পারলেই খুশি। তার মন গাছের সঙ্গে গাছ

হয়, নদীর সঙ্গে নদী। মন চায় মিলতে, মিলে হয় খুশি। মানুষের আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা সাহিত্যের কাজ।'[১২]

তৃতীয় মিলনের দিক হ'লো পাঠকের দিক। লেখকের ক্ষেত্রে যা সত্য, এখানে পাঠকের ক্ষেত্রেও তাই। লেখকের মতো পাঠকেরও সাহিত্য-সংসারের সকলের সঙ্গে মিলন ঘটে। মিলন ঘটে জানকীবল্লভ রামের সঙ্গে, স্ত্রৈণ দশরথের সঙ্গে, নারীহরণকারী উদ্ধত রাবণের সঙ্গে, বিধ্বস্ত স্বর্ণলঙ্কার সঙ্গে, তমসাতীরের নির্বাসিতা সীতাদেবীর সঙ্গে। মিলন ঘটে ধৃতরাষ্ট্রের অন্ধতার সঙ্গে, ইয়াগোর শঠতার সঙ্গে, হ্যাম্‌লেটে অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে। শুধু লেখকের নয়, পাঠকেরও আপনাকে নিয়ে যে বৈচিত্র্যের লীলা, সাহিত্যে তা সার্থক হয়।

এই তিন মিলনের সূত্রে লেখকে পাঠকে যে মিলন ঘটে, আলাদা করে দেখলে, তাকে আমরা মিলনসাধনের চতুর্থ দিক হিসাবে গণনা করতে পারি। কিন্তু তালিকা রচনা করা নিষ্প্রয়োজন। সাহিত্য পাঠকের সঙ্গে পাঠককে মেলায়, এক দেশের সঙ্গে অন্য দেশকে মেলায়, এক কালের সঙ্গে অন্য কালকে মেলায়।

সাহিত্য মানবস্বভাবের উপর থেকে স্বার্থসাধকতার মেঘাবরণ ছিন্ন ক'রে দিয়ে তাকে বৃহৎ ভূমিকায় স্থাপিত করে। নানা দেশের নানা কালের নানা সমাজের নরনারীকে সম্মিলিত ক'রে সাহিত্য মানবসভ্যতার মৌল ঐক্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। একলা-মানুষের সাহিত্য নেই, সাহিত্য সম্মিলিত মানবমনের রচনা। অন্য দিকে সেই সাহিত্যই আবার মানব-সম্মিলনকে গড়ে তোলে। মানুষ যেমন সাহিত্যকে সৃষ্টি করে, সাহিত্যও তেমনি মানুষকে সৃষ্টি করে, মানুষকে মানুষ ক'রে তোলে।

সাহিত্যের এই মিলনসাধকত্ব বা সহিতত্বের উপর রবীন্দ্রনাথ খুব জোর দিয়েছেন। এটাই স্বাভাবিক, তার কারণ রবীন্দ্রনাথের মতে অনুভূতি অর্থই হ'লো মেলা এবং মেলানো, নিজের মধ্যে অপরকে এবং অপরের মধ্যে নিজেকে আবিষ্কার করা।

১২. সাহিত্যের পথে-র ভূমিকা, র/২১৪/২১

এই অর্থে সব শিল্পই মিলনসাধক, এবং সব শিল্পই সাহিত্য। অনেক সময় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য কথাটাকে সাধারণভাবে আর্ট অর্থেই গ্রহণ করেছেন। যেখানে তা করেন নি, সেখানেও সাহিত্য তাঁর কাছে সমস্ত আর্টের প্রতিনিধি। এই কারণে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব একাধারে সাহিত্যতত্ত্ব এবং শিল্পতত্ত্ব।

৫

শাস্ত্রে বিশ্বজগৎকে দেবতার কাব্য বলা হয়েছে। কথাটি রবীন্দ্রনাথের মনে ধরবার মতো। 'আত্মপরিচয়' গ্রন্থে তিনি অথর্ববেদ থেকে এই মর্মের শ্লোক উদ্ধার ক'রে দিয়েছেন: 'দেবস্য পশ্য কাব্যং ন মমার ন জীর্যতি।'[১৩]

দেবতার কাব্য দেবতার প্রয়োজনসাধক নয়। প্রয়োজন অপূর্ণতার সূচক। জগৎ স্রষ্টার অপূর্ণতা নেই। তাহলে তিনি কেন জগৎ সৃষ্টি করলেন? ব্রহ্মসূত্রে বলা হয়েছে, এ তাঁর লীলা। যা প্রয়োজনের জন্য নয়, তা-ই লীলা।

শাস্ত্র কেবল বিশ্ব স্রষ্টাকেই লীলাময় বলেছে, আর কাউকে নয়। এইখানে রবীন্দ্রনাথ শাস্ত্রের সীমানাকে ছাড়িয়ে গিয়েছেন। কেবল দেবতার কাব্যকে নয়, রবীন্দ্রনাথ মানবের কাব্যকেও বলেছেন লীলা, তিনি মানুষকেও বলেছেন, লীলাময়। শাস্ত্রমতে জগৎসৃষ্টি স্রষ্টার আনন্দ-প্রাচুর্যের প্রকাশ। মানুষের সাহিত্য সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ সেই কথাই বলেছেন: সাহিত্য মানুষের প্রয়োজনের প্রকাশ নয়, আনন্দপ্রাচুর্যের প্রকাশ। সৃষ্টি স্রষ্টার স্বভাব। স্বভাবের কোনো কেন হয় না। সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথের সেই কথা। কোনো কেন-র প্রশ্ন ওঠে না, সাহিত্যসৃষ্টি সাহিত্যস্রষ্টা মানুষের স্বভাব।

রবীন্দ্রনাথের মতে মানুষ একই সঙ্গে দুই জগতের অধিবাসী। একটি হ'লো ব্যবহারিক বা প্রয়োজনের জগৎ, স্বার্থসম্পর্কের জগৎ। এখানে

১৩. আত্মপরিচয়, র।১০।২২১ (মূল শ্লোক—অথর্ববেদ শৌনিক সংহিতা, ১০।৮।৩১-৩২)

মানুষ জীবক্রিয়াতত্ত্বের অধীন, আর পাঁচটা জীবের মতোই একটি জীব মাত্র। এই জৈবসত্তা মানুষের মিথ্যা নয়, কিন্তু নিম্নতর স্তরের সত্য, খণ্ডিত সত্য—মিথ্যারই সামিল। একে প্রতিনিয়ত অতিক্রম ক'রে যাওয়াতেই মানুষের মনুষ্যত্ব।

একই সঙ্গে মানুষ আর একটা জগতেরও অধিবাসী। সে জগৎ প্রয়োজনের জগৎ নয়, মানুষ সেখানে জীবমাত্র নয়। আপন জৈবসত্তাকে অতিক্রম করার মধ্যে দিয়েই মানুষ এই জগৎটাকে সত্য ক'রে তোলে, এবং নিজেকেও যথার্থভাবে মানুষ ক'রে তোলে। প্রয়োজনের জগতে মানুষ দাস, আপন মানবস্বভাব থেকে ভ্রষ্ট। অপ্রয়োজনের জগতে মানুষ মুক্ত।

যে-কোনো ক্রিয়াই হোক না কেন, যার মধ্যেই মানুষ জৈবতাকে অতিক্রম করে, সেইখানেই মানুষ স্বাধীন, সেই ক্রিয়াতেই মানুষের মুক্তি। এই মুক্তির জগতেই মানুষ নিজেকে অর্জন করে। এই মুক্তির জগৎই মানুষের লীলার জগৎ। সাহিত্যে আর্টে মানুষ এইভাবে আনন্দের মধ্যে নিজেকে লাভ করে, এবং নিজেকে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে মুক্তিকে অর্জন করে।

সাহিত্যে মানুষ দেবতার সমকক্ষ, বিশ্বস্রষ্টার সমগোত্রীয়। কথাটা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতে বলি। 'সৃষ্টিকর্তাকে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে লীলাময়। অর্থাৎ তিনি আপনার রসবিচিত্র পরিচয় পাচ্ছেন আপন সৃষ্টিতে। মানুষও আপনার মধ্যে থেকে আপনাকে সৃষ্টি করতে করতে নানা ভাবে, নানা রসে আপনাকে পাচ্ছে। মানুষও লীলাময়। মানুষের সাহিত্যে আর্টে সেই লীলার ইতিহাস অঙ্কিত হয়ে চলেছে।'[১৪]

ভারতীয় দর্শনে লীলাবাদ খুব অপরিচিত বস্তু নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা বৈষ্ণব দর্শনের কথা উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু ভারতীয় সাহিত্যতত্ত্ব বিশিষ্ট অর্থে লীলাবাদী সাহিত্যতত্ত্ব নয়। অন্যদিকে, পাশ্চাত্য শিল্পতত্ত্বে-সাহিত্যতত্ত্বে লীলাবাদ জিনিসটা খুব অভিনব নয়। কান্টের অনুসরণে পাশ্চাত্য শিল্পচিন্তায় নানান ধরনের নানান জাতের লীলাবাদের উদ্ভব হয়েছে। এই প্রসঙ্গে শিলারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সে

১৪. 'সাহিত্যের পথে'র ভূমিকা, র।১৪।২৯২

লীলাবাদ সর্বাত্মক নয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন লীলাবাদী জগৎতত্ত্ব আর লীলাবাদী সাহিত্যতত্ত্বকে এক সঙ্গে মিলিয়ে একেবারে এক ক'রে দিয়েছেন, প্রাচ্য বা পাশ্চাত্য চিন্তায় তার তুলনা কমই মিলবে।

পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্বে লীলাবাদের অনুরূপ আর একটি মতবাদের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, যাকে বলা হয় প্লে-থিয়োরি—ক্রীড়াবাদ। তা মূল বক্তব্যটা এই যে, মানুষের যে-প্রৈতি, যে-এনার্জি ব্যবহারিক কর্মের মধ্যে ব্যয়িত না হয়ে উদ্‌বৃত্ত থেকে যায়, সেই এনার্জি মানুষ খেলার মধ্যে ব্যয় করে। মানুষের শিল্প সাহিত্য এগুলি ক্রীড়াধর্মী, এগুলি মানুষের উদ্‌বৃত্ত এনার্জির প্রকাশ।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের সঙ্গে খেলার কিছু কিছু মিল স্বীকার করেন। অন্যদিকে সাহিত্যকেও তিনি উদ্‌বৃত্ত শক্তির প্রকাশ বলেই মনে করেন। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রের উদ্‌বৃত্ত শক্তি আর খেলার ক্ষেত্রের উদ্‌বৃত্ত শক্তি এক জাতের নয়। বস্তুত, তাঁর মতে, খেলার ক্ষেত্রের উদ্‌বৃত্ত শক্তি যথার্থ উদ্‌বৃত্তই নয়, তার কারণ খেলার মধ্যে জৈবতা প্রচ্ছন্ন থাকে। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথ ক্রীড়াবাদী নন। তাঁর বিবেচনায় উদ্‌বৃত্ত শক্তি আদৌ জৈবশক্তি নয়। উদ্‌বৃত্ত শক্তি দেবশক্তির সমতুল্য, কেননা তা স্রষ্টার শক্তি। এই কারণেই স্রষ্টা-মানুষকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'angel of surplus'।

বিশ্বস্রষ্টার মতো মানুষকেও লীলাময় বলার তাৎপর্য এই যে সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষও স্বাধীন। উভয়ের সৃষ্টিই স্বাধীন সৃষ্টি, দু'য়ের মধ্যে এইখানেই স্বভাবগত মিল। একটি আর-একটির অনুকরণ, একটি আর-একটির প্রতিরূপ বা প্রতিধ্বনি, এমন কিন্তু বলা হচ্ছে না। বাস্তবিক পক্ষে, দুই-ই যদি স্বাধীন হয় তাহলে তো অনুকরণের কথা উঠতেই পারে না। যা অনুকরণ তাকে কখনো মুক্ত বলা যায় না, তা কখনো লীলার প্রকাশ হতে পারে না। যা মুক্ত তা কখনো অপরকে অনুসরণ করে না।

সাহিত্যকে দেবশিল্পের অনুকরণ রবীন্দ্রনাথ বলেন নি ঠিকই, কিন্তু দেবশিল্প যে সাহিত্যের অনুপ্রেরণা, সাহিত্যের উদ্‌বেদজক তা রবীন্দ্রনাথ একাধিক বার বলেছেন। জগৎকে বলেছেন দেবতার লিপি, আর সাহিত্যকে বলেছেন তার প্রত্যুত্তর। বলেছেন, 'What is art? It is

the response of man's creative soul to the call of the Real.'[১৫] জগৎকে বলেছেন বংশীধ্বনি আর সাহিত্যকে বলেছেন তার প্রতিধ্বনি।

সাহিত্যকে লীলা বলা আর সাহিত্যকে প্রতিধ্বনি বলা ঠিক এক কথা নয়। লীলা সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রতিধ্বনি সম্পূর্ণ স্বাধীন নয়। তার একটা উপলক্ষ আছে, বাইরে একটা উদ্‌বেজক কারণ আছে। প্রতিধ্বনির মধ্যে একটা অনুসরণের ইঙ্গিত আছে, একটা অনুরূপতার ইঙ্গিতও আছে। এই অনুরূপতার ইঙ্গিতকে যদি স্বীকার করি, তাহলে মানতেই হবে যে, প্রতিধ্বনিবাদ এক ধরনের সূক্ষ্ম, প্রচ্ছন্ন, বা পরোক্ষ অনুকরণবাদ। অন্তত অনুকরণবাদ থেকে তা খুব দূরবর্তী নয়।

রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যকে লীলা এবং প্রতিধ্বনি, এক সঙ্গে দুই-ই বলতে চান। লীলা এবং প্রতিধ্বনির মধ্যে যে কোনো অনিবার্য বিরোধ আছে তা তিনি মানেন বলে মনে হয় না। তিনি লীলাবাদী নিঃসংশয়ে, কিন্তু অনুকরণবাদের যা মর্মসত্য, তাতে তাঁর খুব আপত্তি নেই। তিনি বিশ্বাস করেন যে, জগৎসত্যই সাহিত্যের মৌল উদ্‌বেজনা। তিনি বিশ্বাস করেন, উদ্‌বেজক এবং উদ্‌বেজনার ফল, এ দুয়ের মধ্যে চরিত্রগত বৈষম্য নেই, এ দুয়ের মধ্যে কোনো আত্যন্তিক বিচ্ছেদ নেই। তিনি বিশ্বাস করেন যে, সাহিত্য যথার্থই জগৎসত্যের রূপায়ণ। এই বিশ্বাসের কারণেই লীলাবাদী হয়েও তিনি অনায়াসে বলতে পারেন, 'ভগবানের আনন্দসৃষ্টি আপনার মধ্য হইতে আপনি উৎসারিত। মানবহৃদয়ের আনন্দসৃষ্টি তাহারই প্রতিধ্বনি। এই জগৎসৃষ্টির আনন্দগীতের ঝংকার আমাদের হৃদয়বীণাতন্ত্রীকে অহরহ স্পন্দিত করিতেছে; সেই যে মানসসংগীত, ভগবানের সৃষ্টির প্রতিঘাতে আমাদের অন্তরের মধ্যে সেই-যে সৃষ্টির আবেগ, সাহিত্য তাহারই বিকাশ। বিশ্বের নিশ্বাস আমাদের চিত্তবংশীর মধ্যে কী রাগিনী বাজাইতেছে, সাহিত্য তাহাই স্পষ্ট করিয়া প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিতেছে।'[১৬]

স্পষ্টভাবে অনুকরণবাদ না হলেও এ উক্তি অনুকরণবাদের খুব কাছাকাছি। এ্যারিস্টটলের অনুকরণবাদের আসল লক্ষ্য যে জগৎসত্য,

১৫. The Religion of Man, 139

১৬. সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্য, রা।১২।৭২৯

রবীন্দ্রনাথ তাকে কখনোই অস্বীকার করেন নি। তাকে তিনি নিজের সৃষ্টি সম্পর্কিত অভিমতের সঙ্গে এবং নিজের লীলাবাদের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছেন।

এই মেলাবার সূত্র হ'লো—মানবস্বভাব, মানুষের স্বধর্ম। জগতের সঙ্গে যোগযুক্ত হওয়া, এ-ও মানুষের স্বভাব, আবার সৃষ্টি সে-ও মানুষের স্বভাব। এ দুটো একেবারেই আলাদা নয়। জগৎসত্যকে অঙ্গীকার করার মধ্যে দিয়ে, তাকে স্বী-কৃত করার মধ্যে দিয়ে সত্য ও সার্থক হয়ে ওঠা, নিজেকে স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত করা, রবীন্দ্রনাথের মতে এই হ'লো মানবধর্ম। জগৎসত্যকে অর্জন করা ও প্রকাশ করা, এই হ'লো মানব-প্রকাশ—এর মধ্যে দিয়েই জগৎসত্য রূপায়িত হয়। এর মধ্যে কোনো বাইরের চাপ নেই, যা আছে সে মানুষের স্বভাবেরই তাগিদ। সকলেই জানেন, দাসত্ব পরধর্মে, স্বধর্মে নয়। স্বধর্মাচরণের কোনো কেন নেই। স্বধর্মাচরণেই মুক্তি। রবীন্দ্রনাথের মতে স্বধর্মাচারী-মানুষই লীলাময়-মানুষ।

তা যদি হয়, তাহলে জগৎসত্যের রূপায়ণ—তাকে অনুকরণই বলি আর প্রতিধ্বনিসৃষ্টিই বলি কিংবা অপর যা-কিছুই বলি—তার সঙ্গে লীলার কোনো বিরোধ থাকে না।

৬

রবীন্দ্রনাথ যেমন জগতের সঙ্গে মানুষের দু'রকম যোগের কথা বলেছেন, প্রয়োজনের বা স্বার্থের যোগ আর লীলার বা প্রেমের যোগ, তেমনি কখনো-কখনো তিনি জগতের সঙ্গে মানুষের তিন রকম যোগের কথাও বলেছেন: স্বার্থের যোগ, বুদ্ধি বা জ্ঞানের যোগ আর আনন্দ বা প্রেমের যোগ। এই অনুসারে বলা যায়, মানুষ একই সঙ্গে তিন জগতের অধিবাসী। একটা তার বেঁচে-থাকার জগৎ বা প্রয়োজনের জগৎ—ব্যবহারিক জগৎ। আর একটা তার জ্ঞানের জগৎ, যেখানে সে প্রয়োজন থেকে অনেকখানি মুক্ত, কিন্তু সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। তৃতীয়টি হ'লো তার

অপ্রয়োজনের জগৎ, তার আত্মসৃজনলীলার জগৎ, তার আনন্দের জগৎ—বিশ্বের বহুবিচিত্রের সঙ্গে নিরাসক্ত প্রেমে যোগযুক্ত হবার জগৎ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষের প্রকাশের জগৎ।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্রহ্মস্বরূপের সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ এই তিন দিকের কথা উল্লেখ ক'রে বলেছেন, 'চিরন্তনের এই তিনটি স্বরূপকে আশ্রয় করে মানব-আত্মারও নিশ্চয় তিনটি রূপ আছে। তার একটি হল আমরা আছি, আর-একটি হল আমরা জানি, আর-একটি কথা তার সঙ্গে আছে,…সেটি হচ্ছে, আমরা ব্যক্ত করি। ইংরেজিতে বলতে গেলে বলা যায়—I am, I know, I express। মানুষের এই তিন দিক এবং এই তিন নিয়েই একটি অখণ্ড সত্য।'[১৭]

একটা মানুষের প্রাণময় স্বরূপ, একটা মানুষের জ্ঞানময় স্বরূপ, আর-একটা মানুষের আনন্দময় স্বরূপ। 'আমি আছি', সত্যের এই ভাবটির মধ্যে আছে মানুষের প্রাণধারণের তত্ত্ব। এর মধ্যেও জ্ঞান আছে, কিন্তু সে জ্ঞানের দীপ্তি নেই, সে জ্ঞান মানুষের প্রাণময় স্বরূপের সঙ্গে যুক্ত। 'আমি জানি', সত্যের এই ভাবটি মানুষের জ্ঞানময় স্বরূপের। 'সেখানে মানুষের জ্ঞান সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে মানবাত্মার সর্বত্র প্রবেশের অধিকারকে ঘোষণা করে। এই অধিকারের বিচিত্র আয়োজন বিজ্ঞানে দর্শনে বিস্তৃত হতে থাকে কিন্তু তার বিশুদ্ধ আনন্দ-রসটি নানা রচনায় সাহিত্যে ও আর্টে প্রকাশ পায়।'[১৮]

অর্থাৎ প্রকাশের দিকটা মানুষের বিশুদ্ধ আনন্দরসের দিক। এই দিকটাই সাহিত্যের দিক, আর্টের দিক।

টিঁকে থাকার ইচ্ছা পশুদেরও আছে। এমন কি জ্ঞানের কৌতূহলও পশুদের আছে। কিন্তু '…মানুষের আর-একটি জিনিস আছে যা পশুদের নেই, সে ক্রমাগতই তাকে কেবলমাত্র প্রাণধারণের সীমার বাইরে নিয়ে যায়। এইখানেই আছে প্রকাশতত্ত্ব।'[১৯]

১৭. সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, র/১৪/৩০৬

১৮. তদেব, ৩০৭

১৯. তদেব

প্রকাশের দিকটাই মানুষের অনন্ত-স্বরূপের দিক। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রকাশটা একটা ঐশ্বর্যের কথা। যেখানে মানুষ দীন সেখানে তো প্রকাশ নেই…। মানুষের যে সকল ভাব স্বকীয় প্রয়োজনের মধ্যেই ভুক্ত হয়ে না যায়, যার প্রাচুর্যকে আপনার মধ্যেই আপনি রাখতে পারে না, যা স্বভাবতই দীপ্যমান, তারই দ্বারা মানুষের প্রকাশের উৎসব।'[২০]

আনন্দপ্রাচুর্যেই মানুষ অপরের সঙ্গে মেলে, নিজেকে বিস্তৃত করে, নিজেকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এই বিস্তার সীমাহীন, এই ছড়িয়ে দেওয়া অন্তহীন। এই জন্যই প্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ মানুষের অনন্ত-স্বরূপের সঙ্গে, মানুষের অনন্ত ঐশ্বর্যের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। প্রকাশের দিকটি মানুষের বহু-র সঙ্গে, বিচিত্রের সঙ্গে মিলনসাধনের দিক—একের বহু ও বিচিত্র হওয়ার দিক। কথাটা রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেই বলেছেন, 'আমি আছি, আমাকে টিঁকে থাকতে হবে, এই কথাটি যখন সংকীর্ণ সীমায় থাকে তখন আত্মরক্ষা বংশরক্ষা কেবল আপনার অহংকে আঁকড়ে থাকে। কিন্তু যে পরিমাণে মানুষ বলে যে, অন্যের টিঁকে থাকার মধ্যেই আমার টিঁকে থাকা সেই পরিমাণে সে নিজের জীবনের মধ্যে অনন্তের পরিচয় দেয়, সেই পরিমাণে 'আমি আছি' এবং 'অন্যসকলে আছে' এই ব্যবধানটা তার ঘুচে যায়। এই অন্যের সঙ্গে ঐক্যবোধের দ্বারা যে মাহাত্ম্য সেইটেই হচ্ছে আত্মার ঐশ্বর্য, সেই মিলনের প্রেরণায় মানুষ নিজেকে নানা প্রকারে প্রকাশ করতে থাকে। যেখানে একলা মানুষ সেখানে তার প্রকাশ নেই।'[২১]

আগেই বলেছি, প্রকাশের দিকটাই মানুষের মিলনসাধনের দিক। এ হ'লো বিশ্বজগতের সঙ্গে, মহাজীবনের সঙ্গে যুক্ত হবার দিক। এরই মধ্যে মানুষ নিজের সংকীর্ণ সীমানাকে ছাড়িয়ে মহাজীবনের আনন্দকে লাভ করে। 'সেই মহাজীবনের আনন্দকে আবেগকে সে নানা সাহিত্যে স্থাপত্যে মূর্তিতে চিত্রে গানে প্রকাশ করতে থাকে।[২২]

২০. তদেব

২১. তদেব, ৩০৬

২২. তদেব

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে প্রকাশ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয়। যাকে সহিত-ত্ব বলা হয়েছে, তা প্রকাশ থেকে স্বতন্ত্র কিছু নয়। একই প্রক্রিয়া, সহিত-ত্বে জোর মিলনের দিকটায়, প্রকাশে জোর বিস্তারের দিকটায়, বিচিত্রকে লাভ করার দিকটায়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সৃষ্টি মাত্রের আসল কথাই হচ্ছে প্রকাশ।'[২৩] তাঁর কাছে সৃষ্টি মানেই মিলন, সৃষ্টি মানেই প্রকাশ, অর্থাৎ একের বহুত্ব-লাভ। '...সাহিত্য ও ললিত কলার কাজই হচ্ছে প্রকাশ।'[২৪]

পাশ্চাত্য সাহিত্যশাস্ত্রীরাও কেউ কেউ—রোমান্টিক সাহিত্যশাস্ত্রীদের অনেকেই সাহিত্য ও ললিতকলাকে প্রকাশ বলেছেন। সেখানে প্রকাশ অর্থটা আলাদা। সেখানে প্রকাশ অর্থ হ'লো ভিতরকে বাইরে আনা, প্রচ্ছন্নকে প্রকাশ্য করা।

সাহিত্য কী প্রকাশ করে, এ প্রশ্নে পাশ্চাত্য প্রকাশবাদীরা কেউ বলবেন, স্রষ্টার হৃদয়স্থিত ভাব বা অনুভূতি। কেউ বলবেন, আসলে স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব, আর্ট হচ্ছে স্রষ্টার আত্মপ্রকাশ। রবীন্দ্রনাথ এর সবই স্বীকার করেন, কিন্তু ঈষৎ ভিন্ন অর্থে। তাঁর কাছে প্রকাশ এই সব ব্যাপারে নিঃশেষিত নয়। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য অনেক গভীর। প্রকাশ কথাটার ভারতীয় অর্থের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের যোগ লক্ষণীয়।

ভারতীয় অর্থে প্রকাশ হলো দীপ্তি পাওয়া। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে প্রকাশের এই একই অর্থ। বিস্তারের মধ্যে দিয়ে, নিজেকে অতিক্রম করার মধ্যে দিয়েই মানুষ দীপ্যমান হয়ে ওঠে। প্রকাশের মধ্যে দিয়েই আমরা আমাদের সীমানাকে অতিক্রম করি, একাকীত্বকে পরাভূত করি, সমগ্রকে লাভ করি। প্রকাশচেষ্টার মূলে রয়েছে মানুষের অন্তহীন আত্মবিস্তারের প্রেরণা, বহুকে ও বিচিত্রকে লাভ করবার ক্ষুধা, অন্তহীন আত্মোপলব্ধির তাড়না। মানুষের আপনাকে বহু করার, বিচিত্র করার, রূপে রূপে অপরূপ করার তাগিদই প্রকাশের তাগিদ। 'মানুষের

২৩. সাহিত্যবিচার, সাহিত্যের পথে, র/১৪/৩৩৭
২৪. তথ্য ও সত্য, ঐ, র/১৪/৩১৫

আপনাকে নিয়ে এই বৈচিত্র্যের লীলা'—এই হ'লো সাহিত্য, এই হ'লো ললিতকলা।'[২৫]

ইচ্ছা করলে এই বৈচিত্র্যের লীলাকে আমরা রূপের লীলাও বলতে পারি। প্রকাশের মধ্যে দিয়েই রূপময় বহির্বিশ্ব এবং মানুষের রূপময় অন্তর্লোক পরিপূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছে।

পাশ্চাত্য অর্থে প্রকাশকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন প্রকাশমাত্র। তা সাহিত্যের আদিম সত্য হতে পারে, পরিণাম সত্য নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে আর্টের পরিণাম সত্য হচ্ছে মানুষের প্রকাশ।

ব্যক্তিবিশেষের ভাবপ্রকাশ নয়, রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য হ'লো মানবপ্রকাশ—বিশ্বমানবের আত্মপ্রকাশ। 'সাহিত্যে বিশ্বমানবই আপনাকে প্রকাশ করিতেছে।'[২৬] এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট করে বলেছেন, 'সম্মিলিত মানবের বৃহৎ মন, মনের নিগূঢ় এবং অমোঘ নিয়মেই আপনাকে কেবলই প্রকাশ করিয়া অপরূপ মানসসৃষ্টি সমস্ত পৃথিবীতে বিস্তার করিতেছে। তার কত রূপ, কত রস, কতই বিচিত্র গতি।

৭

'সাহিত্য' গ্রন্থের 'বিশ্বসাহিত্য' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '...সাহিত্যে মানুষের আত্মপ্রকাশে কোনো বাধা নেই। স্বার্থ সেখান হইতে দূরে দুঃখ সেখানে আমাদের হৃদয়ের উপর চোখের জলের বাষ্প সৃজন করে কিন্তু আমাদের সংসারের উপর হস্তক্ষেপ করে না, ভয় আমাদের হৃদয়কে দোলা দিতে থাকে, কিন্তু আমাদের শরীরকে আঘাত করে না; সুখ আমাদের হৃদয়ে পুলকস্পর্শ সঞ্চার করে, কিন্তু আমাদের লোভকে নাড়া দিয়া অত্যন্ত জাগাইয়া তোলে না।'[২৮]

২৫. সাহিত্যের পথের ভূমিকা, র/১৪/২৯২

২৬. বিশ্বসাহিত্য, সাহিত্য, র/১৩/৭৭১

২৭. সাহিত্যসৃষ্টি, সাহিত্য, র/১৩/৭৯৩

২৮. র।১৩।৭৬৯

কিন্তু কেমন ক'রে এটা সম্ভব হয়? সম্ভব হয়, তার কারণ সাহিত্যের জগৎ প্রাণধারণের জগৎ নয়, জীবক্রিয়ার জগৎ নয়। সাহিত্যের জগৎ দূরের জগৎ, অকর্তৃক জগৎ, কল্পনার জগৎ।

উদ্‌ধৃত কথাগুলির পিঠ-পিঠই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এইরূপে মানুষ আপনার প্রয়োজনের সংসারের ঠিক পাশে পাশেই একটা প্রয়োজন-ছাড়া সাহিত্যের সংসার রচনা করিয়া চলিয়াছে। সেখানে সে নিজের বাস্তব কোনো ক্ষতি না করিয়া নানা রসের দ্বারা আপনার প্রকৃতিকে নানারূপে অনুভব করিবার আনন্দ পায়, আপনার প্রকাশকে বাধাহীন করিয়া দেখে। সেখানে দায় নাই, সেখানে খুশি।'[২৯]

সাহিত্যসংসার কল্পনারই হাতে-গড়া সংসার, কল্পনার কারণেই সেখানে মানুষের আপনার প্রকাশ বাধাহীন। কল্পনা একই সঙ্গে নৈকট্যও রচনা করে, আবার দূরত্বও সৃষ্টি করে। এই নৈকট্য স্বার্থের নৈকট্য নয়, এই দূরত্ব উদাসীনতার দূরত্ব নয়। দূরত্ব প্রয়োজনের জগৎ থেকে, নৈকট্য হৃদয়ের জগতের সঙ্গে। কল্পনার দৃষ্টি একই সঙ্গে প্রেমের এবং নিরাসক্তির দৃষ্টি।

অপরের প্রাণের ভিতর প্রবেশ করার যে শক্তি তাকেই রবীন্দ্রনাথ কল্পনা বলেছেন। কল্পনার মধ্যে এক ধরনের সহমর্মিতা বা সম-অনুভূতি ক্রিয়াশীল। শুধু তাই নয়, অপরের মধ্যে গিয়ে একেবারে অপর হয়ে উঠে অনুভব করা, যাকে আমরা এম্‌প্যাথি বলতে পারি, কল্পনার মধ্যে সেই শক্তিও ক্রিয়াশীল। অপরের মধ্যে প্রবেশ করার, অপর হয়ে যাওয়ার এই শক্তি না থাকলে সহিত-ত্ব বা মিলনসাধন আদৌ সম্ভবপর হতো না।

কল্পনার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'মানুষ বাস্তব জগতে ভয় দুঃখ বিপদকে সর্বতোভাবে বর্জনীয় বলে জানে, অথচ তার আত্ম-অভিজ্ঞতাকে প্রবল ও বহুল করবার জন্যে এদের না পেলে তার স্বভাব বঞ্চিত হয়; আপন স্বভাবগত এই চাওয়াটাকে মানুষ সাহিত্যে আর্টে উপভোগ করে। একে বলা যায় লীলা, কল্পনায় আপনার অবিমিশ্র উপলব্ধি।'[৩০]

২৯. তদেব

৩০. সাহিত্যের পথে-র ভূমিকা, র।১৪।২৯২

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, কল্পনাই বিশ্বজগৎকে মানবিক ও মানসিক ক'রে তোলে—এবং সত্য করে তোলে। কল্পনার এই বিশেষত্বের কথায় তিনি বলেছেন, '…যে শক্তির দ্বারা বিশ্বের সঙ্গে আমাদের মিলনটা কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়ের মিলন না হয়ে মনের মিলন হয়ে ওঠে সে শক্তি হচ্ছে কল্পনাশক্তি ; এই কল্পনাশক্তিতে মিলনের পথকে আমাদের অন্তরের পথ করে তোলে, যা-কিছু আমাদের থেকে পৃথক্ এই কল্পনার সাহায্যেই তাদের সঙ্গে আমাদের একাত্মতার বোধ সম্ভবপর হয়, যা আমাদের মনের জিনিস নয় তার মধ্যেও মন প্রবেশ করে তাকে মনোময় করে তুলতে পারে। এ লীলা মানুষের, এই লীলায় তার আনন্দ।'[৩১] এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, 'আমাদের কল্পনার দৃষ্টি ঐক্যকে সন্ধান করে এবং ঐক্যস্থাপন করে।'[৩২]

কল্পনা যেমন ঐক্য আনে, নৈকট্য আনে, তেমনি দূরত্বও সৃষ্টি করে, ব্যবহারিক সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে বিষয়কে দেশকালের আলিঙ্গন থেকে, স্থূল বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে দেয়। এই দূরত্বের কারণেই বিষয়কে আমরা সম্ভোগদৃষ্টিতে বা নান্দনিক দৃষ্টিতে দেখতে পারি। কথাটাকে রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা যাক। 'মহাভারতের খাণ্ডবদাহ বাস্তবতার একান্ত নৈকট্য থেকে বহু দূরে গেছে—সেই দূরত্ববশত সে অকর্তৃক হয়ে উঠেছে। মন তাকে তেমনি করেই সম্ভোগদৃষ্টিতে দেখতে পারে যেমন করে সে দেখে পর্বতকে সরোবরকে। কিন্তু যদি খবর পাই, অগ্নিগিরিস্রাবে শত শত লোকালয় শস্যক্ষেত্র পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে, দগ্ধ হচ্ছে শত শত মানুষ পশু পক্ষী, তবে সেটা আমাদের করুণা অধিকার করে চিত্তকে পীড়িত করে। (ঘটনা যখন বাস্তবের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে কল্পনার বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতে উত্তীর্ণ হয় তখনই আমাদের মনের কাছে তার সাহিত্য হয় বিশুদ্ধ ও বাধাহীন।'[৩৩])

৩১. সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের পথে ব।১৪।৩৬৯

৩২. তদেব, ৩৭০

৩৩. তদেব

প্রাচীনকালের সাহিত্যশাস্ত্রীরা কল্পনাকে মিথ্যাচারী বলেই—মনোহর মিথ্যার জন্মদাতা বলেই জানতেন। মনে করতেন, সত্যের সঙ্গে কল্পনার কোনো সম্পর্ক নেই। রবীন্দ্রনাথ তা মনে করেন না। রবীন্দ্রনাথের মতে কল্পনা সত্যের আবরণকে সরিয়ে দেয়—এই আশ্চর্য ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সত্য আবিষ্কৃতও হয়, রচিতও হয়। মনে রাখতে হবে, সত্য হ'লো সত্য-হয়ে-ওঠা। এই হয়ে-ওঠার মধ্যে কল্পনার ক্রিয়া অনেকখানি।

সত্য থেকে যদি কল্পনার দানকে বাদ দিই তাহলে যা থাকে তা সত্য নয়, সত্যের কঙ্কাল। রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন তথ্য।

ব্যবহারিক জীবনে, প্রয়োজনের জগতে আমরা প্রয়োজনের মাপে টুক্‌রো ক'রে দেখি, আসক্তি দিয়ে রঞ্জিত ক'রে দেখি, স্বার্থের টানে অতি-নৈকট্যে রেখে দেখি। সেখানে কল্পনা স্ফূর্তি পায় না। সে দেখা সত্যকে দেখা নয়, তথ্যকে দেখা।

বুদ্ধির ক্ষেত্রে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমরা ব্যক্তিগত আসক্তির চশমা দিয়ে দেখি না বটে, তবু সে দেখাও টুক্‌রো ক'রে দেখা, বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে চিরে চিরে দেখা, জীবন্তভাবে দেখা নয়—এ্যাব্‌স্ট্রাক্‌শনে দেখা, বিমূর্ততায় বা অবচ্ছিন্নতায় দেখা। মূল্যসমন্বিত দেখা নয়, মূল্যবর্জিতভাবে দেখা, নিছক ফ্যাক্ট রূপে দেখা। এখানেও কল্পনার অবকাশ সামান্য। বিজ্ঞানের দেখাও সত্যকে দেখা নয়, তথ্যকে দেখা।

সাহিত্যের দেখা আর্টের দেখা আনন্দের দেখা, সম্ভোগের দেখা, যুগপৎ নৈকট্যে এবং দূরত্বে রেখে দেখা। সেই দেখাই কল্পনার সহযোগে দেখা। কঙ্কালকে দেখা নয়, বিষয়কে তার প্রাণের লাবণ্যে দেখা। এই দেখাই সত্যকে দেখা। সত্য তাই যা খণ্ডিত নয়, অবচ্ছিন্ন নয়, ভ্যালু-বর্জিত নয়। সত্য তাই যা সমগ্র, জীবন্ত এবং ভ্যালু-সমন্বিত। নিরাসক্ত অথচ প্রেমের দৃষ্টি দিয়ে দেখলে, অথবা বলি, কল্পনার সহযোগে দেখলে তথ্যই সত্য হয়ে ওঠে, তথ্যের পাত্রেই সত্যের প্রকাশ ঘটে। এই প্রকাশই সাহিত্যের কাজ, ললিত-কলার কাজ।

তথ্য আর সত্যের পার্থক্যের সূত্রে বিজ্ঞান আর সাহিত্যের পার্থক্যের কথাটাও এসে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্য ও বিজ্ঞান দুই-ই

নিরাসক্ত। 'সায়ান্সেই বলো আর আর্টেই বলো নিরাসক্ত মনই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বাহন।'৩৪ এই মিল সত্ত্বেও কিন্তু এদের পার্থক্য সুগভীর।

বিজ্ঞান নৈর্ব্যক্তিক, সাহিত্য তা নয়। বিজ্ঞান ভ্যালু-নিরপেক্ষ—মূল্য-উদাসীন, সাহিত্য তা নয়। বিজ্ঞান বিশ্লেষণাত্মক, সাহিত্য সংশ্লেষণধর্মী। সব থেকে বড় কথা, সাহিত্য নিরাসক্ত কিন্তু সপ্রেম, বিজ্ঞান নিরাসক্ত এবং নিষ্প্রেম।

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানে শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু সে তার স্বক্ষেত্রে। সাহিত্যে-বিজ্ঞানের অনধিকার প্রবেশে তাঁর আপত্তি আছে। সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগে তিনি আদৌ শ্রদ্ধাশীল নন। এমন কি সাহিত্য-সমালোচনাতেও না।

৮

অনেকে মনে করেন, সৌন্দর্যসৃষ্টিই সাহিত্যের লক্ষ্য, সাহিত্যিক সৌন্দর্যের পূজারি। রবীন্দ্রনাথ তা মনে করেন না! রবীন্দ্রনাথের পরিণত সাহিত্যচিন্তায় সৌন্দর্য কথাটার কোনো নিজস্ব জায়গাই নেই, সেখানে সৌন্দর্য কোনো মৌল প্রত্যয়ই নয়।

যাঁরা সৌন্দর্যসৃষ্টির কথা বলেন, সৌন্দর্য-সন্ধানের কথা বলেন, তাঁদের কথা থেকে মনে হয়, সাহিত্যের কাজ বুঝি কেবল জীবনের বাছা বাছা সুন্দরদের নিয়েই, যা অসুন্দর, যা ভয়াবহ, যা ঘৃণা উদ্রেক করে, যা দুঃখকর সাহিত্যে বুঝি তাদের আদৌ স্থান নেই। রবীন্দ্রনাথ মোটেই এরকম মনে করেন না। সাহিত্যে সকলেরই স্থান আছে। সাহিত্যে সকলেই আনন্দকর, তথাকথিত অসুন্দরও তাই। বস্তুত, সাহিত্যের কাছে কিছুই অসুন্দর নয়।

জীবনে সুন্দরের সীমানা সংকীর্ণ। সেখানে অবাধ সৌন্দর্যসৃষ্টি নানা কারণে ক্রিয়া করবার অবকাশ পায় না। সাহিত্যে সবই সুন্দর। অথবা সুন্দর-অসুন্দরের পার্থক্যটাই মিথ্যা। সাহিত্যে সবই রূপবান।

৩৪. আধুনিক কাব্য, সাহিত্যের পথে, র৷১৪৷৩৫২

রবীন্দ্রনাথের মতে সাহিত্যের লক্ষ্য সুন্দর নয়, সাহিত্যের লক্ষ্য আনন্দ। কিন্তু আনন্দ ও সত্য যেহেতু অভিন্ন, সেই হেতু সত্যকেও সাহিত্যের লক্ষ্য বলতে পারি। কেউ কেউ মনে করেন, মানুষের হিতসাধনই সাহিত্যের লক্ষ্য। সাহিত্য যে হিতকর তা রবীন্দ্রনাথও বিশ্বাস করেন, কিন্তু হিতসাধনকে কখনো তিনি সাহিত্যের লক্ষ্য বলে মনে করেন না। রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের স্বরাজে বিশ্বাসী, তাঁর মতে সাহিত্যে আর্টে আনন্দই প্রথম কথা, আনন্দই শেষ কথা। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন, '...আনন্দটিই হচ্ছে সব-শেষের কথা, এর পরে আর কোনো কথা নেই। সেই আনন্দের মধ্যেই যখন প্রকাশের তত্ত্ব তখন এই প্রশ্নের কোনো অর্থই নেই যে, আর্টের দ্বারা আমাদের কোনো হিতসাধন হয় কি না।'[৩৫]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সাহিত্যের আসল লক্ষ্য আনন্দ। যা আনন্দকর তাকেই আমরা সুন্দর বলি। যা ললিত, মধুর, কমনীয়, জীবনে সচরাচর যাকে আমরা সুন্দর বলি তা সাহিত্যের লক্ষ্য নয়। হিতসাধনবাদী না হয়েও, তত্ত্বগতভাবে কলাকৈবল্যবাদী হয়েও, কার্যক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ কলাকৈবল্য-বাদীদের সহগামী নন। সৌন্দর্যের প্রশ্নে 'ইস্থেট্'-দের সঙ্গে তাঁর মনের মিল নেই। ত্বক্-চিক্কণতাকে, ভাসমান পেলবতাকে তিনি কখনোই সুন্দর বলেন নি। জীবনের অপরাপর মূল্য থেকে যে-সৌন্দর্য বিচ্ছিন্ন, তাকে রবীন্দ্রনাথ ধিক্কারই দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে 'সাহিত্য'-গ্রন্থের 'সৌন্দর্যবোধ' ও 'সৌন্দর্য এবং সাহিত্য' প্রবন্ধ দুটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ পূর্ণতাবাদী। তাঁর কাছে আনন্দ ও সত্য যেমন অভিন্ন, অন্য দিকে সত্য ও সামঞ্জস্যও তেমনি অভিন্ন। সৌষম্য বা সামঞ্জস্য—এরই অপর নাম সুন্দর। আবার একেই রবীন্দ্রনাথ বলেন কল্যাণ। এ-কথা যিনি বলেন তাঁর পক্ষে 'ইস্থেট্' হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। তাঁকে হিতসাধনবাদী না বলি, গভীর অর্থে কল্যাণবাদী বলতে কোনো বাধা নেই। এই কল্যাণ-ভাবনা রবীন্দ্রনাথের চিন্তায়, অনুভবে, কর্মে সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত। এই কল্যাণ-

৩৫. সাহিত্য, সাহিত্যের পথে, র।১৪।৩১১

ভাবনা রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তিমূলে সব সময় সক্রিয়। একদিকে লীলাবাদ, অন্যদিকে কল্যাণবাদ, একদিকে মুক্তি, অন্যদিকে দায়িত্ববোধ, এর ফলে যে দোটানা, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে তা খুব প্রচ্ছন্ন নয়।

রবীন্দ্রনাথের কাছে সত্য হ'লো বিচিত্রের—সর্ববিধ বিচিত্রের সামঞ্জস্য। সেই বিচিত্রের মধ্যে তথাকথিত সুন্দর যেমন আছে, কুশ্রীও তেমনি আছে, কমনীয় যেমন আছে, ভয়ংকরও তেমনি আছে; শ্রদ্ধেয় যেমন আছে, ঘৃণাযোগ্যও তেমনি আছে। তার মধ্যে সুখ যেমন আছে, দুঃখও তেমনি আছে। তা যদি না থাকবে তাহলে পূর্ণতা হবে কেমন ক'রে?

শুধু পূর্ণতা নয়, আরো একটা জিনিস আছে যা রবীন্দ্রনাথের কাছে খুব মূল্যবান। তা পূর্ণতাকে খণ্ডন করে না, পূর্ণতার ছকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ তার স্থান ক'রে দিয়েছেন। সে হ'লো উপলব্ধির তীব্রতা, অনুভবের প্রখরতা ও প্রবলতা। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে সুখের মূল্য কম, দুঃখের মূল্য অনেক বেশি। তার কারণ দুঃখের অনুভূতি খুব তীব্র। তা নিবিড় অস্মিতাসূচক। দুঃখ আমাদের স্পষ্ট ক'রে তোলে, উজ্জ্বল ক'রে তোলে। রবীন্দ্রনাথের মতে এই খানেই ট্রাজেডির আনন্দকরতা। 'গভীর দুঃখ ভূমা, ট্রাজেডির মধ্যে সেই ভূমা আছে।'[৩৬]

তত্ত্বগতভাবে রবীন্দ্রনাথ উচ্চ ও নীচ, ভালো ও মন্দ, মহৎ এবং তুচ্ছ, তৃপ্তিকর এবং গ্লানিকর—সাহিত্যসংসার থেকে কাউকেই বাদ দেবার পক্ষপাতী নন। জোর দিয়ে বলেছেন, দুঃখকর লজ্জাকর ভয়াবহ ঘৃণাযোগ্য, সাহিত্যে কেউ বর্জনীয় নয়। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু একটু অন্য রকম দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের নিজের সাহিত্যে এই তালিকার অধিকাংশই বর্জিত। কিন্তু সে কথা হয়তো এখানে অবান্তর। কিন্তু যা অবান্তর নয়, তা হ'লো এই যে, অপরের সাহিত্যেও রবীন্দ্রনাথ এই সব তথাকথিত লজ্জাকর ঘৃণাকর ব্যাপারগুলিকে সহজ মনে গ্রহণ করতে পারেন নি। আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অসহিষ্ণুতা লক্ষ করলেই এ-কথার সত্যতা অনুধাবন করা যাবে।

৩৬. সাহিত্যের পথে-র ভূমিকা, র।১৪।২৯২

রবীন্দ্রনাথের পূর্ণতাবাদী সাহিত্যতত্ত্বে ট্রাজেডি যে রকম অকুণ্ঠ সমর্থন পেয়েছে, তথাকথিত লজ্জাকর ঘৃণাকর বা গ্লানিকরের সমর্থন কখনোই সেরকম অকুণ্ঠিত নয়। এই অন্তঃসলিলা নৈতিকতার কারণেই, এই অনতি-প্রচ্ছন্ন মিড্-ভিক্টোরিয়ান সংস্কারের কারণেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের যতোখানি পূর্ণতাবাদী হবার সাধ ছিল, ততোখানি পূর্ণতাবাদী হবার সাধ্য ছিল না। এই দোটানা শেষ জীবনে অনেকটা কেটে গিয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণভাবে কখনোই কাটে নি।

৯

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যমীমাংসায় প্রাচীন ভারতীয় দর্শনচিন্তার, ভারতীয় সাধনা ও জীবনদর্শনের 'প্রভাব' সুগভীর। কিন্তু তাকে প্রভাব বলবো, না উত্তরাধিকার বলবো? বিশেষত যখন দেখছি, রবীন্দ্রনাথ তার সবটাকেই ভেঙে-চুরে নিজের মৌলিক চিন্তার মধ্যে হজম ক'রে নিয়েছেন, তখন প্রভাব কথাটাই সম্পূর্ণ অসঙ্গত।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে প্রাচীন ভারতীয় অলংকারশাস্ত্রের কিন্তু কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাবই নেই, উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণও খুব বেশি কিছু নেই। এমন কি তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয়ও খুব গভীর নয়। অলংকার-শাস্ত্রের দু-একটি সুপরিচিত বাক্য তিনি উদ্‌ধৃত করেছেন বটে, কিন্তু তাদের পারিভাষিক অর্থকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য ক'রে, তাদের বিশিষ্ট ভাবানুষঙ্গকে সম্পূর্ণ ছাঁটাই ক'রে দিয়ে। পরিচয় গভীর হ'লে কখনোই এমন করতে পারতেন না।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে পাশ্চাত্য সাহিত্যচিন্তার, বিশেষ ক'রে ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের সাহিত্যচিন্তার প্রভাব অবশ্যস্বীকার্য। এই প্রভাবের কতোটা যে প্রত্যক্ষ পরিচয় থেকে এসেছে, কতোটা বা পরোক্ষভাবে আপতিত হয়েছে, তা নির্ণয় করা কঠিন। জার্মান রোমান্টিক এবং ভাববাদী দার্শনিকদের প্রভাবের কথাও হয়তো উল্লেখ করা যায়, কিন্তু সম্ভবত তার বেশিটাই পরোক্ষ। যেখান থেকেই যতোটা আসুক না কেন, একটা কথা

মনে রাখতে হবে যে, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় এই পাশ্চাত্য প্রভাব কখনোই খুব গভীর হয় নি। পরিণতি পর্বে এ-প্রভাব অনেকখানি স্তিমিত হয়ে গিয়েছে। প্রভাব গভীর হ'লে তা কখনোই সম্ভব হ'ত না। পরিণতি পর্বে এসে পূর্বের পাশ্চাত্য উপাদানসমূহ রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সাহিত্য-চিন্তার কাছে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করেছে। রবীন্দ্রচিন্তাকে তারা অভিভূত করে নি, রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে প্রবেশ করে তাদেরই গোত্রান্তর ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব পরিপূর্ণ সিস্টেম হিসেবে গড়ে' ওঠে নি। তা একপেশে এবং অপূর্ণাঙ্গ। তার মধ্যে অল্পস্বল্প দ্বৈততা—দুই বিপরীত প্রবণতার আততি লক্ষ্য করা যায়। তার বক্তব্য অনেক সময়ই দৃষ্টান্তের দ্বারা যথোপযুক্তভাবে আলোকিত নয়; তার সিদ্ধান্তসমূহ অনেক সময়ই যুক্তির দ্বারা সমর্থিত নয়; তার ভাবের মধ্যে দার্শনিক প্রবণতার আধিক্য; তার ভাষার মধ্যে কাব্যিক প্রবণতার আধিক্য। এর কোনো-কোনোটাকে নিশ্চয়ই ত্রুটি বলে' গণ্য করা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের মৌলিকতা তর্কাতীত।

যে-সব দার্শনিক সূত্রের উপর রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের ভিত্তি রচিত হয়েছে, তাদের নিয়ে অনেক আপত্তি তোলা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের আনন্দবাদ অথবা রবীন্দ্রনাথের ঐক্যতত্ত্ব অনেকের কাছেই আপত্তিকর ঠেকতে পারে। রবীন্দ্রনাথের মৌল ভাববাদের সঙ্গে আমি ও না-আমির ডায়ালেক্‌টিকের সংমিশ্রণ নিয়ে, অথবা রবীন্দ্রনাথের বিবিধ-বিরোধী-উপাদানে-গড়া মানবতত্ত্ব নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন। কিন্তু মনে রাখতে হবে, প্রশ্নগুলো দর্শনের, সাহিত্যতত্ত্বের নয়। সাহিত্যতত্ত্ববিশেষের দার্শনিক পূর্বস্বীকৃতিকে বিচার করবার অধিকার সাহিত্যতত্ত্বের নেই। যতোক্ষণ সাহিত্যতত্ত্বের সীমানায় আছি, ততোক্ষণ দর্শনের সমস্যা নিয়ে আলোচনা আমাদের পক্ষে অনাধিকার চর্চা।

কিন্তু খাঁটি সাহিত্যজিজ্ঞাসু হিসাবে আমাদেরও কিছু প্রশ্ন আছে। প্রথম প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথের অনুভূতিতত্ত্ব নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,-অনুভূতি যতো তীব্র, আনন্দ ততো তীব্র। এ অনুভূতি কি লৌকিক অনুভূতি? বাস্তব

ক্রোধ আর সাহিত্যের রৌদ্ররস, বাস্তব শোক আর সাহিত্যের করুণ রস কি এক? মাঝে মাঝে রবীন্দ্রনাথ এমন অনেক উক্তি করেছেন, যাতে মনে হয়, লৌকিক অনুভূতিকেই তিনি রস মনে করেন। তাহলে বাস্তবজীবনের রতি তার প্রবলতার কারণেই সাহিত্যে আনন্দকরতায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করতে পারতো—শৃঙ্গার রস নয়, অবিমিশ্র যৌনতা। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু ঔদরিকতা যৌনতা ইত্যাদির দাবিকে মানতে চান না। লৌকিক অনুভূতিকেই যদি রস বলি এবং অনুভূতির তীব্রতাকেই যদি সাহিত্যের আনন্দ-করতার হেতু বলে' স্বীকার করি, তাহলে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যে কুণ্ঠা দেখিয়েছেন, সে-কুণ্ঠার কিছুমাত্র যুক্তি থাকে না।

রবীন্দ্রনাথ শুধু নৈকট্যের কথা বলেন নি, দূরত্বের কথাও বলেছেন। কল্পনা যে দূরত্ব রচনা করে, সেই দূরত্বই কি লৌকিকের থেকে দূরত্ব নয়। ঘটনাকে বাস্তববন্ধন থেকে মুক্তি দেওয়া মানেই কি ঘটনাকে অলৌকিকের স্তরে স্থাপন করা নয়? যে অনুভূতি কেবল আস্বাদ্য তাকে কি খাঁটি বাস্তব অনুভূতি বলতে পারি? যে আগুনে দাহ নেই, কেবল দীপ্তি আছে, তাকে বাস্তব আগুন বলবো কোন যুক্তিতে? রবীন্দ্রনাথ এই অলৌকিতার সম্বন্ধে সচেতন, কিন্তু সব সময় নন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন প্রয়োজন আর অপ্রয়োজনের পার্থক্য নিয়ে। এবং সেই সূত্রে তথ্য আর সত্যের পার্থক্যকে নিয়ে। এই পার্থক্য কি মৌলিক পার্থক্য, নিত্য পার্থক্য, চিরকালের পার্থক্য? মুক্তি যদি মানুষের স্বভাব হয়, লীলা যদি মানুষের স্বধর্ম হয়, তাহলে মানুষের সব প্রয়োজনসাধনের মধ্যেই অপ্রয়োজনের ছোঁওয়া আছে। মানবিক দৃষ্টি যদি মানবস্বভাবের দৃষ্টি হয়, তাহলে সে সব সময়ই ভ্যালু-সমন্বিত, ব্যবহারিক জীবনেও, এমন কি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও। তথ্য আর সত্যের তফাৎ-টা বিষয়ের মধ্যে নয়, দেখার মধ্যে। আবিল দৃষ্টিতে সত্যই তথ্যরূপে দেখা দেয়, চিত্তের আবরণভঙ্গ হলে—অনাবৃত দৃষ্টির কাছে তথ্যই সত্য হয়ে ওঠে। প্রভেদটা যে আপেক্ষিক, তা রবীন্দ্রনাথও জানেন। কিন্তু অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার ফলে প্রয়োজন ও অপ্রয়োজন, তথ্য ও সত্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে অনাবশ্যক দ্বিখণ্ডিত চেহারা এনে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, এ দ্বৈততা রবীন্দ্রনাথের ঐক্যতত্ত্বের বিরোধী।

মানবব্রহ্মের প্রত্যয়টিকে নিয়ে যে সব প্রশ্ন উঠতে পারে, তা এখানে উত্থাপন করা সঙ্গত হবে না, কেননা তার প্রত্যেকটিই আমাদের অবধারিত ভাবে দর্শনের সীমানার মধ্যে নিয়ে যাবে। বরং দর্শনকে নিয়ে, দর্শনের আধিক্যকে নিয়ে সাহিত্যজিজ্ঞাসু হিসেবে আমাদের যে অভিযোগ, সেইটিই আমরা এখানে উপস্থিত করতে পারি।

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কে সাধারণ সাহিত্যপাঠকের সব থেকে বড়ো অভিযোগ এই যে, সেখানে তত্ত্ব-সংবাদ যতোটা আছে, সাহিত্য-সংবাদ ততোটা নেই। সেখানে দার্শনিক আলোচনা যতোটা আছে, বিশিষ্ট সাহিত্যবস্তুর, অর্থাৎ নাটক উপন্যাসে গল্প কবিতার প্রত্যক্ষ স্পর্শ ততোটা নেই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে প্রত্যক্ষ সাহিত্য-অভিজ্ঞতা থেকে তত্ত্বের অভিমুখে যাবার রাস্তা অতি প্রশস্ত, কিন্তু তত্ত্ব থেকে আবার সাহিত্যবস্তুতে নেমে আসার পথ পাওয়া যায় না।

সাহিত্যতত্ত্বের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ সাহিত্য-অভিজ্ঞতাকে আলোকিত করা, সমালোচককে সমালোচনাতত্ত্ব সরবরাহ করা, ব্যবহারিক সমালোচনাকে শক্তিশালী করা। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের অন্য মূল্য যাই থাক না কেন, তার ব্যবহারিক প্রয়োগযোগ্যতা খুব বেশি নয়।

এ-অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা করলেও বোধকরি এড়াতে পারতেন না। তার কারণ, এর মূলে আছে রবীন্দ্রচিন্তার বিশিষ্ট স্বভাবধর্ম। রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধি অনুভূতির কথা বলছি না, এখানে বিশেষ রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বৈশিষ্ট্যের কথাই বলছি। রবীন্দ্রচিন্তা স্বভাবতই তথ্য-অসহিষ্ণু, পুঙ্খতা-বিমুখ এবং বস্তু-বিরাগী। রবীন্দ্রচিন্তা স্বভাবতই ব্যাপক সত্যের অনুরাগী, স্বভাবতই তত্ত্বমুখী এবং ঊর্ধ্বচারী। এই বৈশিষ্ট্যের প্রত্যেকটিই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে উপস্থিত।

পঞ্চম অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা

১

সমালোচনা কথাটাকে সব সময়েই যে আমরা খুব সুনির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করি তা নয়। অনেক সময় যে-কোনো রকম সাহিত্য-আলোচনাকেই আমরা সমালোচনা বলে' থাকি। রবীন্দ্রনাথ প্রায় কখনোই সমালোচনা কথাটাকে এ-রকম ঢিলে-ঢালা অর্থে ব্যবহার করেন নি। প্রয়োগ থেকে মনে হয়, তাঁর কাছে সমালোচনা কথাটার একটা বিশিষ্ট এবং নির্দিষ্ট অর্থ আছে। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি বিভিন্ন সময়ে এতো ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কথা বলেছেন যে, তাঁর অভীষ্ট বিশিষ্ট অর্থটা যে কী সে-বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া কঠিন। তবে বেশির ভাগ সময়ই মনে হয়, সাহিত্যসমালোচনা কথাটির রবীন্দ্র-অভিপ্রেত অর্থ হ'লো সাহিত্যবিচার। এই বিচার কথাটার উপর জোর দেবার জন্য— সমালোচনার বিশিষ্টতাকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার জন্য, সাহিত্য-সমালোচনার বদলে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যবিচার কথাটাকেই বেশির ভাগ সময় ব্যবহার করেছেন।

সাহিত্যবিচার জিনিসটা যে কী তা রবীন্দ্রনাথ নিজেই ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে বলেছেন। প্রবাসীর ১৩৩৬ সালের কার্তিক সংখ্যায় (১১২৯) প্রকাশিত 'সাহিত্য বিচার' প্রবন্ধের গোড়াতেই তিনি বলেছেন, 'বিশেষ রচনার পরিচয় দেওয়াই সাহিত্যবিচারের লক্ষ্য।'[১] আবার এই প্রবন্ধেরই একেবারে শেষে এসে তিনি এ-ও বলেছেন যে, 'সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ নয়।'[২]

১. পরে প্রবন্ধটিকে 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করার সময় প্রবন্ধের প্রথমাংশের অনেকখানি বর্জিত হয়। উদ্‌ধৃত বাক্যটি বর্জিত অংশের অন্তর্গত। 'সাহিত্যের পথে'র গ্রন্থপরিচয় দ্রষ্টব্য।

২. রা:১৪।৩৪১

বিচার পরিচয় আর ব্যাখ্যা, কথা তিনটিকে এখানে রবীন্দ্রনাথ এমনভাবে ব্যবহার করেছেন, যাতে সহজেই মনে হয়, এরা বুঝি সম্পূর্ণ সমার্থক শব্দ। যেহেতু সাধারণ ব্যবহারে আমরা মোটেই এদের সমার্থক হিসেবে গ্রহণ করি না, সেই হেতু রবীন্দ্রনাথের এই বুঝিয়ে বলার প্রয়াসটি খুব সার্থক হতে পারে নি। বিচারই পরিচয়, আবার বিচারই ব্যাখ্যা, এই ফরমূলা থেকে কিছুই স্পষ্ট হ'লো না। কেবল এইটুকুই এখানে বোঝা গেল যে, বিশ্লেষণকে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার অঙ্গ বলে' বা সমালোচনার পদ্ধতি বলে' স্বীকার করেন না।

সমালোচনার পদ্ধতি হিসেবে বিশ্লেষণের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অপ্রসন্নতার অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হয়, বিশ্লেষণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি হিসেবেই বেশি পরিচিত। সাহিত্যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োগ বা বৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রশ্রয়, রবীন্দ্রনাথের মতে, সাহিত্যের পক্ষে শুভ নয়। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, যেহেতু সাহিত্যের পদ্ধতি সংশ্লেষণ, সেই হেতু সমালোচনারও তাই হওয়া উচিত। দ্বিতীয়ত, সাহিত্য রসবস্তু, কোনো বিচ্ছিন্ন উপাদানে রসের পরিচয় মিলবে না। বিশ্লেষণ কেবল উপাদানের স্থূল পরিচয়ই দিতে পারে, রসের পরিচয় দিতে পারে না। (সাহিত্যবিচার, র৷১৪৷৩৩৬-৪১)

বিশ্লেষণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই অভিমত মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য, আক্ষরিকভাবে নয়। রসসাহিত্যের পদ্ধতি সংশ্লেষণাত্মক হতে পারে, কিন্তু মননশীল সাহিত্যের পদ্ধতিতে সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণ দুই-ই অচ্ছেদ্যভাবে মিশে থাকে। সমালোচনা যে রসসাহিত্য একথা যেমন রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, তেমনি সমালোচনা যে মননশীল সাহিত্য তা-ও রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন নি। সমালোচনাকে মননধর্মী বলে' মানলে, সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মানতে হবে যে, সমালোচনায় সংশ্লেষণ বিশ্লেষণ দু'য়েরই স্থান আছে। এ-কথা যে রবীন্দ্রনাথ মানেন, কার্যক্ষেত্রে অর্থাৎ নিজের সমালোচনাসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ তার ভূরি ভূরি প্রমাণ দিয়েছেন।

স্মরণ রাখতে হবে, বিশ্লেষণ সমালোচনার কোনো জাতি বা গোত্র নয়, একটি পদ্ধতি মাত্র।) বিশ্লেষণই সমালোচনা এমন কথা কেউ-ই বলেন

না। বিশ্লেষণ বিজ্ঞানেও থাকতে পারে, অন্যত্রও থাকতে পারে। বিচার ব্যাখ্যা পরিচয় সকলকেই বিশ্লেষণ সাহায্য করতে পারে। এক্ষেত্রে, সমালোচনার স্বরূপ নির্ণয়ের প্রসঙ্গে বিশ্লেষণের কথা তোলারই প্রয়োজন করে না।

রবীন্দ্রনাথের মতে সমালোচনার স্বরূপ কী? বিচার, না পরিচয়, না ব্যাখ্যা? না এই তিনের সমন্বয়?) এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য খুব স্পষ্ট নয়। ব্যাখ্যা, বিচার, পরিচয় এই তিন আলাদা না এক, আলাদা হলে এদের মধ্যে কোন্‌টা সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ তা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ক'রে বলেন নি। (এই তিনেরই নাম যখন পাশাপাশি করেছেন এবং অপর-কিছুরই নাম এখানে যখন পাই না,) তখন এ-সিদ্ধান্ত কি করতে পারি যে, রবীন্দ্রনাথের মতে এই তিনের বাইরে সমালোচনা নেই?

এই সিদ্ধান্ত খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয় বটে, কিন্তু মুশকিল এই যে, এখানে না হলেও অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ আর-একটি ব্যাপারেরও নাম করেছেন। (দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা', রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, 'রামায়ণ-চরিত্র-সমালোচনা', তার ভূমিকাটি রবীন্দ্রনাথকৃত। এই ভূমিকায় ('প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের 'রামায়ণ' প্রবন্ধ) রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার স্বরূপ-নির্ণয় প্রসঙ্গে পূজা নামক একটি পৃথক্ তত্ত্বের অবতারণা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ এখানে বলেছেন, 'কবিকথাকে ভক্তের ভাষায় আবৃত্তি করিয়া তিনি [দীনেশচন্দ্র] আপন ভক্তির চরিতার্থতা সাধন করিয়াছেন। এইরূপ পূজার আবেগ-মিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা, এই উপায়েই এক হৃদয়ের ভক্তি আর-এক হৃদয়ে সঞ্চারিত হয়। আমাদের আজকালকার সমালোচনা বাজার-দর যাচাই করা…। এরূপ যাচাই-ব্যাপারের উপযোগিতা অবশ্য আছে, কিন্তু তবু বলিব যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারী পুরোহিত, তিনি নিজের অথবা সর্বসাধারণের ভক্তিবিগলিত বিস্ময়কে ব্যক্ত করেন মাত্র।'[৩]

ব্যাখ্যা কথাটাকে রবীন্দ্রনাথ এখানে পূজার সঙ্গেই স্থান দিয়েছেন

৩. র।১৩।৬৬২ (৬)

স্বাধীন ব্যাখ্যা নয়, যে-ব্যাখ্যা পূজার সহগামী, সে-ব্যাখ্যা সমালোচনার অঙ্গ। ঠিক এইভাবে পরিচয়ের জন্যও এখানে একটু স্থান ক'রে দেওয়া যায়। বলা যায়, যে-পরিচয় ভক্তিবিগলিত তা সমালোচনার অঙ্গ। কিন্তু বিচার? মূল্যায়ন আর বিগলিত ভক্তি, বিচার আর আবেগাপ্লুত পূজা পরস্পরের সহগামী নয়। এরা সম্পূর্ণ পৃথক্ বৃত্তির ক্রিয়া, এবং বিপরীত ধরনের ক্রিয়া। একই কাজের মধ্যে একই সময়ে দুটিকে এক সঙ্গে রক্ষা করা সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ কোন্‌টিকে রক্ষা করেছেন? বিচার, না পূজা? এর কোন্‌টিকে রবীন্দ্রনাথ যথার্থ সমালোচনা বলে' মনে করেন?

মানতেই হবে যে, এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ কোনো স্থির অবিচল সিদ্ধান্ত আমাদের জন্য তুলে রেখে যান নি। সমালোচনাকে কখনো তিনি দৃঢ়ভাবে বলেছেন বিচার; আবার কখনো সমান দৃঢ়ভাবেই বলেছেন স্বাধীন রসসৃষ্টি। আবার কখনো একই সুরে বলেছেন ব্যাখ্যা, বলেছেন পরিচয়, বলেছেন পূজা। এ-বিষয়ে তাঁর মত বার বার খুশিমতো এ-ঘাট থেকে ও-ঘাটে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। কিন্তু এ-গুলি কি সত্যিই তাঁর মত-পরিবর্তন, সমালোচনা সম্পর্কে ধারণার আমূল বদল? না, একটা জটিল বহুমুখী অভিমতই এক-এক সময় তার এক-একটা মুখকে আমাদের সামনে ভালো ক'রে মেলে ধরবার জন্য অপর মুখগুলোকে একটু আড়াল ক'রে দাঁড়াচ্ছে? এই সন্দেহের প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি, আপাতত বিবিধ মতের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক।—

'রামায়ণ' প্রবন্ধ, যেখানে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনাকে পূজা বলেছেন, তার দশ বছর আগে 'আধুনিক সাহিত্যে'র 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি (সাধনা, ১৩০১ বৈশাখ, ১৮৯৪) রচিত হয়েছে। সেখানে তিনি সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশংসাসূত্রে যা বলেছেন তার সঙ্গে পূজার আবেগের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। এই প্রবন্ধে দেখি, রবীন্দ্রনাথের মতে সমালোচক মূল্যসচেতন বিচারক, ক্ষেত্রবিশেষে রীতিমতো দণ্ডপাণি বিচারক। তিনি বলেছেন—

'পূর্ব-অভ্যাসবশত সাহিত্যের সহিত যদি কেহ ছেলেখেলা করিতে আসিত তবে বঙ্কিম তাহার প্রতি এমন দণ্ডবিধান করিতেন যে, দ্বিতীয়বার সেরূপ স্পর্ধা দেখাইতে সে আর সাহস করিত না।

'...লেখার প্রয়াস জাগিয়া উঠিয়াছে, অথচ উচ্চ আদর্শ তখনো দাঁড়াইয়া

যায় নাই। সেই সময় সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে এক হস্ত নিবারণ-কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। এক দিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতেছিলেন, আর-এক দিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন।'[৪]

আপত্তি উঠতে পারে যে, এটা 'রামায়ণ' প্রবন্ধের অনেক আগেকার অভিমত, যে-অভিমতটি পরবর্তীকালে ব্যক্ত হয়েছে, সেইটেকেই রবীন্দ্রনাথের যথার্থ অভিমত বলে' ধরতে হবে। এই প্রসঙ্গে একটা তথ্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। একটু আগে আমরা 'সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধটি থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছি। সেখানে তিনি প্রায় এক নিশ্বাসে ব্যাখ্যা পরিচয় ও বিচারের কথা বলেছেন, কিন্তু পূজার কথা উচ্চারণও করেন নি। 'সাহিত্য-বিচার' প্রবন্ধটি 'রামায়ণ' প্রবন্ধের প্রায় ছাব্বিশ বছর পরে লিখিত।

যে-তিনটি প্রবন্ধের কথা এখানে উল্লেখ করা হ'লো, তাদের রচনা-কালের দিকে আবার একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৮৯৪ সাল, 'রামায়ণে'র রচনাকাল তার প্রায় দশ বছর পরে, আর 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধটির রচনাকাল ১৯২৯ সাল। দীর্ঘ পঁয়ত্রিশ বছর সময়ের মধ্যে যদি মাত্র দু'বার মতের পরিবর্তন দেখতে পাওয়া যায়, সেটা নিশ্চয়ই খুব একটা অস্থিরমতিত্বের পরিচায়ক নয়। কিন্তু ১৯২৯-এর পরেই কি সমালোচনা বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অভিমত খুব সুস্পষ্ট এবং খুব সুস্থির ও অবিচল ছিল? সে-কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। এই পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে মতের পরিবর্তন যে মাত্র তিনবারই ঘটেছে, তা-ও বলা যাবে না।

'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধের এক বছর দেড় বছর পরে 'লোকসাহিত্যে'র 'ছেলে ভুলানো ছড়া' (১৩০১), সেখানে সমালোচক সম্পর্কে সিদ্ধান্ত প্রায় বিপরীত। সেখানে পরিহাস ক'রে তিনি বলেছেন, 'যাঁহারা উপযুক্ত সমালোচক তাঁহাদের নিকট একটা দাঁড়িপাল্লা আছে; তাঁহারা সাহিত্যের একটা বাঁধা ওজন এবং সেই সঙ্গে অনেকগুলি বাঁধি বোল বাহির করিয়াছেন; যে-কোনো রচনা তাঁহাদের নিকট উপস্থিত করা যায়, নিঃসংকোচে তাহার পৃষ্ঠে উপযুক্ত নম্বর এবং ছাপ মারিয়া দিতে পারেন।

৪. রা।১৩।৮৯৪

'কিন্তু অক্ষমতা এবং অনভিজ্ঞতাবশত সেই ওজনটি যাঁহারা পান নাই, সমালোচনাস্থলে তাঁহাদিগকে একমাত্র নিজের অনুরাগ-বিরাগের উপর নির্ভর করিতে হয়।...

'...কাব্য-সমালোচকও যদি যুক্তিতর্ক এবং শ্রেণীনির্ণয়ের দিক ছাড়িয়া দিয়া কাব্যপাঠ-জাত মনোভাব পাঠকগণকে উপহার দিতে উদ্যত হন তবে সেজন্য তাঁহাকে দোষী করা উচিত হয় না।'[৫]

আমরা দেখেছি, 'রামায়ণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সমালোচনাকে বলেছেন পূজা। তার মাস তিনেক মাত্র পূর্বে 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যের বিচারক' প্রবন্ধটি ('সাহিত্যসমালোচনা', বঙ্গদর্শন, ১৩১০ আশ্বিন, ১৯০৩) প্রকাশিত হয়। সেখানে যে-অভিমত ব্যক্ত হয় তা পূর্বের 'ছেলে ভুলানো ছড়া' এবং অল্প পরের 'রামায়ণ' উভয়েরই বিরোধী। সেখানে তিনি বিচারের উপর, সাহিত্যবিচারের ধ্রুব মানদণ্ডের উপর এবং বিচারকের যোগ্যতার উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

'যেমন সাহিত্যের স্বাধীন রচনায় এক-একজনের প্রতিভা সর্বকালের প্রতিনিধিত্ব গ্রহণ করে, সর্বকালের আসন অধিকার করে, বিচারের প্রতিভাও আছে, এক-একজনের পরখ করিবার শক্তিও স্বভাবতই অসামান্য হইয়া থাকে। যাহা ক্ষণিক, যাহা সংকীর্ণ, তাহা তাঁহাদিগকে ফাঁকি দিতে পারে না; যাহা ধ্রুব, যাহা চিরন্তন, এক মুহূর্তেই তাহা তাঁহারা চিনিতে পারেন। সাহিত্যের নিত্যবস্তুর সহিত পরিচয়লাভ করিয়া নিত্যত্বের লক্ষণগুলি তাঁহারা জ্ঞাতসারে এবং অলক্ষ্যে অন্তঃকরণের সহিত মিলাইয়া লইয়াছেন; স্বভাবে এবং শিক্ষায় তাঁহারা সর্বকালীন বিচারকের পদ গ্রহণ করিবার যোগ্য।'[৬]

বক্তব্য অতি স্পষ্ট। সাহিত্যের কতকগুলি নিত্য লক্ষণ আছে। সেই নিত্য লক্ষণগুলিকে অবলম্বন ক'রেই সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড স্থিরীকৃত হয়। সে মানদণ্ডও নিত্য। সমালোচকের কাজ সেই মানদণ্ডের সহায়তায় সাহিত্যবিশেষকে পরীক্ষা করা।

দেখা যাচ্ছে, মত পরিবর্তন—যদি আদৌ একে মতপরিবর্তন বলি—

৫. র।১৩।৬৬৫

৬. র।১৩।৭৪৮

তিনবার নয়, বারবার। তর্কস্থলে অবশ্য বলতে পারি, মতের অটলত্বটাই সব থেকে বড় কথা নয়। যিনি দীর্ঘকাল চিন্তা করতে করতে এগিয়েছেন এবং অগ্রগমনের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করেছেন, তাঁর পক্ষে বারবার মতপরিবর্তন স্বাভাবিকভাবেই ঘটতে পারে। তর্কস্থলে অনায়াসে মেনে নিতে পারি যে, প্রত্যেক ক্ষেত্রে মত-পরিবর্তন নতুন চিন্তা ও নতুন যুক্তিতর্কের উপরে ভিত্তি করেই ঘটেছে, তা মনের তরলতার পরিচায়ক নয়, বরং মনের সজীবতারই পরিচায়ক। কিন্তু একই প্রবন্ধে যদি গোড়ার দিকে আর শেষের দিকে দু'রকম অভিমত দেখতে পাই, দু'রকম সুর শুনতে পাই?

('সাহিত্যের পথে' গ্রন্থের 'সাহিত্যবিচার' প্রবন্ধের প্রায় বারো বছর পরে, মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বে 'সাহিত্যের স্বরূপ'-বইয়ের 'সাহিত্যবিচার' নিবন্ধটি (কবিতা, ১৩৪৮ আষাঢ়, ১৯৪১) রচিত হয়। এই একটি স্বল্পায়তন নিবন্ধের মধ্যেই একাধিক অভিমতের আভাস পাওয়া যাবে, একাধিক সুর বেশ স্পষ্টভাবেই পাওয়া যাবে। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

'সাহিত্যে কোন্‌টা ভালো, কোন্‌টা মন্দ, সেটা অধিকাংশ স্থলেই যোগ্য বা অযোগ্য বিচারকের বা তার সম্প্রদায়ের আশ্রয় নিয়ে আপনাকে ঘোষণা করে। বর্তমানকালে বিত্তাল্পতার মমত্ব বা অহংকার সর্বজনীন আদর্শের ভান করে দণ্ডনীতির প্রবর্তন করতে চেষ্টা করছে।'[৭]

মনে হতে পারে যে, সাহিত্যে কোনো সর্বজনীন আদর্শ নেই, যারা সর্বজনীন আদর্শের কথা বলে তারা ভান করে মাত্র, এইটেই বুঝি এখানে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য। আসলে কিন্তু তা নয়। সর্বজনীন আদর্শ নেই, এমন কথা রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ক'রে বলেন নি। এখানে তাঁর আসল আপত্তি বিচারকের বিত্তাল্পতা ও অযোগ্যতার বিরুদ্ধে। দেখতে পাচ্ছি, এর সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বলেছেন, '...অবশ্য যারা শ্রেণীগত বা দলগত বা বিশেষকালগত মমত্বের দ্বারা সম্পূর্ণ অভিভূত নয় তাদের বুদ্ধি অপেক্ষাকৃত নিরাসক্ত

বোঝা যাচ্ছে, কিছু নিরাসক্ত সমালোচকও আছেন, যাঁদের সাহিত্যবিচার নিছক ব্যক্তিগত ভালোলাগা মন্দ-লাগার জবানবন্দী নয়, অর্থাৎ যাঁদের

৭. রা।১৪।৫৩০

৮ তদেব,

সাহিত্যবিচার নিরাসক্ত বুদ্ধির বিচার, আদর্শ-ভিত্তিক বিচার। এর পরেই আমাদের দেশে কে সেই রকম নিরাসক্ত সমালোচক, 'সাহিত্যে কার হাতে কর্ণধারের কাজ দেওয়া যেতে পারে, অর্থাৎ কার হাল ডাইনে-বাঁয়ে ঢেউয়ে দোলাদুলি করে না',[৯] রবীন্দ্রনাথ সেই সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং নিজেই তার উত্তর দিয়েছেন। সাহিত্যের কর্ণধার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এখানে যাঁর নাম করেছেন, তাঁর সত্যিকারের যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্ন আমাদের কাছে অবান্তর, কেননা আমাদের লক্ষ্য তথ্য নয়, আমাদের লক্ষ্য এখন রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্ব। সুতরাং কর্ণধার হিসেবে রবীন্দ্রনাথ এখানে যাঁর কথা বলেছেন, তাঁর কোন্ গুণকে রবীন্দ্রনাথ এখানে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে ধরেছেন, সেইটেই এখন আমাদের বিবেচ্য। সমালোচক হিসেবে তাঁর মূলধন কী? রবীন্দ্রনাথের কথাই উদ্ধৃত করি। 'তাঁর যেটা আমার মনকে আকৃষ্ট করেছে সে হচ্ছে তাঁর চিত্তবৃত্তির বাহুল্য-বর্জিত আভিজাত্য, সেটা উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশ পায় তাঁর বুদ্ধিপ্রবণ মননশীলতায়—এই মননধর্ম মনের সে তুঙ্গ শিখরেই অনাবৃত থাকে যেটা ভাবালুতার বাষ্পস্পর্শহীন।'[১০]

দেখা যাচ্ছে, এখানে রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় সমালোচকের আসল মূলধন হ'লো বাহুল্যবর্জিত চিত্তবৃত্তি, বুদ্ধিপ্রবণ মন, ভাবালুতামুক্ত মননশীলতা। অর্থাৎ ঠিক সেই সব গুণ বিচারের ক্ষেত্রে যা অপরিহার্য, কিন্তু রসসৃষ্টির ক্ষেত্রে যা অল্পবিস্তর অনাবশ্যক আর পূজার ক্ষেত্রে যা প্রায় বাধাস্বরূপ।

অথচ এই নিবন্ধেরই গোড়ার দিকে রবীন্দ্রনাথ একেবারে অন্যরকম কথা বলেছেন। বলেছেন, সর্বজনীন আদর্শ দিয়ে সাহিত্যবিচার একটা ছলনা বা ভান মাত্র। সমালোচক সাধারণত তাঁর নিজের মনের বিশেষ সংস্কার দিয়েই সাহিত্যবিচার করেন। তিনি বলেছেন, 'এই সংস্কারের প্রবর্তনা ঘটে তাঁর দলের সংস্রবে, তাঁর শ্রেণীর টানে, তাঁর শিক্ষার বিশেষত্ব নিয়ে।'[১১]

৯. তদেব,
১০. র।১৪।৫৩১
১১. র।১৪।৫২৯

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথ অনেকটা এই রকম বলতে চাইছেন যে, সাহিত্যের কোনো নিত্য-বস্তু থাকুক আর না-থাকুক, বিচারের কোনো স্থির ধ্রুব আদর্শ থাকুক আর না-থাকুক, কার্যক্ষেত্রে সমালোচক যা নিয়ে অগ্রসর হন তা একেবারে তাঁর দলগত রুচি। প্রকৃত সমালোচনার সময় যে-আদর্শ ব্যবহৃত হয়, তা সম্পূর্ণ আপেক্ষিক। যে সমালোচক নিজে অন্তত এই সম্পর্কে সচেতন, তিনি হাস্যকর আড়ম্বরের হাত থেকে বাঁচতে পারেন। বিচারের বিড়ম্বনার মধ্যে না গিয়ে, তিনি অন্তত তাঁর নিজের সমালোচনাটিকে সাহিত্যগুণান্বিত ক'রে তুলতে পারেন। কথাটা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলি। 'মোটের উপর নিরাপদ হচ্ছে ভান না করা, সাহিত্যের সমালোচনা-কেই সাহিত্য করে তোলা।' সেই রকম সাহিত্য একান্ত সত্যতা নিয়ে চরম মূল্য পায় না। তার মূল্য তার সাহিত্যরসেই।'[১২]

অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে সমালোচনার মূল্য তার মতামতে নয়, তার নির্ভুলতায় বা তার মূল্যায়নের যথাযথতায় নয়—আদৌ তার বক্তব্যে নয়, সমালোচনার মূল্য তার প্রকাশসৌন্দর্যে, তার নিজস্ব সাহিত্যগুণে, তার নিজস্ব সৃজনশীলতায়, তার স্বাধীন রসসৃষ্টির ক্ষমতায়।

আর কিছু না হয়ে কেবল রসোত্তীর্ণ হলেই তা সমালোচনা হবে কি না, কোনো কবিতা, নাটক, বা উপন্যাসের সঙ্গে সমালোচনার তফাৎ কোথায়, যে-কোনো রসোত্তীর্ণ জিনিসই সমালোচনা নয় কেন, এ-সব কূট তর্কের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রবেশ করেন নি। সমালোচনাকে যে রসাত্মক হতেই হবে এখানে কেবল এই কথাটাই জোর দিয়ে বলেছেন। সেই সঙ্গে যদি এ-ও ধ'রে নেওয়া যায় যে, বিচারের কোনো ধ্রুব মানদণ্ড নেই—যথার্থ সমালোচক বিচার করেন না, রসসৃষ্টি করেন, তাহলে যে কূটতর্ক রবীন্দ্রনাথ এড়িয়ে গিয়েছেন তা আপনিই এসে পড়ে।

কিন্তু আপাতত সে-তর্ক আমাদের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। আমাদের লক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের অভিমত, সে অভিমতের যৌক্তিকতা অযৌক্তিকতা নয়। অনেক বিভিন্ন ধরনের অভিমতের সাক্ষাৎ পেলাম। তার মধ্যে দুয়েকটি পরস্পর-

১২. স্বা:১৪।৫৯২

বিরোধী, রবীন্দ্রনাথের মনে না-হোক, অন্তত লোকপ্রচলিত ভাষা-ব্যবহারে। এর মধ্যে-কোন্‌টাকে বলবো রবীন্দ্রনাথের পাকা অভিমত? এ-সিদ্ধান্ত তো করা চলে না যে, এই-সব সর্বজনদৃষ্টিগোচর পরস্পর-বিরোধিতা রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধিতে ধরাই পড়ে নি! তাহলে এ-বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্তটা কী হওয়া উচিত?

এ-বিষয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত একটু জটিল। তাকে সিদ্ধান্ত না বলে' প্রকল্প বলাই ভালো। প্রকল্পটি এই যে, এই সব অভিমতের কোনোটিই রবীন্দ্রনাথের পাকা অভিমত নয়। নয় এই জন্য যে এদের কোনোটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথের অভিমতের সমগ্রতা নেই। এরা সব ক'টিই আংশিক। প্রকল্পের বিপরীত দিকটা হ'লো এই যে, এদের প্রত্যেকটিই রবীন্দ্রনাথের অভিমত, কেন না এদের প্রত্যেকটির মধ্যেই সমালোচনা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধারণার একটা-না-একটা দিক ফুটে উঠেছে।

রবীন্দ্রনাথের চিন্তার মধ্যে, রবীন্দ্রনাথের মনে সমালোচনা সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে কোনো পরস্পরবিরোধিতা নেই। অথবা মাত্র সেই টুকুই আছে, প্রত্যেক সত্য নিজের মধ্যে যে-টুকু আত্ম-বিরোধিতাকে লালন ক'রে নিজেকে অতিক্রম করতে চেষ্টা করে। অথবা মাত্র ততোটুকুই আত্ম-বিরোধিতা, যে-কোন জটিল জীবন্ত চলিষ্ণু সত্তার পরিচয়ের মধ্যে যা অনিবার্য ভাবে নিহিত থাকে।

সমালোচনার এক-মুখের পরিচয় দেবার সময় রবীন্দ্রনাথ যে তার অপর মুখগুলির কথা অন্তত সাময়িকভাবেও বিস্মৃত হয়েছেন, এই বিস্মরণটাই আমাদের বিস্মিত করে। রবীন্দ্রনাথ নিজে অবশ্য তাঁর অসামান্য বিস্মরণ-শক্তির কথা খুব জোর দিয়েই বলেছেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা নিছক বিস্মরণ নয়। এর একটা ইতিবাচক দিকও আছে। অসাধারণ সংবেদনশীল কবির সংবেদনার প্রবল তাৎক্ষণিকতাই এর মূলে ক্রিয়া করেছে। যিনি হৃদয়ের পত্রপুটকে মেলে রেখেছেন প্রত্যেকটি মুহূর্তকে ধরবার জন্য, যিনি প্রতি মুহূর্তের চৈতন্যকে তার তৎক্ষণের অনন্যতায় গ্রহণ করতে উৎসুক, যিনি প্রতিটি উদ্‌বেজনাকে আনন্দিত উত্তেজনার সঙ্গে বরণ করতে সক্ষম, কেবল পথের প্রান্তে নয়, পথের মোড়ে-মোড়ে যাঁর দেবালয়, সেই রকম কবি যখন তত্ত্ব-

ব্যাপারে আগ্রহী হন, তখন এই রকম ঘটাই বোধকরি স্বাভাবিক। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের এই সব অভিমতের প্রত্যেকটিই তাঁর কাছে তখনকার মতো সত্য, তখনকার মতো একান্ত, তখনকার মতো এক এবং অদ্বিতীয়। প্রত্যেকটি অভিমতই একটা বিশেষ, অভিজ্ঞতা, বিশেষ পরিবেশ, বিশেষ কাল, বিশেষ একটি সাহিত্যিক ঘটনাচক্রের সঙ্গে যুক্ত। এক প্রবন্ধের মধ্যে দু'রকমের সিদ্ধান্ত, সে শুধু পরিবেশ বা ঘটনাচক্রের জটিলতার কারণে প্রতিক্রিয়ার জটিলতা মাত্র।

আমরা অবশ্য এমন কথা বলছি না যে, অংশকে পূর্ণের মতন মর্যাদায়, তাৎক্ষণিককে সর্বক্ষণের মূল্যে গ্রহণ করার দ্বারা রবীন্দ্রনাথ খুব উত্তম কর্ম করেছেন। আমাদের বক্তব্য শুধু এই যে, কবি যখন তত্ত্বমীমাংসায় অবতীর্ণ হন, তখন তাঁর উক্তিগুলিকে সব সময়ই একটু তলিয়ে দেখতে হবে। এ-কথা রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব সম্পর্কেও কিছু-পরিমাণে প্রযোজ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু সমালোচনাতত্ত্ব সম্পর্কে অনেক বেশি পরিমাণেই প্রযোজ্য।

বলা বাহুল্য, রবীন্দ্রনাথ যদি তাঁর সমালোচনাতত্ত্ব সম্পর্কে উপযুক্ত পরিমাণে মনোযোগী হতেন, তাহলে তাঁর উক্তিতে এই ধরনের ত্রুটির অবকাশ ঘটতো না। ঘটতো না, এ-অনুমানের কারণ তাঁর নিজের সমালোচনা-সাহিত্যের মধ্যেই নিহিত আছে। যে-কথা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্ব স্পষ্ট ক'রে বলতে পারে নি, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য নীরব ভাষায় সেই কথাই আমাদের শুনিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য কার্যত এই কথাই বলে যে, ব্যাখ্যা, পরিচয়, বিচার—সাহিত্যের সাহিত্যগুণের সঙ্গে যুক্ত হ'লে, সাহিত্য-পাঠের আনন্দের সঙ্গে যুক্ত হলে সবই সমালোচনা। এমন কি পূজাও সমালোচনা, স্বাধীন সৃজনশীলতাও সমালোচনা। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্য বলে, সমালোচনার কোনো বিধিনির্দিষ্ট নিয়ম নেই। সাহিত্যবস্তু সচেতন পাঠককে একভাবে নয়, নানা দিক থেকে নানাভাবে স্পর্শ করে, নানা রকমভাবে উদ্‌বেজিত করে। একই পাঠককে একই সাহিত্যবস্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে স্পর্শ করতে পারে, তার মনে বিভিন্ন রকমের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। তা কখনো বিচার, কখনো পূজা, কখনো ব্যাখ্যা, কখনো রসপরিচয়। কিন্তু কোনোটিই একেশ্বর নয়।

যে ভাবটি প্রবলতম, তার নামেই সমালোচনাবিশেষের গোত্র নিরূপিত হয়, কিন্তু প্রত্যেক ভাবের সঙ্গেই অপর ভাবগুলি মিলে-মিশে থাকে। সেই জন্যই, বহুবিধ বললে সমালোচনার সঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না। তাতে শুধু বহুত্বের কথাটাই বলা হয়, মৌল ঐক্যের কথাটা বলা হয় না। বিচ্ছিন্ন বহু নয়, সমালোচনা একেরই বহুবিধ রূপ। বলতে পারি, সমালোচনা বহুমুখী।

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাতত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে এই বহুবিধ রূপের তত্ত্বকে, এই বহুমুখিতার তত্ত্বকে তত্ত্ব-আকারে প্রতিষ্ঠিত করে নি। তত্ত্বালোচনার সময় এ-সম্পর্কে সচেতনতার পরিচয়ও বিশেষ দেয় নি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে, অর্থাৎ নিজের সমালোচনাসাহিত্যে তিনি এই বহুমুখিতারই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি ব্যাখ্যামূলক রসপরিচয়মূলক, বিচারমূলক সব রকম সমালোচনাই লিখেছেন, এবং প্রায় সব সমালোচনাতেই সকলকে সমন্বিত ক'রে নিতে চেষ্টা করেছেন। তাঁর মুখের উক্তির থেকে, তাঁর এই রচনাগুলিই বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি যে একদিকে 'মেঘদূতের'র মতো ভাবাত্মক ও সৃজনশীল সমালোচনা এবং অন্য দিকে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র মতো বুদ্ধিপ্রবণ ও মননধর্মী সমালোচনা লিখেছেন, তিনি যে 'রাজসিংহে'-র মতো নান্দনিক বিচারমূলক সমালোচনা, যেখানে রূপের নিকষে, ইস্থেটিক মূল্যের নিকষে সাহিত্যবিচার ঘটেছে, অথচ সৃজনশীলতাও অব্যাহত আছে, এমন সমালোচনা লিখেছেন, অন্যদিকে 'শকুন্তলা'র মতো এমন সমালোচনা লিখেছেন, যেখানে নৈতিক মূল্য, জীবনমূল্য ও সাহিত্যমূল্য একেবারে এক হয়ে গিয়েছে, আবার সেই সঙ্গে তিনি যে 'রামায়ণে'র মতো পূজার আবেগমিশ্রিত ব্যাখ্যাও রচনা করেছেন, এই কথাটাই আমাদের প্রয়োজনের পক্ষে এখানে সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ।

২

(বাংলা গদ্যসাহিত্যে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পদক্ষেপ সমালোচনার ক্ষেত্রে।) প্রথম প্রবন্ধে সমালোচকের সুগম্ভীর প্রাজ্ঞতা বোধকরি পাঠকমাত্রকেই চমৎকৃত করে। (সমালোচকের গাম্ভীর্যের সঙ্গে তাঁর বয়সের অমিলটা বিশেষভাবে

লক্ষণীয়। তখন রবীন্দ্রনাথের বয়স ঠিক সাড়ে পনেরো। কবিখ্যাতি তখনো সুদূরের ঘটনা। সবে কয়েকটি খণ্ড কবিতা প্রকাশিত হয়েছে। 'বনফুল' নামক 'কাব্যোপন্যাস'টি তখন সবে শেষ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটির নাম 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসর সরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী।' প্রকাশিত হয়েছিল 'জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব' পত্রিকায় (১২৮৩ কার্তিক) ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে।)

মাত্র চার বছর আগে বঙ্গদর্শন পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয়েছে। ঠিক সেই সময়টা অবশ্য কিছুকাল বঙ্গদর্শন প্রকাশ বন্ধ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃজনীপ্রতিভা তখন তুঙ্গস্পর্শী। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কয়েক কিস্তি প্রকাশিত হয়ে বঙ্গদর্শন বন্ধ থাকার দরুন তখন সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত সমালোচনা প্রবন্ধের অধিকাংশই তখন প্রকাশিত হয়ে গিয়েছে, কেবল জীবনীসমন্বিত ভূমিকা জাতীয় রচনাগুলি বাদে। রবীন্দ্র-নাথের প্রবন্ধ প্রকাশের মাত্র মাস-তিনেক আগে (জুলাই, ১৮৭৬) বঙ্গদর্শনের কয়েকটি প্রবন্ধ নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ সমালোচনা' নামে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে (এর এক বছর পরে 'বিবিধ সমালোচনা' বাতিল হয়, এবং অন্যান্য অনেক রচনা সহ এই রচনাগুলিকে নিয়ে 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রকাশিত হয়)। বঙ্কিমচন্দ্রের আধা-ক্লাসিক্যাল আধা-রোমান্টিক সাহিত্যতত্ত্ব তখন পাঠকদের কাছে সুপরিচিত এবং গভীর প্রভাবশালী। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বের পরিণতির একটি ধাপ তখনো কিছু দূরবর্তী—শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যতত্ত্বে যে প্রবল ধর্মীয় প্রভাব দেখা যায়, সেই উত্তেজিত, উদ্ধত, প্রায় আক্রমণাত্মক ধর্মীয়তার পর্ব, বঙ্কিমচন্দ্রের 'নব্য-হিন্দুয়ানীর' পর্ব তখনো অনাগত।

(রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনা-প্রবন্ধে সমালোচ্য কাব্যগ্রন্থ তিনটির যথার্থ সমালোচনা যৎসামান্যই পাওয়া যাবে। লেখকের আসল উদ্দেশ্য একটি নতুন সাহিত্যতত্ত্বের প্রস্তাবনা রচনা। সে-সাহিত্যতত্ত্ব একান্তভাবে রোমান্টিক গীতিকবির সাহিত্যতত্ত্ব। শুধু তাই নয়, এমন এক কবিকিশোরের সাহিত্যতত্ত্ব যিনি গীতিকবিতা ছাড়া আর কিছুই জানেন না। পরবর্তীকালে এই কবিকিশোরের সাহিত্যতত্ত্বকে পেছনে ফেলে রবীন্দ্রনাথ অনেক দূরে

সরে' এসেছেন। তবু ঐতিহাসিক দিক থেকে 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'—ইত্যাদি প্রবন্ধটির গুরুত্ব অনেকখানি।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনা-প্রবন্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বুঝতে হ'লে সেই কালের সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটের দিকে তাকাতে হবে। বিশেষ ক'রে সেই কালের সাহিত্যচিন্তার দিকে, তখনকার চল্‌তি সাহিত্যাদর্শের দিকে, তখনকার সাহিত্যরুচির ক্ষেত্রের ঘাত-প্রতিঘাত, আকর্ষণ-বিকর্ষণের দিকে।

তখনকার বাংলাসাহিত্যে আমরা তিনটি স্বতন্ত্র ধরনের সাহিত্যরুচি—এবং সেই অনুযায়ী তিনটি ভিন্ন গোত্রের সাহিত্য-আদর্শের সাক্ষাৎ পাই। তার একটি দেশীয়, মোটামুটি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুগামী। তবে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের নয়, হিন্দুযুগের শেষ দিকের অবক্ষয়িত ক্লাসিক্যাল সংস্কৃত সাহিত্যের। তার অলংকারপ্রাচুর্যের, তার কৃত্রিম মণ্ডন-কলার, তার অতিশয়িত কারু-সচেতনতার, তার পুঞ্জিত বিধিনিষেধের।

অপর দুটি ধারার দুটিই মূলত বহিরাগত, অথবা বাইরের প্রভাবসঞ্জাত। দুটির সঙ্গেই ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তবু তারা পৃথক্, মোটামুটি পরস্পরবিরোধী। তার একটিকে বলতে পারি পাশ্চাত্য প্রাচীনপন্থী আদর্শের, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকীয় ইংরেজি সাহিত্যের প্রচলিত মতাদর্শের—নব্য-ক্লাসিক্যাল সাহিত্যরুচি ও সাহিত্য-সংস্কারের অনুগামী ধারা। অপরটিকে বলতে পারি, পাশ্চাত্য সাহিত্যের তখনকার নব্যপন্থী আদর্শের, ঊনবিংশ শতকীয় ইংরেজি সাহিত্যের প্রচলিত মতাদর্শের—এক কথায় পাশ্চাত্য রোমান্টিক সাহিত্যের অনুগামী ধারা। এর ক্লাসিকপন্থী ধারাটি কালের দিক থেকে কিছু অগ্রবর্তী, রোমান্টিক ধারাটি কালের দিক থেকে কিছু পরবর্তী। ভারতীয় অলংকারবাদ-প্রভাবিত ধারা, পাশ্চাত্য নব্য-ক্লাসিক্যাল ধারা এবং তৎকালের রোমান্টিক ধারা, এই তিন ধারার বিরোধমিলনের প্রেক্ষাপটেই সাহিত্যচিন্তারক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের প্রথম প্রবেশকে আমাদের বুঝে দেখতে হবে। কিন্তু তার আগে এই ধারা তিনটির প্রত্যেকটিকেই আমাদের আর-একটু ভালো ক'রে বুঝে নেওয়া দরকার।

প্রথমে অলংকারবাদ-প্রভাবিত দেশীয় সাহিত্য-আদর্শের ধারার কথাই ধরা যাক। আগেই বলেছি, সংস্কৃত সাহিত্যের মহৎ কীর্তিগুলির সঙ্গে

এর সংযোগ কম।) আনন্দবর্ধন-অভিনবগুপ্তের সাহিত্যতত্ত্বে যে-সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়, তার সাক্ষাৎ-ও এর মধ্যে মিলবে না। (সংস্কৃত সাহিত্যের অবক্ষয়ের যুগে সর্বত্র যে অলংকারবাহুল্য, বাক্‌চাতুর্য, শব্দাড়ম্বর এবং কৃত্রিমতার প্রতাপ দেখতে পাই, বাংলা সাহিত্যের সংস্কৃত-অনুগামী রুচি ও আদর্শ সেই অলংকার-বাহুল্য ও কৃত্রিমতার সঙ্গে যুক্ত) সেদিনের সংস্কৃতজ্ঞ বাঙালি পণ্ডিতেরা—মধুসূদন যাঁদের আখ্যা দিয়েছিলেন 'barren rascals'—তাঁরা সকলেই ছিলেন এই ধারার সমর্থক, সকলেই ছিলেন মনে-প্রাণে অলংকারবাদী। 'সাহিত্য-দর্পণ'-কার বিশ্বনাথ, ব্যঙ্গ ক'রে মধুসূদন যাঁকে বলেছেন Mr. Visvanath of the Sahityadarpan', মতাদর্শে রসবাদী হয়েও আচরণে ও চরিত্রে যিনি অনেকখানি অলংকারবাদী, সেদিনকার বাঙালি পণ্ডিতেরা প্রায় সকলেই ছিলেন সেই মিঃ বিশ্বনাথের গুরু-মারা চেলা। সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রকে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন শিরোধার্য বিধিবাক্য রূপে, অনুসন্ধানের শাস্ত্র হিসেবে গ্রহণ না ক'রে, গ্রহণ করেছিলেন অনুশাসনের শাস্ত্র রূপে। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধপ্রকাশের কালে স্বাধীন সাহিত্যধারা হিসেবে এর শক্তি নিঃশেষিতপ্রায়। এমন কি সমালোচক হিসেবে বা নিছক নিন্দুকরূপেও তখন এর মধ্যে আর বিশেষ জীবনীশক্তি ছিল না। কিন্তু অপর একটি ঈষৎ অনুরূপ কিন্তু অপেক্ষাকৃত সবল ধারার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ার ফলে সাময়িকভাবে এর মধ্যে কিছু শক্তির সঞ্চার ঘটেছিল।

এই (দ্বিতীয় শক্তিটি হ'লো ইংরেজি সাহিত্যের ধারা-বিশেষের, ড্রাইডেন-পোপ-জনসন প্রমুখ নব্যক্লাসিক্যাল সাহিত্যশাস্ত্রীদের প্রভাবসঞ্জাত বাংলা সাহিত্যের রক্ষণশীল-আধুনিকতার শক্তি। একে বলতে পারি, দেশীয় নব্য-ক্লাসিক্যাল সাহিত্যধারা।) বাংলা সাহিত্যে এর সূত্রপাত ইংরেজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রসারের সঙ্গে যুক্ত, জ্ঞানসাধনার ও বুদ্ধিচর্চার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু নানা জটিল কারণে ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ক্রমেই এ ধারার মধ্যে রক্ষণশীল প্রবণতার প্রাধান্য ঘটতে থাকে। এই রক্ষণশীলতার প্রধান অঙ্গ হ'লো সাহিত্যিক বিধিনিষেধের অন্ধ আজ্ঞাবাহিতা। এই ধারার অপর এক বিশেষত্ব হ'লো সাহিত্যে ব্যবহারিক বুদ্ধির প্রাধান্য, সাহিত্যে

গদ্যধর্মী মেজাজের আধিপত্য, সাহিত্যে কল্পনাদৈন্য। এই রক্ষণশীলতার সূত্রে, মেজাজের ঐক্যের সূত্রে এর সঙ্গে প্রথমোক্ত সংস্কৃতানুগামী ধারাটির মিলন ঘটে।

এই ইংরেজি-প্রভাবিত নব্য-ক্লাসিক্যাল ধারাটি তখনকার কালের, অর্থাৎ ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধ এবং দ্বিতীয়ার্ধেরও অনেক দূর পর্যন্ত সময়ের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীদের প্রায় সর্বজনসমর্থিত ধারা। কিন্তু সমর্থন খুব দৃঢ়মূল নয়। অনেক ক্ষেত্রে একই সঙ্গে সমর্থন ও বিরোধিতা মনে এক ধরনের অবচেতন ভাবদ্বন্দ্বের জন্ম দিয়েছে, যার ফলে তাঁদের চিন্তার মধ্যে নানা রকম জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। এই প্রসঙ্গে মধুসূদনের নাম করা যেতে পারে, কিন্তু এ-দ্বন্দ্ব মধুসূদনে তেমন উল্লেখযোগ্য রকমের প্রখর নয়। ভাবদ্বন্দ্বের প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের নামই সব থেকে উল্লেখযোগ্য বলে' মনে হয়।

(এইবারে তৃতীয় ধারা, যাকে বলতে পারি রোমান্টিক ধারা। এই তৃতীয় ধারার সঙ্গে সাধারণ শত্রুতার ফলেই সংস্কৃতানুসারী দেশজ রক্ষণশীলতা এবং ইংরেজি অনুগামী নব্য-ক্লাসিক্যাল রক্ষণশীলতা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়েছিল।) এ ধারা তখন বাংলাসাহিত্যে নবীন আগন্তুক। রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালকে এই নবীনেরই 'ভোরের পাখি' বলে' বর্ণনা করেছেন। বিহারীলাল একাই ভোরের পাখি কি না সে প্রশ্ন এখন উত্থাপন করার প্রয়োজন নেই, তবে এই বর্ণনার সূত্রে পরবর্তীকালের রবীন্দ্রনাথকেই যে এই নবীনকালের মধ্যাহ্নসূর্য বলতে হয় তাতে সন্দেহ নেই। তবে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যভাবনা যে শেষ পর্যন্ত এই ধারার সাহিত্যচিন্তার সংকীর্ণ ছাঁচের মধ্যে নিজেকে আটকে রাখে নি, এ কথাও এখানে উল্লেখ ক'রে রাখা ভালো।

সে যা-ই হোক, শুধু রোমান্টিক বললে এই নবীন ধারাটির অন্তর-ধর্মের সমগ্র পরিচয় দেওয়া হয় না। একে বলতে পারি, রোমান্টিক গীতিকবিতার ধারা। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগ কোনো বাহ্য প্রভাবের ফল নয়। তাঁর কবিস্বভাবই স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই সংযোগকে সিদ্ধ ক'রে নিয়েছে। অথবা একে সংযোগ বলাই বোধকরি অসঙ্গত। স্বভাব-ধর্মেই রবীন্দ্রনাথ এই ধারার প্রধান প্রতিনিধি এবং অগ্রগামী পথপ্রদর্শক। প্রথম প্রবন্ধ রচনার কালেই তিনি মনে-প্রাণে নিজেকে এই ধারার সঙ্গে সম্পূর্ণ একাত্ম ক'রে

নিয়েছেন। সেই বালক বয়সেই রবীন্দ্রনাথ এই ধারার প্রতিনিধিরূপে প্রখরভাবে আত্ম-অধিকারসচেতন। সেই বালক বয়সেই রবীন্দ্রনাথ এই সচেতনতাকে সগৌরবে ঘোষিত করবার জন্য আগ্রহশীল। এই প্রবল সচেতনতাকে ঘোষণা করবার সুযোগ কবিতায় কম, এর জন্য গদ্যই প্রশস্ত পথ, সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধে বা সমালোচনা-প্রবন্ধেই এই সচেতনতা সার্থকভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনা-প্রবন্ধটিই তার প্রমাণ। শুধু প্রথমটি নয়, পর পর অনেক-গুলি সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধই তাই। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তার প্রথম পর্বের অর্থাৎ প্রথম ছ-সাত বছর—পূর্বে যাকে আমরা উন্মেষ-পর্ব বলে' বর্ণনা করেছি সেই সময়ের প্রায় সমস্ত সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধই এই জাতীয় বস্তু। এদের সকলেরই লক্ষ্য অভিন্ন : গীতিকবিতার পক্ষ সমর্থন, গীতিকাব্যের তুলনায় মহাকাব্যের কৃত্রিমতা ও অসারত্ব প্রতিপাদন—সম্ভব হ'লে মহাকাব্যের অ-কাব্যত্ব প্রতিপাদন, এবং যেটা আরো বড়ো কথা, রোমাণ্টিক গীতিকবিতা-ভিত্তিক কাব্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার।

রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার সাহিত্য-বিষয়ক সব প্রবন্ধই অবশ্য ব্যবহারিক সমালোচনা নয়। কয়েকটি সরাসরি সাহিত্যতত্ত্ব বা কাব্যতত্ত্ব বিষয়ক। অপর কয়েকটি ব্যবহারিক সমালোচনা। কিন্তু সেগুলিতেও রবীন্দ্রনাথের আসল লক্ষ্য সমালোচ্য পুস্তকের সমালোচনা নয়। সমালোচনা-অংশ যতোই দীর্ঘ হোক না কেন, যতোই উচ্চকণ্ঠ হোক না কেন, আসল লক্ষ্য হ'লো সমালোচ্য পুস্তককে উপলক্ষ ক'রে—তাকে সুযোগরূপে গ্রহণ ক'রে বিশেষ এক সাহিত্যতত্ত্বের প্রতিষ্ঠা, গীতিকবিতার মাহাত্ম্য-কীর্তন, রোমাণ্টিক সাহিত্য-আদর্শের প্রতিষ্ঠা ও প্রচার।

৩

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব আলোচনার সময় কাজের সুবিধার জন্য উক্ত সাহিত্যতত্ত্বকে কালক্রমের দিক থেকে আমরা চারটি পৃথক্ পর্বে ভাগ ক'রে নিয়েছিলাম। ব্যবহারিক সমালোচনার পর্বভাগ কিন্তু সাহিত্যতত্ত্বের পর্বভাগের

সঙ্গে হুবহু মিলবে না। সাহিত্যতত্ত্বের তুলনায় ব্যবহারিক সমালোচনার কালগত দৈর্ঘ্য অনেক কম, ভাবগত বা চরিত্রগত জটিলতাও অনেক কম। সাহিত্যতত্ত্বের মতো পর্ব চারটি নয়, সমালোচনার ক্ষেত্রে পর্ব মোটে দুটি।

সাহিত্যতত্ত্বে প্রথম বা উন্মেষপর্ব ধরা হয়েছে ১৮৭৬ থেকে ১৮৮৩, এই সাত বছর—রবীন্দ্রনাথের পনেরো থেকে বাইশ বছর বয়স পর্যন্ত। সমালোচনার ক্ষেত্রেও এইটেই প্রথম পর্ব। এর পরে আর কোনো স্বতন্ত্র প্রস্তুতির পর্ব নেই। সুতরাং সমালোচনার এই প্রথম পর্বটিকে আমরা উন্মেষও বলতে পারি, প্রস্তুতিও বলতে পারি। সময়টাকে চিহ্নিত করবার জন্য বলি, 'প্রভাতসংগীত' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের কালে এই পর্বের পরিসমাপ্তি।

এর পরে বছর আটের একটা ছেদ। তার পর সাধনা পত্রিকার প্রকাশের কাল (১৮৯১) থেকে সমালোচনার দ্বিতীয় পর্বের আরম্ভ। তারপর আর কোনো পর্ব নেই। ইচ্ছা করলে এই দ্বিতীয় পর্বটিকে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাপর্বও বলতে পারি। এর শেষের দিকটাতে রচনার পরিমাণ ক'মে আসছিল, সে সব অগ্রাহ্য ক'রে হিসেবটাকে যদি যথাসাধ্য টেনে নিয়ে যাই, তাহলেও দ্বিতীয় পর্বের ব্যাপ্তিকাল পনেরো বছরের থেকে বেশি হয় না।

সাহিত্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে বালক বয়স থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত, এই দীর্ঘ পঁয়ষট্টি বছর কালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ পর্বে পর্বে নানা বাঁক পার হয়ে-হয়ে যে সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে এসেছেন, সমালোচনার ক্ষেত্রে সে-রকম কিছু ঘটে নি। সমালোচনার ব্যাপ্তি রবীন্দ্রনাথের পনেরো থেকে ছেচল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত মোট একত্রিশ বছর। দুই পর্বের মাঝখানের আট বছর ছেদকে এবং শেষের দিকের বিরল রচনার কয়েকটা বছরকে বাদ দিলে আসল ব্যাপ্তিকালটা প্রায় কুড়ি বছরের মতো এসে দাঁড়ায়।

সমালোচনার প্রথম পর্বের সূচনা 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'—ইত্যাদি প্রবন্ধ (১৮৭৬) দিয়ে, সমাপ্তি দ্বিতীয় পর্যায়ের 'মেঘনাদবধকাব্য' প্রবন্ধে (১৮৮২), কিংবা 'বাউলের গান' (১৮৮৩) প্রবন্ধে। দ্বিতীয় পর্ব তুলনায় অনেক দীর্ঘ। এটি হ'লো, মোটামুটি বলা যায়, সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শনের

কাল। এর আরম্ভ বিখ্যাত 'মেঘদূত' প্রবন্ধ (১২৯৮ অগ্রহায়ণ, ১৮৯১) দিয়ে। এর শেষ প্রান্তে 'শুভবিবাহ' প্রবন্ধ (১৩১৩ আষাঢ়, ১৯০৬)।

প্রথম পর্বের অধিকাংশ প্রবন্ধই 'সমালোচনা' গ্রন্থে (১৮৮৮) স্থান পেয়েছিল। পরে 'সমালোচনা' গ্রন্থটির প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেলে প্রবন্ধগুলিও বাতিল হয়ে যায়। 'ডি প্রোফণ্ডিসে'র অংশবিশেষ 'আধুনিক সাহিত্যে' স্থান পেয়েছে। বাকি প্রবন্ধগুলি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বর্জিত। পাঠক-সাধারণ অবশ্য এই বর্জনকে সানন্দে স্বীকার ক'রে নেয় নি। এখন, রবীন্দ্র-রচনাবলী প্রকাশিত হবার পর, রবীন্দ্রনাথের বর্জন ব্যাপারটাই বাতিল হয়ে গিয়েছে।

যাই হোক, দ্বিতীয় পর্বটিই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার প্রকৃত ফসলের কাল। এই সময়টাই রবীন্দ্রনাথ সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে সব থেকে ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলেন। আগেই বলেছি, এটা হ'লো সাধনা-ভারতী-বঙ্গদর্শনের কাল। কালের শেষ সীমাটা কিন্তু বঙ্গদর্শনের তিরোধান অবধি বিস্তৃত নয়। সরকারিভাবে ধরলে 'শুভবিবাহ' (১৯০৬) প্রবন্ধটিই অবশ্য এই পর্বের শেষ সীমানা, কিন্তু 'শুভবিবাহ' অনেকটা অকালের ফলনের মতো আকস্মিক রচনা। আসল সীমানা 'রামায়ণ' প্রবন্ধ (১৩১০ পৌষ, ১৯০৩ ইং)। কিন্তু 'রামায়ণ'-ও দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থের ভূমিকা হিসেবে রচিত, সমালোচনার জন্য সমালোচনা নয়। 'রামায়ণ' অতি উৎকৃষ্ট রচনা, কিন্তু সমালোচনার পূর্ণতা তার মধ্যে আছে কিনা সে-বিষয়ে সন্দেহ করা যায়। 'রামায়ণ'-কে বাদ দিলে 'শকুন্তলা' প্রবন্ধটিকেই (বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ শ্রাবণ, ১৯০২) দ্বিতীয় পর্বের যথার্থ শেষ সীমা বলে' ধরতে হয়। সময়টাকে চিহ্নিত করবার জন্য বলি, 'শকুন্তলা' প্রকাশিত হয়েছে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের (১৯০১) অব্যবহিত পরে, আর 'শুভবিবাহ' প্রকাশিত হয়েছে 'খেয়া' প্রকাশের (১৯০৬) বৎসর। যেটাকেই ধরি, এইখানেই পূর্ণচ্ছেদ। এর পর সমালোচক-রবীন্দ্রনাথের চকিত আভাস একাধিকবার পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু কোনো পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা পাওয়া যায় না।

৪

রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনাপ্রবন্ধ প্রকাশের তিন বছর আগে, রবীন্দ্রনাথের যখন বারো বছর বয়স, সেই সময় বঙ্গদর্শন পত্রিকার ১৮২০ সালের বৈশাখ সংখ্যায় (১৮৭৩) বঙ্কিমচন্দ্রের 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। আগেই বলা হয়েছে, এটি 'বিবিধ প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধের পূর্ব-রূপ। 'অবকাশরঞ্জিনী' প্রবন্ধটির উপলক্ষ অবশ্য নবীনচন্দ্রের ওই নামের কাব্যগ্রন্থ, কিন্তু আসল লক্ষ্য যে বঙ্কিমচন্দ্রের গীতিকাব্যতত্ত্ব, তা এর নাম-পরিবর্তন থেকেই খানিকটা বোঁঝা যায়। গীতিকাব্য তখন বাংলা সাহিত্যে বেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন ক'রে বঙ্গদর্শনে এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করলেন।

এর কয়েক মাস পরে, ওই বছরেরই বঙ্গদর্শনের পৌষ সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধের পূর্ব-রূপ 'মানস বিকাশ' প্রবন্ধটি প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধেরও লক্ষ্য গীতিকাব্য। সে দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের এই দুই প্রবন্ধ পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত। এরা মিলিতভাবে সেদিনের বাঙালি পাঠকের সামনে একটি নতুন গীতিকাব্যতত্ত্ব উপস্থিত করেছে। তত্ত্বটি একটা চ্যালেঞ্জের মতো। এতে একদিকে যেমন রোমান্টিক গীতিকবিতার অধিকারকে একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে, তেমনি সেই নির্দিষ্ট সীমার বাইরে গীতিকবিতার অধিকারকে একেবারে সরাসরি অস্বীকার করাও হয়েছে।

এর প্রথমোক্ত প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র মহাকাব্য, গীতিকাব্য, নাটক, প্রত্যেকের জন্যই আলাদা-আলাদা স্থান নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকবিতার শ্রেণীবিভাগ করেছেন এবং সেই প্রবন্ধে আধুনিক বাংলা গীতিকবিতা সম্পর্কে কিছু বক্রোক্তিও করেছেন। এবং উভয় প্রবন্ধেই ক্লাসিক রোমান্টিকে মিলিয়ে, অথবা উল্টো ক'রেও বলতে পারি, কিছুটা ক্লাসিকপন্থীদের বিরোধী এবং কিছুটা রোমান্টিকদের বিরোধী এক মিশ্র কাব্যতত্ত্ব উপস্থিত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের রোমান্টিক-লিরিক্যাল কবিস্বভাব ও কাব্যরুচির কাছে, বিশেষত রবীন্দ্রনাথের সেই বালক বয়সের অত্যন্ত-রকমের গীতিকবিতাভিত্তিক কাব্যচিন্তার কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক কথাই যে সন্তোষজনক মনে হবে না, এটা স্বাভাবিক। প্রবন্ধ দুটি প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্যকে অনুধাবন করবার অবস্থায় উপনীত হন নি, কিন্তু তার মাত্র তিন বছর পরের 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'-ইত্যাদি প্রবন্ধের মধ্যেই যে বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিহিত আছে, তাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই।

তখনকার কালের প্রচলিত যে-দুটি রক্ষণশীল সাহিত্যধারা গদ্যধর্মী মেজাজের বশে পরস্পরের সঙ্গে এসে হাল মিলিয়েছিল, সংস্কৃতানুগ অলংকারবাদী ধারা আর পাশ্চাত্যপ্রভাবিত নব্য-ক্লাসিকপন্থী ধারা, এই দুই ধারার সমর্থকদের ব্যবহারিক সাহিত্যদৃষ্টি, এঁদের বহু-ঘোষিত মহাকাব্যপ্রীতি, এঁদের সমর্থিত বস্তুবর্ণাত্মক কাব্যরীতি যে বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে সর্বৈব প্রতিবাদযোগ্য হবে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তো তাঁদের একজন নন! পরবর্তীকালে 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃদ্‌পদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।'[১৩] সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন বঙ্কিমচন্দ্রের মিশ্র কাব্যতত্ত্বও বালক রবীন্দ্রনাথের কাছে খুব কম আপত্তিকর, খুব কম প্রতিবাদযোগ্য বলে' মনে হয় নি।

এই প্রতিবাদই রবীন্দ্রনাথের প্রথম সমালোচনাপ্রবন্ধের মুখ্য লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথের এই সময়কার সাহিত্যতত্ত্বমূলক প্রবন্ধগুলিতে এই প্রতিবাদ আরো স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষভাবে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। সমালোচনাপ্রবন্ধগুলি তাদেরই পরিপূরক। এ সময়কার অধিকাংশ সমালোচনাপ্রবন্ধেই ব্যবহারিক সমালোচনার স্থান গৌণ। তার আসল কাজ হ'লো রবীন্দ্রনাথের কাব্যতত্ত্বের সমর্থনে দৃষ্টান্ত জোগানো—ক্বচিৎ ইতিবাচক, বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই নেতিবাচক। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বঘটিত বক্তব্যের নেতিমূলক লক্ষ্য মহাকাব্য, ইতিমূলক লক্ষ্য গীতিকাব্য। নেতিমূলক লক্ষ্যের প্রধান দৃষ্টান্ত হ'লো মধুসূদন এবং মিল্‌টন। ইতিমূলক লক্ষ্যের দৃষ্টান্ত টেনিসন এবং শেলি।

১৩. র।১৩।৮৯১

প্রথম সমালোচনাপ্রবন্ধ 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা'-ইত্যাদিতে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, মহাকাব্য প্রাচীন কালের সাহিত্য, সর্বকালের নয়। গীতিকাব্য হৃদয়ের কবিতা। মহাকাব্য তা নয়, উন্নত সভ্যতায় তার স্থান নেই। তিনি বলেছেন, 'গীতিকাব্য যেমন প্রাচীন কালের তেমনি এখনকার, বরং সভ্যতার সঙ্গে তাহা উন্নতি লাভ করিবে, কেননা সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন হৃদয় উন্নত হইবে, তেমনি হৃদয়ের চিত্রও উন্নতি লাভ করিবে।'[১৪] বাংলা মহাকাব্য প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'এখনকার মহাকাব্যের কবিরা রুদ্ধহৃদয় লোকদের হৃদয়ে উঁকি মারিতে গিয়া নিরাশ হইয়াছেন ও অবশেষে মিল্টন খুলিয়া ও কখন কখন রামায়ণ ও মহাভারত লইয়া অনুকরণের অনুকরণ করিয়াছেন, এই নিমিত্ত মেঘনাদবধে, বৃত্রসংহারে ঐ সকল কবিদিগের পদছায়া স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালার গীতিকাব্য আজকাল যে ক্রন্দন তুলিয়াছে তাহা বাঙ্গালার হৃদয় হইতে উত্থিত হইতেছে।'[১৫]

বলার তীব্রতা থেকে সন্দেহ হয়, এখানে রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্তের মধ্যে স্বচ্ছ বিচারশীলতার থেকে ভাবের আবেগ প্রবলতর, স্বভাবধর্মের উৎস থেকে উৎসারিত প্রত্যয়ের অধিকার দৃঢ়তর। অনুমান করা যায়, গীতিকবিতাকার রবীন্দ্রনাথই এখানে নেপথ্য-নায়ক। তাঁর কাছ থেকে নির্দেশ এবং উৎসাহ পেয়েই সমালোচক-রবীন্দ্রনাথ আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন এবং সেই কারণেই সমালোচকের বক্তব্যে এমন বাড়্তি বেগ লেগেছে। এখানে কবির রুচি, কবির স্বভাবই সমালোচনাকে নির্দিষ্ট পথে নিয়ন্ত্রিত করেছে।

বিশিষ্ট কাব্যরুচির নির্দেশে চালিত হওয়াটা প্রথম পর্বে সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে মোটেই ব্যতিক্রমস্থানীয় ঘটনা নয়। প্রথম প্রবন্ধের পাঁচ বছর পরে রচিত 'ডি প্রোফণ্ডিস' থেকে দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। টেনিসনের কবিতার প্রশংসাসূত্রে মিল্‌টনের গুণগ্রাহীদের প্রতি কটাক্ষপাত ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'যাঁহারা একটা দৈত্যকে পর্বত বলিলে, দৈত্যের যষ্টিকে শালবৃক্ষ কহিলে মহান্ ভাবে হাঁ করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে এত বড় কবিতাব মহান্ ভাব উপলব্ধি করিতে পারেন না, ইহাই আশ্চর্য। বস্তুগত মহান্

১৪. র।১৫।১০৬-৭

১৫, র।১৫।১০৭

ভাব পর্যন্তই বোধকরি তাঁহাদের কল্পনার সীমা, বস্তুর অতীত মহান্ ভাব তাঁহারা আয়ত্ত করিতে পারেন না। তাহা যদি পারিতেন, তবে তাঁহারা এই ক্ষুদ্র কবিতাটিকে সমস্ত Paradise Lost-এর অপেক্ষা মহান্ বলিয়া বিবেচনা করিতেন।'১৬

বিচার-বিভ্রাটটা এখানে গণনীয় নয়। আসলে এটা বিচারই নয়। এ হ'লো এক বিশেষ কবি-প্রকৃতির বলিষ্ঠ আত্মঘোষণা। এর এই যে যোদ্ধভাব, তার রহস্যটাও এইখানেই। কারণ মামলাটা টেনিসন বা মিল্‌টনকে নিয়ে নয়, মামলাটা তাঁর নিজেকে নিয়েই।

'মেঘনাদবধ কাব্য' (প্রথম পর্যায়) প্রবন্ধটি রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় সমালোচনাপ্রবন্ধ। প্রবন্ধটি সুদীর্ঘ. ১২৮৪ সালের ভারতীতে শ্রাবণ থেকে ফাল্গুন, মাঝে অগ্রহায়ণ ও মাঘ এই দু'মাস বাদ দিয়ে মোট ছয় কিস্তিতে প্রকাশিত হয়েছিল (১৮৭৭)। এখানে আক্রমণটা সরাসরি মেঘনাদবধ কাব্যের বিরুদ্ধে, এবং এ-ও সেই একই ব্যাপার। অর্থাৎ এ-ও তাঁর নিজেরই মামলা। এই দিক থেকে রবীন্দ্রনাথের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনাপ্রবন্ধ পরস্পরের পরিপূরক। প্রথমটিতে ব্যবহারিক সমালোচনা গৌণ—প্রথমটিতে ঘটেছে তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা। দ্বিতীয়টিতে উক্ত তত্ত্বের দৃষ্টান্ত ও তার বিচার-বিশ্লেষণ। দৃষ্টান্ত এখানে বাংলাসাহিত্যের সব থেকে বিখ্যাত মহাকাব্য—মেঘনাদবধ কাব্য।

সমালোচনার এখানেও গৌণ হবারই কথা ছিল, কাব্যতত্ত্বেরই আপেক্ষিক প্রাধান্য পাবার কথা ছিল। কিন্তু ভুবনমোহিনীপ্রতিভা আর মেঘনাদবধ কাব্য এক দরের জিনিস নয়। সমালোচ্য বিষয় যেখানে মেঘনাদবধ কাব্য, সেখানে ব্যবহারিক সমালোচনাকে অবহেলা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া, তত্ত্ব-বিষয়ে যা-কিছু বলার তা আগের প্রবন্ধেই বলা হয়ে গিয়েছে, এখানে নতুন কিছু বিশেষ বলারও ছিল না। তত্ত্ব মনের সামনে সমানভাবেই জাগরূক ছিল, কিন্তু তা সমালোচনাকে মোটেই আচ্ছন্ন করে নি। ব্যাখ্যায়, বিষয়-পরিচিতিতে, মূলের পাঠবিশ্লেষণে, শব্দ-বিচারে, ঔচিত্য-নির্ধারণে,

১৬. র।১৩।৬২৩ (এই অংশ 'আধুনিক সাহিত্যে'র প্রবন্ধে বর্জিত)।

স্থানে-স্থানে খুঁটিনাটির আলোচনায় এবং সর্বোপরি প্রখর বিচার-প্রবণতায় এ-সমালোচনাটি বিশেষ সমৃদ্ধ। ঠিক এই জাতীয় বিশ্লেষণাত্মক ও বিচার-মূলক সমালোচনা, ঠিক এই জাতীয় তথ্যের পুঙ্খতার সম্পর্কে সতর্ক সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে বেশি মিলবে না। রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে উল্লেখযোগ্য সমালোচনা-প্রবন্ধগুলির মধ্যে এই প্রবন্ধটিকেই সব থেকে বেশি অরাবীন্দ্রিক ব'লে' মনে হয়। এ-রকম ঘটার কারণ এখানে প্রতিপক্ষ স্বয়ং মধুসূদন।

বালক-সমালোচক মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রথম বাক্যেই বলেছেন যে, মধুসূদনের মতো একজন গ্রন্থকার, যিনি বঙ্গীয় পাঠকসমাজের অত্যন্ত প্রিয়, 'তাঁহার গ্রন্থ নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে কিঞ্চিৎ সাহসের প্রয়োজন হয়।'[১৭]

বালক হ'লেও সমালোচকের সাহসের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। বরং অল্পবয়সের দুঃসাহসই কিছু বেশি পরিমাণে ছিল। এই আত্মসচেতন দুঃসাহসের ঔদ্ধত্যই তাঁর মাত্রাজ্ঞানকে কিছু পরিমাণে বিঘ্নিতও করেছে। দেখতে পাই, সমালোচনায় মেঘনাদবধ কাব্যের দোষের তালিকাটি একটু অনাবশ্যক রকমের দীর্ঘ। তাছাড়া, দোষের তালিকা দীর্ঘ করার প্রয়াসেই বোধকরি—তালিকাতে গুরু-লঘুর একত্র সমাবেশ ঘটেছে এবং লঘু দোষের ভীড়ে গুরুত্বপূর্ণ দোষগুলি পাঠকের কাছে খানিকটা আড়ালে প'ড়ে গিয়েছে।

মেঘনাদবধ কাব্যের দোষের তালিকাটির দিকে একটু দৃষ্টিপাত করা যাক।—

প্রথম, রাবণের রাজসভার বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথের মতে মধুসূদনের বর্ণনায় মহাপ্রতাপ রাবণের রাজসভার গৌরব ও গাম্ভীর্যের হানি ঘটেছে। বাল্মীকি রাবণের রাজসভার তুলনা দিয়েছেন তরঙ্গসঙ্কুল নক্রকুম্ভীরভীষণ গম্ভীর সমুদ্রের সঙ্গে, আর মধুসূদনের বর্ণনা যেন ঝালরশোভিত নাট্যশালার বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যে, এই লঘু বর্ণনার মধ্যে একটা অনৌচিত্য-দোষ আছে।

১৭. র।১৫।১১২

রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্যকে একেবারে অযথার্থ বলা যায় না। রাবণের রাজসভা বাস্তবিকই যথোপযুক্ত গাম্ভীর্য অর্জন করতে পারে নি। এবং সম্ভবত অভাবিত লঘুতার মিশ্রণের জন্যই এরকম ঘটেছে। তবে, তত্ত্বের দিক থেকে এর সমর্থনেও কিছু বলবার আছে। মহাকাব্যে বিষয়ের বিস্তার, ভাবের বিস্তার একটা বড়ো কথা। আমরা জানি, মধুসূদন গম্ভীর ও লঘু বিষয়ের, সমুচ্চ ও ঘরোয়া বর্ণনার, মহিমান্বিত এবং খেলো ব্যাপারের পাশাপাশি সংস্থাপনে বাংলাসাহিত্যে অদ্বিতীয়। সব সময় এটা দুর্বলতা নয়। অনেক সময়—যদিও সব সময় নয়—এর ফলে বিষয় নানা অভাবিত দিকে বিস্তার লাভ করে, ঘটনা অভাবিত পথে ব্যাপ্তি পায়, বর্ণনা বহুস্তরান্বিত ব্যাপকতা অর্জন করে, বিষয় জটিলতা অর্জন করে—এবং পাঠকচিত্ত বিস্ফারিত হয়। স্মরণ রাখতে হবে, গাম্ভীর্য বা আপাতগাম্ভীর্যই মহাকাব্যের একমাত্র লক্ষ্য নয়, মহাকাব্যের বহুশাখায়িত সঞ্চরণের জন্য, মহাকাব্যের বহুমুখী বিশালতার জন্য বিষয়বিস্তার অবশ্যপ্রয়োজনীয়। মহাকাব্যের বিশিষ্ট আবেদনের প্রতি উদাসীন রবীন্দ্রনাথ এই দিকটা খুব তলিয়ে বিবেচনা করেছেন বলে মনে হয় না।

কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও মনে রাখতে হবে যে, মধুসূদনের ক্ষেত্রে এইরকম উচ্চ-নীচের সমাবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঞ্ছিত সার্থকতা অর্জনে অক্ষম হয়েছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তা নিছক অসংগতি ছাড়া আর কিছুই রচনা করতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ এই জাতীয় ত্রুটি অনেকগুলি উল্লেখ করেছেন, তার কোনোটিই খুব অযথার্থ নয়। রাজসভা সম্পর্কেও এ-কথা বলা যায়।

রবীন্দ্রনাথ যে নাট্যশালার তুলনা দিয়েছেন, তা-ও খুব ইঙ্গিতপূর্ণ। মধুসূদনের নাট্যশালার প্রতি কিছু দুর্বলতা ছিল বলে' মনে হয়। রাজসভার এই বর্ণনার অল্প পরেই দূতের বার্তার পিঠে রাবণ যে বিলাপ আরম্ভ করেছে, তার মধ্যে রাবণ নাট্যশালার উপমাই ব্যবহার করেছে।—

'কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে
উজ্জ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল
এ মোর সুন্দর পুরী।......'

এই সঙ্গে এ-ও স্মরণ রাখতে হবে যে, বাংলাসাহিত্যে মধুসূদনের প্রথম

প্রবেশ নাট্যকার রূপে, মধুসূদনই বাংলা নাট্যশালায় নবযুগের প্রবর্তন করেছেন এবং মেঘনাদবধ কাব্য রচনাকালে নাট্যশালা মধুসূদনের মনের অনেকখানি জুড়ে ছিল। কিন্তু নাট্যশালার প্রসঙ্গ এখানে নিশ্চয়ই অবান্তর।

দোষের তালিকায় দ্বিতীয় বিষয় হ'লো রাবণের চরিত্রের অসংগতি—রাবণের ক্রন্দনপরায়ণতা। যার মধ্যে 'স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলা', সেই রাবণ, 'যে অটলশক্তি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনোমতেই হার মানিতে চাহিতেছে না, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছু মানিতে চায় না', (মধুসূদনের রাবণ সম্পর্কে এই কথাগুলি পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নিজেই উচ্চারণ করেছেন। এ-প্রসঙ্গে 'সাহিত্য'* গ্রন্থের 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধের শেষভাগ দ্রষ্টব্য।[১৮])—সভাগৃহে সেই রাবণের রমণীসুলভ ক্রন্দন রবীন্দ্রনাথের কাছে অসংগত বোধ হয়েছে। 'উত্তরচরিত' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ভবভূতির রামের ক্রন্দনপরায়ণতায় আপত্তি করেছিলেন। রামের 'বীরত্ব, রামের স্পর্ধা, রামের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলা ভবভূতির বর্ণনার বিষয় ছিল না। বরং রামচরিত্রের কোমলতার দিকটিই ভবভূতির লক্ষ্য ছিল। সেই কারণে ভবভূতির ক্রন্দনপরায়ণ রাম ততোখানি অনৌচিত্যের বোধ জাগায় না, যতোখানি মধুসূদনের ক্রন্দনপরায়ণ রাবণ জাগায়। উত্তরচরিত সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্যের তুলনায় মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য অনেক বেশি যুক্তিযুক্ত।

রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় আপত্তি চরিত্র-চিত্রণে। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায় মেঘনাদবধ কাব্যের প্রধান অপ্রধানকে অনেক চরিত্রই, হয় অন্তঃসংগতিবিহীন, আর না-হয় অনৌচিত্যদোষে দুষ্ট। লক্ষ্মীকে একবার পাই রাবণের প্রতি স্নেহশীলা ভক্তবৎসলা রূপে, আবার আর-একবার, কোনো সংগত কারণ ছাড়াই, রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রপরায়ণা রূপে। লক্ষ্মীর এই অন্তঃসংগতি-হীনতা একমাত্র তাঁর কপটতা ছাড়া ব্যাখ্যা করা যায় না। এই কপটতা লক্ষ্মীর চরিত্রচিত্রণে অনৌচিত্যের সৃষ্টি করেছে। অনুরূপ অনৌচিত্য পাই পার্বতীর লাস্যে। ততোধিক অনৌচিত্য মাতা পার্বতীর রূপমাধুরী সম্পর্কে

১৮. র।১৩।৭২৯

'বাছা' মদনের উক্তিতে, হৃষিকেশের মোহিনীমূর্তির সঙ্গে মাতার মোহিনী-মূর্তির তুলনায় (ষোলো বছর বয়সের সমালোচকের মন্তব্যটি—বিশেষত দুই মোহিনীমূর্তির তুলনার ইঙ্গিত বিষয়ক মন্তব্যটি উপভোগ্য : ' "বাছার" সহিত "মাতার" কি চমৎকার মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়াছেন ? মলম্বা অম্বরের (গিলটি) উদাহরণ দিয়া, মদন কথাটি আরো কেমন রসময় করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়াছেন ?[১৯]) । অনুরূপ অনৌচিত্য ইন্দ্রের অকল্পনীয় ভীরুতায়, নৃমুণ্ডমালিণীর শৃঙ্গাররসরঞ্জিত বর্ণনায়, নিতান্ত অসময়ে প্রমীলার মুখে 'সূর্পনখা পিসী মাতিলা মদন-মদে পঞ্চবটী বনে' ইত্যাদি উক্তিতে, চির-অশ্রুসজল রামের উৎকট কাপুরুষতায়, ইন্দ্রজিৎ-প্রতিদ্বন্দ্বী লক্ষ্মণের নীচতা ও শক্তিহীনতায় ।

রবীন্দ্রনাথের চতুর্থ আপত্তি ভাবের অগভীরতা নিয়ে। শোকের দৃশ্যে মধুসূদন অশ্রুর বন্যা এনেছেন, কিন্তু কোথাও শোকের গভীরতা ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। রাবণের পুত্রশোক সম্পর্কে একথা যেমন প্রযোজ্য, রামের ভ্রাতৃশোক সম্পর্কেও এ-কথা তেমনি প্রযোজ্য ।

পঞ্চম আপত্তি উপমার কৃত্রিমতা। মধুসূদনের উপমা অনেক সময় বর্ণনীয় বিষয়কে অধিকতর পরিস্ফুট না ক'রে বরং পাঠকচিত্তকে কষ্টকল্পনার আঘাতে পীড়িত করে। অনেক সময় উপমার লঘুতা ও সংকীর্ণতাও বিষয়ের গৌরবহানি করে। রাবণের একটি অলংকৃত উক্তি ধরা যাক ।—

'বরজে সজারু পশি বারুইর যথা
ছিন্ন ভিন্ন করে তারে, দশরথাত্মজ
মজাইছে লঙ্কা মোর ।......'

এই উপমার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'এই উদাহরণটি অতিশয় সংকীর্ণ হইয়াছে ; যদি সাহিত্যদর্পণকার জীবিত থাকিতেন তবে দোষ পরিচ্ছেদে যেখানে সূর্যের সহিত কুপিত কপি-কপোলের তুলনা উদ্ধৃত করিয়াছেন সেইখানে এইটি প্রযুক্ত হইতে পারিত ।'[২০]

রবীন্দ্রনাথ এ-পর্যন্ত যতগুলি আপত্তি উত্থাপন করেছেন, তার কোনোটিই

১৯. রা।১৫।১৩৭

২০. রা।১৫।১১৭

সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়। উপমার কৃত্রিমতা সম্পর্কিত আপত্তিকেও খুব অসংগত বলা যায় না। তবে উপমার কৃত্রিমতার প্রসঙ্গে একটা কথা মনে রাখতে হবে। এখানে কৃত্রিম উপমা অর্থ কষ্টকল্পিত উপমা। গতানুগতিকের বাইরে সব উপমাই অল্পবিস্তর কষ্টকল্পিত, বিশেষত সে-উপমা যদি বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত দূরান্বয়ী উপমা হয়। দূরান্বয়ী উপমার সার্থকতার পরিমাপ উপমাবিশেষের মধ্যে নয়, লেখকের ক্ষমতার মধ্যে। এই প্রসঙ্গে আমরা ডান, মার্ভেল প্রমুখ মেটাফিজিক্যাল কবিদের উপমার কথা স্মরণ করতে পারি। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথ এখানে উপমার কৃত্রিমতাকে উপমার লঘুতা ও লৌকিকতার সঙ্গে, উপমার স্থূল বাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখেছেন। সে-ক্ষেত্রে আমাদের পূর্বের মন্তব্য এখানেও খাটবে। মহাকাব্যে উপমার ব্যবহার আর গীতিকাব্যে উপমার ব্যবহার এক রকম নয়। উভয়ের লক্ষ্য অনেকখানি পৃথক্। মহাকাব্যে বিষয়বস্তুর নানামুখী সম্প্রসারণের জন্য, কাহিনীর ডালপালার অবাধ বিস্তারের জন্য, উচ্চমধ্যনিম্ন সর্বস্তরে সর্বত্র-গামিতার জন্য, কাহিনীর ত্রৈকালিক বিস্তারের জন্য উপমাকে যে-বিশেষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়, তার সম্পর্কে এ-সময় রবীন্দ্রনাথ খুব সচেতন ছিলেন না, এ-কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। কোনো সময়ই সচেতন ছিলেন না, 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতার রচয়িতা সম্পর্কে এ-রকম মন্তব্য নিশ্চয়ই হঠকারিতা হবে। তবু লক্ষণীয় যে, 'ভাষা ও ছন্দে'র এপিক উপমাও সবই গৌরবমুখী, কোনোটিই স্থূল, বাস্তব, লৌকিক বা লঘু নয়।

ষষ্ঠ আপত্তি: কৃত্রিমতা শুধু ভাষাতে নয়, সমগ্র কাব্যটিই কৃত্রিম, সমগ্র কাব্যটিই বাহ্য কৌশলে পরিপূর্ণ, সমগ্র কাব্যটিতেই সরলতা ও আন্তরিকতার অভাব। সমালোচক বলেছেন, 'সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসময় কথা অতি অল্পই আছে, প্রায় সকলই কৌশলময়।'[২১] পুনশ্চ, '... মেঘনাদবধে হৃদয়ের কবিতা নাই, ইহার বর্ণনা সুন্দর হইতে পারে, ইহার দুই একটি ভাব নূতন হইতে পারে, কিন্তু কবিতার মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি অল্প।'[২২]

২১. র।১৫।১২৮

২২. র।১৫।১২৯-৩০

হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের প্রশ্নটি আপাতত থাক, অভিযোগের প্রথম অংশ—অর্থাৎ কৃত্রিমতার প্রশ্নটিই এখন বিবেচনা ক'রে দেখা যাক। কৃত্রিমতা নিশ্চয়ই দোষের, কিন্তু কোন্ সীমানা অতিক্রম করলে কাব্য যে কৃত্রিম হয়, তা নির্ণয় করা কঠিন। কাব্যের ক্ষেত্রে—এবং আলাদা ক'রে দেখলে কাব্যের ভাষার ক্ষেত্রে, উপমাদি অলংকারের ক্ষেত্রে—সরলতার কোনো স্থির মানদণ্ড নেই, কোনো সর্বজনস্বীকৃত আদর্শ নেই। এখানে সরলতা কৃত্রিমতা শুধু যে আপেক্ষিক তা-ই নয়, প্রত্যেক কাব্যের সরলতা কৃত্রিমতার মান তার নিজস্ব কাব্যগত প্রয়োজনের দ্বারা, নিজস্ব রূপগত ও রসগত বিশিষ্টতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। এখানে দুটি জিনিস বিবেচ্য। এক, কবির ক্ষমতা। দুই, রচনার চরিত্রগত বিশেষত্ব। অর্থাৎ, অসার্থক কাব্যের আপাত-সরলতাও কৃত্রিম, সার্থক কাব্যের আপাত-কৃত্রিমতাই তার আভ্যন্তরীণ সরলতার বাহন। দ্বিতীয়ত, চারণ কবির সরলতা শেক্স্পীয়ারে মিলবে না, মৈমনসিংহ গীতিকার সরলতা মিল্টনে প্রত্যাশা করা যাবে না, সহজপাঠের কবিতার সরলতা পূরবী বা প্রান্তিকের কবিতায় পাওয়া যাবে না। এটা মোটেই দোষগুণের কথা নয়, কাব্যের সবই যে রসপরতন্ত্র এ হ'লো তারই প্রমাণ।

এই বিষয়টি রবীন্দ্রনাথ সে-সময় খুব অনুধাবন করেছিলেন বলে' মনে হয় না। করেন নি বলেই রবীন্দ্রনাথের কাছে সেদিন মধুসূদনের থেকে হরু ঠাকুর সরল এবং আন্তরিক বলে'—এবং সেই কারণে বেশি প্রশংসনীয় বলে' মনে হয়েছে। করেন নি বলেই বৃত্রসংহারের ফাঁপানো গৌরবকে সেদিন রবীন্দ্রনাথের কাছে মেঘনাদবধ কাব্যের থেকে অনেক মহার্ঘ বলে' মনে হয়েছে।

এইবারে ষষ্ঠ আপত্তির দ্বিতীয়াংশ। আপত্তিটি সরল: মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস অতি অল্প। কথাটা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই কি একে ত্রুটি বলে' ধরা যায়? মেঘনাদবধ কাব্য গীতিকবিতা নয়, তাতে হৃদয়ের উচ্ছ্বাসের অবকাশ স্বভাবতই কম। এটা একা মেঘনাদবধ কাব্যের অপরাধ নয়, যা-কিছু গীতিধর্মী নয় এই রকম তাবৎ কাব্যই এই অপরাধে অপরাধী। রবীন্দ্রনাথ আসলে এখানে সেই

কথাই বলতে চান। গীতিকবিতা ছাড়া আর-কিছুই সার্থক কবিতা নয়, মহাকাব্য-নামধারী মেঘনাদবধ কাব্য এই সব অসার্থক রচনার অন্যতম প্রধান প্রতিনিধি। রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কাব্যরুচির কাছে, তাঁর রোমান্টিক লিরিক্যাল কাব্যপ্রত্যয়ের কাছে এ সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ যুক্তিপূর্ণ।

বালক-সমালোচকের বিশিষ্ট কাব্যপ্রত্যয় নিয়ে এখানে তর্ক তুলে লাভ নেই, কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের দোষের তালিকায় তিনি অপর যে দোষগুলির কথা বলেছেন, খুঁটিয়ে দেখলে তার প্রত্যেকটিকে অল্পবিস্তর সত্য বলে' মনে হবে। সময় পেলে এবং প্রবন্ধটিকে দীর্ঘতর করবার অবকাশ পেলে সূক্ষ্মদর্শী সমালোচক যে আরো অনেক দোষ খুঁজে বার করতে পারতেন, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। তৎসত্ত্বেও, সমগ্রভাবে দেখলে, রবীন্দ্রনাথের এ-সমালোচনাকে যথার্থ বলে' মেনে নেওয়া যায় না।

দোষের তালিকার বড়ো-ছোটো দিয়ে সব সময় উৎকর্ষ বা অনুৎকর্ষের পরিমাপ করা যায় না। অনেক সময় সম্পূর্ণ নির্দোষ কাব্য, তার দোষহীনতা সত্ত্বেও, যাকে বলা হয় well-made তা হওয়া সত্ত্বেও, সম্পূর্ণ অকিঞ্চিৎকর হতে পারে। ঠিক তেমনি, অনেক সময় সুদীর্ঘ দোষের তালিকা সত্ত্বেও মহৎ কাব্য মহৎ-ই থেকে যায়। খুচ্‌রো দোষ-গুণ আর সামগ্রিক মহত্ত্ব বা অকিঞ্চিৎকরতা সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। মাত্র দোষের অভাবের কারণেই কাব্য সার্থক হয়ে ওঠে না। সার্থক কাব্য অনেক খুচ্‌রো দোষকে অবলীলাক্রমে হজম ক'রে নিতে পারে, যেমন পেরেছে মেঘনাদবধ কাব্য। এই সত্যটি বালক-সমালোচকের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে।

যে-কোনো কারণেই হোক, নিজের কাব্যরুচি ও কাব্যপিপাসার পক্ষে বিজাতীয় বস্তু বলেই হোক, অথবা বাল্যকালে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলেই হোক, অথবা মেঘনাদবধ কাব্যই নতুন কাব্যতত্ত্বের পক্ষে সব থেকে মারাত্মক বিপরীত-দৃষ্টান্ত—এই বিবেচনার জন্যই হোক, অথবা বাংলা কাব্যজগতে মধুসূদনই একমাত্র দ্বেষ-যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী, এই কারণেই হোক, বাল্যে বা যৌবনে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যকে নিরপেক্ষ দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, সমগ্রদৃষ্টি দিয়েও দেখতে পারেন নি। তা যদি পারতেন, তাহলে অনেক দোষদর্শন সত্ত্বেও তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের

সামগ্রিক উৎকর্ষকে সহজেই উপলব্ধি করতে পারতেন। মেঘনাদবধ কাব্যের মহত্ত্বের উৎস কোথায় তা তাঁর কিছু নজরে পড়ে নি। এই কাব্যের সুগভীর মানবিক আবেদন, এর মধ্যে নবযুগের বিশিষ্ট যুগসত্যের প্রতিফলন, এর সমুন্নত নৈতিক তাৎপর্য, এর ভাব ও রসের বিশালত্ব, কিছুই রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিগোচর হয় নি। তা যদি হ'তো, তাহলে বৃত্রসংহারের পোষাকী নৈতিকতা এবং সাজানো বীররস কিছুতেই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করতে পারতো না। মধুসূদনের ভাষা ও ছন্দের সহজ প্রবলতা, রূপসৃষ্টিতে মধুসূদনের অনায়াস নৈপুণ্য, তা-ও রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করতে পারে নি। পরবর্তীকালে 'সাহিত্য'-গ্রন্থের 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধ রচনার কালে (বঙ্গদর্শন, ১৩১৪ আষাঢ়, ১৯০৭) রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের রাবণ-চরিত্রের অটলশক্তির ভয়ংকর মহিমার কথা অতুলনীয় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু এ-সময় সে মহিমাও তাঁর নজরে পড়ে নি।

প্রথম পর্যায় মেঘনাদবধ কাব্য-সমালোচনার দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে, রবীন্দ্রনাথ যখন একুশ বছর বয়সের নবযুবক, তখন দ্বিতীয় পর্যায়ের 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' প্রকাশিত হয় (ভারতী, ১২৮৯ ভাদ্র, ১৮৮২)। এ-প্রবন্ধ আমাদের আলোচ্যমান পর্বের, অর্থাৎ প্রথম পর্বের শেষ সীমানার কাছাকাছি সময়ের রচনা। বিশিষ্ট কাব্যরুচির নিয়ন্ত্রণ এখনো প্রায় পূর্বের মতোই কঠোর। অনেক উদারতার সঙ্গে এইটুকু কেবল এখানে স্বীকার করা হয়েছে যে, মহাকাব্যের পক্ষে পুরোপুরি গীতিকাব্য হওয়া সম্ভব নয়, মহাকাব্য কাব্যের বিশুদ্ধ আদর্শকে অনুসরণ করতে পারে না, মহাকাব্যের সবটাই খাঁটি কবিতা নয়। মহাকাব্য আসলে অনেক অকাব্য এবং অনেক বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতার সমাহার (এই প্রসঙ্গে এড্‌গার এলেন পো-প্রমুখ কিছু রোমাণ্টিক কবি-সমালোচকের কাব্যতত্ত্ব স্মরণীয়)। কাব্যের সঙ্গে অকাব্যকে যুক্ত করার, বিচ্ছিন্ন গীতিকবিতাখণ্ডগুলিকে পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত করার সূত্রটা কী? কোন্ সূত্রে মহাকাব্যের বিচিত্র উপাদান সমূহকে একসঙ্গে গাঁথা হয়? একটি মহান্ চরিত্র। 'মেঘনাদবধ কাব্য' দ্বিতীয় পর্যায় প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলেছেন, মহান্ চরিত্র মহাকাব্যের অপরিহার্য অবলম্বন, তার সমস্ত বিচ্ছিন্ন কাব্যখণ্ডগুলির আশ্রয়স্থল।

এই কাব্যতত্ত্বের প্রেক্ষাপটেই দ্বিতীয়বারের মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা। তত্ত্বটি রবীন্দ্রনাথের মুখেই শোনা যাক ।—

'মনের মধ্যে যখন একটা বেগবান অনুভাবের [বলা হয়তো নিষ্প্রয়োজন যে, 'অনুভাব' এখানে ভারতীয় সাহিত্যশাস্ত্রের পরিভাষিক শব্দ নয়, এ-অনুভাব অনেকটা বাংলায় যাকে আমরা অনুভূতি বলি, ইংরেজি ফীলিংয়ের সমার্থক] উদয় হয়, তখন কবিরা তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারেন না। তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহৎ ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন একজন পরমপুরুষ কবিদের কল্পনার রাজ্য অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্যচরিত্রের উদার মহত্ত্ব তাঁহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাঁহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরমপুরুষের প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্মাণ করিতে থাকেন। ...ইহাকেই বলে মহাকাব্য। মহাকাব্য পড়িয়া...আমরা বুঝিতে পারি সেই সময়কার উচ্চতম আদর্শ কি ছিল। কাহাকে তখনকার লোকেরা মহত্ত্ব বলিত। ...কবিরা স্ব স্ব উচ্চতম আদর্শের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন, ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবতারিত হইয়াছে—যুদ্ধের বর্ণনা করিবার জন্যই মহাকাব্য লেখেন নাই।

'কিন্তু আজকাল যাঁহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞা করিয়া মহাকাব্য লেখেন তাঁহারা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের প্রাণ বলিয়া জানিয়েছেন...। পাঠকেরাও সেই যুদ্ধবর্ণনামাত্রকে মহাকাব্য বলিয়া সমাদর করেন।'[২৩]

ইঙ্গিতটা এই যে, মধুসূদন-প্রমুখ অনেকেই যুদ্ধবর্ণনার জন্যই যুদ্ধবর্ণনার অবতারণা করেছেন, তাঁরা যুদ্ধকেই মহাকাব্যের প্রাণ মনে করেন। রবীন্দ্র-নাথের মতে এই সব রচনা নাম-মাত্র-মহাকাব্য। তিনি বলেছেন, 'হেমবাবুর বৃত্রসংহারকে আমরা এইরূপ নাম-মাত্র-মহাকাব্য শ্রেণীতে গণ্য করি না, কিন্তু মাইকেলের মেঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি না। মহাকাব্যের সর্বত্রই কিছু আমরা কবিত্বের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পারি না। কারণ, আট-নয় সর্গ ধরিয়া, সাত-আট-শ পাতা ব্যাপিয়া প্রতিভার স্ফূর্তি

২৩. র৷১৩৷৬০০-১

সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারেই না। এই জন্যই আমরা মহাকাব্যের সর্বত্র চরিত্র-বিকাশ, চরিত্রমহত্ত্ব দেখিতে চাই। মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়ত কবিত্ব আছে, কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন্ অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে!...সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্তি মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়?...মহাকাব্যে মহৎ চরিত্র দেখিতে চাই ও সেই মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্য মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই।'[২৪]

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট: মেঘনাদবধ কাব্য পাঠকের এই স্বাভাবিক প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে না।—

'হীন ক্ষুদ্র তস্করের ন্যায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ করা, অথবা পুত্রশোকে অধীর হইয়া লক্ষ্মণের প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? ...রামায়ণ মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গ-উদ্ধারের জন্য নিজের অস্থিদান এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ—যথার্থ মহাকাব্যের উপযোগী বিষয়।...দেখিতেছি মেঘনাদবধ কাব্যে ঘটনার মহত্ত্ব নাই, একটি মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই।'[২৫]

এ-বিষয়ে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। পরবর্তীকালে রাবণ-চরিত্রের অটল পৌরুষের মাহাত্ম্য-ঘোষণার দ্বারা ('সাহিত্যসৃষ্টি') রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের পূর্ব-সিদ্ধান্তকে নিজেই খণ্ডন ক'রে দিয়েছেন। এই খণ্ডনকে যদি গ্রহণ করি তাহলে এ-প্রবন্ধের সবই বাতিল হয়ে যায়। তার কারণ এ-প্রবন্ধ পাঁচ বছর আগের প্রবন্ধের মতো খুঁটিনাটির বিচার নয়, সমগ্রের বিচার। পূর্বের প্রবন্ধের ত্রুটি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বোধকরি সচেতন ছিলেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধের উপসংহারে তিনি বলেছেন, 'আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না—আমি তাহার মূল লইয়া, তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোচনা করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম তাহা মহাকাব্যই নয়।'[২৬]

২৪. রা।১৩।৬০১

২৫. রা।১৩।৬০২

২৬. রা।১৩।৬০৩

এ আলোচনা শেষ করার আগে রবীন্দ্রনাথের একটি আনুষঙ্গিক মন্তব্যের কথা উল্লেখ করা দরকার। মন্তব্যটি ট্র্যাজেডি সম্পর্কে। এপিক, ট্র্যাজেডি প্রভৃতি সাহিত্যের এক-একটা শ্রেণীর কিছু-কিছু বহিরঙ্গলক্ষণ বা ছাঁচ থাকে। সেই ছাঁচটা তার প্রাণবস্তু নয়। নির্মাণের ছাঁচ থাকে, সৃজনের কোনো ছাঁচ নেই। অনেকে ছাঁচটাকেই প্রাণ মনে করেন। তাঁরা যুদ্ধ বর্ণনাকেই মহাকাব্য এবং মৃত্যুবর্ণনাকেই ট্র্যাজেডি মনে করেন। তাঁরা মনে করেন, যুদ্ধ না থাকলে মহাকাব্য হয় না, মৃত্যু না থাকলে ট্র্যাজেডি হয় না। ট্র্যাজেডি প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপর শোকের কঙ্কাল, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কি আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে—কুন্দনন্দিনী ত এ ট্র্যাজেডির উপলক্ষ মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল… ইহাই ট্র্যাজেডি!'[২৭]

'মেঘনাদবধ কাব্য' (২) প্রবন্ধের এক মাস আগে 'বসন্ত রায়' প্রবন্ধ (ভারতী, ১২৮৯ শ্রাবণ, ১৮৮২) এবং তারও পাঁচ মাস আগে 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধ (ভারতী, ১২৮৮ ফাল্গুন, ১৮৮২)। এই সময়ের তিনটি প্রবন্ধেই একটা জায়গায় মিল পাওয়া যাবে। কাব্যে সহজ ভাষা ও সহজ ভাবের প্রশংসা, স্বতঃস্ফূর্ততা ও আন্তরিকতার প্রশংসা। ঠিক যে-ধরনের সরলতা মহাকাব্যের কাব্যগুণের বিপরীত, সেই সরলতার প্রশস্তি। এই মিল তাৎপর্যপূর্ণ সন্দেহ নেই।

রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব'-কে স্মরণ করায়। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতিকে একান্তভাবে অন্তঃপ্রকৃতির কবি, অর্থাৎ একান্তভাবে অন্তর্মুখী কবি বলে' এবং জয়দেবকে

২৭. র।১৩।৬০০

একান্তভাবে বহিঃপ্রকৃতির কবি, অর্থাৎ একান্তভাবে বহির্মুখী বলে' বর্ণনা করেছেন। কবিত্বের জগতের এই রকম দ্বিখণ্ডীকরণ রবীন্দ্রনাথের মনঃপূত নয়। রবীন্দ্রনাথের বিবেচনায়, যাঁরা একান্তভাবেই বহিঃপ্রকৃতির কবি, যাঁরা বিশেষভাবে 'বস্তুগত কবিতা'-রই রচয়িতা, অর্থাৎ যাঁরা গীতিকবি নন, তাঁরা যথার্থ কবিই নন। কথাটা স্পষ্ট ক'রে উচ্চারণ না করলেও, এ ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথ নানা প্রবন্ধে বার বার দিয়েছেন। এ পর্বের প্রায় সমস্ত প্রবন্ধেই তা পাওয়া যাবে।[২৮] রবীন্দ্রনাথের মতে, যাঁরা যথার্থ কবি তাঁরা সকলেই অন্তর্মুখী।

তবে অন্তর্মুখিতার বিশুদ্ধতা ও মাত্রাভেদ অনুযায়ী স্থূলভাবে এঁদের দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এক, যাঁদের অন্তর্মুখিতা সম্পূর্ণ নির্ভেজাল, যেমন চণ্ডীদাস। অথবা, পরবর্তী প্রবন্ধে বলেছেন, বসন্তরায়। এঁদের ভাব ও ভাষা সরল, এঁদের বক্তব্য সহজ, স্বতঃস্ফূর্ত ও আন্তরিক। আর দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়বেন তাঁরা যাঁদের অন্তর্মুখিতায় বস্তু-র মিশ্রণ আছে, অর্থাৎ বহির্মুখিতার ভেজাল আছে। তাঁরা 'হৃদয়ের ভাবের আবেশে' সম্পূর্ণভাবে মগ্ন নন, তাঁরা 'রূপ-কে চক্ষে দেখেন', তাঁরা ইন্দ্রিয়-সচেতন, তাঁরা বাক্য-চতুর এবং অলংকার-কুশল। তাঁদের ভাব অগভীর, ভাষা আড়ম্বরপূর্ণ, বক্তব্যে কৃত্রিম বর্ণনাবাহুল্য, বিষয়বস্তুতে ইন্দ্রিয়গম্য রূপের প্রাধান্য। রবীন্দ্রনাথের মতে, এই শ্রেণীর কবির উদাহরণ বিদ্যাপতি। এখানে লক্ষণীয় এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাপতিকে যে-শ্রেণীর প্রতিনিধিস্থানীয় কবি হিসাবে গণ্য করেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে আদৌ সে-শ্রেণীতে স্থান দেন নি। রবীন্দ্রনাথের মতে বিদ্যাপতির স্থান খানিকটা জয়দেবের শ্রেণীতেই।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব' প্রবন্ধে অলক্ষ্যে সমালোচনার একটি নতুন পদ্ধতির দিকে একটু ঝোঁক দিয়েছিলেন। একে বলতে পারি সৃজনশীল যা ইম্প্রেশনিস্টিক পদ্ধতি। অথবা বলতে পারি কাব্যিক সমালোচনার পদ্ধতি। পুরোপুরি কাব্যিক পদ্ধতি নয়, কিন্তু তারই একটু মৃদু এবং সীমিত প্রয়োগ এই প্রবন্ধে দেখতে পাওয়া যায়। এই কাব্যিকতার ঝোঁকেই

২৮. এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে 'সমালোচনা' গ্রন্থের 'বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা' (রা।১৩। ৬১৭-১৩।৬১৩-১৪) এবং 'ডি প্রোফণ্ডিস' (রা।১৩।৬১৭-২৩) প্রবন্ধ দুটি দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, 'জয়দেব ভোগ; বিদ্যাপতি আকাঙ্ক্ষা ও স্মৃতি। জয়দেব সুখ, বিদ্যাপতি দুঃখ। জয়দেব বসন্ত, বিদ্যাপতি বর্ষা।...জয়দেবের কবিতা স্বর্ণহার, বিদ্যাপতির কবিতা রুদ্রাক্ষমালা'—ইত্যাদি।[২৯] পদ্ধতিটি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবধর্মের ততোটা অনুকূল নয়, যতোটা অনুকূল রবীন্দ্রনাথের স্বভাবধর্মের। কতোটা বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টান্তের দ্বারা উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আর কতোটা-বা স্বভাবের নিজস্ব তাগিদে তা বলা কঠিন, তবে 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও খানিকটা সৃজনশীল কাব্যিকতার দিকে ঝোঁক দিয়েছেন এবং তাঁর কথার সুর অবধারিতভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অথচ রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডিদাস দুঃখের কবি, বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডিদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন। চণ্ডিদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার কবি, চণ্ডিদাস সহ্য করিবার কবি। চণ্ডিদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন'—ইত্যাদি।[৩০]

এই ধরনের তুলনামূলক বিচারে বঙ্কিমচন্দ্রই যে রবীন্দ্রনাথের পথ-প্রদর্শক তাতে সন্দেহ নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ যে অনেকখানি পরিমাণে বঙ্কিম-চন্দ্রের রচনাধারাকে অনুসরণ করেছে তাতেও সন্দেহ নেই। অপর পক্ষে প্রবন্ধটি যে এক দিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ তাতেও সন্দেহ নেই। বস্তু-প্রধান কবিতাকে কবিতা বলে' গণ্য করা, রাজসভার বিদগ্ধ নাগরিক কবি বিদ্যাপতিকে—মণ্ডনকলা-নিপুণ, অলংকার প্রয়োগে-সিদ্ধ বিদ্যাপতিকে অন্তর্মুখী কবিদের প্রতিনিধি রূপে গ্রহণ করা, এর কোনোটাই রবীন্দ্রনাথ বিনা-প্রতিবাদে মেনে নিতে পারেন নি। বিদ্যাপতি যে অন্তর্মুখী কবিগোষ্ঠীর যোগ্য প্রতিনিধি নন, চণ্ডীদাসই যে যোগ্যতর প্রতিনিধি, এ-সম্বন্ধে অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও সচেতন ছিলেন, কিন্তু বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসকে

২৯. 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', বিবিধ প্রবন্ধ, বঙ্কিমচন্দ্র, ৫৭
৩০. রা।১৩।৬২৯-৩০

পরস্পরের সঙ্গে তুলনা ক'রে উভয়ের যে-পরিচয় রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টি অতো দূর প্রসারিত ছিল না।

রবীন্দ্রনাথ নিজের বক্তব্যটিকে আরো স্পষ্ট ক'রে তুলেছেন পাঁচ মাস পরের 'বসন্ত রায়' প্রবন্ধটিতে। এর মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কাব্য-রুচির শাসনও খানিকটা ক্রিয়া করেছে, তা এই 'বসন্ত রায়' প্রবন্ধটিতেই সব থেকে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পূর্বের প্রবন্ধের সঙ্গে সাম্য রেখে এটির নাম অনায়াসে 'বসন্ত রায় ও বিদ্যাপতি' হতে পারতো। কেননা পূর্বের প্রবন্ধের অনুরূপ তুলনামূলক বিচারই এ-প্রবন্ধে প্রধান উপজীব্য। একদিকের পাল্লায় বিদ্যাপতি এবং অপর দিকের পাল্লায় বসন্তরায়। এবং এই শেষের পাল্লাটিই ওজনে ভারী। এখানেও মূল কথা সেই একই—সহজ ভাব, সহজ ভাষা, আন্তরিক হৃদয়-উচ্ছ্বাস, একান্ত অন্তর্মুখিতা। সেই সব গুণ যা বিদ্যাপতিতে যৎসামান্য, যার প্রসাদে বসন্তরায় অপর অনেক কবির থেকে শ্রেষ্ঠতর। সেই সব গুণ, রবীন্দ্রনাথের মতে যা মহাকাব্যে নেই, গীতিকবিতায় আছে।

পদকর্তা বসন্তরায়ের ঐতিহাসিকতা নিয়ে, অথবা তাঁর পদের নিশ্চয়তা নিয়ে এখানে কোনো প্রশ্ন তোলা সঙ্গত হবে না। কিন্তু বসন্ত রায় সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিচারই কি খুব নির্ভরযোগ্য? বিচারটা রবীন্দ্রনাথের মুখেই একটু শোনা যাক।—

'বসন্তরায়ের কবিতার ভাবও তেমন। সাদা-সিধা, উপমার ঘনঘটা নাই, সরল প্রাণের সরল কথা…।…বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের তুলনা করিলেই টের পাওয়া যাইবে যে, বিদ্যাপতি অপেক্ষা চণ্ডীদাস কত সহজে সরল ভাব প্রকাশ করিয়াছেন, আবার বিদ্যাপতির সহিত বসন্তরায়ের তুলনা করিলেও দেখা যায়, বিদ্যাপতির অপেক্ষা বসন্তরায়ের ভাষা ও ভাব কত সরল। বসন্তরায়ের কবিতায় প্রায় কোনখানেই টানাবোনা তুলনা নাই, তাহার মধ্যে কেবল সহজ কথার যাদুগিরি আছে।'[৩১]

এ কিন্তু কেবল তথ্যের নিরপেক্ষ উপস্থাপনা নয়। এর মধ্যে একটি

৩১. র।১৩।৬৩৬

সিদ্ধান্ত অনতিপ্রচ্ছন্ন। সে হ'লো এই যে বসন্তরায় বিদ্যাপতির থেকে বড়ো কবি।

আর-একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতির বিরহের পদের সঙ্গে তুলনা করবার জন্য বসন্তরায়ের একটি অনুরূপ ভাবের পদ উদ্‌ধৃত করেছেন। পদটি রাধার উক্তি, প্রথমাংশ এই রকম—

'প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি ?
তোমা বিনে মন করে উচাটন
কে জানে কেমন তুমি।
না দেখি নয়ন ঝুরে অনুক্ষণ,
দেখিতে তোমায় দেখি।
সোঙরণে মন মূরছিত-হেন
মুদিয়া রহিয়ে আঁখি।'৩২

সমগ্র পদটি তুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'ইহার প্রথম দুটি ছত্রে ভাবের অধীরতা, ভাষার বাঁধ ভাঙ্গিবার জন্য ভাবের আবেগ কি চমৎকার প্রকাশ পাইতেছে! "প্রাণনাথ কেমন করিব আমি!" ইহাতে কতখানি আকুলতা প্রকাশ পাইতেছে! আমার প্রাণ তোমাকে লইয়া কি-যে করিতে চায় কিছু বুঝিতে পারি না।...বিদ্যাপতি বলিয়াছেন—

লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখনু
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল!

বিদ্যাপতি সমস্ত কবিতাটিতে যাহা বলিয়াছেন, ইহার এক কথায় তাহার সমস্তটা বলা হইয়াছে এবং তাহা অপেক্ষা শতগুণ অধীরতা ইহাতে ব্যক্ত হইতেছে।'৩৩

'লাখ লাখ যুগ'-পদটি সত্যিই বিদ্যাপতির রচনা কি না সে-প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর। কিন্তু 'লাখ লাখ যুগ'-পদের থেকে বসন্তরায়ের 'প্রাণনাথ, কেমন করিব আমি'-পদটির ব্যক্ততা শতগুণ, এ-সিদ্ধান্ত কি যথার্থ বিচারশীলতার নিদর্শন? না, এ রবীন্দ্রনাথের ঐকান্তিক সরলতা-প্রীতির নিদর্শন, যে-

৩২. র।১৩।৬৪১
৩৩. র।১৩।৬৪১

সরলতা মহাকাব্যে প্রত্যাশিত নয়, যে-সরলতা মধুসূদনে মিলবে না? অথবা খুব সম্ভব, সরলতাও এখানে লক্ষ্য নয়, আসল লক্ষ্য গীতিকবিতা, আসল লক্ষ্য রোমান্টিক ভাবাকুলতা।

এই 'বসন্তরায়' প্রবন্ধের এক মাস পরেই 'মেঘনাদবধ কাব্য' (২)। সে-প্রবন্ধ সম্পর্কে আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তারও কয়েক মাস পরে 'বাউলের গান'। প্রবন্ধের প্রথমাংশ বাউল গানের ভাষা ও ভাবের সরলতার প্রশস্তি, বাউল গানের খাঁটি বাঙালিত্বের প্রশস্তি। প্রবন্ধের এই অংশটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' প্রবন্ধের প্রথমাংশকে স্মরণ করায়। প্রবন্ধের দ্বিতীয়ার্ধ বাউল প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা। বাউলতত্ত্বের আধুনিক বিশেষজ্ঞেরা রবীন্দ্রনাথের এ-ব্যাখ্যাকে কতোখানি গ্রহণ করবেন জানি না। তা করুন আর না-ই করুন, আমাদের পক্ষে এ-আলোচনা অনাবশ্যক। তার কারণ সাহিত্যসমালোচনার সঙ্গে এই প্রেমতত্ত্বব্যাখ্যার কোনো সম্পর্ক নেই।

এইখানেই রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার প্রথম পর্বের সমাপ্তি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা ঃ দ্বিতীয় পর্ব

১

'বাউলের গান' (১৮৮৩) প্রবন্ধের পর দীর্ঘ আট বছরের ছেদ। এই ছেদের শেষ দিকটাতে 'মানসী' কাব্যগ্রন্থ (১৮৯০) প্রকাশিত হয়। পরের বছর, সাধনা পত্রিকা প্রকাশের সময় (১২৯৮ অগ্রহায়ণ, ১৮৯১) থেকে দ্বিতীয় পর্বের শুরু। সূচনা বিখ্যাত 'মেঘদূত' প্রবন্ধ (১২৯৮ অগ্রহায়ণ, ১৮৯১) দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ত্রিশ পূর্ণ হয়েছে। এই সময় থেকে শুরু ক'রে 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের (১৯০১) কয়েক বছর পর পর্যন্ত এই পর্ব প্রসারিত। তারপর অবসান। শুধু দ্বিতীয় পর্বের নয়, সমগ্র সমালোচনা-কাণ্ডের। তখন বিংশ শতকের প্রথম দশক চলছে। রবীন্দ্রনাথ তখন উত্তরচল্লিশ মধ্যবয়সে পা দিয়েছেন।

'মেঘদূত' প্রবন্ধটি 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্তর্ভুক্ত হলেও কালের দিক থেকে 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্যান্য রচনার সঙ্গে এর কোন যোগ নেই। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র অন্য সমস্ত প্রবন্ধই বিংশ শতকের প্রথম কয়েক বছরের মধ্যে রচিত হয়েছে। তাদের সঙ্গে মনের যোগ 'কল্পনা'র (১৯০০) কবিতার, 'নৈবেদ্য'র (১৯০১) কবিতার। তাদের সঙ্গে ভাবের যোগ রবীন্দ্রনাথের তপোবন-চিন্তার, যার অন্যতম প্রকাশ পরবর্তী কালের 'তপোবন-' বক্তৃতায় (১৯০৯)।

'মেঘদূত' প্রবন্ধ এসবের অনেক পূর্বের রচনা। তার সঙ্গে ভাবের মিল 'মানসী' কাব্যগ্রন্থের (১৮৯০) বিখ্যাত 'মেঘদূত' কবিতার (রচনা ১২৯৭, ৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮৯০)। যে প্রেরণায় 'মেঘদূত' কবিতা রচিত, মনে হয় যেন অবিকল সেই প্রেরণাতেই দেড় বছর পরে এই 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। দু'য়েরই অবলম্বন কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূত। দু'য়ের মধ্যেই কালিদাসের কাব্যের রসপরিচয় নিহিত আছে, তুলনায় কবিতাটিতেই

অপেক্ষাকৃত প্রত্যক্ষ ও বিশ্বস্তভাবে। কবিতাটিকে যদি সমালোচনা না বলি, তাহলে প্রবন্ধটিকেই বা সমালোচনা বলবো কেন, এ-প্রশ্ন অবশ্যই উঠতে পারে। যেহেতু সমালোচনা কথাটির সংজ্ঞা খুব সুনির্ণীত নয়, যেহেতু সমালোচনার পরিধি খুব সুনির্দিষ্ট নয়, সেই কারণে এ-প্রশ্নের সর্বজনগ্রাহ্য কোনো উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। এই প্রসঙ্গে 'লিপিকা'-র (১৯২২) 'মেঘদূত' গদ্যকবিতাটির কথাও স্মরণ করা যেতে পারে। তাকে সমালোচনা বলার কথা হয়তো কারোই মনে হবে না।

রবীন্দ্রনাথের এই তিন 'মেঘদূতে'র মধ্যে কোন্‌টির সঙ্গে কালিদাসের কাব্যের যোগ ঘনিষ্ঠতম? যদি ভাষার দিক থেকে দেখি, যদি রূপকল্প-প্রয়োগ ও পরিবেশ সৃষ্টির দিক থেকে দেখি, তাহলে 'মানসী'র কবিতাই কালিদাসের কাব্যের নিকটতম, 'লিপিকা'র গদ্যকবিতাই কালিদাস থেকে দূরতম। আর ভাবের দিক থেকে যদি দেখি, কোনোটিকেই খুব নিকটবর্তী বলা চলে না। তবে কেবল গদ্যপ্রবন্ধটিকেই সমালোচনা বলা হয় কেন? রবীন্দ্রনাথ একে সমালোচনাগ্রন্থে স্থান দিয়েছেন বলেই কি? অথবা, এর ভাষা গদ্য এই জন্যই কি? গদ্য হলেও এর ভাষা যথেষ্ট পরিমাণে ব্যঞ্জনাত্মক। অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণে কাব্যধর্মী।

এই খানেই বোধকরি এ-প্রশ্নের উত্তরের কিছুটা হদিস মিলবে। প্রচুর পরিমাণে কাব্যধর্মী হওয়া আর প্রকৃত কাব্য হওয়া এক নয়। 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'মেঘদূত' কাব্যধর্মী, কিন্তু কাব্য নয়। আবেগ-সঞ্চার তার শেষ কথা নয়, রসব্যঞ্জনা তার চরম লক্ষ্য নয়। 'মানসী' বা 'লিপিকা'র রচনাকে যে-রকম নিঃসঙ্কোচে কবিতা বলা যায়, একে তা বলা যায় না। সেই কারণে সমালোচনা বলে' গৃহীত হবার দাবি, অন্তত এই তিনের মধ্যে এরই সর্বাধিক।

সাহিত্য হিসেবে 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি একটি অসামান্য সৃষ্টি। কী ভাব-গৌরবে, কী বক্তব্য-পরিবহনের শক্তিতে, কী আবেগ-সঞ্চারে, কী সংযমে ও মাত্রাবোধে, রচনাটি সব দিক দিয়েই অসাধারণ। শুধু স্বাধীন সাহিত্য হিসেবে নয়, যদি আদৌ একে সমালোচনা বলে' স্বীকার করি, তাহলে সমালোচনা হিসেবেও একে অসামান্য বলেই মানতে হবে। কিন্তু তার

পূর্বে প্রশ্ন, যদি সমালোচনাই বলি, তাহলে এটি কোন্ জাতীয় সমালোচনা? যদিও কালিদাসের কাব্যের বিষয়বিশেষের প্রশস্তি দিয়েই প্রবন্ধের আরম্ভ, যদিও প্রবন্ধের আদ্যোপান্ত কালিদাসের প্রচ্ছন্ন প্রশস্তি, তাহলেও মূল লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে একে বিচারমূলক সমালোচনা বলা যায় না। প্রবন্ধটিতে ব্যাখ্যা যৎসামান্য আছে বটে, কিন্তু তা ব্যাখ্যার জন্য ব্যাখ্যা নয়। মেঘদূতের একটি হৃদয়গ্রাহী রসমূর্তি পাঠকের সামনে তুলে ধরা, এইটেই এ-প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

কিন্তু এই ব্যাখ্যা, এই রসপরিচয়, এ কি সত্যিই কালিদাসের মেঘদূতের? কালিদাস তো নরনারীর সর্বজনপরিচিত বাস্তব বিরহের কথাই বলেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ এখানে কি কেবল সেই বিরহের কথাই বলছেন? '...প্রত্যেক মানুষের মধ্যে অতলস্পর্শ বিরহ। আমরা যাহার সহিত মিলিত হইতে চাহি, সে আপনার মানসসরোবরের অগম তীরে বাস করিতেছে, সেখানে কেবল কল্পনাকে পাঠানো যায়, সেখানে সশরীরে উপনীত হইবার কোনো পথ নাই। আমিই বা কোথায় আর তুমিই বা কোথায়। মাঝখানে একেবারে অনন্ত, কে তাহা উত্তীর্ণ হইবে। ...যদি তোমার কাছ হইতে একটা দক্ষিণের হাওয়া আমার কাছে আসিয়া পৌঁছে তবে সেই আমার বহুভাগ্য, তাহার অধিক এই বিরহলোকে কেহই আশা করিতে পারে না।'[১] —এ কোন্ বিরহলোক? রবীন্দ্রনাথ এখানে মানুষের যে নিত্য-বিরহের কথা বলেছেন, রামগিরির যক্ষে কি সেই বিরহের আভাস মেলে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '...আমরা যেন কোনো এক কালে একত্র এক মানসলোকে ছিলাম, সেখান হইতে নির্বাসিত হইয়াছি।...যাহারা একটি সর্বব্যাপী মনের মধ্যে এক হইয়া ছিল, তাহারা আজ সব বাহির হইয়া পড়িয়াছে। তাই পরস্পরকে দেখিয়া চিত্ত স্থির হইতে পারিতেছে না—বিরহে বিধুর, বাসনায় ব্যাকুল হইয়া পড়িতেছে।'[২] —কিন্তু এ কোন্ মানসলোক? কালিদাস কি এরই কথা বলেছেন? যে মানসসরোবরের অগম তীরে রবীন্দ্রনাথ কল্পনার মেঘদূতকে প্রেরণ করার কথা বলেছেন,

---

১. র।১৩।৬৬২ (৮-৯)

২. র।১৩।৬৬২ (৯)

সেই অলৌকিক মানসসরোবর কালিদাসের কাব্যে কোথায় আছে? যে সর্বব্যাপী মনের মধ্যে আমরা এক হয়ে ছিলাম, সেই সর্বব্যাপী অখণ্ড হৃদয়-রাজ্যের কোনো সংকেত কি কালিদাসের কাব্যে পাওয়া যাবে?

এর উত্তর দেওয়া কঠিন, কেননা এর শেষ মীমাংসা পাঠকের বোধসাপেক্ষ। কেউ বলবেন, কালিদাসের মেঘদূত এই অলৌকিক নিত্যবিরহের কাব্য নয়, কালিদাস এই মানসসরোবরের কথা বলেন নি। আবার কেউ বলবেন, ওইটেই কালিদাসের কাব্যের নিহিতার্থ, ওইটেই কালিদাসের অভীষ্ট ব্যঞ্জনার্থ। এর মীমাংসা তর্কের দ্বারা করা সম্ভব নয়। সৃজনশীল সমালোচনাকে যদি সমালোচনা ব'লে গ্রহণ করি, তাহলে সমালোচকের স্বাধীনতার শর্তেই তাকে গ্রহণ করতে হবে। বলা বাহুল্য, এ স্বাধীনতা চূড়ান্ত নয়, কেননা মূল সমালোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এর সংযোগ কখনোই ছিন্ন হবার নয়। সে-সংযোগ সম্পূর্ণ ছিন্ন হলে' তাকে সমালোচনা বলার কোনো যুক্তি থাকে না। এ-স্বাধীনতা আপেক্ষিক। বন্ধন শিথিল বলেই সৃজনশীল সমালোচনার পক্ষে সৃজনশীল হয়ে ওঠা সম্ভব হয়, রসাত্মক হয়ে ওঠা সম্ভব হয়। সার্থক সৃজনশীল সমালোচনায় পাঠকের যে প্রাপ্তি ঘটে তা অন্যত্র দুর্লভ। কিন্তু তার জন্য কিছু দামও দিতে হয়। অর্থাৎ, এই সম্ভাবনাকে স্বীকার ক'রে নিতে হয় যে, ক্ষেত্রবিশেষে সৃজনশীলতার প্রয়াস সম্পূর্ণ উন্মার্গগামী হবে, রচিত বস্তুটি না হবে সমালোচনা, না হবে সৃজনশীল। যদি বা সৃজনশীল হয়, সমালোচনা হবে না।

সে যাই হোক, স্বাধীনতা যেখানে আপেক্ষিক. সেখানে তার সঙ্গত পরিমাণ নিয়ে তর্কও অন্তহীন। 'মেঘদূত' সমালোচনা কি সমালোচনা নয়, তার চূড়ান্ত মীমাংসা—সর্বজনগ্রাহ্য মীমাংসা সম্ভব নয়। যদি অসঙ্গত স্বাধীনতার মূল্যেই 'মেঘদূত' অভাবিত রসসঞ্চার সম্ভব ক'রে তুলতে পেরে থাকে, তাহলে সাহিত্যরসিকের অভিযোগের কোনো কারণ নেই, তা সে সমালোচনা হোক আর নাই হোক।

২

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বর্জিত 'সমালোচনা'-গ্রন্থটিকে যদি বাদ দিই, তাহলে রবীন্দ্রনাথের ব্যবহারিক সমালোচনার বই মোট তিনটি—'আধুনিক সাহিত্য' (১৯০৭), 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭) এবং 'প্রাচীন সাহিত্য' (১৯০৭)। সংস্কৃত বা পালি ভাষায় রচিত প্রাচীন গ্রন্থের আলোচনার জন্য 'প্রাচীন সাহিত্য', লোকজীবনের সঙ্গে জড়িত যে সাহিত্য, তার আলোচনা 'লোক-সাহিত্য', আর বাকি সমস্ত সমালোচনা জাতীয় প্রবন্ধ, তা সে মধ্যযুগেরই হোক আর আধুনিক কালেরই হোক, বাংলা গ্রন্থ নিয়েই হোক আর ইংরেজি গ্রন্থ নিয়েই হোক, এরা সমস্তই স্থান পেয়েছে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে।

গ্রন্থ তিনটি যদিও একই বছর প্রকাশিত হয়েছে, বিভিন্ন সময়ের রচনা এতে এমন ভাবে সংকলিত হয়েছে যে, এরই মধ্যে মোটামুটি একটা কালগত পৌর্বাপর্যও দেখতে পাওয়া যায়। তবে হিসেবটা ধরতে হবে অধিকাংশ রচনার ভিত্তিতে, সমস্ত রচনার ভিত্তিতে নয়। একটি রচনা, 'শুভবিবাহ', বাদে 'আধুনিক সাহিত্যে'র সব রচনাই অপেক্ষাকৃত আগেকার। ঠিক তেমনি, একটি মাত্র রচনা, 'মেঘদূত', বাদে 'প্রাচীন সাহিত্যে'র সব প্রবন্ধই অনেকটা পরের, বিংশ শতকে পা দেবার পরের। 'লোকসাহিত্যের' প্রবন্ধগুলি এই দুই বইয়ের প্রবন্ধের মধ্যবর্তী সময়ের, অর্থাৎ উনবিংশ শতকের একেবারে শেষ প্রান্তের।

ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী গ্রন্থটির সমালোচনা 'কঙ্কাবতী' (সাধনা, ১২৯৯ ফাল্গুন, ১৮৯৩) কিছুটা অবজ্ঞাত রচনা। প্রবন্ধটির 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থে স্থান পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু যে কারণেই হোক, প্রবন্ধটি কোনো গ্রন্থেই সংকলিত হয় নি। অথচ এটিকে কোনো ক্রমেই উপেক্ষা করার মতো প্রবন্ধ বলা যায় না।

যা-ই হোক, কোনো গ্রন্থভুক্ত নয় বলেই এর স্বতন্ত্র আলোচনার প্রয়োজন। তবে রচনাকাল, বিষয়বস্তু এবং রচনার চরিত্র তিন দিক থেকেই একে 'আধুনিক সাহিত্যে'-র প্রবন্ধগুচ্ছের সমগোত্রের বলে' ধরা যেতে পারে।

কেউ কেউ ত্রৈলোক্যনাথের কঙ্কাবতী-র উপখ্যানকে স্বপ্নধর্মী বলে' বর্ণনা

করেছেন। আবার আধুনিক কোনো কোনো লেখক কঙ্কাবতীতে সমাজ-বাস্তবের প্রতিফলন দেখতে পেয়েছেন, এবং ত্রৈলোক্যনাথকে আধুনিক অর্থে সমাজ-সচেতন ব্যঙ্গরসিক বলে' বর্ণনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত ভিন্ন রকমের। তিনি মনে করেন, কঙ্কাবতীর কাহিনী প্রধানত রূপকথা-ধর্মী, অংশত বাস্তবধর্মী, কিন্তু দুই ভাব ঠিকমতো জোড়া লাগে নি।

প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ অদ্ভুতরসাত্মক কাহিনীর বিষয়ে বলতে গিয়ে স্বপ্নধর্মী ও রূপকথা-ধর্মী সাহিত্যের যে পার্থক্যের কথা বলেছেন,তা তাঁর পরবর্তীকালের লোকসাহিত্য ও ছড়া বিষয়ক মতামতের সঙ্গে যুক্ত। রবীন্দ্রনাথ কঙ্কাবতীর কাহিনীর চরিত্র ব্যাখ্যা ক'রে বলেছেন, কঙ্কাবতী 'স্বপ্নের ন্যায় সৃষ্টিছাড়া বটে, কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় অসংলগ্ন নহে।'[৩] রবীন্দ্রনাথ লেখকের কল্পনাশক্তির প্রশংসা ক'রে বলেছেন, 'গল্পটি দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে প্রকৃত ঘটনা এবং দ্বিতীয় ভাগে অসম্ভব অমূলক অদ্ভুত রসের কথা। এইরূপ অদ্ভুত রূপকথা ভালো করিয়া লেখা বিশেষ ক্ষমতার কাজ। অসম্ভবের রাজ্যে যেখানে কোনো বাঁধা নিয়ম, কোনো চিহ্নিত রাজপথ নাই, সেখানে স্বেচ্ছা-বিহারিণী কল্পনাকে একটি নিগূঢ় নিয়মপথে পরিচালনা করিতে গুণপনা চাই। কারণ রচনার বিষয় বাহ্যতঃ যতই অসংগত বা অদ্ভুত হউক না কেন, রসের অবতারণা করিতে হইলে তাহাকে সাহিত্যের নিয়মবন্ধনে বাঁধিতে হইবে। রূপকথার ঠিক স্বরূপটি, তাহার বাল্য-সারল্য, তাহার অসন্দিগ্ধ বিশ্বস্ত ভাবটুকু লেখক যে রক্ষা করিতে পারিয়াছেন, ইহা তাঁহার পক্ষে অল্প প্রশংসার বিষয় নহে।'[৪]

ত্রৈলোক্যনাথ উপন্যাসের দ্বিতীয় অংশকে রোগশয্যার স্বপ্ন বলে' বর্ণনা করেছেন, কিন্তু যথার্থ স্বপ্নের অসংলগ্নতা রক্ষা করেন নি। কাহিনীর প্রথম অংশের বাস্তবতাও নিজের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে নি, বাস্তবের মাঝখানেই সহসা অবাস্তবের আবির্ভাব অসংগত সংঘর্ষের সৃষ্টি করেছে। রবীন্দ্রনাথের

৩. সাধনা, ১২৯৯ ফাল্গুন

৪. তদেব

মতে উপাখ্যানটির এইটুকুই মাত্র ত্রুটি, এবং তিনি মনে করেন, এ-ত্রুটি সম্পূর্ণ মার্জনার যোগ্য।

৩

'আধুনিক সাহিত্যে'-র 'ডি প্রোফণ্ডিস' প্রবন্ধটির পূর্ণতর সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল 'সমালোচনা' গ্রন্থে। এই প্রবন্ধটিকে বাদ দিলে 'বিদ্যাপতির রাধিকা'-ই (সাধনা ১২৯৮ চৈত্র, ১৮৯২) 'আধুনিক সাহিত্যে'র সব থেকে আগে-রচিত প্রবন্ধ। এর সঙ্গে দশ বছর আগের রচনা, প্রথম পর্বের 'চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধের ভাবের মিল সুস্পষ্ট। এ-ও সেই দুই কবির পুরানো তুলনারই জের। সুরও পূর্বের অনুরূপ। যথা, 'বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য ; চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক। এইজন্য ছন্দ সংগীত এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্য তাহাতে সৌন্দর্যসুখসম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা।... চণ্ডীদাসের মতো সুখে দুঃখে বিরহে মিলনে জড়িত হইয়া যায় নাই। সেইজন্য বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।'[৫]

যে-কোনো রসাত্মক সমালোচনাকেই সৃজনশীল সমালোচনা বলা যায়। কিন্তু সৃজনশীলতার নানা ধরন, নানা পরিমাণ, নানা চরিত্র সম্ভব। এরই বিশেষ একটি চূড়ান্ত রূপকে ইম্‌প্রেশনিস্ট সমালোচনা বলা হয়। সৃজনশীল সমালোচনার অন্যান্য শাখার পক্ষে সমালোচনা বলে' স্বীকৃতি পেতে ততোটা আপত্তি ঘটে না, যতোটা আপত্তি ঘটে ইম্‌প্রেশনিস্ট সমালোচনার ক্ষেত্রে। রবীন্দ্রনাথের ইম্‌প্রেশনিস্ট সমালোচনার—বা অনেকটা ওই জাতীয় জিনিসের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন বোধ করি 'মেঘদূত'। কিন্তু সৃজনশীল সমালোচনারও শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে বোধ করি 'মেঘদূতে'-র নাম করা চলে না। 'মেঘদূতে' সৃজনের আধিক্যে, অথবা সমালোচকের স্বকীয় অনুভবের প্রভাবে মূল বিষয় খানিকটা আবৃত হয়ে গিয়েছে—পুরোপুরি না হোক, খানিকটা-যে তাতে

৫. র/১৩/৯২২-৩

সন্দেহ নেই। সমস্ত সৃজনশীল সমালোচনার ক্ষেত্রেই এই ধরনের আপত্তি অল্পস্বল্প তোলা যায়, কিন্তু 'মেঘদূতে'র ক্ষেত্রে তার জোরটা অনেক বেশি। এই আপত্তি 'রাজসিংহ' প্রবন্ধটিকেই (সাধনা, ১৩০০ চৈত্র, ১৮৯৪) বোধকরি সব থেকে কম স্পর্শ করে। 'রাজসিংহ' ইম্‌প্রেশনিস্ট না হয়েও সৃজনশীল। শুধু তাই নয়, 'রাজসিংহ' রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীল সমালোচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। মূল লেখক বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যৎসামান্যই আবৃত হয়েছেন। মাত্র ততোটুকুই আবৃত হয়েছেন, সৃজনশীলতার ঐশ্বর্যকে পেতে হলে যে দামটুকু আমাদের দিতেই হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। তিনি এ-ও বলেছেন যে, হিন্দুর বাহুবল প্রতিপাদন করা এ-উপন্যাসের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথও রাজসিংহকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলেই মেনে নিয়েছেন। কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণা ও রবীন্দ্রনাথের ধারণায় অনেক পার্থক্য।

সকলেই জানেন, ঐতিহাসিক উপন্যাস নিয়ে মতভেদের অন্ত নেই। তবু, একটা মোটা ধারণাকে আমরা সাধারণভাবে প্রচলিত ধারণা বলে' বর্ণনা করতে পারি। ধারণাটি সকলেরই পরিচিত। যে-উপন্যাস উপন্যাস হয়েও নিছক উপন্যাস নয়, অন্যান্য উপন্যাস থেকে সত্যতর, যে-উপন্যাসের কাহিনী কাল্পনিক, কিন্তু প্রেক্ষাপট ইতিহাসের, স্থানকালের সত্যটা ইতিহাসের, এক-আধ্‌টা পাত্র-পাত্রীও ইতিহাসের, প্রচলিত মতে তা-ই হলো ঐতিহাসিক উপন্যাস। অর্থাৎ যে-উপন্যাসে ইতিহাসের তথ্য আর উপন্যাসের কল্পনা এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে মিশ্রিত হয়েছে যে, তার মধ্যে যে-রূপকে পাবো তা উপন্যাসের, যে-রসকে পাবো তা উপন্যাসের, কিন্তু যে-সত্যকে পাবো তার অনেকখানি ইতিহাসের, যে-উপন্যাস ইতিহাসের ফাঁকগুলিকে কল্পনায় পূরণ ক'রে ইতিহাসকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলে, সাধারণত তাকেই ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে এই প্রচলিত ধারণার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ধারণার অনেকটা মিল পাওয়া যাবে।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ধারণা সম্পূর্ণ অন্য রকম। প্রচলিত ধারণায়

ঐতিহাসিক উপন্যাস যেন আট-আনা উপন্যাস আর আট-আনা ইতিহাস। রবীন্দ্রনাথের ধারণায় ঐতিহাসিক উপন্যাস ষোলো-আনাই উপন্যাস, এক-আনাও ইতিহাস নয়। রবীন্দ্রনাথের মতে ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের সত্য থাকে না, যা থাকে তা সত্যও নয় তথ্যও নয়, তা এক রকমের রস। তা উপন্যাস-রসের সঙ্গে মিশে থাকে। রবীন্দ্রনাথ তাকে বলেছেন, ঐতিহাসিক রস।

'রাজসিংহে'-র সাড়ে তিন বছর পরে রবীন্দ্রনাথ 'সাহিত্য'-গ্রন্থের বিখ্যাত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' প্রবন্ধটি (ভারতী, ১৩০৫ আশ্বিন, ১৮৯৮) প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক উপন্যাস সম্পর্কে, ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাস ও উপন্যাসের আপেক্ষিক অধিকার সম্পর্কে তাঁর মতামত খুব স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, '...আমরা ইতিপূর্বে কোনো একটি সমালোচনায় লিখিয়াছিলাম, 'ইতিহাসের সংস্রবে উপন্যাসে একটি বিশেষ রস সঞ্চার করে, ইতিহাসের সেই রসটুকুর প্রতি ঔপন্যাসিকের লোভ, তাহার সত্যের প্রতি তাঁহার কোনো খাতির নাই। কেহ যদি উপন্যাসে কেবল ইতিহাসের সেই বিশেষ গন্ধটুকু এবং স্বাদটুকুতে সন্তুষ্ট না হইয়া তাহা হইতে অখণ্ড ইতিহাস-উদ্ধারে প্রবৃত্ত হন তবে তিনি ব্যঞ্জনের মধ্যে আস্ত জিরে-ধনে-হলুদ-সর্ষে সন্ধান করেন।'৬

বোঝা যাচ্ছে, মশলা যেমন ব্যঞ্জনে বাড়্‌তি স্বাদ জোগায়, ইতিহাস তেমনি উপন্যাসে বাড়্‌তি একটা স্বাদের যোগান দেয়। এই স্বাদটাকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঐতিহাসিক রস। তিনি বলেছেন, '...লেখক ইতিহাসকে অখণ্ড রাখিয়াই চলুন আর খণ্ড করিয়াই রাখুন, সেই ঐতিহাসিক রসের অবতারণায় সফল হইলেই হইল।

'তাই বলিয়া কি রামচন্দ্রকে পামর এবং রাবণকে সাধুরূপে চিত্রিত করিলে অপরাধ নাই? অপরাধ আছে। কিন্তু তাহা ইতিহাসের বিরুদ্ধে অপরাধ নহে, কাব্যেরই বিরুদ্ধে অপরাধ। সর্বজনবিদিত সত্যকে একেবারে উল্টা করিয়া দাঁড় করাইলে রসভঙ্গ হয়।'৭

৬. র/১৩/৮২০

৭. তদেব

অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য, সমস্যাটা আসলে ইতিহাসের সত্যমিথ্যাকে নিয়ে নয়, সমস্যাটা পাঠকের প্রত্যয়-উৎপাদন করা না-করা নিয়ে। তিনি বলেছেন, '...যাহা স্বভাবতই আমাদের হইতে দূরস্থ,.. তাহাকে কোনো একটা ছুতায় খানিকটা প্রকৃত ঘটনার সহিত বাঁধিয়া দিতে পারিলে পাঠকের প্রত্যয়-উৎপাদন লেখকের পক্ষে সহজ হয়। রসের সৃজনটাই উদ্দেশ্য, অতএব সেজন্য ঐতিহাসিক উপকরণ যে পরিমাণ যতটুকু সাহায্য করে সে পরিমাণ ততটুকু লইতে কবি কুণ্ঠিত হন না।'[৮]

ইতিহাসের যে-সাহায্য, তা তথ্য বা সত্য দানের সাহায্য নয়, স্বাদ ও সৌরভ দানের সাহায্য এবং সেই সঙ্গে বিশ্বাস-উৎপাদনের সাহায্য। সেই জন্যই রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলতে পেরেছেন, 'এমন-কি যদি কোনো ঐতিহাসিক মিথ্যাও সর্বসাধারণের বিশ্বাস আকর্ষণ করিয়া বরাবর চলিয়া আসে, ইতিহাস এবং সত্যের পক্ষ লইয়া কাব্য তাহার বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করিলে দোষের হইতে পারে।'[৯]

এ্যারিস্টট্‌ল বলেছিলেন, কাব্যে অবিশ্বাস্য তথ্য অপেক্ষা বিশ্বাসযোগ্য অ-তথ্য অনেক বেশি মূল্যবান। রবীন্দ্রনাথও এখানে প্রায় সেই কথাই বলেছেন। প্রবন্ধের সূচনা হয়েছিল স্কটের আইভ্যান্‌হো-নামক ঐতিহাসিক উপন্যাসকে দিয়ে। সেই কথা দিয়েই প্রশ্নোত্তর ছলে প্রবন্ধের উপসংহার টেনেছেন। 'এক্ষণে কর্তব্য কী? ইতিহাস পড়িব না আইভ্যান্‌হো পড়িব? ইহার উত্তর অতি সহজ। দুইই পড়ো। সত্যের জন্য ইতিহাস পড়ো, আনন্দের জন্য আইভ্যান্‌হো পড়ো।'[১০]

ইতিহাসের সংস্রব উপন্যাসকে যে বিশেষ স্বাদ ও সৌরভ দেয়, তা যে কেবল ইতিহাসই দিতে পারে, আর কোনোভাবেই পাওয়া যায় না, এমন কথা রবীন্দ্রনাথ বলেন নি। বরং এমন ইঙ্গিতই দিয়েছেন, যাতে মনে হয়, ক্ষেত্রবিশেষে ইতিহাসের সহায়তা ভিন্নই উপন্যাসে ঐতিহাসিক রস সঞ্চারিত হতে পারে। যেমন মহাকাব্যে হয়ে থাকে। মহাকাব্যের রস পাঠকের

৮. র/১৩/৮১৯

৯. র।১৩।৮২০

১০. র।১৩।৮২১

চিত্তবিস্ফারক বৃহত্ত্বের রস, বিশালত্বের রস। কী ঐতিহাসিক উপন্যাসে, কী ঐতিহাসিক কাব্যনাটকে, ইতিহাসটা উপলক্ষ, এই রসটাই আসল লক্ষ্য। শেক্‌স্‌পীয়ারের 'এ্যান্টনি এ্যাণ্ড্‌ ক্লিয়োপাট্রা'র উদাহরণ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের সুপ্রত্যক্ষ নরনারীর বিষামৃতময় প্রণয়লীলাকে কবি একটি সুবিশাল ঐতিহাসিক রঙ্গভূমির মধ্যে স্থাপিত তাহাকে বিরাট করিয়া তুলিয়াছেন। ...আদি এবং করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করিতেই তাহা এমন একটি চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।'[১১]

ঐতিহাসিক রস যদি ইতিহাসের সত্যেরই রস না হয়, তাহলে ঐতিহাসিক রসটা কী বস্তু? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের অধিকাংশেরই সুখদুঃখের পরিধি সীমাবদ্ধ; আমাদের জীবনের তরঙ্গক্ষোভ কয়েকজন আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের মধ্যেই অবসান হয়।'[১২] সাধারণ উপন্যাসে সেই কারণে রসের তীব্রতা থাকে, কিন্তু বিস্তার থাকে না। কিন্তু ব্যক্তিকে যদি নিছক ব্যক্তিবিশেষ রূপে না দেখে, বৃহৎ জগৎ-ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত ক'রে দেখি, ব্যক্তির জীবনসংগীতকে যদি 'রাজ্যের উত্থানপতন মহাকালের সুদূর কার্যপরম্পরা, যে সমুদ্রগর্জনের সহিত উঠিতেছে পড়িতেছে সেই মহান্‌ কলসংগীতের'[১৩] সঙ্গে মিলিয়ে দেখি, তখন উপন্যাসে 'একটা বিচিত্রগম্ভীর, একটা সুদূরবিস্তৃত ঝঙ্কার'[১৪] বাজতে থাকে, তখন উপন্যাসের মধ্যে মহা-কাব্যোচিত বিশালত্বের সঞ্চার ঘটে। এই-যে আমাদের ক্ষুদ্র জীবনের ব্যক্তিগত সুখদুঃখ থেকে দূরত্ব, এই-যে বৃহৎ পটভূমিতে রেখে জীবনকে দেখা, এই-যে বৃহত্ত্বের উপলব্ধি, এই উপলব্ধিই ঐতিহাসিক রসের প্রাণস্বরূপ।

ঐতিহাসিক রস ইতিহাসের ব্যাপার নয়, পাঠকচিত্তের ব্যাপার। এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে ইতিহাস তা দিতে পারে না। আবার এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে ইতিহাস ব্যতিরেকেই এই রসের আস্বাদ পাওয়া যায়, যেমন মহাকাব্যে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের অলংকারে নয়টি,

১১. র।১৩।৮২০

১২. র।১৩।৮১৯

১৩-১৪. তদেব

মূলরসের নামোল্লেখ আছে। কিন্তু অনেকগুলি অনির্বচনীয় মিশ্ররস আছে, অলংকারশাস্ত্রে তাহার নামকরণের চেষ্টা হয় নাই।

'সেই সমস্ত অনির্দিষ্ট রসের মধ্যে একটিকে ঐতিহাসিক রস নাম দেওয়া যাইতে পারে। এই রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ।'[১৫]

উদ্‌ধৃতির শেষের বাক্যটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। যে-রস মহাকাব্যের প্রাণস্বরূপ, সেই রসই রবীন্দ্রনাথ-কথিত ঐতিহাসিক রস। বিশালতাই তার বিশিষ্ট আস্বাদ। কিন্তু তাই যদি হয়, তাহলে তাকে মহাকাব্যের রস বলতে বাধা কোথায়?

নাম নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ নেই। ভুল নামকরণ যে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করতে পারে, পাঠক সচেতন থাকলে সে-বিভ্রান্তির আশঙ্কা নেই। এখানে একটি বিষয় সম্বন্ধেই আমাদের সচেতন থাকতে হবে: ঐতিহাসিক উপন্যাসে সাধারণ পাঠক সচরাচর যে-ইতিহাসরসের সন্ধান করেন, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসে যে-রসের সঞ্চারে অভিলাষী হয়েছিলেন, রবীন্দ্রনাথ-কথিত ঐতিহাসিক রস মোটেই সে-বস্তু নয়। তথ্যগত ঐতিহাসিকতা বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রেত হতে পারে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহ উপন্যাসে তা খোঁজেন নি, তার অস্তিত্ব-অনস্তিত্ব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান নি। রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহ উপন্যাসে যা খুঁজেছেন এবং যার সাক্ষাৎ পেয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রশস্তি রচনা করেছেন, তা বিশেষভাবে রবীন্দ্রনাথেরই অন্বিষ্ট। তাকেই রবীন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক রস নাম দিয়েছেন। তা মহাকাব্যের বিশাল-রসেরই নামান্তর।

বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্য ছিল ইতিহাসের সত্যের পাত্রে উপন্যাসের কাহিনী-রসের সঞ্চার, ভারত-ইতিহাসের একটি বিশেষ পর্বের ঐতিহাসিক সত্যকে রক্তমাংসের রূপ দেওয়া—এবং সেই সঙ্গে হিন্দুর বাহুবল প্রতিপাদন করা। এই উদ্দেশ্যসাধনে বঙ্কিমচন্দ্র কতোদূর সফলকাম হয়েছেন, তা রবীন্দ্রনাথ বিবেচনা ক'রে দেখেন নি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি কাহিনী-রসের দিকে, কাহিনীর এপিক-লক্ষণের দিকে। রবীন্দ্রনাথ 'রাজসিংহ' প্রবন্ধের উপসংহারে

১৫: রা।১৩।৮১৮

বলেছেন, '...দেখা কর্তব্য, লেখক গ্রন্থবিশেষে কী করিতে চাহিয়াছেন এবং তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন।'১৬

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে সেই কর্তব্য, অন্তত ঐতিহাসিকতার ক্ষেত্রে, পালন করেন নি।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাধারণ মানদণ্ড দিয়ে বিচার করলে রাজসিংহ উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের অনেক ত্রুটি নজরে পড়তে পারে। রবীন্দ্রনাথ সে-প্রসঙ্গ উত্থাপনই করেন নি। এ-সম্পর্কে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত যা বলেছেন তা বিশেষ প্রনিধানযোগ্য : 'এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র পারিবারিক ও রাজনৈতিক জগতের যে প্রলয়ংকর চিত্র আঁকিয়াছেন রবীন্দ্রনাথ তাহার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের অপরূপ বিবরণ ও ব্যাখ্যা দিয়াছেন, কিন্তু এই উপন্যাস ঐতিহাসিক উপন্যাস, এবং ইহাকে সেইভাবেই বিচার করিতে হইবে। রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন, এই ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইতিহাস অংশের নায়ক ঔরংজেব ও রাজসিংহ; উপন্যাস অংশের নায়িকা জেব-উন্নিসা। তিনি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছেন অনৈতিহাসিক জেব-উন্নিসার কাহিনীর উপর; সেই কারণে ঐতিহাসিক উপন্যাসের ইতিহাস অংশ যথাযোগ্য মর্যাদা পায় নাই।'১৭

ঐতিহাসিকতার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ত্রুটিকে রবীন্দ্রনাথ ত্রুটি বলেই গণ্য করেন নি। ইতিহাসের তথ্য দিয়ে নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায় যা-ই থাকুক না কেন, মহাকাব্য-লক্ষণের সাফল্য-বৈফল্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ এ-উপন্যাসের বিচার করেছেন। মহাকাব্য-রস বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায়ের অন্তর্গত ছিল কি না সে প্রশ্ন উঠতে পারে। তবে, স্মরণ রাখতে হবে, সব সময় লেখকের ঘোষিত অভিপ্রায় আর নিগূঢ় অভিপ্রায়, লেখকের সচেতন লক্ষ্য আর অবচেতন লক্ষ্য এক না-ও হতে পারে।

লেখকের অভিপ্রায় নির্ধারণ ক'রে তাই দিয়ে গ্রন্থবিশেষের সমালোচনা, এটা রোমান্টিক সমালোচনার ধারা-বিশেষের একটি বহু-ঘোষিত সূত্র। অভিপ্রায়-ভিত্তিক (intentional) সমালোচনা নিয়ে অনেক তর্ক আছে। লেখক শিব গড়তে গিয়েই বাঁদর গড়লেন, না বাঁদর গড়তে গিয়েই বাঁদর

১৬. রা।১৩।৯৪৩

১৭. বাংলা সমালোচনা পরিচয়, ১৯১-২

গড়লেন—উল্টো পক্ষে, লেখক শিব গড়তে গিয়েই শিব গড়লেন, না বাঁদর গড়তে গিয়েই শিব হয়ে গেল, সমালোচকের পক্ষে তার সুনিশ্চিত নির্ধারণ সব সময় সম্ভব হয় না। অভিপ্রায়-ভিত্তিক সমালোচনা যে কী রকম অবধারিত ভাবে হেত্বাভাসের গহ্বরে গিয়ে পড়ে, তা উইমৃস্যাট এবং বিয়ার্ডস্‌লে তাঁদের বিখ্যাত 'দি ইন্‌টেন্‌শনাল ফ্যালাসি' প্রবন্ধে সুন্দরভাবে আলোচনা ক'রে দেখিয়েছেন।'[১৮] এখানে তার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক।

লেখকের মনোগত অভিপ্রায় যা-ই হোক না কেন, রচনা নিজের মধ্যেই একটি শিল্পগত অভিপ্রায়কে ধারণ করে এবং প্রকাশ করে। সে অভিপ্রায় সাহিত্যবস্তুর রূপের মধ্যে, রসের মধ্যে, সাহিত্যবস্তুর মর্মগত তাৎপর্যের মধ্যে নিজেকে অভ্রান্তভাবে অভিব্যক্ত করে। রচনার সেই শিল্পগত অভিপ্রায়টি, তার সেই রসগত অভিপ্রায়টি রচয়িতার সচেতন অভিপ্রায়ের সঙ্গে না-ও মিলতে পারে। সমালোচকেব কাছে রচনার মধ্যে রূপে-রসে অভিব্যক্ত অভিপ্রায়টিই বড়ো কথা, রচয়িতার মনস্তত্ত্ব নয়। লেখককে ভুলে গিয়ে সমালোচক সাহিত্যবস্তুর নিজস্ব প্রকাশরূপের দিকে দৃষ্টি দেবেন, এইটেই সমালোচকের কাছে প্রত্যাশিত। রবীন্দ্রনাথ এখানে তাই করেছেন। তিনি মুখে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায়ের কথা বললেও, কার্যত রাজসিংহ উপন্যাসের রূপ-তাৎপর্যের দিকে, রস-তাৎপর্যের দিকে, তার দূরত্ব, গাম্ভীর্য ও বিশালত্বের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। সেই জন্যই এ-উপন্যাসের গঠনের বিশেষত্ব, এর কাহিনীবিন্যাসের বিশেষত্ব—ঘটনার দ্রুতগামিতা, উপকরণসম্ভারের মাধ্যাকর্ষণবিজয়ী অবাধ-সঞ্চরণ, পটভূমির বিস্ফার, নিকট ও দূরের, উচ্চ ও নীচের, বড়ো ও ছোটোর, আলো ও অন্ধকারের বিচিত্র বিপর্যাস প্রথমাবধিই তাঁর কাছে এত গুরুত্বপূর্ণ বলে' মনে হয়েছে।

'রাজসিংহ' প্রবন্ধে প্রথমেই রবীন্দ্রনাথ এ উপন্যাসের গঠনের দ্রুতগামিতার কথা বলেছেন। 'কোনো ঘটনা কোনো পরিচ্ছেদ কোথাও বসিয়া কালক্ষেপ করিতেছে না, সকলেই অবিশ্রাম চলিয়াছে; এবং সেই অগ্রসরগতিতে পাঠকের

১৮. 'The Intentional Fallacy', W. K. Wimsatt, Jr. and M. C. Beardsly, Essays In Modern Literature, Ed. Ray B. West, Jr. (1961), Holt, Rinehart and Winston, New York.

মন সবলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রন্থের পরিণামের দিকে বিনা আয়াসে ছুটিয়া চলিয়াছে।

'এই অনিবার্য অগ্রসরগতি সঞ্চার করিবার জন্য বঙ্কিমবাবু তাঁহার প্রত্যেক পরিচ্ছেদ হইতে সমস্ত অনাবশ্যক ভার দূরে ফেলিয়া দিয়াছেন।'[১৯]

প্রবন্ধের এই অংশে রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহের গঠনের উপর, বঙ্কিমচন্দ্রের নির্মাণকৌশল ও পরিকল্পনার বিশেষত্বের উপর জোর দিয়েছেন। একটু অগ্রসর হয়েই তিনি বলেছেন, 'রাজসিংহের গল্পটা সৈন্যদলের চলার মতো; ঘটনাগুলো বিচিত্র ব্যূহ রচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখদুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।'[২০]

এর একটু আগে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে রাজসিংহ উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হয় যেন এই উপন্যাস-জগৎ থেকে সহসা মাধ্যাকর্ষণশক্তি অনেকটা কমে গিয়েছে। বাস্তব জগতে বাস্তবের সত্য এবং বাস্তবের নিয়মকানুন অচ্ছেদ্য-ভাবে যুক্ত থাকে। সেখানে নিয়মের ভারকে বাদ দিয়ে সত্যকে লাভ করা যায় না। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন 'সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহি না।

'কিন্তু সত্যকে সম্যক্ প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য কিয়ৎপরিমাণে ভারের আবশ্যক, সেটুকু ভারে কেবল সত্য ভালোরূপ অনুভবগম্য হইয়া হৃদয়ের আনন্দ উৎপাদন করে; কল্পনাজগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় ও স্পর্শযোগ্য ও চিরস্থায়ী রূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।

'বঙ্কিমবাবু রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভারেরও কিয়দংশ যেন বাদ দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যেটুকু কম পড়িয়াছে গতির দ্বারা তাহা পূরণ করিয়াছেন।'[২১]

প্রবন্ধের মধ্যভাগে রবীন্দ্রনাথ রাজসিংহের এই গতির, এই বস্তুভারহীন দ্রুততার সার্থকতা ব্যাখ্যা করেছেন। সকলেই জানেন, সাহিত্যে কর্ম এবং

১৯. র।১৩।৯৩৮

২০. র।১৩।৯৪০

২১. র।১৩।৯৩৯

কন্টেন্ট্‌ পরস্পরের সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংবদ্ধ। উপন্যাসের বিষয়বস্তু আর তার গঠন বা তার প্রকাশরূপ এরা পরস্পর পরস্পরকে প্রভাবিত করে ও নিয়ন্ত্রিত করে। ফর্ম এবং কন্টেন্টের নিরন্তর দেওয়া-নেওয়ার মধ্যে দিয়েই সেই অখণ্ড অবিভাজ্য ঐক্য গড়ে' ওঠে যার নাম শিল্পবস্তু। যেখানে বিষয়-বস্তুটি ছোটো পরিসরে সীমাবদ্ধ, কাহিনী যেখানে পারিবারিক জীবনের তীব্র কিন্তু ছোটো-মাপের ব্যক্তিগত সুখদুঃখের মধ্যে সীমায়িত, লক্ষ্য যেখানে সুনির্দিষ্ট একটি-দুটি হৃদয়, লক্ষ্য যেখানে ক্ষুদ্র একটি গণ্ডীর মধ্যে তীব্র আলোকপাত, সেখানে উপন্যাসের রূপও সেই লক্ষ্যের অনুযায়ীই হবে। যেমন হয়েছে বিষবৃক্ষ-উপন্যাসে। লক্ষ্য যেখানে ব্যাপ্তি, একটি-দুটি হৃদয় নয়, ইতিহাসের বৃহৎ প্রেক্ষাপটে বহু মানুষের মিছিল, প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র সুর যেখানে মহাকালের বিপুল গম্ভীর সমুদ্রগর্জনের সঙ্গে মিলিতভাবে ধ্বনিত, লক্ষ্য যেখানে এপিকের বিশালতা, সেখানে ব্যক্তিহৃদয়ের সংকীর্ণ ভূমিতে ধীর পদক্ষেপে বিচরণ করা সম্ভব নয়। যেমন সম্ভব হয় নি রাজসিংহ উপন্যাসের পক্ষে।

প্রত্যেক শিল্পগোত্রের গোত্রগত রূপ যে স্বতন্ত্র, প্রত্যেক আর্ট-ফর্ম যে তার নিজস্ব নিয়মের দ্বারা নিজেকে অভিব্যক্ত করে তা রাজসিংহ আর বিষবৃক্ষকে তুলনা করলেই বোঝা যায়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '‘রাজসিংহ’ দ্বিতীয় ‘বিষবৃক্ষ’ হয় নাই বলিয়া আক্ষেপ করা সাজে না। বিষবৃক্ষের সুতীব্র সুখদুঃখের পাকগুলা প্রথম হইতেই পাঠকের মনে কাটিয়া কাটিয়া বসিতেছিল, অবশেষে শেষ কয়টা পাকে হতভাগ্য পাঠকের একেবারে কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসে। রাজসিংহের প্রথম দিকের পরিচ্ছেদগুলি মনের উপর সেরূপ রক্তবর্ণ সুগভীর চিহ্ন দিয়া যায় না, তাহার কারণ রাজসিংহ স্বতন্ত্রজাতীয় উপন্যাস।'[২২]

রাজসিংহের প্রথম দিকের এক একটি খণ্ড নির্ঝরের মতো লঘু ও দ্রুতগতি, তখন কেবল চঞ্চল লহরীর তরল কলধ্বনি। তারপর ক্রমে যখন ইতিহাস আর উপন্যাস একসঙ্গে মিশতে আরম্ভ করেছে, ঘটনায় ব্যাপ্তি এসেছে, প্রবলতা এসেছে, গভীরতা এসেছে, তখন থেকে জলের স্রোত গভীর, জলের

২২. রা।১৩।৯৪১

বর্ণ ঘনকৃষ্ণ। আরো অগ্রসর হওয়ার পর অমোঘ পরিণামের মেঘগম্ভীর গর্জনধ্বনি শোনা যায়। 'সেখানে নৃত্য অতিশয় রুদ্র, ক্রন্দন অতিশয় তীব্র এবং ঘটনাবলী ভারত-ইতিহাসের একটি যুগাবসান হইতে যুগান্তরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছে।'[২৩]

রাজসিংহ মোটেই বিষবৃক্ষ নয়। তার রূপ স্বতন্ত্র, রস স্বতন্ত্র। বিষবৃক্ষের রস পারিবারিক উপন্যাসের রস, রাজসিংহের রস সেই রস যা মহাকাব্যের প্রাণ-স্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ খানিকটা জোর ক'রেই যাকে বলেছেন ঐতিহাসিক রস।

রাজসিংহ উপন্যাসের ঐতিহাসিকতা প্রসঙ্গে এবং এর নায়ক-নায়িকার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ইহার নায়ক কে কে ? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব রাজসিংহ এবং বিধাতা-পুরুষ; উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না জানি না, নায়িকা জেবউন্নিসা।'[২৪]

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির মর্মার্থতে আপত্তি নেই, কিন্তু এর বাচ্যার্থ নিশ্চয়ই আপত্তিকর। ঐতিহাসিক উপন্যাসে 'ঐতিহাসিক-অংশ' আর 'উপন্যাস-অংশ'-কে কখনোই আলাদা করা যায় না, দুই অংশের নায়ক নায়িকাও কখনো পৃথক্ হতে পারে না। তা যদি হ'তো, তাহলে শিল্পবস্তুর অখণ্ডতা বিনষ্ট হয়ে যেতো, রাজসিংহ দু'খানা পৃথক্ উপন্যাসে পরিণত হ'তো। ঔরংজেব ও রাজসিংহের পাশে তৃতীয় নায়ক হিসাবে স্বয়ং বিধাতা-পুরুষকে কল্পনা করা ব্যঞ্জনার দিক থেকে ভাবগর্ভ হতে পারে, কিন্তু শাদা অর্থে দুর্বোধ্য। এই তৃতীয় নায়কটি আসলে কে? ইতিহাসভাগ্যবিধাতা? তাঁর নায়কত্ব কোথায় নেই? অথবা, উপন্যাসের স্রষ্টাই যেহেতু উপন্যাসের ভাগ্যবিধাতা, স্বয়ং রচয়িতাই কি তৃতীয় নায়ক? তা যদি হয়, তাঁর নায়কত্বই বা কোথায় নেই?

আসল কথা, রাজসিংহ একনায়ক-কেন্দ্রিক উপন্যাস নয়, আদৌ নায়ক-সর্বস্ব উপন্যাস নয়। প্রথম যৌবনে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, মহাকাব্য মহৎ-চরিত্র-কেন্দ্রিক কাব্য। এখানে দেখা যাচ্ছে, মহাকাব্যের রস তেমন কোনো সুমহৎ চরিত্রের অপেক্ষা করে না।

২৩. তদেব

২৪. র।১৩।৯৪১

এ-উপন্যাসে কোনো স্বতন্ত্র ঐতিহাসিক অংশ নেই। রাজসিংহের ঐতিহাসিকতা তথ্যের ঐতিহাসিকতা নয়, ভাবের ঐতিহাসিকতা, রসের ঐতিহাসিকতা। কাহিনীর মধ্য পর্বে দিগন্তব্যাপী মেঘ-সমারোহের মধ্যে ঘনবর্ষার কালরাত্রে অকস্মাৎ মৃত্যুর দোলায় এই রস যেন উদ্‌বেল হয়ে উঠেছে।—

'এই অকস্মাৎ মৃত্যুর দোলায় সকলেই সজাগ হইয়া উঠিয়াছে…। কোথায় ছিল ক্ষুদ্র রূপনগরের অন্তঃপুরপ্রান্তে একটি বালিকা, কালক্রমে সে কোন্ ক্ষুদ্র রাজপুতনৃপতির শত রাজ্ঞীর মধ্যে অন্যতম হইয়া……শ্বেতপ্রস্তররচিত কক্ষ-প্রাচীর-মধ্যে পুরু গালিচায় বসিয়া রঙ্গসঙ্গিনীগণের হাসি-টিট্‌কারি-পরিবৃত হইয়া আলবোলায় তামাকু টানিত।…সে আজ বাধামুক্ত বন্যার একটি গর্বোদ্ধত তরঙ্গের ন্যায় দিল্লির সিংহাসনে গিয়া আঘাত করিল। কোথায় ছিল মোগল রাজপ্রাসাদের রত্নখচিত রঙমহলে সুন্দরী জেবউন্নিসা—সে সুখের উপর সুখ, বিলাসের উপর বিলাস বিকীর্ণ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাকে আরামের পুষ্পরাশির মধ্যে আচ্ছন্ন অচেতন করিয়া রাখিয়াছিল—সেদিনের সেই মৃত্যুদোলায় হঠাৎ তাহার অন্তরশয্যা হইতে জাগ্রত হইয়া তাহাকে কোন্ মহাপ্রাণী এমন নিষ্ঠুর কঠিন বাহুবেষ্টনে পীড়ন করিয়া ধরিল, সম্রাট দুহিতাকে কে সেই সর্বত্রগামী দুঃখের হস্তে সমর্পণ করিল যে দুঃখ প্রাসাদের রাজরাজেশ্বরীকেও কুটিরবাসিনী কৃষক-কন্যার সহিত এক বেদনাশয্যায় শয়ান করাইয়া দেয়! দস্যু মানিকলাল হইল বীর, রূপমুগ্ধ মোবারক মৃত্যুসাগরে আত্মবিসর্জন করিল, গৃহপিঞ্জরের নির্মলকুমারী বিপ্লবের বহিরাকাশে উড়িয়া আসিল, এবং নৃত্যকুশলা পতঙ্গ-চপলা দরিয়া সহসা অট্টহাস্যে মুক্তকেশে কালনৃত্যে আসিয়া যোগ দিল।'[২৫]

সৃজনশীল সমালোচনার অন্য যে-সীমাবদ্ধতাই থাকুক না কেন, যেখানে সে সার্থক, সেখানে তার প্রতিদ্বন্দ্বী নেই—রবীন্দ্রনাথের 'রাজসিংহ' এই কথাই প্রমাণ করে। এ ধরনের সৃজনশীলতা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, কবি-সমালোচক হলেও না। এ রকম সমালোচনা কেবল তাঁর পক্ষেই সম্ভব

২৫. র।১৩।৯৪০-৪১

যিনি 'ক্ষুধিত পাষাণ' বা 'দুরাশা'-র মতো বর্ণাঢ্য গল্প রচনা করতে পারেন, যিনি 'কথা ও কাহিনী'র কবিতার মতো কবিতা লিখতে পারেন, 'গোরা'-র মতো এপিক ধাঁচের উপন্যাস রচনা করতে পারেন, যিনি 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র মতো সংবেদনশীল সৃজনধর্মী সমালোচনা রচনা করতে পারেন, যিনি পরিপূর্ণ নিজত্বকে রক্ষা ক'রেই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র হয়ে উঠতে পারেন।

৪

যে-মাসে 'রাজসিংহ' প্রবন্ধটি সাধনায় প্রকাশিত হ'লো, সেই মাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু হয় (১৩০০ চৈত্র, ১৮৯৪)। তার অল্প দিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি (১৩০১ বৈশাখ, ১৮৯৪) সাধনায় প্রকাশিত হয়। রচনার উপলক্ষ থেকেই অনুমান করা যায়, সাধারণ সমালোচনাপ্রবন্ধের সঙ্গে এর খুব মিল থাকা সম্ভব নয়।

এ-প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো গ্রন্থবিশেষের সমালোচনা নয়। এ-প্রবন্ধ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে—সেদিনের সাহিত্যগুরু ও সংস্কৃতিনায়ক বঙ্কিমচন্দ্রকে এক-দৃষ্টিতে সমগ্রভাবে দেখবার প্রয়াস, বাংলা ভাষা, বাংলা সাহিত্য এবং বাংলা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরাট দানের সামগ্রিক তাৎপর্য নিরূপণের চেষ্টা।

এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো নতুন মূল্যায়নের চেষ্টা করেন নি। তিনি ধ'রে নিয়েছেন যে, সৃজনশীলতার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান এতোই উচ্চে এবং এতোই সর্বজনস্বীকৃত যে, এ ক্ষেত্রে তার নতুন মূল্যায়ন অনাবশ্যক। কৃষ্ণচরিত্র ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো প্রবন্ধ-গ্রন্থের কথা এখানে রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ মাত্র করেন নি। কৃষ্ণচরিত্রের উল্লেখও কৃষ্ণচরিত্রগ্রন্থের পরিচয় দেবার জন্য নয়। এ উল্লেখ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহস, তেজ, সংযম, মাত্রাজ্ঞান ও সত্যনিষ্ঠার দৃষ্টান্ত হিসেবে।

এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের দায়িত্ব ও কৃতিত্বের উপর এবং বাংলা সংস্কৃতিতে বঙ্গদর্শনের

ব্যাপক ও গভীর প্রভাবের উপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। বঙ্গদর্শনের পূর্বের এবং পরের বাংলাসাহিত্যের পার্থক্যের কথা এবং বঙ্গদর্শনের আবির্ভাবের গুরুত্বের কথা রবীন্দ্রনাথ অল্প-কথায় যেমন উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করেছেন, তা বহু লেখকের বহুবারের উদ্ধৃতি সত্ত্বেও আজও অমলিন আছে।

এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের অগাধ শ্রদ্ধা ও অপরিসীম প্রীতির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, সেদিন বাংলা ভাষার মতো 'একটি অপরীক্ষিত অপরিচিত অনাদৃত অন্ধকার পথে আপন নবীন জীবনের সমস্ত আশা উদ্যম ক্ষমতাকে প্রেরণ করা কত বিশ্বাসে এবং কত সাহসের বলে হয় তাহার পরিমাণ করা সহজ নহে।'[২৬] রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশ্বাস ও সাহসের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

প্রবন্ধের শেষে রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রকে ভগীরথের সঙ্গে তুলনা ক'রে বলেছেন, '...তিনি ভগীরথের ন্যায় সাধনা করিয়া বঙ্গসাহিত্যে ভাবমন্দাকিনীর অবতারণ করিয়াছেন এবং সেই পুণ্যস্রোতস্পর্শে জড়ত্বশাপ মোচন করিয়া আমাদের প্রাচীন ভস্মরাশিকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন....ইহা ঐতিহাসিক সত্য।'[২৭]

রচনা হিসেবে এ-প্রবন্ধটির মূল্য কখনোই অস্বীকার করা যাবে না, কিন্তু একে খাঁটি সাহিত্যসমালোচনা হিসেবে গ্রহণ করার উপায় নেই। সেই কারণেই এ-প্রবন্ধের বিস্তৃত আলোচনা করার সুযোগ এখানে আমরা গ্রহণ করতে পারছি না।

এই প্রবন্ধের দু'মাস পরে সাধনায় রবীন্দ্রনাথের 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটি (১৩০১ আষাঢ়, ১৮৯৪) প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি বিহারীলালের মৃত্যুর অল্প পরে সেই উপলক্ষেই রচিত হয়েছিল। প্রবন্ধের নাম ও রচনার উপলক্ষ থেকে সহজেই মনে হতে পারে যে, এটিও 'বঙ্কিমচন্দ্র' জাতেরই প্রবন্ধ, রবীন্দ্রনাথ এখানে বিহারীলালের সাহিত্যকীর্তির একটা সামগ্রিক পরিচয়ই

২৬. র।১৩।৮৯৩

২৭. র।১৩।৮৯৯

দেবেন। কিন্তু কার্যত তিনি তা করেন নি। একটি সামগ্রিক প্রেক্ষাপট আছে বটে, কিন্তু 'সারদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থটিই এ-প্রবন্ধের মূল লক্ষ্য।

রবীন্দ্রনাথের কাছে 'সারদামঙ্গল' কাব্যগ্রন্থটির একটি বিশেষ গুরুত্ব আছে। অল্প বয়সের কাব্যগুরুর রচনা বলেই নয়, বাংলাসাহিত্যে রোমান্টিক-লিরিক্যাল ভাব-প্রেরণার অকুণ্ঠ প্রকাশ হিসেবেও। বহুকাল পরে আবার গীতিকবিতার পক্ষ নিয়ে কথা বলবার একটি জোরালো উপলক্ষ রবীন্দ্রনাথের সামনে এসে উপস্থিত হ'লো। বিহারীলালের কালের মহাকাব্যরচয়িতাদের প্রতি কটাক্ষপাতের সুযোগকে সানন্দে গ্রহণ ক'রে প্রায় পুরানো দিনের ভঙ্গীতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। বিহারীলালের কাব্যের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে তিনি লিখলেন, 'বিহারীলাল তখনকার ইংরাজিভাষায়-নব্য-শিক্ষিত কবিদিগের ন্যায় যুদ্ধ-বর্ণনাসংকুল মহাকাব্য, উদ্দীপনাপূর্ণ দেশানুরাগমূলক কবিতা লিখিলেন না এবং পুরাতন কবিদিগের ন্যায় পৌরাণিক উপাখ্যানের দিকেও গেলেন না—তিনি নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা বলিলেন।'[২৮]

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বিহারীলালের অবোধবন্ধু পত্রিকার কথা উত্থাপন করেন। তিনি বলেন, 'বঙ্গদর্শনকে যদি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের প্রভাতসূর্য বলা যায় তবে ক্ষুদ্রায়তন অবোধবন্ধুকে প্রত্যূষের শুকতারা বলা যাইতে পারে।

'সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই এবং সাহিত্যকুঞ্জে বিচিত্র কলগীত কূজিত হইয়া উঠে নাই। সেই উষালোকে কেবল একটি ভোরের পাখি সুন্দর সুমিষ্ট সুরে গান ধরিয়াছিল। সে সুর তাহার নিজের।

'ঠিক ইতিহাসের কথা বলিতে পারি না, কিন্তু আমি সেই প্রথম বাংলা কবিতায় নিজের সুর শুনিলাম।'[২৯]

'নিভৃতে বসিয়া নিজের ছন্দে নিজের মনের কথা' বলা, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 'স্বগত উক্তি', যার মধ্যে পাঠককে 'বিশ্রব্ধভাবে আপনার নিকট টানিয়া আনিবার ভাব' আছে, আধুনিক গীতিকবিতার এই হ'লো মূল কথা। রবীন্দ্রনাথ এখানে জানাচ্ছেন যে, আধুনিক গীতিকবিতার এই স্বরূপলক্ষণ

---

২৮. র।১৩।২০১

২৯. র।১৩।৯০০

বাংলাসাহিত্যে তিনি প্রথম বিহারীলালের কবিতাতেই দেখতে পেয়েছেন। বিহারীলালে সেই—

'সর্বদাই হু হু করে মন,
বিশ্ব যেন মরুর মতন ;'—

ইত্যাদি কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদধৃত ক'রে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেন, 'আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে এই প্রথম বোধ করি কবির নিজের কথা। তৎসময়ে অথবা তৎপূর্বে মাইকেলের চতুর্দশপদীতে কবির আত্মনিবেদন কখনো কখনো প্রকাশ পাইয়া থাকিবে—কিন্তু তাহা বিরল—এবং চতুর্দশপদীর সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে আত্মকথা এমন কঠিন ও সংক্ষিপ্ত হইয়া আসে যে, তাহাতে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস তেমন স্ফূর্তি পায় না।'৩০

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি প্রায় সর্বজনপরিচিত। এ-উক্তির অন্তর্নিহিত ভাবসত্যকে স্বীকার করতে বাধা নেই, কিন্তু উক্তিটি যখন ইতিহাস সম্পর্কিত, বহু-উদ্‌ধৃত এবং বক্তা যখন রবীন্দ্রনাথ, তখন কথাটার শাদা অর্থ কতোদূর গ্রহণীয় তা-ও একটু তলিয়ে দেখতে হবে। আক্ষরিক অর্থে ধরলে ঐতিহাসিক তথ্য রবীন্দ্রনাথকে এখানে সমর্থন করবে বলে' মনে হয় না।

সত্যিই কি বাংলাসাহিত্যে কবির আত্মনিবেদন, কবির প্রাণের কথা, কবির নিজের সুর বিহারীলালেই প্রথম পাওয়া গেল—আক্ষরিক অর্থে প্রথম? সাহিত্যের ক্ষেত্রে যখন ভাবের বদল হয়, বোধের বদল হয়, রুচির বদল হয়—যখন ধারার বদল হয়, তখন কখনোই তা একেবারে অকারণে হয় না, এবং সেই জন্য কখনোই তা হঠাৎ এক নিমেষে ঘটে' যায় না। এসব ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্টভাবে কাউকেই প্রথম বলে' চিহ্নিত করা যায় না। লঘুভাবে হয়তো করা যাবে, করা হয়ও, কিন্তু তার উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব দিলে ঐতিহাসিক কার্যকারণ পরম্পরার গুরুত্ব হ্রাস পায়, ব্যক্তিবিশেষ অতিশয় হয়ে দেখা দেয়। প্রথম কথাটা এখানে স্থূল ও আপেক্ষিক অর্থেই মাত্র গ্রহণীয়।

কিন্তু সেইভাবেই বা বিহারীলালকে কতোখানি প্রথম বলে' চিহ্নিত করা

৩০. রা।১৩।৯০১

যায় তা ভেবে দেখা দরকার। রামপ্রসাদ কি কমলাকান্তের শাক্ত সংগীতে —এই সব সাধক কবির আগমনী বিজয়ার গানে কোথাও কি অস্ফুটভাবেও কবির নিজের কথা শুনতে পাওয়া যায় নি? কিংবা নিধুবাবু বা শ্রীধর কথকের প্রণয়সংগীতে? এরা তো কেউ-ই রবীন্দ্রনাথের অপরিচিত নন।

আরো প্রশ্ন আছে। মধুসূদনকে রবীন্দ্রনাথ বাদ দিয়েছেন। কিন্তু সত্যিই চতুর্দশপদীর বন্ধনে বেদনার গীতোচ্ছ্বাস কখনোই স্ফূর্তি পায় না? বেদনার গীতোচ্ছ্বাস খুব স্ফূর্তি না পেলে, তাকে কি মোটেই কবির আপন-কথা বলে' গ্রহণ করা যাবে না? মধুসূদনের চতুর্দশপদীর কোনো কবিতাতেই কবির অন্তরঙ্গ স্পর্শ পাওয়া যায় না, এমন কথা কি সত্যিই জোর দিয়ে বলা যায়?

যদিও যায়ও, মধুসূদন তো কেবল মহাকাব্য আর কেবল চতুর্দশপদীই লেখেন নি, কিছু কিছু ভিন্ন ধরনের খণ্ড-কবিতাও লিখেছেন। দু'একটি খুবই সুপরিচিত। যেমন 'আত্মবিলাপ' (আশার ছলনে ভুলি) কিংবা 'বঙ্গভূমির প্রতি' (রেখো মা দাসেরে মনে)। দুই-ই বিহারীলালের সারদামঙ্গলের (১৮৭৯, রচনা আরম্ভ ১৮৭০-তে) অনেক পূর্বে রচিত হয়েছে। 'আত্মবিলাপের' রচনাকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে, 'বঙ্গভূমির প্রতি' রচিত হয়েছে ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে। মধুসূদনের এই সব কবিতায় কবির নিজের কথা, কবির নিজের সুর বেশ স্পষ্টভাবেই শোনা যায়।

তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের কথার মর্মগত সত্যকে গ্রহণ করা যায়। বিহারীলালই প্রথম উল্লেখযোগ্য বাঙালি গীতিকবি যিনি কেবল গানে নয়, কবিতাতেও—এমন কি দীর্ঘ কাব্যেও শুধু আপন-কথাই বলেছেন এবং সারা জীবন একনিষ্ঠভাবে আপন মনে কেবল আপন-কথাই বলে' গিয়েছেন।

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথের 'বিহারীলাল' প্রবন্ধটি প্রধানত সারদামঙ্গল কাব্যগ্রন্থখানি অবলম্বন ক'রে রচিত। সারদামঙ্গল অস্পষ্ট ও দুর্বোধ্য কাব্য। এ-দুর্বোধ্যতার আংশিক কারণ কবির চূড়ান্ত আত্মমগ্নতা। সারদামঙ্গলের রচয়িতা আত্মভাবে বিভোর মিস্টিক কবি। সারদামঙ্গল কাব্যখানি অবিন্যস্ত, অসংলগ্ন, ধূম্রাবয়ব। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনায় বলেছেন, 'প্রথম যখন তাহার পরিচয় পাইলাম তখন তাহার ভাষায় ভাবে

এবং সংগীতে নিরতিশয় মুগ্ধ হইতাম, অথচ তাহার আদ্যোপান্ত একটা সুসংলগ্ন অর্থ করিতে পারিতাম না।...সূর্যাস্তের সুবর্ণমণ্ডিত মেঘমালার মতো সারদামঙ্গলের সোনার শ্লোকগুলি বিবিধ রূপের আভাস দেয়, কিন্তু কোনো রূপ-কে স্থায়ীভাবে ধারণ করিয়া রাখে না, অথচ সুদূর সৌন্দর্যস্বর্গ হইতে একটি অপূর্ব পূরবী রাগিণী প্রবাহিত হইয়া অন্তরাত্মাকে ব্যাকুল করিয়া তুলিতে থাকে।'৩১

দুর্বোধ্যতা-সমস্যার সমাধানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে সারদা-মঙ্গল একটি সমগ্রকাব্য নহে, তাহাকে কতকগুলি খণ্ড কবিতার সমষ্টিরূপে দেখিলে তাহার অর্থবোধ হইতে কষ্ট হয় না। দ্বিতীয়ত, সরস্বতী সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকের মনে যেরূপ ধারণা আছে কবির সরস্বতী তাহা হইতে স্বতন্ত্র।

'কবি যে সরস্বতীর বন্দনা করিতেছেন তিনি নানা আকারে নানা ভাবে নানা লোকের নিকট উদিত হন।'৩২

সারদামঙ্গলের ভাষা ও ছন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছন্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছেন। পূর্ববর্তী কাব্য 'বঙ্গসুন্দরী'-তে কবি মিষ্টতার অনুরোধে যুক্তাক্ষর যথাসাধ্য বর্জন করেছিলেন। সেই কথা উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'কিন্তু বাংলা যে ছন্দে যুক্ত অক্ষরের স্থান হয় না সে ছন্দ আদরণীয় নহে। কারণ, ছন্দের ঝংকার এবং ধ্বনিবৈচিত্র্য যুক্ত অক্ষরের উপরেই অধিক নির্ভর করে। একে বাংলা ছন্দে স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা নাই, তার উপরে যদি যুক্ত অক্ষর বাদ পড়ে তবে ছন্দ নিতান্তই অস্থিবিহীন সুললিত শব্দপিণ্ড হইয়া পড়ে। তাহা শীঘ্রই শ্রান্তিজনক তন্দ্রাকর্ষক হইয়া উঠে, এবং হৃদয়কে আঘাতপূর্বক ক্ষুব্ধ করিয়া তুলিতে পারে না। সংস্কৃত ছন্দে যে বিচিত্র সংগীত তরঙ্গিত হইতে থাকে তাহার প্রধান কারণ স্বরের দীর্ঘহ্রস্বতা এবং যুক্ত অক্ষরের বাহুল্য। মাইকেল মধুসূদন ছন্দের এই নিগূঢ় তত্ত্বটি অবগত ছিলেন, সেই জন্য তাঁহার অমিত্রাক্ষরে এমন পরিপূর্ণ ধ্বনি এবং তরঙ্গিত গতি অনুভব করা যায়।'৩৩

৩১. র|১৩|৯০৬-৭

৩২. র|১৩|৯০৭

৩৩. র|১৩|৯০৬

বঙ্গসুন্দরী-র দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা সারদামঙ্গলে নেই। 'আর্যদর্শনে বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল' সংগীত যখন প্রথম বাহির হইল তখন ছন্দের প্রভেদ মুহূর্তেই প্রতীয়মান হইল।...'বঙ্গসুন্দরী'র ছন্দোলালিত্য অনুকরণ করা সহজ, সেই মিষ্টতা একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহার বন্ধন ছেদন করা কঠিন, কিন্তু সারদামঙ্গলের গীতিসৌন্দর্য অনুকরণসাধ্য নহে।'৩৪

প্রবন্ধের উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ হয়তো একটু উচ্ছ্বসিতই হয়ে উঠেছেন। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, প্রবন্ধটি মৃত্যু উপলক্ষে রচিত, বিশুদ্ধ সমালোচনা নয়। এখানে হৃদয়োচ্ছ্বাস অপ্রত্যাশিত নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, '...সাধারণের পরিচিত কণ্ঠস্থ শতসহস্র রচনা যখন বিনষ্ট ও বিস্মৃত হইয়া যাইবে, সারদামঙ্গল তখন লোকস্মৃতিতে প্রত্যহ উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিবে এবং কবি বিহারীলাল যশঃস্বর্গে অম্লান বরমাল্য ধারণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যের অমরগণের সহিত একাসনে বাস করিতে থাকিবেন।'৩৫—বাল্যকালের সাহিত্যগুরুর প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই শ্রদ্ধানিবেদন সংবেদনশীল পাঠককে স্পর্শ না ক'রে পারে না।

এর কয়েক মাস পরের 'সঞ্জীবচন্দ্র' প্রবন্ধটিও (সাধনা, ১৩০১ পৌষ) অনেকটা এই ধরনের লেখক-পরিচিতি জাতের রচনা। এখানেও রবীন্দ্র-নাথের মূল লক্ষ্য বিশেষ একটি রচনা: সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ'।

প্রবন্ধের আরম্ভেই রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের প্রতিভার অসম্পূর্ণতা ও অসংলগ্নতার কথা উল্লেখ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, সঞ্জীবচন্দ্রের 'প্রতিভার অভাব ছিল না, কিন্তু সেই প্রতিভাকে তিনি প্রতিষ্ঠিত করিয়া যাইতে পারেন নাই।...তাঁহার মধ্যে যে পরিমাণ ক্ষমতা ছিল সে পরিমাণ উদ্যম ছিল না।

'তাঁহার প্রতিভার ঐশ্বর্য ছিল কিন্তু গৃহিণীপনা ছিল না।...তাঁহার অপেক্ষা অল্প ক্ষমতা লইয়া অনেকে যে পরিমাণ সাহিত্যের অভাব মোচন করিয়াছেন তিনি প্রচুর ক্ষমতা সত্ত্বেও তাহা পারেন নাই।'৩৬

৩৪. তদেব

৩৫. র।১৩।৯১৬

৩৬. র।১৩।৯১৬

সঞ্জীবচন্দ্রের স্বভাবের এই শিথিলতার পরিচয় প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের 'জাল প্রতাপচাঁদ' সম্পর্কেও কিছু মন্তব্য করেছেন। এই গ্রন্থরচনাতেও সঞ্জীবচন্দ্র আপন ক্ষমতার অপব্যয়েরই নিদর্শন দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'এই ক্ষমতা যদি তিনি কোনো প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যাপারে প্রয়োগ করিতেন তবে তাহা আমাদের ক্ষণিক কৌতূহল চরিতার্থ না করিয়া স্থায়ী আনন্দের বিষয় হইত।'৩৭

সৌন্দর্যের প্রতি সঞ্জীবচন্দ্রের অকৃত্রিম অনুরাগ, সমস্ত জিনিসকে সজীব কৌতূহলের সঙ্গে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা, তাঁহার সহজ বর্ণনাভঙ্গী, অল্পকথায় ছবি প্রত্যক্ষ করানোর ক্ষমতা, উপমা-প্রয়োগের ক্ষমতা, বিশেষ ক'রে এইগুলিই রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছে। তখনকার কালের খ্যাতনামা প্রবন্ধকার, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তরঙ্গ অনুগামী, নব্যহিন্দু গোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান চন্দ্রনাথ বসু সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পর্কে আলোচনার প্রসঙ্গে একটি নতুন সৌন্দর্যতত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে আলোচনাসূত্রে চন্দ্রনাথ বসুর সৌন্দর্যতত্ত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। চন্দ্রনাথ বসু লিখেছিলেন, সঞ্জীবচন্দ্র তাঁর অসামান্য পর্যবেক্ষণ-শক্তির প্রসাদে যেখানে অপরে সৌন্দর্য দেখতে পায় না সেখানেও সৌন্দর্য আবিষ্কার করতে পেরেছেন। চন্দ্রনাথের কথার নিহিত তত্ত্বটা এই যে, সৌন্দর্য একটা স্বতন্ত্র সত্তা, তা বস্তুতেই অধিষ্ঠিত। সৌন্দর্য দর্শকসাপেক্ষ নয়, সৌন্দর্য একটা তদ্‌গত ব্যাপার। সৌন্দর্যরসিক বিষয়ের মধ্যে সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে চন্দ্রনাথের অভিমতের প্রতিবাদ ক'রে বলেছেন যে, সৌন্দর্য কোনো বস্তু-আশ্রিত বিষয়ী-নিরপেক্ষ তদ্‌গত সত্তা নয়। সৌন্দর্য আবিষ্কারের বিষয় নয়। লেখকের অনুরাগই, লেখকের কল্পনাশক্তিই বিষয়ে সৌন্দর্য-গৌরব অর্পণ করে। চন্দ্রনাথের মিশ্র ক্লাসিক্যাল সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং রবীন্দ্রনাথের অমিশ্র রোমান্টিক সৌন্দর্যতত্ত্ব যে একটি-দুটি প্রবন্ধের মধ্যে কোনো চূড়ান্ত মীমাংসায় পৌঁছুতে পারবে না তা সহজেই বোঝা যায়। এখানে শুধু এইটুকু উল্লেখ করা যায় যে, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যতত্ত্বও ঠিক এখনকার মতো বিষয়ী-সর্বস্ব রোমান্টিক সৌন্দর্যতত্ত্ব ছিল না।

৩৭. র।১৩।৯১৭

প্রবন্ধের প্রথমে রবীন্দ্রনাথ সঞ্জীবচন্দ্রের সব থেকে বড়ো ত্রুটির কথা বলেছেন : গৃহিণীপনার অভাব। তেমনি প্রবন্ধের শেষে তিনি যে-কথা বলেছেন, তা-ই বোধকরি সঞ্জীবচন্দ্রের সব থেকে বড়ো কৃতিত্বের দিক। তিনি বলেছেন, 'সঞ্জীব বালকের ন্যায় সকল জিনিস সজীব কৌতূহলের সহিত দেখিতেন এবং প্রবীণ চিত্রকরের ন্যায় তাহার প্রধান অংশগুলি নির্বাচন করিয়া লইয়া তাঁহার চিত্রকে পরিস্ফুট করিয়া তুলিতেন এবং ভাবুকের ন্যায় সকলের মধ্যেই তাঁহার নিজের হৃদয়াংশ যোগ করিয়া দিতেন।'৩৮

রবীন্দ্রনাথের 'ফুলজানি' প্রবন্ধটি (সাধনা, ১৩০১ অগ্রহায়ণ, ১৮৯৪) শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের ফুলজানি উপন্যাসের এবং 'যুগান্তর' প্রবন্ধটি (সাধনা, ১৩০১ চৈত্র, ১৮৯৫) শিবনাথ শাস্ত্রীর যুগান্তর উপন্যাসের সমালোচনা। শেষোক্ত প্রবন্ধের প্রায় এগারো বছর পরে রচিত—রবীন্দ্রনাথের সমালোচক-জীবনের শেষ সীমানার 'শুভবিবাহ' প্রবন্ধটি (বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ আষাঢ়, ১৯০৬) শরৎকুমারী চৌধুরাণীর শুভবিবাহ উপন্যাসের সমালোচনা। তিনটি উপন্যাসই অধুনা বিস্মৃতপ্রায়। তিনটিরই লেখক বা লেখিকা রবীন্দ্রনাথের অতি নিকটের লোক। শ্রীশচন্দ্র (১৮৬০) রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। শরৎকুমারী (১৮৬১) রবীন্দ্রনাথের বান্ধবীস্থানীয়া, এবং রবীন্দ্রনাথের অগ্রজতুল্য অক্ষয় চৌধুরীর পত্নী। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ আগ্রহেই শরৎ-কুমারীর উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়।৩৯ প্রকাশের তিন মাস পরেই বঙ্গদর্শনে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাটি প্রকাশিত হয়। শিবনাথও (১৮৪৭) রবীন্দ্রনাথের অগ্রজতুল্য—এবং ব্রাহ্ম সমাজের আচার্য। রবীন্দ্রনাথকৃত এই তিনটি সমালোচনাই প্রীতিস্নিগ্ধ এবং লেখকের পক্ষে উৎসাহবর্ধক। বন্ধু ও বান্ধবীর গ্রন্থের সমালোচনাকে, অর্থাৎ 'ফুলজানি' ও 'শুভবিবাহ'-কে ঈষৎ পক্ষপাত-দুষ্টও মনে হতে পারে। সে যা-ই হোক, উপন্যাস তিনটির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজে যা-ই বলুন না কেন, এর কোনোটিই ঠিক রবীন্দ্রনাথের দ্বারা সমালোচিত হবার যোগ্যতা রাখে না। সমালোচ্য বিষয়ের দৈন্যই রবীন্দ্রনাথের এই তিনটি সমালোচনা-প্রবন্ধকে কিছু-পরিমাণে মলিন ক'রে দিয়েছে।

৩৮. র।১৩।৯২২

৩৯. শরৎকুমারী চৌধুরাণী, পৃঃ ২৩, সাহিত্য সাধক চরিতমালা, ৭ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

'শুভবিবাহে'র শুরুতে কিছু শিল্পতত্ত্ব আছে। তত্ত্বটি বিষয়ের ভূমিকা। রাস্কিন যে বলেছেন, 'মহৎ আর্ট মাত্রই স্তব', এ-ভূমিকা তারই আলোচনা। এখানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, মানুষ যা ভালবাসে আর্টের দ্বারা তার স্তব করে। যা সুন্দর তা স্তবের যোগ্য। কিন্তু আর্ট কেবল সুন্দরেরই স্তব নয়, অসুন্দরেরও স্তব ; কেবল মহতেরই স্তব নয়, সাধারণেরও স্তব ; কেবল আদর্শেরই স্তব নয়, বাস্তবেরও স্তব।

এই ভূমিকা সমালোচ্য বিষয়ের সঙ্গে অর্থাৎ শুভবিবাহ উপন্যাসের সঙ্গে কী ভাবে যুক্ত তা রবীন্দ্রনাথ ব্যাখ্যা ক'রে বলেন নি। শুভবিবাহ আমাদের সুপরিচিত জীবনেব উপন্যাস, এবং বাস্তবতাধর্মী উপন্যাস। সম্ভবত এই সাধারণত্ব এবং বাস্তবতাই ভূমিকার সঙ্গে বিষয়ের যোগসূত্র।

সমালোচনা-অংশটি দীর্ঘ নয়। মূল কথা একটিই : সত্যতা, সজীবতা ও বাস্তবতা। সমালোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'এমন সজীব সত্য চিত্র বাংলা কোনো গল্পের বইয়ে আমরা দেখি নাই।'[৪০] আরো বলেছেন, '...সমস্ত গ্রন্থে কলাকৌশল বা ভাষার ছটা একেবারেই নাই, কেবল জীবন এবং সত্য আছে।'[৪১]

উপসংহারে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'রোমান্টিক উপন্যাস বাংলাসাহিত্যে আছে ; বাস্তব চিত্রের অত্যন্ত অভাব। এজন্যও এই গ্রন্থকে আমরা সাহিত্যের একটি বিশেষ লাভ বলিয়া গণ্য করিলাম।'[৪২]

ফুলজানির সমালোচনাতেও এই রকম প্রীতিমধুর অত্যুক্তির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। সমালোচনাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ দুই শ্রেণীর উপন্যাসের কথা বলেছেন : এক, শহর-চরিত্রের, দুই, পল্লীচরিত্রের। প্রথমটিতে থাকে অসাধারণ মানবপ্রকৃতির জটিল ঘটনা এবং প্রচণ্ড হৃদয়বৃত্তির সংঘর্ষ। দ্বিতীয়টিতে পাই সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক সুখদুঃখ। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'শ্রীশবাবুর ফুলজানি এই শেষোক্ত শ্রেণীর উপন্যাস। ইহার স্বচ্ছতা, সরলতা,

---

৪০. রা|১৩|৯৬০

৪১. তদেব

৪২. তদেব

ইহার ঘটনার বিরলতাই ইহার প্রধান সৌন্দর্য।'[৪৩] এই প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেছেন, 'পরিচিত সহজ সৌন্দর্যের সহিত সুন্দরভাবে সহজে পরিচয় সাধন করাইয়া দেওয়া অসামান্য ক্ষমতার কাজ ; বাংলার লেখকসম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রীশবাবুর সেই অসামান্য ক্ষমতাটি আছে...।'[৪৪]

কিন্তু, সুহৃদের উপন্যাস সম্পর্কে যতোই মুগ্ধতা থাকুক না কেন, উপন্যাসের গঠনগত ত্রুটি রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়ায় নি এবং সে বিষয়ে তিনি নীরবও থাকেন নি। তিনি ইঙ্গিত করেছেন যে, এই ত্রুটির অন্যতম কারণ পাঠককে চমৎকৃত করার প্রলোভন। অপর কারণটি আরও গুরুতর। সে হ'লো উপন্যাসের সামগ্রিক ঐক্য সম্পর্কে সচেতনতার অভাব। এই কারণেই উপন্যাসের শেষ-অংশে আকস্মিকতার চমক বড়ো হয়ে উঠেছে। অধিকতর চমক সৃষ্টির জন্য লেখক গ্রন্থশেষেও ক্ষান্ত না হয়ে 'আবার শেষকে নিঃশেষ করিতে বসিলেন।'[৪৫] ফুলের অপহরণ, সিরাজের অন্তঃপুর, পুরন্দর কর্তৃক উদ্ধার চেষ্টা, একাধিক মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে আকস্মিক ঘটনাবর্ত। রবীন্দ্রনাথ প্রশ্ন করেছেন, 'এ সমস্ত কেন? আগাগোড়া গল্পের সহিত ইহার কি যোগ? প্রথম হইতে এমন কী-সকল অনিবার্য কারণ একত্র হইয়াছিল যাহাতে গ্রন্থের এই বিচিত্র পরিণাম অবশ্যম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল।'[৪৬]

উপন্যাসের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যে অনিবার্য যোগ থাকতে হবে, সমগ্র কাহিনী যে একটি নিবিড় কার্যকারণসূত্রের দ্বারা ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, এই সচেতনতা শুধু ফর্মেরই সচেতনতা নয়, কন্টেন্ট্ ও ফর্মের ঐক্যেরও সচেতনতা। বস্তু ও রূপের সম্পর্কের নিবিড়তার দিকে দৃষ্টি দেওয়াতেই 'ফুলজানি' প্রবন্ধের গুরুত্ব।

শিবনাথের 'যুগান্তর' উপন্যাসেও রবীন্দ্রনাথ অনেক প্রশংসনীয় গুণ দেখতে পেয়েছেন, যেমন—পর্যবেক্ষণ, চরিত্রসৃষ্টি, সুরস হাস্য, সরল সহৃদয়তা। কিন্তু এই উপন্যাসটিতেও একটি গুরুত্বপূর্ণ গঠনগত ত্রুটি তাঁর নজরে পড়েছে।

৪৩. রা।১৩।৯৪৪
৪৪. রা।১৩।৯৪৭
৪৫. রা।১৩।৯৪৭
৪৬. তদেব

রবীন্দ্রনাথের কথাতেই বলি, '......লেখক বঙ্গসাহিত্যে নশিপুর-নামক আস্ত একটি* গ্রাম বসাইয়া দিয়াছেন। এই গ্রামের ক্রিয়াকর্ম আমোদ-প্রমোদ কৌতুক-উপদ্রব সুজন-দুর্জন সমস্তই পাঠকদের চিরসম্পত্তি হইয়া গিয়াছে। ...এমন সময়ে আমাদের পরমদুর্ভাগ্যবশত উপন্যাসটি অকস্মাৎ যুগান্তরে লোকান্তরে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোথায় গেল তর্কভূষণ, নশিপুর, হাঁসের দল—কোথা হইতে উপস্থিত নবীনচন্দ্র, হাতিবাগান নবরত্নসভা। গ্রন্থকারও নূতন বেশ ধারণ করিলেন। তিনি ছিলেন ঔপন্যাসিক, হইলেন ঐতিহাসিক ; ছিলেন ভাবুক, হইলেন নীতিপ্রচারক।'[৪৭]

দুটি সম্পূর্ণ পৃথক্ কাহিনীকে লেখক জোর ক'রে একসঙ্গে গেঁথে দিয়ে উপন্যাসের বস্তু ও রূপের ঐক্যকে—উপন্যাসের সমগ্রতাকে সম্পূর্ণ বিনষ্ট ক'রে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন,...'লেখক দুইখানি বহির পাতা পরস্পর উল্টাপাল্টা করিয়া দিয়া এক সঙ্গে বাঁধাইয়া দপ্তরীর অন্ন মারিয়াছেন এবং পাঠকদিগের রসভঙ্গ করিয়াছেন।'[৪৮]

'আর্যগাথা' (সাধনা, ১৩০১ অগ্রহায়ণ, ১৮৯৪), 'আষাঢ়ে' (ভারতী, ১৩০৫ অগ্রহায়ণ, ১৮৯৮) এবং 'মন্দ্র' (বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ কার্তিক, ১৯০২) তিনটি প্রবন্ধই যথাক্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের আর্যগাথা, আষাঢ়ে ও মন্দ্র, এই তিন গ্রন্থের সমালোচনা। আর্যগাথা সংগীতপুস্তক, সমালোচনাতেও রবীন্দ্রনাথ রচনাগুলির কাব্যধর্মের থেকে সংগীতধর্মের উপর বেশি জোর দিয়েছেন। বাংলা কবিতাই যে কেবল গীতিধর্মী তা নয়, বাংলা গানও যে বিশেষভাবে কাব্যধর্মী, বাংলা গান যে সংগীত ও কাব্যের পরিপূর্ণ সমন্বয়, এখানে রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে এই সত্যটির দিকেই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আষাঢ়ের অধিকাংশ কবিতাই হাস্যরসপ্রধান। কবিতাগুলির ছন্দের শিথিলতা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ কিঞ্চিৎ আপত্তি উত্থাপন করলেও, তিনি গ্রন্থকারের প্রতিভার স্বকীয়তাকে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন। মন্দ্র-কাব্যের সমালোচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। 'কাব্যে যে নয় রস আছে অনেক কবিই সেই ঈর্ষান্বিত নয়

৪৭. র।১৩।৯৪৭-৪৮

৪৮. র।১৩।৯৫০

রসকে নয় মহলে পৃথক্ করিয়া রাখেন। দ্বিজেন্দ্রলালবাবু অকুতোভয়ে এক মহলেই একত্র তাহাদের উৎসব জমাইতে বসিয়াছেন। তাঁহার কাব্যে হাস্য করুণা মাধুর্য বিস্ময় কখন্ কে কাহার গায়ে আসিয়া পড়িতেছে তাহার ঠিকানা নাই।'৪৯

রবীন্দ্রনাথের সর্বোচ্চ প্রশংসা মন্দ্রের ভাষা বিষয়ে। তিনি বলেছেন, 'দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলাভাষার একটা নূতন শক্তি আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রতিভাসম্পন্ন লেখকের সেই কাজ। ...দ্বিজেন্দ্রলালবাবু বাংলা কাব্য-ভাষার একটি বিশেষ শক্তি দেখাইয়া দিলেন। তাহা ইহার গতিশক্তি। ইহা যে কেমন দ্রুতবেগে কেমন অনায়াসে তরল হইতে গম্ভীর ভাষায়, ভাব হইতে ভাবান্তরে চলিতে পারে—ইহার গতি যে কেবলমাত্র মৃদুমন্থর আবেশভারাক্রান্ত নহে—তাহা কবি দেখাইয়াছেন।'৫০

রবীন্দ্রনাথ নানা উপলক্ষে দ্বিজেন্দ্রলালের কবিত্বশক্তির অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেও, তাঁর নাটক সম্পর্কে নীরব ছিলেন। সম্ভবত এই মৌনকে দ্বিজেন্দ্র-লাল রবীন্দ্রনাথের অসম্মতির লক্ষণ বলেই গণ্য করেছেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের সাময়িক বিরূপতার ঘটনাটি সকলেরই সুবিদিত। সেই ঘটনার প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নীরবতাকে স্মরণ করা যেতে পারে।

'রাজসিংহ' প্রবন্ধটিকে বাদ দিলে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধটিই (সাধনা, ১৩০১, মাঘ-ফাল্গুন, ১৮৯৫) বোধকরি সমালোচনা হিসেবে সব থেকে উল্লেখযোগ্য রচনা। কিন্তু সমালোচনা হ'লেও একে সাহিত্য-সমালোচনা বলা যায় না। একদিকে সমালোচ্য গ্রন্থের, অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্রের অসামান্যতা, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের সমালোচনার অসাধারণত্ব —রবীন্দ্রনাথের স্থিতপ্রজ্ঞ বিচারশীলতা এবং গভীর সংবেদনশীলতা, রবীন্দ্রনাথের তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণক্ষমতা এবং সেই সঙ্গে ব্যাপ্ত সমগ্রদৃষ্টি, রবীন্দ্র-নাথের বলিষ্ঠ স্পষ্টভাষণ এবং সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধা—সব মিলিয়ে এই প্রবন্ধটি এমন এক উচ্চতার স্তরে নিজেকে উন্নীত

৪৯. র।১৩।৯৫৭

৫০. র।১৩।৯৫৭-৫৮

করেছে যে, সাহিত্যসমালোচনা না হলেও, একে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থটি খাঁটি সাহিত্য, না ঐতিহাসিক গবেষণা, না মহাভারতের সম্পাদক-সুলভ পাঠভিত্তিক অনুসন্ধান ও বিচার—এর কোন্‌টা নির্ণয় করা কঠিন। সবেরই ধর্ম এর মধ্যে কিছু কিছু পাওয়া যাবে। সেই কারণেই এই মহাগ্রন্থের যথাযোগ্য সমালোচনা সাধারণ সাহিত্য-সমালোচকের পক্ষে বা সাধারণ ঐতিহাসিকের পক্ষে বা সাধারণ নীতিতত্ত্ববিদ্‌ দার্শনিকের পক্ষে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধ প্রমাণ করে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের এই গ্রন্থের যোগ্য সমালোচকের যে-গুণসমাহার আবশ্যক, তার সবই রবীন্দ্রনাথের আছে। সেই সঙ্গে এ-ও প্রমাণ করে যে, সমালোচক রবীন্দ্রনাথ সেই প্রায়-অকল্পনীয় যোগ্যতার অধিকারী, যে-যোগ্যতার বলে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের মনীষার সঙ্গে অবলীলাক্রমে দ্বৈরথে—হোক সশ্রদ্ধ এবং প্রীতিপূর্ণ তবু দ্বৈরথ নিঃসন্দেহে—অবতীর্ণ হওয়া যায়। যাঁর মনীষার ঔজ্জ্বল্যে এমন কি বঙ্কিম-মনীষাও স্থানে স্থানে মলিন হয়ে যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র ইতিহাস-সমালোচনাই হোক, মহাভারত-সমালোচনাই হোক, আর প্রচ্ছন্ন ধর্মতত্ত্বই হোক, তা যে রসসাহিত্য নয়, এ-বিষয়ে মতদ্বৈধ হবে না। বঙ্কিমচন্দ্র মহাভারতকে ইতিহাস হিসেবে গ্রহণ ক'রেই এবং কৃষ্ণকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে গ্রহণ ক'রেই তাঁর—কৃষ্ণচরিত্র রচনা করেছেন। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য বিশেষ বিবেচনাযোগ্য : 'বঙ্কিম, মেকলে কার্লাইল লামার্টিন্‌ থুকিদিদিস্‌ প্রভৃতি উদাহরণ দেখাইয়া মহাভারতকে কবিত্বময় ইতিহাস বলিতে চাহেন ; আমরা মহাভারতকে ঐতিহাসিক কাব্য বলিয়া গণ্য করি।'[৫১]

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা তাঁর নিজের ধারণার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ঐতিহাসিক গবেষণার পথেই অগ্রসর হয়েছেন। কিন্তু কাব্যগ্রন্থের কাব্যসমালোচনাই সম্ভব, ঐতিহাসিক গবেষণা তার বহিরঙ্গের পরিচয় দিতে পারে, তার অন্তরকে স্পর্শ করতে পারে না।

৫১. রা।১৩।৯৩১

রবীন্দ্রনাথ পরে দেখিয়েছেন যে, মহাভারতের কৃষ্ণ-চরিত্রটির মর্মগত সত্যের প্রতিই বঙ্কিমচন্দ্র অধিক আগ্রহী ছিলেন। সে ক্ষেত্রে নিছক তথ্যগত সন্ধান তাঁর উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে যথেষ্ট নয়। রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত করেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসন্ধানের অন্তর্নিহিত গূঢ় অভিপ্রায়ই শেষ পর্যন্ত তাঁকে খাঁটি তথ্যগত গবেষণার পথে অটল থাকতে দেয় নি।

মহাভারতকে কাব্য মনে করলেও, বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থকে রবীন্দ্রনাথ কাব্যসমালোচনা হিসেবে গ্রহণ করেন নি, খাঁটি ইতিহাস-সমালোচনা হিসেবেও গ্রহণ করেন নি, অনেকটা ইতিহাস-আলোচনাভিত্তিক নীতিগ্রন্থ হিসেবেই গ্রহণ করেছেন। এই কারণেই রবীন্দ্রনাথের এ প্রবন্ধ তাঁর অন্যান্য সমালোচনাপ্রবন্ধ থেকে এতো পৃথক্।

ইতিহাসই হোক, আর নীতিগ্রন্থই হোক, সহজেই মনে হবে, কৃষ্ণের চরিত্রই বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থের কেন্দ্রস্থ বিষয়, কৃষ্ণই এ-গ্রন্থের নায়ক। এইখান থেকেই রবীন্দ্রনাথের আলোচনার সূত্রপাত, এইখানেই তাঁর প্রশ্ন। প্রবন্ধের প্রায় প্রথমেই তিনি এই প্রশ্নের উত্থাপন করেছেন। সত্যিই কি বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক কৃষ্ণের সন্ধানে যাত্রা করেছেন? রবীন্দ্রনাথ তা মনে করেন না। তিনি বলেছেন, 'আমাদের মতে কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেতন চিত্তবৃত্তি। প্রথমত বঙ্কিম বুঝাইয়াছেন, জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনুবর্তী হইয়া আমরা পূজা করিব না, সতর্কতার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্তী হইয়া পূজা করিব। তাহার পরে দেখাইয়াছেন, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহাই শাস্ত্র। এই মূল ভাবটিই কৃষ্ণ-চরিত্র গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্মশক্তি, ইহাই সমস্ত গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।'[৫২]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমালোচনায় এই মূল ভাবটিকে অনুসরণ করেছেন। সেই কারণেই রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটিকে খাঁটি সাহিত্যসমালোচনা নাম দেওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথের এ প্রবন্ধ মূলত জীবনতত্ত্ব সম্পর্কিত গ্রন্থের

৫২. র।১৩।৯২৬

সমালোচনা। ঐ অবস্থায় এই প্রবন্ধটিকে বর্তমান আলোচনা-পরিধির বাইরে রাখা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

৫

একদিকে 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের অধিকাংশ প্রবন্ধ, অন্যদিকে 'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'মেঘদূত' বাদে অন্যসমস্ত প্রবন্ধ, এর মাঝখানে 'লোক-সাহিত্য' গ্রন্থের প্রবন্ধ তিনটি খানিকটা যেন সেতুর মতো। বলা দরকার, এ-সেতু বিষয়গতও নয়, ভাবগতও নয়। এ সেতু নিছক কালগত। এই কাল ১৩০১ সাল থেকে ১৩০৫ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বছর বিস্তৃত, যদিও প্রবন্ধ মাত্র তিনটি। এর অল্প আগে 'আধুনিক সাহিত্যে'র 'যুগান্তর', অল্প পরে 'প্রাচীন সাহিত্যের' বিখ্যাত প্রবন্ধ 'কাব্যের উপেক্ষিতা'। দ্বিজেন্দ্রলালের আষাঢ়ে কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা এই কালের মধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। পূর্বের বা পরের কোনো প্রবন্ধের সঙ্গেই 'লোকসাহিত্যের' প্রবন্ধত্রয়ের কোনো যোগ নেই। এদের প্রথমটির অংশ বিশেষ সাধনাতে প্রকাশিত হলেও, ভাবে রূপে বস্তুতে এরা যেন সাধনা পত্রিকারও নয়, ঈষৎ পরবর্তী নব-পর্যায়ের বঙ্গদর্শন পত্রিকারও নয়, এরা যেন আলাদা, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাসাহিত্যে যেন একটা বিচ্ছিন্ন দ্বীপখণ্ড। মাঝখানের 'কবিসংগীত' প্রবন্ধটির সম্পর্কে ততোটা না-খাটলেও, এদের প্রথম ও শেষ এই দুটি প্রবন্ধ সম্পর্কে এ-কথা পুরোপুরিই খাটে। এই দুটি প্রবন্ধ বাংলা-সাহিত্যের একটা আলাদা জগৎকে নিয়ে, আলাদা ভাবের প্রবন্ধ।

প্রবন্ধ দুটি আধুনিককে নিয়েও নয়, প্রাচীনকে নিয়েও নয়, যাকে নিয়ে সে খুব কাল-চিহ্নিত নয়। সে এই গ্রামে-গাঁথা দেশের গ্রামীণকে নিয়ে, যে গ্রামীণ চিরকালের। এরা গ্রামবাংলার সেই নিভৃত জগতের সংবাদ বহন ক'রে আনে, যে জগতের সঙ্গে পূর্ববঙ্গে বাসের কালে—পদ্মাবক্ষে বোটে বোটে ভেসে বেড়ানোর সময় রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ঘটেছিল। এ-জগতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ পতিসর কালিগ্রাম সাজাদপুরের জীবনের যে যোগ, তা কেবল ভূগোলের যোগ নয়, প্রাণের যোগ।

লোকজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ এই সময়েই বোধকরি ঘনিষ্ঠতম। এই সংযোগ রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও সাহিত্যে নানাভাবে নানা রকম ফসল ফলিয়েছে। শ্রীনিকেতন প্রতিষ্ঠা ও পল্লীসংগঠন মূলক কর্মসাধনা এরই পরিণত ফসল। সাহিত্যেও তার ফলন নানান্ জমিতে নানান্ রকমের। রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রবন্ধসমূহ, গ্রামজীবন-আশ্রিত ছোটগল্প, ছিন্নপত্রাবলী, রথযাত্রা মুক্তধারা রক্তকরবী প্রভৃতি নাটক, স্বদেশীগান, রবীন্দ্রসংগীতের সুর ও ভাবের মধ্যে লোকসংগীতের সুর ও ভাবের অনুপ্রবেশ, হয়তো নৃত্যেও, তাছাড়া ফাল্গুনীর বাউল, সর্বঘটে-উপস্থিত দাদাঠাকুর বা ঠাকুরদা, গোরা-উপন্যাস, ঘরে-বাইরে উপন্যাস, চৈতালি-ক্ষণিকা-খেয়া-ছড়ার ছবি, কাকে বাদ দেবো—অসংখ্য কবিতার সোনার ফসল—তলিয়ে দেখতে গেলে এ-তালিকা অতি দীর্ঘ। 'লোকসাহিত্য' বইখানি এই সুবৃহৎ পরিবারের একটি বিনীত সভ্য। বিনীত, কিন্তু মহার্ঘ। শুধু সাহিত্যরসিকের কাছে নয়, দেশ-সন্ধানীর কাছেও।

রবীন্দ্রনাথের লোকসাহিত্যের প্রতি বা গ্রামীণ সাহিত্যের প্রতি আকর্ষণ প্রধানত সাহিত্যরসিক হিসেবে, দেশসন্ধানী হিসেবে, রোমান্টিক হিসেবে নয়, এই কথাটি আমাদের সব সময় স্মরণ রাখতে হবে। কিন্তু কথাটাকে বোধকরি একটু ব্যাখ্যা ক'রে বলা দরকার।

আমরা জানি, রেনেশাঁসের পর থেকে দু' তিন শ' বছর—এন্‌লাইটেনমেণ্ট বা জ্ঞানদীপ্তির যুগে, ক্লাসিকপন্থী জীবনদর্শনের প্রাধান্যের কালে যে যে প্রত্যয় মানুষের কাছে খুব বিশ্বাসভাজন ও শ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছিল, যেমন—বুদ্ধির সার্বভৌমত্ব, কিংবা মানুষে মানুষে জাতিধর্মগত দেশকালগত ভেদে অনাস্থা—মৌলিক অভেদে অর্থাৎ সর্বমানবিক ঐক্যে আস্থা, অথবা শিক্ষার মূল্য, কি সভ্যতার অগ্রগতি ইত্যাদি—উনবিংশ শতকে এসে অনেকেই—বিশেষ ক'রে রোমান্টিক কবি-শিল্পীরা এই সব প্রত্যয়ের অধিকাংশের সম্পর্কেই বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। রোমান্টিকদের আস্থা—আস্থা না বলে' আবেগতপ্ত আকাঙ্ক্ষাও বলা যায়—এর বিপরীত প্রত্যয়গুলিতে। অর্থাৎ তাঁদের আস্থা সর্বমানবিক ঐক্যের বদলে বিভিন্ন দেশের বিশিষ্টতার উপরে, বিভিন্ন জাতীয়-মানসের চূড়ান্ত স্বাতন্ত্র্যে; শিক্ষা

ও সভ্যতার জটিলতা-কৃত্রিমতার বদলে আদিমে অশিক্ষিতে ও শৈশব-সারল্যে ; উন্নতি ও অগ্রগতির বদলে অতীতের সত্যযুগে প্রত্যাবর্তনে, স্বভাবে ফিরে যাওয়ায়, গ্রামীণতায় ফিরে যাওয়ায়, অরণ্যে ফিরে যাওয়ায়। বুদ্ধির আধিপত্যের বদলে হৃদয়ের আধিপত্যে, রক্তের সংস্কারে, অন্ধকার অবচেতনায়। পুনশ্চ, নগরজীবনের পরিবর্তে লোকজীবনে, নগরসংস্কৃতির পরিবর্তে লোকসংস্কৃতিতে, শহরের উচ্চসম্প্রদায়ের সাহিত্যের পরিবর্তে গ্রামের লোকসাহিত্যে।

লোকসাহিত্যের প্রতি, লোকসংস্কৃতির প্রতি রোমান্টিকদের আকুল আগ্রহের মূলে লোকসাহিত্য-লোকসংস্কৃতির স্বকীয় মূল্য ততোটা নয়, যতোটা ছিল তাঁদের নিজেদের জীবনগত উদ্বেগ, পরিবর্তিত জীবন-পরিবেশের সঙ্গে নিজেদের খাপ-খাওয়াতে না পারার উৎকণ্ঠা, উপস্থিত ও অব্যবহিত বাস্তবতার প্রতি অভিমান। লোকসংস্কৃতি যেন একটা আঁকড়ে ধরার নোঙর, একটা মানসিক অবলম্বন, বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়ার যেন একটা শ্লোগান। উনবিংশ শতকের রোমান্টিকেরা লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি দেখিয়েছেন তার মধ্যে ফাঁকি নেই। যেভাবে তাঁরা অহংকৃত সংস্কৃতিবান্ নগরবাসীর দৃষ্টি গ্রামের দিকে টেনে এনেছেন, তথাকথিত উচ্চসম্প্রদায়কে দেশের নিম্নতর কিন্তু সবিস্তৃত সংস্কৃতিধারার দিকে আগ্রহী ক'রে তুলেছেন, তার জন্য তাঁরা পরবর্তী কালের কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞতাভাজন। কিন্তু রোমান্টিকদের লোকসংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণের মধ্যে যে একটা অবৈজ্ঞানিকতার বীজও ছিল, একটা রক্ষণশীলতা এ প্রতিক্রিয়াশীলতার ভাবও ছিল, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এদেশের লোকসংস্কৃতিপ্রেমিকদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথই সর্বাগ্রগামী এবং সর্বাগ্রগণ্য। তাঁর মধ্যে রোমান্টিকতাও খুব কম নেই। তিনিও সারল্যে বিশ্বাসী, প্রকৃতিতে প্রত্যাবর্তনে—'ফিরে চল মাটির টানে'-তে আস্থাশীল। কিন্তু কোনো বিক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া, কোনো শিক্ষাবিরোধী সভ্যতাবিরোধী অগ্রগতিবিরোধী অভিমান তাঁকে লোকসংস্কৃতির অভিমুখী করে নি। এ-ব্যাপারে পাশ্চাত্য রোমান্টিকদের মতো অবৈজ্ঞানিকতা ও রক্ষণশীলতা রবীন্দ্রনাথের ছিল না।

লোকসাহিত্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব একদিকে যেমন বিশুদ্ধ সাহিত্যপ্রেমিকের মনোভাব, অন্যদিকে তেমনি লোকজীবনের সঙ্গে সংযোগ-কামীর মনোভাব। এই সংযোগকামনা যে-বিচ্ছেদের দিকে অঙ্গুলি-নির্দেশ করে সেই বিচ্ছেদটা বিশেষভাবে ঘটেছে ইংরেজি-শিক্ষার ফলে, আমাদের ভিত্তিভূমিহারা আধুনিকতার প্রসাদে। এ-সম্বন্ধে যে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সচেতন, লোকসাহিত্যের প্রত্যেকটি প্রবন্ধেই—সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গীতেই তার প্রমাণ আছে।

লোকসাহিত্যের প্রবন্ধগুলি ব্যাখ্যামূলক। ব্যাখ্যা রসপরিচয়ের কারণেও, আবার লোকজীবনের সঙ্গে নিবিড়তর পরিচয়ের অভিপ্রায়েও—সংযোগের পথ-সন্ধানের কারণেও। এই ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি যেন বিশুদ্ধ জিজ্ঞাসুর দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনা থেকে—বিশেষ ক'রে তাঁর শিক্ষা বিষয়ক রচনা থেকে মনে হয়, লোকসাহিত্য-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের কিছুটা বরং ঐতিহাসিকের দৃষ্টি, সমাজতাত্ত্বিকের দৃষ্টি। যে সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টির সমর্থন আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় পাই। এ যেন সাহিত্যরসিকের দৃষ্টির সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের দৃষ্টির মিলন। এর মধ্যে লোকসাহিত্য সম্পর্কে কোনো রকম পৌত্তলিকতার ভাব নেই।

আমরা জানি, ঊনবিংশ শতকের রোমান্টিকদের দৃষ্টি—এবং এখনকার অনেক রোমান্টিক-কল্প লোকসাহিত্যপ্রেমিকেরও দৃষ্টি স্বেচ্ছাসম্মোহিতের দৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের লোকসংস্কৃতিপ্রীতির মধ্যে কোনো রকম স্বেচ্ছাসম্মোহন কিছুমাত্র প্রশ্রয় পায় নি। জাতির প্রাণশক্তির উৎস যে লোকজীবনে, এই সচেতনতা রবীন্দ্রনাথের রচনায় অতি প্রখর। কিন্তু উচ্চতর সাহিত্যমাত্রই যে কৃত্রিম বা ব্যর্থ নয়, ইচ্ছা করলেই যে লোকসাহিত্যে ফিরে যায় না—জীবনপরিবেশের বদলে ওর-ও যে রূপান্তর গোত্রান্তর ঘটে, এ সম্পর্কেও রবীন্দ্রনাথ সমানই সচেতন। এমন নির্মোহ ইতিহাস-সচেতনতা খাঁটি রোমান্টিকের কাছে প্রত্যাশা করা যায় না।

৬

আগেই বলেছি, 'লোকসাহিত্য' (১৯০৭) মাত্র তিনটি প্রবন্ধের সমাহার। তার প্রথম প্রবন্ধ—'ছেলে ভুলানো ছড়া' দুই অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি সাধনায় 'মেয়েলি ছড়া' নামে প্রকাশিত হয় (১৩০১ ভাদ্র-আশ্বিন, ১৮৯৪)। এইটেই মূল প্রবন্ধ। দ্বিতীয় অংশ ছড়ার সংকলন, একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা সহ। এই অংশটি মাস কয়েক পরে 'ছেলে ভুলানো ছড়া' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয় (১৩০১ মাঘ, ১৮৯৫)। পরে দুই অংশই—দ্বিতীয় অংশ প্রথম অংশের অনুবৃত্তিরূপে—'লোকসাহিত্যে' গৃহীত হয়, 'ছেলেভুলানো ছড়া' নামে।

দ্বিতীয় প্রবন্ধ 'কবিসংগীত' (১৩০২) সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের বিষয় নিয়ে রচিত। পূর্বের ও পরের প্রবন্ধের বিষয়বস্তু গ্রামীণ সাহিত্য, এটি না-গ্রামীণ না-নাগরিক, বলতে পারি, আধা-নাগরিক। আরো সঠিকভাবে বললে, অপনাগরিক। গ্রামীণ সাহিত্যের যে-শাখাটা কুলত্যাগী হয়ে শহরে গিয়ে খারাপ অর্থে নাগরিক সেজেছে, এর আলোচ্য বিষয় হ'লো সেই ভ্রষ্ট শাখার সাহিত্য।

খাঁটি গ্রামীণ সাহিত্য চিরকালীন সাহিত্য, অন্তত আপেক্ষিক অর্থে। কবিসংগীত কঠিনভাবে কালচিহ্নিত, দিনের অন্তে অর্থহীন, আজ প্রায় নিঃশেষেই হারিয়ে গিয়েছে। কবিগান লোকসংগীতের অন্তর্গত নয়, তার সাহিত্যও লোকসাহিত্য নয়। 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে এ-প্রবন্ধের উপস্থিতিকে প্রায় অনধিকারপ্রবেশ বলে' গণ্য করা যায়। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গী ও রচনার সুর আগের ও পরের প্রবন্ধের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। আরো মনে রাখতে হবে যে, কবিগানের ধারাটা যতোই নাগরিক বা অপনাগরিক হোক না কেন, কবিগানের রচয়িতা ও গায়কেরা নানা অনতিপ্রচ্ছন্ন সূত্রে গ্রামজীবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। মনে রাখতে হবে, তাঁরা কেউ শহরের ইংরেজিনবিশ ছিলেন না।

তৃতীয় প্রবন্ধ 'গ্রাম্যসাহিত্য' দ্বিতীয় প্রবন্ধের তিন বছর পরে (১৩০৫) প্রকাশিত হয়েছে। আজকাল যাকে পারিভাষিক অর্থে লোকসাহিত্য বলা

হয়, ইংরেজি Folk-literatureসমার্থক শব্দ হিসেবে—অথবা আরো মূলে গেলে হার্ডার যাকে বলেছেন, Volkspoesie, তার সমার্থক শব্দ হিসেবে, রবীন্দ্রনাথ লোকসাহিত্য কথাটাকে ঠিক সেই রকম পারিভাষিক অর্থে গ্রহণ করেন নি। পারিভাষিক অর্থে ধরলে সব লোকসাহিত্যই গ্রাম্যসাহিত্য, কিন্তু সব গ্রাম্যসাহিত্যই লোকসাহিত্য নয়। রবীন্দ্রনাথ কিন্তু এই দুইকে প্রায় সমার্থক হিসেবেই ধরেছেন। আধুনিক গবেষক হয়তো কেবল প্রথম প্রবন্ধের বিষয়বস্তুকেই খাঁটি লোকসাহিত্য বলে' ধরবেন। কিন্তু নাম নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ নেই, রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ ক'রে আমরা এখানে গ্রামীণতাকেই লোকায়ত সাহিত্যের অন্যতম প্রধান লক্ষণ বলে ধরে' নেবো।

'ছেলেভুলানো ছড়া' (২) রচনার ভূমিকা-অংশে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '...ছেলে-ভুলানো ছড়ার মধ্যে যে রসটি পাওয়া যায়, তাহা শাস্ত্রোক্ত কোনো রসের অন্তর্গত নহে। সদ্যঃকর্ষণে মাটি হইতে যে সৌরভটি বাহির হয়, অথবা শিশুর নবনীত কোমল দেহের যে স্নেহোদ্বেলকর গন্ধ, তাহাকে পুষ্পচন্দন, গোলাপজল, আতর বা ধূপের সুগন্ধের সহিত একশ্রেণীতে ভুক্ত করা যায় না। সমস্ত সুগন্ধের অপেক্ষা তাহার মধ্যে যেমন একটি অপূর্ব আদিমতা আছে, ছেলেভুলানো ছড়ার মধ্যে তেমনি একটি আদিম সৌকুমার্য আছে—সেই মাধুর্যটিকে বাল্যরস নাম দেওয়া যাইতে পারে। তাহা তীব্র নহে, গাঢ় নহে, তাহা অত্যন্ত স্নিগ্ধ সরস এবং যুক্তিসংগতিহীন।'[৫৩]

এই পরিচয়ই ছেলেভুলানো ছড়ার সর্বোত্তম রসপরিচয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কেবল রসপরিচয়েই সন্তুষ্ট নন। সে-পরিচয় এই বিশেষ ক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য। রসপরিচয়ের আসল ভিত্তি এখানে ব্যাখ্যা। রবীন্দ্রনাথের আলোচনাও এখানে সেই কারণেই বিশেষভাবে ব্যাখ্যা-অভিমুখী।

'ছেলেভুলানো ছড়া' (১) প্রবন্ধে মেয়েলি ছড়া প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, শিশু যেমন চিরনবীন হয়েও চিরপুরাতন, এই ছড়াগুলিও তেমনি সাহিত্য-রাজ্যে চিরনবীন হয়েও চিরপুরাতন। এই ছড়াগুলি যেন সাহিত্যরাজ্যের শিশু। ছড়াগুলি যেন মানব-মনে আপনিই জন্মেছে। এঁরা যেন স্বপ্নের

৫৩. র।১৩।৬৮৯

মতো—আমাদের মানস-আকাশের লঘু মেঘলীলা। 'এই ছড়াগুলি আমাদের নিয়ত-পরিবর্তিত অন্তরাকাশের ছায়ামাত্র, তরল স্বচ্ছ সরোবরের উপর মেঘক্রীড়িত নভোমণ্ডলের ছায়ার মতো।'[৫৪]

কথাগুলি শুনতে কবিত্বের মতন। কিন্তু এর সবটাই নিছক কবিত্ব নয়। অথবা বলি, কবিত্ব হলেও সত্য। বিজ্ঞানে যাকে সত্য বলে, অনেকটা সেই অর্থেই সত্য। বিশেষ ক'রে ওই যে স্বপ্নের সঙ্গে সাদৃশ্য-সন্ধান, ওর মধ্যে দূরপ্রসারী মনস্তাত্ত্বিক সত্যের, নৃতাত্ত্বিক সত্যের ইঙ্গিত লুকোনো আছে। ধরে নেওয়া যায় যে, এই অন্তর্দৃষ্টি ফ্রয়েড বা ইয়ুং বা ফ্রেজার পাঠের ফল নয়। মড বড্‌কিন প্রমুখ আর্কিটাইপ পন্থীরা চমকিত হবেন, কনস্ট্যান্স রুর্কি প্রমুখ লোককথাপন্থীরা ঈর্ষা করবেন, এমন অভিনবত্ব প্রত্যাশা করলে অবশ্যই ভুল করবো। কিন্তু যে অভিনবত্ব এর মধ্যে সহজে আত্মগোপন ক'রে আছে, তাকে উপেক্ষা করলে আরো বেশি ভুল করবো। এই প্রসঙ্গে দুটো জিনিস স্মরণ রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথের উক্তি বৈজ্ঞানিকে বিবৃতি নয়, প্রথমত এবং প্রধানত একে কবির উপলব্ধি হিসেবেই দেখতে হবে। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথের এই সব লোকসাহিত্য সম্পর্কিত প্রবন্ধের রচনাকাল বিংশ শতাব্দী নয়, এদের রচনাকাল উনবিংশ শতকের শেষভাগ।

যা-ই হোক, রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধে বলেছেন যে, ছড়াগুলি বহু দূরের হারিয়ে-যাওয়া আদিম একটা জগতের টুক্‌রো টুক্‌রো ছবি, অদ্ভুত অসংলগ্ন কিন্তু গূঢ় অর্থে সত্য। ছড়াতে সংলগ্নতা নেই, কিন্তু ছবি আছে। ছবিগুলি স্বপ্নের মতো অদ্ভুত, এবং স্বপ্ন যেমন বিশ্বাসজনকতায় সত্যবৎ, তেমনি সত্যবৎ।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ছড়াগুলি যেন এক-একটা টুকরো জগৎ। সে জগৎ দূরের হয়েও অতি নিকটের। তিনি বলেছেন, 'অনেক প্রাচীন ইতিহাস প্রাচীন স্মৃতির চূর্ণ অংশ এই সকল ছড়ার মধ্যে বিক্ষিপ্ত হইয়া আছে, কোনো পুরাতত্ত্ববিৎ আর তাহাদিগকে জোড়া দিয়া এক করিতে পারেন না, কিন্তু আমাদের কল্পনা এই ভগ্নাবশেষগুলির মধ্যে সেই বিস্মৃত

৫৪. র।১৩।৬৬৭

প্রাচীন জগতের একটি সুদূর অথচ নিকট পরিচয় লাভ করিতে চেষ্টা করে।'[৫৫]

বিভিন্ন ছড়া উদ্‌ধৃত ক'রে, তার অংশবিশেষ বিশ্লিষ্ট ক'রে, ছড়া কোন্ অর্থে নতুন হয়েও পুরানো, কোন্ অর্থে স্বপ্ন হয়েও সত্যবৎ, কোন্ শক্তিতে অসংলগ্ন হয়েও অর্থবহ, সুদূর হয়েও প্রত্যক্ষ, তা রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা ক'রে দেখিয়েছেন। তারপরেই এনেছেন ছড়ার নৈকট্যের প্রশ্ন, আত্মীয়তার প্রসঙ্গ। সেই প্রসঙ্গে বলেছেন, '…প্রায় প্রত্যেক ছড়ায় প্রত্যেক তুচ্ছ কথায় বাংলা দেশের একটি মূর্তি, গ্রামের একটি সংগীত, গৃহের একটি আস্বাদ পাওয়া যায়।'[৫৬]

অনেক ছড়ায় বাঙালির সমাজজীবনের, পারিবারিক জীবনের ছায়াপাত সুস্পষ্ট। শিশু বা বালিকা কন্যার বিবাহ, অপ্রাপ্তবয়স্কা অনভিজ্ঞা কন্যার শ্বশুরবাড়ি যাত্রা, বৃদ্ধ বরের সংসার, শাশুড়ির অত্যাচার—অসংখ্য টুকরো ছবির মধ্যে দিয়ে চিরকালের গ্রামবাংলার দৈনন্দিন জীবনযাপনের চল্‌তি রূপ ফুটে উঠেছে। সব থেকে উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে শিশুর ছবি, বাঙালির ঘরের ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের ছবি। এ-সব ছবি ইতিহাসের অতীত, কালের দ্বারা অস্পৃষ্ট, তা তারা যখনি রচিত হোক না কেন। কালকের ছবিটাও চিরপুরাতনেরই ছবি।

রবীন্দ্রনাথ ঋগ্‌বেদের ইন্দ্র চন্দ্র বরুণের স্তবগানের সঙ্গে মাতৃহৃদয় থেকে উত্থিত ছোট-ছোট খোকা-খুকুর এই স্তবগুলির তুলনা ক'রে বলেছেন, 'প্রাচীনতা হিসাবে কোনোটাই ন্যূন নহে। কারণ, ছড়ার পুরাতনত্ব ঐতিহাসিক পুরাতনত্ব নহে, তাহা সহজেই পুরাতন। . তাহা আপনার আদিম সরলতাগুণে মানব-রচনার সর্বপ্রথম। সে এই উনবিংশ শতাব্দীর তীব্র মধ্যাহ্ন-রৌদ্রের মধ্যেও মানবহৃদয়ের নবীন অরুণোদয়রাগ রক্ষা করিয়া আছে।'[৫৭]

রবীন্দ্রনাথ মেয়েলি ছড়ার সরল শিশুস্তবগুলিকে বলেছেন চির-পুরাতন

৫৫. র।১৩।৬৭১

৫৬. র।১৩।৬৭৬

৫৭. র।১৩।৬৮৫

নব-বেদ। রবীন্দ্রনাথের মতে সব ছড়াতেই এই নব-বেদের ভাবটি আছে, সব ছড়াই সরলতাগুণে প্রথমতম, তারা 'সহজেই পুরাতন'—বৃদ্ধতায় নয়, বরং নিত্য নবীনতায়। সুপ্রাচীন পুরাণকথা বা মিথ্‌ যে জাতের বস্তু, রবীন্দ্রনাথের মতে ছড়াও খানিকটা সেই জাতের জিনিস। মিথ্‌ যেমন জাতির মানস-আকাশে স্বপ্নের মতো, ছড়াও খানিকটা সেই রকম, 'যেন কোন্‌ অলক্ষ্য বায়ুপ্রভাবে দৈবচালিত হইয়া কখনো সংলগ্ন কখনো বিচ্ছিন্নভাবে বিচিত্র আকার- ও বর্ণ-পরিবর্তনপূর্বক ক্রমাগত মেঘ-রচনা করিয়া বেড়াইতেছে।'৫৮

ছড়া এবং মেঘের সাদৃশ্য যে কতো গভীর, রূপে চরিত্রে ক্রিয়ায় উভয়ে যে কতো সমধর্মী, তারই ইঙ্গিতের মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধের বক্তব্য শেষ করেছেন।—

'উভয়েই পরিবর্তনশীল, বিবিধ বর্ণে রঞ্জিত, বায়ুস্রোতে যদৃচ্ছাভাসমান। দেখিয়া মনে হয় নিরর্থক। ছড়াও কলাবিচার-শাস্ত্রের বাহিরে, মেঘবিজ্ঞানও শাস্ত্রনিয়মের মধ্যে ভালো করিয়া ধরা দেয় নাই। অথচ জড়জগতে এবং মানবজগতে এই দুই উচ্ছৃঙ্খল অদ্ভুত পদার্থ চিরকাল মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিয়া আসিতেছে। মেঘ বারিধারায় নামিয়া আসিয়া শিশু-শস্যকে প্রাণদান করিতেছে এবং ছড়াগুলিও স্নেহরসে বিগলিত হইয়া কল্পনাবৃষ্টিতে শিশু-হৃদয়কে উর্বর করিয়া তুলিতেছে।'৫৯

'কবি-সংগীত' বিষয়বস্তুর কারণে নয়, লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর টানেই 'লোকসাহিত্য' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। আগেই বলেছি, কবিগান লোকসংগীত নয়। বাংলাসংস্কৃতির মধ্যযুগের অবসানকালে, নতুন-গজিয়ে-ওঠা শহরের ইতিহাসের একটি কলঙ্কিত পর্বের সঙ্গে এর সংযোগ। তখনকার হঠাৎ-বড়লোকদের নতুন নাগরিক জীবনের একটি বিশেষ আমোদ-ফূর্তির অধ্যায়ে এর উদ্‌ভব, ইংরেজ কুঠিয়ালদের প্রসাদপুষ্ট বেনিয়ান-মুৎসুদ্দি-দালাল এবং নবগঠিত ভূম্যধিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতায় এর প্রতিষ্ঠা, ইতিহাসের পর্বান্তরে এর বিলুপ্তি। পূর্বের জের হিসেবে গ্রামসংস্কৃতির প্রান্তদেশে

৫৮. র।১৩।৬৬৭

৫৯. র।১৩।৬৬৯

এখনো কবিগানের একটি অতি ক্ষীণ ধারা হয়তো টি'কে আছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কবিগানের নামে সেকালে যে শহুরে আমোদের কথা বলেছেন, তা আর আজ কোথাও নেই।

সে যা-ই হোক, কবিগান যে লোকসংগীত নয়, এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন। প্রবন্ধের সূচনাতেই তিনি বলেছেন, 'বৈষ্ণব কবিদের পদাবলী বসন্তকালের অপর্যাপ্ত পুষ্পমঞ্জরীর মতো; যেমন তাহার ভাবের সৌরভ তেমনি তাহার গঠনের সৌন্দর্য। রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলগান রাজকণ্ঠের মণিমালার মতো, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য।...এই কবির গানগুলিও গান, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেই ভাবের গাঢ়তা এবং গঠনের পারিপাট্য নাই।'৬০

ছেলেভুলানো ছড়াকে রবীন্দ্রনাথ সদ্যঃকর্ষিত মাটির সৌরভের সঙ্গে, শিশুর নবনীত-কোমল দেহের সৌরভের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কবিগানে সেই সৌরভ নেই, সেই আদিম সৌকুমার্য নেই। মৈমনসিংহ থেকে যে-সব লোকগীতিকা সংগ্রহ করা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাদের তুলনা করেছেন ধানের মঞ্জরীর সঙ্গে। বলেছেন, সে যেন মাটির পাত্রে আহারের অন্ন। এ সম্মানও কবিগানের প্রাপ্য নয়। তুলনা যদি কিছুর সঙ্গে করতেই হয়, তাহলে কবিগানকে তুলনা করতে হবে খেলো নকল গয়নার সঙ্গে যার গিল্টিটা পর্যন্ত চোখে খোঁচা মারে।

কবিগানের ভাবের অগভীরতা, গঠনের পারিপাট্যহীনতা, তার সাহিত্য-রসের দৈন্য, তার মধ্যেকার উত্তেজনার খোরাক, তার কথার কৌশল, অনুপ্রাসের আড়ম্বর, তার অশ্লীলতা ইতরতা—এর সমস্ত-কিছুর ব্যাখ্যা যে-ঐতিহাসিক দৃষ্টি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ করেছেন, এবং সেই সঙ্গে যেভাবে তিনি কবিগানের রূপ ও চরিত্রের তাৎপর্য নিরূপণ করেছেন, কবিগানের মূল্য নির্ধারণ করেছেন, তা এখন পর্যন্ত এই বিষয়ে মূল্যবান দিগ্‌দর্শনীর কাজ ক'রে থাকে।

আগেই বলেছি, এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যের ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার পথে অগ্রসর হয়েছেন। ব্যাখ্যার যৌক্তিকতা নিয়ে

৬০. র।১৩।৭১০

আমাদের কোনো প্রশ্ন নেই। আমাদের প্রশ্ন এই ব্যাখ্যার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সঙ্গতির সম্পর্কে। কথাটা একটু স্পষ্ট ক'রে বলা দরকার।—

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, কবিগান দেবতার জন্যও নয়, রাজসভার জন্যও নয়, কবিগান যাদের জন্য, তাদের চরিত্রই কবিগানের চরিত্রকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। অর্থাৎ সাহিত্যেও চাহিদা অনুযায়ীই যোগান ঘটেছে। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত কি রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বসম্মত? এখানে রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ক'রেই বলেছেন, 'পূর্বকালের গানগুলি, হয় দেবতার সম্মুখে, নয় রাজার সম্মুখে গীত হইত—সুতরাং স্বতই কবির আদর্শ অত্যন্ত দুরূহ ছিল।'[৬১] কবিগানের ক্ষেত্রে তা ছিল না। তার কারণ, 'ইংরেজের নূতনসৃষ্ট রাজধানীতে পুরাতন রাজসভা ছিল না, পুরাতন আদর্শ ছিল না। তখন কবির আশ্রয়দাতা রাজা হইল সর্বসাধারণ-নামক এক অপরিণত স্থূলায়তন ব্যক্তি, এবং সেই হঠাৎ-রাজার সভায় উপযুক্ত গান হইল কবির দলের গান। তখন যথার্থ সাহিত্যরস-আলোচনার অবসর, যোগ্যতা এবং ইচ্ছা কয়জনের ছিল? তখন নূতন রাজধানীর নূতন সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক্-সম্প্রদায় সন্ধ্যাবেলার বৈঠকে বসিয়া দুই দণ্ড আমোদ উত্তেজনা চাহিত, তাহারা সাহিত্যরস চাহিত না।

'কবির দল তাহাদের সেই অভাব পূর্ণ করিতে অবতীর্ণ হইল।'[৬২]

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বে পাই, স্রষ্টা পরিবেশের ঊর্ধ্বে, ইতিহাসের ঊর্ধ্বে, বাস্তব ঘটনাপুঞ্জ স্রষ্টাকে চালিত করতে পারে না, এমন কি স্পর্শও করতে পারে না। পরিণত বয়সেও তিনি এ বিশ্বাস ত্যাগ করেন নি। মৃত্যুর অল্পদিন পূর্বে 'সাহিত্যের স্বরূপ' বইয়ের 'সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা' প্রবন্ধে এ-বিষয়ে সন্দেহবাদীদের তর্কের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়ে বলেছেন, 'এ তর্কের মীমাংসা আমার নিজের অন্তরেই আছে, যেখানে আমি আর-কিছু নই, কেবলমাত্র কবি। যেখানে আমি সৃষ্টিকর্তা, সেখানে আমি একক, আমি মুক্ত; বাহিরের বহুতর ঘটনাপুঞ্জের দ্বারা জালবদ্ধ নই।'[৬৩]

৬১. তদেব

৬২. তদেব

৬৩. র।১৪।৫৩৬

যিনি সাহিত্যিককে ঘটনাপুঞ্জের নিয়ন্ত্রণ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে' মনে করেন, তিনি কখনো সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক কার্যকরণ-সন্ধানে বা সাহিত্যের সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় আস্থাশীল হতে পারেন না। তিনি কখনো ইঙ্গিতেও বলতে পারেন না যে, সাহিত্যেও চাহিদা অনুযায়ী যোগান ঘটে থাকে। বিস্ময়ের কথা, শুধু 'কবিসংগীত' প্রবন্ধটি নয়, বাংলাসাহিত্যে সমাজতাত্ত্বিক সাহিত্যসমালোচনা ধারার একাধিক শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ—এই ধারার প্রধান সমর্থক বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারা রচিত হয় নি, রচিত হয়েছে প্রতিবাদকারী রবীন্দ্রনাথের দ্বারা। এই প্রসঙ্গে মঙ্গলকাব্য বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন আলোচনার কথা তোলা যেতে পারে। কিছু দৃষ্টান্তের কথা পূর্বেও বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—আপত্তিও বলা যেতে পারে—রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক ব্যবহৃত 'সর্বসাধারণ' কথাটির সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, সর্বসাধারণই কবিগানের আশ্রয়দাতা। কিন্তু কথাটা কি সম্পূর্ণ সত্য? ইংরেজসৃষ্ট শহরের 'সমৃদ্ধিশালী কর্মশ্রান্ত বণিক্-সম্প্রদায়', একেই কি সর্বসাধারণ বলবো? 'শিক্ষার বিকিরণ' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যে উপমা ব্যবহার করেছেন, সেইটে ধার ক'রেই বলি, রবীন্দ্রনাথ কি 'ময়ূর বলতে বুঝলেন তার পেখমটা, হাতি বলতে তার গজদন্ত?'[৬৪] মেয়েলি ছড়া, ছেলেভুলানো ছড়া, তা-ও তো রাজসভার উদ্দেশ্যে বা দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত নয়, তার চরিত্র এমন পৃথক্ কেন? মৈমনসিংহের লোকগীতিকাও তো না দেবতার, না রাজসভার, তার চরিত্রই বা কবিগানের সঙ্গে মেলে না কেন? বুঝতে হবে, দোষটা সাধারণ অর্থে সর্বসাধারণের নয়, দোষটা কবিগানের বিশেষ পৃষ্ঠপোষকদের বিশেষ ধরনের চাহিদারই। লোকসাহিত্যের গ্রামীণ পৃষ্ঠপোষকদের সর্বসাধারণ বলা যাবে কি না জানি না, কিন্তু কবিগানের এই সব বিশেষ ধরনের শহুরে পৃষ্ঠপোষকদের যে সর্বসাধারণ বলা যায় না, এ-কথা মানতেই হবে। এখানে রবীন্দ্রনাথ 'সর্বসাধারণ' কথাটিকে অত্যন্ত বিশিষ্ট ও সীমিত অর্থে ব্যবহার করেছেন। কথাটা এখানে হীনার্থে শহরের পাব্‌লিক বোঝানোর জন্য প্রযুক্ত হয়েছে।

৬৪. র।১১।৬৯১

রবীন্দ্রনাথের এই শব্দপ্রয়োগগত ত্রুটি নিয়ে বেশি আপত্তি তুললে লাভ হবে না। সর্বসাধারণ কথাটার এই রকম সীমিত ও বিশিষ্ট অর্থে প্রয়োগের মধ্যে এমন একটি নিহিত সত্য আছে, যার তাৎপর্য আজকের দিনে বহু-বিস্তৃত। আজও শহরের পাব্‌লিকই আমাদের সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। সাধারণ বলতে আজো আমরা এই পাব্‌লিককেই বুঝে থাকি। পাব্‌লিকের পৃষ্ঠপোষকতার প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে (রা।১৩।৭১৪) রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, 'ধর্মভাবের উদ্দীপনাতেও নহে, রাজার সন্তোষের জন্যও নহে, কেবল সাধারণের অবসর-রঞ্জনের জন্য গান রচনা বর্তমান বাংলায় কবিওয়ালারাই প্রথম প্রবর্তন করেন। এখনো সাহিত্যের উপর সেই সাধারণের আধিপত্য, কিন্তু ইতিমধ্যে সাধারণের প্রকৃতি পরিবর্তন হইয়াছে। এবং সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য গভীরতা লাভ করিয়াছে।'

গভীরতা লাভ করেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে কি? পরিবর্তন ঘটেছে অবশ্যই, কিন্তু পরিবর্তনটা মৌলিক কিনা সেইটেই প্রশ্ন। মনে রাখতে হবে, এসব ক্ষেত্রে নির্বিশেষে সর্বসাধারণ বলে' কিছু নেই। যা আছে তা হ'লো বিশেষ গোষ্ঠী, বিশেষ সম্প্রদায়, বিশেষ শ্রেণী। গভীরতায় যতোই পার্থক্য থাক, সেদিনের কবিগানের পৃষ্ঠপোষক আর আজকের শহুরে পাব্‌লিকের মধ্যে শ্রেণী-লক্ষণে অনেক জায়গায় মিল পাওয়া যাবে। কবিগান যে খাঁটি আধুনিক না হয়েও, সূক্ষ্ম অর্থে অন্তত কোনো-কোনো দিক থেকে আমাদের আজকের আধুনিক সাহিত্যের পূর্বপুরুষ, দু'য়ের মধ্যে গভীরতার অনেক পার্থক্য সত্ত্বেও এ-সত্যটা একেবারে চাপা পড়ার মতো নয়। এই সত্যের গ্লানিকর দিকটি হয়তো রবীন্দ্রনাথের কালে তেমন স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। সে-যাই হোক, সম্ভবত প্রসঙ্গচ্যুতির আশঙ্কাতেই রবীন্দ্রনাথ এখানে সে-আলোচনায় অগ্রসর হন নি।

ধনতান্ত্রিক সভ্যতায়, বণিকৃতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যে ধরনের বিপুলায়তন পাব্‌লিকের সৃষ্টি হয়, নিছক আয়তনের কারণেই যাকে আমরা সর্বসাধারণ বলতে দ্বিধা করি না, সেই বিপুলায়তন পাব্‌লিকের সঙ্গে সেদিনের কবিগানের পৃষ্ঠপোষক দালাল-গোত্রের পাব্‌লিকের অন্তশ্চরিত্রে একটা মিল আছে। রবীন্দ্রনাথ কবিগানের সম্পর্কে যে-কথা বলেছেন, সীমিত

অর্থে হলেও, সে-কথা ধনতান্ত্রিক সমাজের সমস্ত সাহিত্য সম্পর্কেই অল্পবিস্তর প্রযোজ্য। চাহিদা আর যোগানের সূত্রটি এখানে বেশ অনাবৃতভাবেই ক্রিয়াশীল।

সে যা-ই হোক, কিছু সাধুবাদ যে কবিগানেরও প্রাপ্য ছিল, এ-কথা রবীন্দ্রনাথ ভোলেন নি। সেই কথা দিয়েই তিনি তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন।—

'তথাপি এই নষ্টপরমায়ু কবির দলের গান আমাদের সাহিত্য এবং সমাজের ইতিহাসের একটি অঙ্গ—এবং ইংরেজ-রাজ্যের অভ্যুদয়ে যে আধুনিক সাহিত্য রাজসভা ত্যাগ করিয়া পৌরজনসভায় আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছে এই গানগুলি তাহারই প্রথম পথপ্রদর্শক।'৬৫

আগেই বলেছি, রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্যসাহিত্য ও লোকসাহিত্য এ-দুয়ের মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য করেন নি। ভেদটা বোধকরি আপেক্ষিক। কোন্ গ্রামীণ সাহিত্য যে সম্পূর্ণভাবে লোকায়ত-চরিত্র বর্জিত, তা নিশ্চিত ক'রে বলা কঠিন। এমন কি ধর্মীয় সাহিত্য সম্পর্কেও এ-কথা বলা যায়, বিশেষ ক'রে তা যদি লৌকিক ধর্মের কাছাকাছি বস্তু হয়। বিশেষভাবে উচ্চবর্ণের অভিজাত সাহিত্য ছাড়া, গ্রামের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যেই লোকায়তচরিত্র অল্পবিস্তর মিশে থাকে।

'গ্রাম্যসাহিত্য' প্রবন্ধের গোড়ার দিকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে, পদ্মাতীরের চকাচকীর কলরবে যেমন সুর বেসুর যা-ই লাগুক না কেন, তা পদ্মাচরের গান, পদ্মাতীরের অসংখ্য প্রাণীর জীবনসম্ভোগের আনন্দধ্বনি, গ্রাম্যসংগীতও তেমনি গ্রামের মানুষের জীবনসম্ভোগের স্বাভাবিক গান। গ্রাম্যসাহিত্যের এই বিশেষত্বের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'গ্রাম্যসাহিত্যের মধ্যেও কল্পনার তান অধিক থাক্ বা না-থাক্ সেই আনন্দের সুর আছে। গ্রামবাসীরা যে জীবন প্রতিদিন ভোগ করিয়া আসিতেছে, যে কবি সেই জীবনকে ছন্দে তালে বাজাইয়া তোলে সে কবি সমস্ত গ্রামের হৃদয়কে ভাষা দান করে। পদ্মাচরের চক্রবাক-সংগীতের মতো, তাহা নিখুঁত সুরতালের অপেক্ষা রাখে না।...কল্পনার সংকীর্ণতা-দ্বারাই সে আপন

৬৫. র।১৩।৭১৪

প্রতিবেশীবর্গকে ঘনিষ্ঠসূত্রে বাঁধিতে পারিয়াছে এবং সেই কারণেই তাহার গানের মধ্যে, কল্পনাপ্রিয় একক কবির নহে, পরন্তু সমস্ত জনপদের হৃদয় কলরবে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে।'৬৬

এখানে রবীন্দ্রনাথ গ্রাম্যসাহিত্যের যে বিশেষত্বে কথা বলেছেন—একক কবির রচনা হয়েও একক কবির নয়, সমস্ত জনগোষ্ঠীর—এইটেই লোক-সাহিত্যের অন্যতম প্রধান বিশেষত্ব। রবীন্দ্রনাথকে অনুসরণ ক'রে যে-কোনো গ্রাম্যসাহিত্যকেই আমরা মাটির পাত্রে আহারের অন্নের সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

বিষয়টির আর একটা দিক আছে যার উপর রবীন্দ্রনাথ বিশেষ জোর দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতে প্রাচীন বাংলাসাহিত্যের প্রায় সবটাই—তা রাজসভার জন্যই হোক আর দেবোদ্দেশ্যেই হোক—প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাসাহিত্যের সব শাখাই গ্রাম্যসাহিত্যের সঙ্গে অল্পবিস্তর যুক্ত, সবেরই অন্তশ্চরিত্রে অল্পবিস্তর গ্রামীণতা বিদ্যমান। তিনি বলেছেন যে, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে 'নিম্নসাহিত্য এবং উচ্চসাহিত্যের মধ্যে বরাবর একটা নিবিড় যোগ আছে।'৬৭ এই সুনিবিড় সংযোগের ফলেই, রবীন্দ্রনাথের মতে, লোকসাহিত্যের ধর্ম সেকালের তথাকথিত উচ্চসাহিত্যেও কিছু পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। কথাটা রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই বলা যাক।—

'নিচের সহিত উপরের এই-যে যোগ, প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে আলোচনা করিলে ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। অন্নদামঙ্গল ও কবিকঙ্কণের কবি যদিচ রাজসভা ধনিসভার কবি, যদিচ তাঁহারা উভয়ে পণ্ডিত, সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যে বিশারদ, তথাপি দেশীয় প্রচলিত সাহিত্যকে বেশি দূর ছাড়াইয়া যাইতে পারেন নাই। অন্নদামঙ্গল ও কুমারসম্ভবের আখ্যানে প্রভেদ অল্প; কিন্তু অন্নদামঙ্গল কুমারসম্ভবের ছাঁচে গড়া হয় নাই। তাহার দেবদেবী বাংলাদেশের গ্রাম্য হরগৌরী। কবিকঙ্কণচণ্ডী, ধর্মমঙ্গল, মনসার ভাসান, সত্যপীরের কথা, সমস্তই গ্রাম্যকাহিনী অবলম্বনে রচিত। সেই গ্রাম্য ছড়াগুলির পরিচয় পাইলে তবেই ভারতচন্দ্র-মুকুন্দরাম-রচিত

৬৬. র।১৩।৭১৬

৬৭. র।১৩।৭১৭

কাব্যের যথার্থ পরিচয় পাইবার পথ হয়। রাজসভার কাব্যে ছন্দ মিল ও কাব্যকলা সুসম্পূর্ণ সন্দেহ নাই, কিন্তু গ্রাম্য ছড়াগুলির সহিত তাহার মর্মগত প্রভেদ ছিল না।'[৬৮]

তা যদি হয় তাহলে মানতে হবে যে, দেশের জনসমাজে উচ্চ ও নিম্ন স্তরের মধ্যে এই যে ব্যবধান, বাংলাসাহিত্যের অনাধুনিক পর্বে এটা খুব দুস্তর ছিল না। এই বিচ্ছেদ ইংরেজি শিক্ষা এবং আমাদের ভিত্তিভূমিহারা আধুনিকতার সৃষ্টি।

এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের সচেতনতা অতি প্রখর। বিশেষ ক'রে শিক্ষা সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রসঙ্গে এ-কথা তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন। একটু উদ্‌ধৃত করি। 'শহরবাসী একদল মানুষ এই সুযোগে শিক্ষা পেলে, মান পেলে, অর্থ পেলে; তারাই হল এন্‌লাইটেন্‌ড্‌, আলোকিত। সেই আলোর পিছনে বাকি দেশটাতে লাগল পূর্ণ গ্রহণ।...দেশের বুকে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে এত বড়ো বিচ্ছেদের ছুরি আর-কোনোদিন চালানো হয় নি, সে কথা মনে রাখতে হবে।'[৬৯] রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের সংযোগকে বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করেছেন এবং উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। তা থেকে যেন আমরা ভুল না বুঝি। ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে আনন্দের যোগ আর মাতৃভাষাকে হঠিয়ে দিয়ে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা মোটেই এক জিনিস নয়। রবীন্দ্রনাথ প্রথমটির যেমন সমর্থক, দ্বিতীয়টির তেমনি বিরোধী।

গ্রাম্যসাহিত্যকে, বিশেষত গ্রাম্য ছড়াকে বিষয়বস্তুর দিক থেকে রবীন্দ্রনাথ মোটামুটি দু'ভাগে ভাগ ক'রে নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'হরগৌরী-বিষয়ক এবং কৃষ্ণরাধা-বিষয়ক। হরগৌরী বিষয়ে বাঙালির ঘরের কথা এবং কৃষ্ণরাধা বিষয়ে বাঙালির ভাবের কথা ব্যক্ত করিতেছে। একদিকে সামাজিক দাম্পত্যবন্ধন, আর-একদিকে সমাজবন্ধনের অতীত প্রেম।'[৭০]

হরগৌরীর গানে দাম্পত্য প্রেমের বাধার কথা। সব থেকে বড়ো বাধা

৬৮. তদেব

৬৯. র।১১।৬৯১

৭০. র।১৩।৭১৮

দারিদ্র্য। দারিদ্র্যকে ঘিরেই মহত্ত্বের আদর্শ, বৈরাগ্যের আদর্শ। 'ভোলানাথ দারিদ্র্যকে অঙ্গের ভূষণ করিয়াছিলেন ; দরিদ্রসমাজের পক্ষে এমন আনন্দময় আদর্শ আর কিছুই নাই।'[৭১]

হরগৌরীর গানে স্বামীর দারিদ্র্য ছাড়াও দাম্পত্য প্রেমে আরো অনেক বাধা আছে। যেমন, স্বামীর বার্ধক্য, স্বামীর কুরূপতা, ক্ষেত্রবিশেষে স্বামীর দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, নেশাভাঙে আসক্তি, ক্ষেত্রবিশেষে আচরণে ও চরিত্রে লজ্জাকর শিথিলতা। হরগৌরীর গান এইসব ছোটো বড়ো নানা রকম বিঘ্নের উপর দাম্পত্যের বিজয়কাহিনী। শাক্ত পদকর্তাদের আগমনী ও বিজয়ার গান এরই সঙ্গে যুক্ত।

'হরগৌরীর গান যেমন সমাজের গান, রাধাকৃষ্ণের গান তেমনি সৌন্দর্যের গান।'[৭২] প্রেমের শক্তি সমাজের কাঠামোর মধ্যে এক রূপে প্রকাশ পায়, সমাজের বাইরে সেই শক্তি সম্পূর্ণ আর-এক রূপে নিজেকে প্রকাশিত করে। এই দ্বিতীয় রূপটি অনেক সময় অধ্যাত্মশক্তির রূপক হিসেবেও গৃহীত হয়েছে। এই প্রেম একদিকে যেমন উন্মত্ত, অন্যদিকে তেমনি বিরহ-চিহ্নিত। কী ভগবৎ-বিরহ, কী দয়িত-বিরহ, কী আত্ম-বিরহ, মানুষের সমস্ত বিরহের কাব্যই এই প্রেমকে অবলম্বন ক'রে রচিত হয়েছে। বাংলা-সাহিত্যে এই প্রেমের সার্থক রূপায়ণ বৈষ্ণব পদাবলীতে। 'হরগৌরীর কথায় দাম্পত্যবন্ধনে যেমন কতকগুলি বাধা বর্ণিত হইয়াছে, বৈষ্ণব গাথার প্রেমপ্রবাহেও তেমনি একমাত্র প্রবল বাধার উল্লেখ আছে, তাহা সমাজ। তাহা একাই সহস্র। বৈষ্ণব পদাবলীতে সেই সমাজবাধার চতুর্দিকে প্রেমের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে।'[৭৩]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, হরগৌরীর কথা আমাদের ঘরের কথা। নানা কারণে হরগৌরীর গান ও ছড়া বাস্তব ভাবের। সেগুলি রচয়িতা ও শ্রোতাদের একান্ত নিজেদের কথা। এই ঘরোয়া ভাবটি রাধাকৃষ্ণের ছড়ায় নেই, থাকার কথাও নয়। 'রাধাকৃষ্ণ সম্বন্ধীয় ছড়াগুলির জাতি স্বতন্ত্র। সেখানে

৭১. তদেব

৭২. র।১৩।৭১৯

৭৩, র।১৩।৭২০

বাস্তবিকতার কোঠা পার হইয়া মানসিকতার মধ্যে উত্তীর্ণ হইতে হয়। প্রাত্যহিক ঘটনা, সাংসারিক ব্যাপার, সামাজিক রহস্য সেখানে স্থান পায় না। সেই অপরূপ রাখালের রাজ্য বাঙালি ছড়া-রচয়িতা ও শ্রোতাদের মানসরাজ্য।'[৭৪]

কৃষ্ণরাধার প্রেমের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'কৃষ্ণরাধার বিরহ মিলন সমস্ত বিশ্ববাসীর বিরহ মিলনের আদর্শ; ইহার মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মণসমাজ বা মনুসংহিতা নাই; ইহার আগাগোড়া রাখালি কাণ্ড।... আমাদের দেশে, যেখানে কর্মবিভাগ শাস্ত্রশাসন এবং সামাজিক উচ্চনীচতার ভাব সাধারণের মনে এমন দৃঢ় বদ্ধমূল, সেখানে কৃষ্ণরাধার কাহিনীতে এই প্রকার আচার-বিরুদ্ধ বন্ধনবিহীন ভাবের স্বাধীনতা যে কত বিস্ময়কর তাহা চিরাভ্যাসক্রমে আমরা অনুভব করি না।'[৭৫]

বাংলাদেশে হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথা ছাড়াও রামসীতা ও রামরাবণের কথাও পাওয়া যায়, কিন্তু তুলনায় অনেক কম। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এ কথা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমে, যেখানে রামায়ণ-কথাই সাধারণের মধ্যে বহুল পরিমাণে প্রচলিত সেখানে বাংলা অপেক্ষা পৌরুষের চর্চা অধিক।' এর কোন্‌টা কার্য কোনটা কারণ, রামায়ণ-কথার প্রতি আদরের ফলেই পৌরুষ বৃদ্ধি পেয়েছে, না পৌরুষের প্রবলতাই তাদের রামায়ণ-কথার প্রতি অনুরাগী ক'রে তুলেছে, রবীন্দ্রনাথ এখানে সে তর্কে প্রবেশ করেন নি। কথা থেকে মনে হয়, প্রথমোক্ত বিকল্পটিই তিনি এখানে গ্রহণ করেছেন। ঈষৎ ক্ষোভের সঙ্গে তিনি বলেছেন, 'আমাদের দেশে হরগৌরী-কথায় স্ত্রী-পুরুষ এবং রাধাকৃষ্ণ-কথায় নায়ক-নায়িকার সম্বন্ধ নানারূপে বর্ণিত হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রসর সংকীর্ণ, তাহাতে সর্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্বের খাদ্য পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে রাধাকৃষ্ণের কথায় সৌন্দর্যবৃত্তি এবং হরগৌরীর কথায় হৃদয়বৃত্তির চর্চা হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে ধর্মপ্রবৃত্তির অবতারণা হয় নাই। তাহাতে বীরত্ব, মহত্ত্ব, অবিচলিত ভক্তি ও কঠোর ত্যাগস্বীকারের আদর্শ নাই।'[৭৬]

৭৪. র।১৩।৭২৯

৭৫. র।১৩।৭৩১

৭৬. র।১৩।৭৩৩

রবীন্দ্রনাথের মতে, 'রামসীতার দাম্পত্য আমাদের দেশপ্রচলিত হর-গৌরীর দাম্পত্য অপেক্ষা বহুতরগুণে শ্রেষ্ঠ, উন্নত এবং বিশুদ্ধ ; তাহা যেমন কঠোর গম্ভীর তেমনি স্নিগ্ধ কোমল। রামায়ণ-কথায় এক দিকে কর্তব্যের দুরূহ কাঠিন্য, অপর দিকে ভাবের অপরিসীম মাধুর্য, একত্র সম্মিলিত। ...বাংলাদেশের মাটিতে সেই রামায়ণকথা হরগৌরী ও রাধাকৃষ্ণের কথার উপর যে মাথা তুলিয়া উঠিতে পারে নাই তাহা আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য। রামকে যাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে ও কর্মক্ষেত্রে নরদেবতার আদর্শ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে তাহাদের পৌরুষ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও ধর্মপরতার আদর্শ আমাদের অপেক্ষা উচ্চতর।'৭৭

সেই মুলতুবী প্রশ্নে ফিরে আসা যাক্ঃ কোন্‌টা আগে—আমাদের জীবনের দৈন্য, না আমাদের সাহিত্যের দৈন্য। রবীন্দ্রনাথ এখানে সাহিত্যের দৈন্যকেই কারণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন, এবং তারই জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করছেন। কিন্তু কবিগানের প্রসঙ্গে দেখেছি, সেখানে তিনি জীবনপরিবেশের উপরেই বেশি জোর দিয়েছেন। বলেছেন, কবিগানের দৈন্যের মূলে রয়েছে সেদিনকার শহরের জীবনপরিবেশের দৈন্য। তাহলে, কোন্‌টা রবীন্দ্রনাথের আসল অভিমত—জীবনই সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, না সাহিত্যই জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে ?

অনুমান করি, দুটোই। জীবন ও সাহিত্যের সম্পর্কটা পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের। অন্তত, রবীন্দ্রনাথের সমালোচনাপ্রবন্ধ থেকে তাই মনে হয়। কিন্তু সাহিত্যতাত্ত্বিক রবীন্দ্রনাথকে জিজ্ঞাসা করলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের উত্তর পাবো। সাহিত্য যে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে তা হয়তো তিনি মানবেন। কারণ তাতে সাহিত্যের স্বাধিকার, সাহিত্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয় না। কিন্তু জীবনও যে সাহিত্যকে নিয়ন্ত্রিত করে, তা তিনি মানবেন না। মানলে সাহিত্যের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হয়।

৭৭. র।১৩।৭৩৩-৩৪

৭

'প্রাচীন সাহিত্য' বইটির (১৯০৭) মোট সাতটি প্রবন্ধের একটির আলোচ্য বিষয় হ'লো 'ধম্মপদং' নামে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ। এ প্রবন্ধটিকে সাহিত্যসমালোচনা বলে' গণ্য করা যাবে না। এমন কি সমালোচনা বলেও গণ্য করা যাবে না। বাকি ছয়টি প্রবন্ধের প্রত্যেকটিই প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের আলোচনা। একটি বাদে অপর সবগুলিরই রচনাকাল কাছাকাছি উনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকে বিংশ শতকে প্রথম দশক। ব্যতিক্রম কেবল 'মেঘদূত'। এর চরিত্রও স্বতন্ত্র, রচনাকালও বহু পূর্ববর্তী। আগেই বলেছি, 'মেঘদূত' প্রবন্ধটি তার কাছাকাছি কালের 'মানসী'র 'মেঘদূত' কবিতার দোসরস্থানীয়।

'মেঘদূত'-কেও যদি বাদ দিই, তাহলে বাকি থাকে পাঁচটি প্রবন্ধ। এদের দুই আর তিন, এই রকম দুই গুচ্ছে ভাগ ক'রে নেওয়া যায়। এ-ভাগ কালের দিক থেকেও সত্য, স্বভাবের দিক থেকেও সত্য। প্রথম ভাগে 'কাদম্বরী চিত্র' (প্রদীপ, ১৩০৬ মাঘ, ১৯০০) এবং 'কাব্যের উপেক্ষিতা' (ভারতী, ১৩০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৯০০)। আর দ্বিতীয় ভাগে পড়বে 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা, (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ পৌষ), 'শকুন্তলা' (বঙ্গদর্শন, ১৩০৯ আশ্বিন, ১৯০২) এবং 'রামায়ণ' (১৩১০ পৌষ)।

প্রথম গুচ্ছের প্রবন্ধ দুটি, অর্থাৎ 'কাদম্বরী চিত্র' ও 'কাব্যের উপেক্ষিতা' রচনাকালের দিক থেকে 'কথা ও কাহিনী', 'কল্পনা' ও 'ক্ষণিকা' এই তিন কাব্যের সন্নিকটবর্তী। সমালোচনা জাতীয় বস্তু হলেও এই তিন কাব্যগ্রন্থের সঙ্গে এদের ভাব রূপ ও মেজাজের মিল লক্ষ করা যাবে। প্রবন্ধ দুটির নিজেদের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে, কিন্তু মেজাজের প্রকাণ্ড মিল এই যে, কোনোটিই নৈতিক সমালোচনা নয়, দুটিই মুক্ত মনের সমালোচনা, আদর্শবিশেষের চাপের দ্বারা কোনোটিই ভারাক্রান্ত নয়।

দ্বিতীয় গুচ্ছের প্রবন্ধ তিনটি অপেক্ষাকৃত পরের রচনা। এদের কাছাকাছি কালে রচিত 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থের (১৯০১) সনেটগুলির সঙ্গে এদের ভাবগত মিল সুগভীর। তিনটি প্রবন্ধের মধ্যেই নৈতিকতার সুর প্রবল।

প্রাচীন ভারতের মহৎ আদর্শের প্রতি প্রথমাবধিই এরা এতো ভক্তিপরায়ণ, সেই আদর্শের ব্যাখ্যানে এরা এতো মুখর যে, বিশুদ্ধ সাহিত্যরসের দিকে এদের দৃষ্টি নেই, সাহিত্যিক মূল্যায়নে এদের উৎসাহ নেই। তিনটি প্রবন্ধেরই অব্যবহিত লক্ষ্য ব্যাখ্যা, কিন্তু তিন ক্ষেত্রেই ব্যাখ্যার লক্ষ্য পথ-সন্ধান, আদর্শ-প্রতিষ্ঠা, আদর্শ-প্রচার। এ-ব্যাখ্যাকে যদি কেউ সাহিত্য-ব্যাখ্যা না বলে' আদর্শ-ব্যাখ্যা বা নীতিতত্ত্বের ব্যাখ্যা বলেন, খুব দোষ দেওয়া যায় না।

'প্রাচীন সাহিত্যে'র 'মেঘদূত' প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের অন্যান্য রচনার সঙ্গে ওর যোগ অতি শিথিল। 'ধম্মপদং' আমাদের বিষয়-পরিধির বাইরে। এখন প্রথমে প্রথম গুচ্ছ, অর্থাৎ 'কাদম্বরী চিত্র' ও 'কাব্যের উপেক্ষিতা', তারপরে দ্বিতীয় গুচ্ছের আলোচনা।

বিচ্ছিন্ন ও সংক্ষিপ্ত 'মেঘদূত'-কে বাদ দিলে, রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত 'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধ (১৯০০) থেকেই। প্রবন্ধটির একটি উপলক্ষ আছে। বাণভট্টের কাদম্বরী গদ্যকাব্যকে, তার আরম্ভের দৃশ্যকে বিষয় ক'রে প্রদীপ পত্রিকায় শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের একটি ছবি প্রকাশিত হয়। পত্রিকার সম্পাদক কর্তৃক অনুরুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ এই ছবির একটি সমালোচনা লেখেন। এই সমালোচনাই 'কাদম্বরী চিত্র'। অর্থাৎ 'কাদম্বরী চিত্র' মূলত সাহিত্যসমালোচনা নয়, চিত্রসমালোচনা। তা হলেও তার মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক মূল্যবান মন্তব্য পাওয়া যাবে। তা ছাড়া, এই প্রবন্ধের সূত্র ধ'রেই রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্য-আলোচনার ভিতরের কোঠায় গিয়ে প্রবেশ করেন।

'কাদম্বরী চিত্র' প্রবন্ধের একটা মূল্যবান দিক হ'লো সংস্কৃত ভাষা সম্পর্কে —এবং সেই সূত্রে সাহিত্যের ভাষা সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক আলোচনা। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য যেমন দুঃসাহসী তেমনি সুচিন্তিত—ভাষা-ব্যাপারটির সম্পর্কে সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'সংস্কৃত ভাষা কথ্য ভাষা ছিল না বলিয়াই সে ভাষায় ভারতবর্ষের সমস্ত হৃদয়ের কথা

সম্পূর্ণ করিয়া বলা হয় নাই। ইংরেজি অলংকারে যে শ্রেণীর কবিতাকে lyrics বলে তাহা মৃত ভাষায় সম্ভব না। কালিদাসের বিক্রমোর্বশীতে যে সংস্কৃত গান আছে তাহাতেও গানের লঘুতা সরলতা ও অনির্বচনীয় মাধুর্যটুকু পাওয়া যায় না।...

'মৃত ভাষায়, পরের ভাষায় গল্পও চলে না; কারণ, গল্পে লঘুতা ও গতিবেগ আবশ্যক। ভাষা যখন ভাসাইয়া লইয়া যায় না, ভাষাকে যখন ভারের মতো বহন করিতে হয়, তখন তাহাতে গান এবং গল্প সম্ভব হয় না।'৭৮

কাদম্বরী যেহেতু গদ্যে রচিত, সেই কারণে রবীন্দ্রনাথ এখানে সংস্কৃত গদ্যের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। গদ্যের কথায় তিনি বলেছেন, 'দুর্ভাগ্য-ক্রমে সংস্কৃত গদ্য সর্বদা-ব্যবহারের জন্য নিযুক্ত ছিল না, সেই জন্য বাহুশোভার বাহুল্য তাহার অল্প নহে। মেদস্ফীত বিলাসীর ন্যায় তাহার সমাসবহুল বিপুলায়তন দেখিয়া সহজেই বোধ হয় সর্বদা চলাফেরার জন্য সে হয় নাই; বড়ো বড়ো টীকাকার ভাষ্যকার পণ্ডিত বাহকগণ তাহাকে কাঁধে করিয়া না চলিলে তাহার চলা অসাধ্য। অচল হোক, কিন্তু কিরীটে কুণ্ডলে কঙ্কণে কণ্ঠমালায় সে রাজার মতো বিরাজ করিতে থাকে।'৭৯

এর পর এ বিষয়ে মন্তব্য অনাবশ্যক। শুধু এইটুকু বলা যেতে পারে যে, এ-রকম নির্মোহ ও নির্মম উক্তি দ্বিতীয় গুচ্ছের কোনো প্রবন্ধে কল্পনা করা যায় না।

রবীন্দ্রনাথের মতে কাদম্বরীর সব থেকে প্রশংসনীয় দিক হ'লো বাণভট্টের চিত্ররচনানৈপুণ্য, ভাষায় বর্ণ-সৌন্দর্যবিকাশের ক্ষমতা। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, 'কিন্তু কাদম্বরীর বিশেষ মাহাত্ম্য এই ভাষা ও ভাবের বিশাল বিস্তার রক্ষা করিয়াও তাহার চিত্রগুলি জাগিয়া উঠিয়াছে।'৮০

বাণভট্টের অপরূপ চিত্রাঙ্কনের অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। শেষ উক্তিও এই কথারই অনুবৃত্তি। 'সংস্কৃত

৭৮. র।১৩।৬৩২ (৩২)
৭৯. র।১৩।৬৬২ (৩৩)
৮০. র।১৩।৬৬২ (৩৫)

কবিদের মধ্যে চিত্রাঙ্কণে বাণভট্টের সমতুল্য কেহ নাই…। সমস্ত কাদম্বরী কাব্য একটি চিত্রশালা।…গল্প গতিশীল নহে, তাহা বর্ণচ্ছটায় অঙ্কিত। চিত্রগুলিও যে ঘনসংলগ্ন ধারাবাহিক তাহা নহে, এক-একটি ছবির চারিদিকে প্রচুর কারুকার্য-বিশিষ্ট বহুবিস্তৃত ভাষার সোনার ফ্রেম দেওয়া—ফ্রেম-সমেত ছবিগুলির সৌন্দর্য-আস্বাদনে যে বঞ্চিত সে দুর্ভাগ্য।'[৮১]

কাদম্বরীর সাহিত্যসমালোচনা এখানে যৎসামান্যই পাওয়া যাবে। এই অভাব খানিকটা দূর হয়েছে পরবর্তী প্রবন্ধ 'কাব্যের উপেক্ষিতা'-তে (১৯০০)। দুই প্রবন্ধের যোগসূত্র কাদম্বরীকাব্যের পত্রলেখা।

'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধটি খাঁটি সমালোচনা কি না, তা নিয়ে তর্ক থাকতে পারে, কিন্তু এটি যে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যবিষয়ক রচনাসমূহের শ্রেষ্ঠতমের একটি, এ-বিষয়ে কোনো তর্ক নেই। পত্রলেখা-অংশটি বাদ দিলে, এর মধ্যে সাহিত্যবিচার গৌণ, নব-সৃজনই মুখ্য। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে ব্যাখ্যা, বিচার রসপরিচয় তিনেরই সাক্ষাৎ পাবো। সৃজনশীল সমালোচনাকে সমালোচনা বলে' মানলে, একে সমালোচনা না বলার কোনো কারণ নেই। 'মেঘদূতের'র তুলনায় এর সমালোচনা-লক্ষণ অনেক জোরালো। 'মেঘদূত'-কে সমালোচনা বলে' মানলে, এর সম্পর্কে প্রশ্নই উঠতে পারে না।

'মেঘদূত' ও 'কাব্যের উপেক্ষিতা' দুই-ই সৃজনশীল, কিন্তু দু'য়ের মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। 'মেঘদূতে'র ক্ষেত্রে সৃজন ঘটেছে ভাবের পথে, ব্যঞ্জনার পথে, সংকেতের পথে। অর্থাৎ 'মেঘদূতে'র সৃজন কাব্যধর্মী সৃজন। 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র ক্ষেত্রে সৃজন ঘটেছে কাহিনীর পথে, চরিত্র-চিত্রণের পথে, আখ্যানে-বিধৃত পাত্রপাত্রীর সুখদুঃখের পথে। অর্থাৎ 'কাব্যের উপেক্ষিতা'র সৃজন কথাসাহিত্যধর্মী সৃজন, উপন্যাসধর্মী সৃজন। বলতে পারি, 'মেঘদূত' কবি-সমালোচকের সমালোচনা, আর 'কাব্যের উপেক্ষিতা' কথা-সাহিত্যিক-সমালোচকের সমালোচনা।

আরো একটা পার্থক্য আছে। 'মেঘদূত' আগাগোড়া লিরিক্যাল, বিচার যা তা যাত্রারম্ভের পূর্বেই ঘটে গিয়েছে, রচনার মধ্যে বিচারের

৮১, র।১৩।৬৬২ (৩৮)

বাষ্পমাত্রও নেই। 'কাব্যের উপেক্ষিতা' সৃজনশীল হলেও আগাগোড়াই বিচারপ্রবণ, লেখক সংস্কৃত সাহিত্যের তিন মহারথীর সঙ্গে সারা পথ তর্ক করতে করতে, অভিযোগ করতে করতে, মামলা করতে করতে এবং রায় দিতে দিতে অগ্রসর হয়েছেন।

'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃত সাহিত্যের তিনটি মহৎ কীর্তির দোষদর্শন ও ত্রুটিসংশোধন করেছেন—অন্তত আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হবে। কীর্তি তিনটির একটি বাল্মীকির রামায়ণ মহাকাব্য, আর-একটি কালিদাসের শকুন্তলা নাটক, তৃতীয়টি বাণভট্টের কাদম্বরী গদ্যকাব্য। রবীন্দ্রনাথ অভিযোগ করেছেন যে, তিন ক্ষেত্রেই মূল লেখক তাঁদের রচনায় কোনো-না-কোনো সম্ভাবনাপূর্ণ নারীচরিত্রের প্রতি অযৌক্তিক অবহেলা দেখিয়েছেন। রামায়ণে ঊর্মিলা অবহেলিতা, শকুন্তলা-নাটকে উপেক্ষিতা অনসূয়া ও প্রিয়ংবদা আর কাদম্বরীতে উপেক্ষিতা পত্রলেখা।

রবীন্দ্রনাথ ঊর্মিলার কথা দিয়ে আরম্ভ করেছেন।—

'তরুণশুভ্র ভালে যেদিন প্রথম সিন্দূরবিন্দুটি পরিয়াছিলেন, ঊর্মিলা চিরদিনই সেই দিনকার নববধূ। কিন্তু রামের অভিষেক-মঙ্গলাচরণের আয়োজনে যেদিন অন্তঃপুরিকাগণ ব্যাপৃত ছিল সেদিন এই বধূটিও কি সীমন্তের উপর অর্ধাবগুণ্ঠন টানিয়া রঘুকুললক্ষ্মীদের সহিত প্রসন্নকল্যাণমুখে মাঙ্গল্যরচনায় নিরতিশয় ব্যস্ত ছিল না! আর যেদিন অযোধ্যা অন্ধকার করিয়া দুই কিশোর রাজভ্রাতা সীতাদেবীকে সঙ্গে লইয়া তপস্বীবেশে পথে বাহির হইলেন সেদিন বধূ ঊর্মিলা রাজহর্ম্যের কোন্ নিভৃত শয়নকক্ষে ধূলিশয্যায় বৃন্তচ্যুত মুকুলটির মতো লুণ্ঠিত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা কি কেহ জানে! সে-দিনকার সেই বিশ্বব্যাপী বিলাপের মধ্যে এই বিদীর্যমান ক্ষুদ্র কোমল হৃদয়ের অসহ্য শোক কে দেখিয়াছিল!' —এই পর্যন্ত গেল সৃজনধর্মী বর্ণনাত্মক সমালোচনা। কিন্তু এর পরের বাক্যটিই একেবারে ভিন্ন জাতের। 'যে ঋষিকবি ক্রৌঞ্চবিরহিণীর বৈধব্যদুঃখ মুহূর্তের জন্য সহ্য করিতে পারেন নাই তিনিও একবার চাহিয়া দেখিলেন না।'[৮২]

৮২. র।১৩।৬৬২ (৩৯-৪০)

উদ্‌ধৃতির শেষের বাক্যটিতেই রবীন্দ্রনাথের অভিযোগটি স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হয়েছে। প্রবন্ধের প্রথমেই তিনি এর আভাস দিয়ে রেখেছেন: 'হায় অব্যক্তবেদনা দেবী ঊর্মিলা, তুমি প্রত্যুষের তারার মতো মহাকাব্যের সুমেরুশিখরে একবার মাত্র উদিত হইয়াছিলে, তার পরে অরুণালোকে আর তোমাকে দেখা গেল না। কোথায় তোমার উদয়াচল, কোথায় তোমার অস্তশিখরী, তাহা প্রশ্ন করিতেও সকলে বিস্মৃত হইল।'৮৩

পাঠকের এই বিস্মরণ স্বাভাবিকভাবে ঘটে নি, বাল্মীকির পক্ষপাতের কারণেই ঘটেছে। '...সীতার জন্য ঊর্মিলার যে আত্মবিলোপ তাহা কেবল সংসারে নহে, কাব্যেও।'৮৪ সংসারে যে ঊর্মিলার আত্মবিলোপ, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কোনো প্রশ্ন নেই। রবীন্দ্রনাথের প্রশ্ন কাব্যে ঊর্মিলার যে-বিলুপ্তি বাল্মীকি নিজে ঘটিয়েছেন, তার সম্পর্কে। '...ঊর্মিলা নিজের চেয়ে অধিক নিজের স্বামীকে দান করিয়াছিল, সে কথা কাব্যে লেখা হইল না। সীতার অশ্রুজলে ঊর্মিলা একেবারে মুছিয়া গেল।'৮৫

যে চিরদিনকার নববধূ ঊর্মিলার কথা রবীন্দ্রনাথ আমাদের শোনালেন সে কার সৃষ্টি—বাল্মীকির, না রবীন্দ্রনাথের? অভিষেকের দিনে অযোধ্যার অন্তঃপুরে মাঙ্গল্যরচনায় ব্যস্ত যে-মেয়েটির ছবি আমাদের মনের সামনে ফুটে উঠলো, সে মেয়ের ছবিটি কার আঁকা—বাল্মীকির, না রবীন্দ্রনাথের? দুই কিশোর রাজভ্রাতা যেদিন সীতাদেবীকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যা ত্যাগ করলো, সেদিন যে-ঊর্মিলা নিভৃত শয়নকক্ষে বৃন্তচ্যুত মুকুলটির মতো লুণ্ঠিত, সে কোন্ ঊর্মিলা? এ কি বাল্মীকির রামায়ণেরই ঊর্মিলা? বাল্মীকি কি এই ঊর্মিলাকেই উপেক্ষা করেছেন? উপেক্ষা যে করবেন, একে পেলেন কোথায়? এই দিব্যরূপিনী এতোদিন কোথায় ছিল? আমরা জানি, কাব্য কবির মায়া-সৃষ্টি, কাব্যের নায়ক-নায়িকা কবির মায়াসৃষ্টি। ব্যক্ত-বেদনা সীতা বাল্মীকির মায়াসৃষ্টি। বাল্মীকির মায়াসৃজনের পরিধির মধ্যে নামমাত্র-ঊর্মিলা আছে, কিন্তু কোনো অব্যক্তবেদনা চিরনববধূ নেই। যে-অব্যক্তবেদনা ঊর্মিলাকে

৮৩. র।১৩।৬৬২ (৩৮)

৮৪. র।১৩।৬৬২ (৪০)

৮৫. তদেব

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্ত করলেন, এখন সে সীতাদেবীর মতোই সত্য, রবীন্দ্রনাথের অঙ্গুলিনির্দেশের পূর্বে সে কোথাও ছিল না, সে রবীন্দ্রনাথের মায়া-সৃষ্টি, কেবল অঙ্গুলিনির্দেশের মায়ামন্ত্রে সে শরীরিণী হয়ে উঠেছে।

কবির মায়াসৃষ্টিটুকুই কবির কাব্য, তার বাইরে যাবার অধিকার সমালোচকের নেই। কবি যা দেন নি, দিলে দিতে পারতেন, তা নিয়ে অভিযোগ কেবল তখনই করা যায়, যখন তা না-দেওয়ার দরুন কাব্যের ক্ষতি হয়েছে, দিলে কাব্যের উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেতো। যা থাকলে কাব্যের সামগ্রিক ঐক্যের নিটোলতায় ফাটল ধরে, তার উপস্থিতি অনধিকার-প্রবেশ। সেই কারণে সীতা-কাব্যে উর্মিলার অতলস্পর্শ বেদনার প্রবেশ-অধিকার নেই। সীতা-কাব্যের সীতার অশ্রুজলে উর্মিলার মুছে যাওয়াই স্বাভাবিক, ঠিক যেমন উর্মিলা-কাব্যে সীতার মুছে যাওয়াই প্রত্যাশিত। বাল্মীকি লিখেছেন সীতার কাব্য; রবীন্দ্রনাথ মাত্র কয়েকটি অনুচ্ছেদের পরিসরে অপরূপ একটি উর্মিলা-কাব্য রচনা ক'রে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

যতোই হৃদয়গ্রাহী হোক, কাব্যের প্রয়োজনের দিক থেকে যা অবান্তর তাকে দূরে রাখা, একে কাব্যের উপেক্ষা বলে না, এ হ'লো কাব্যের আত্মরক্ষা। নিজের নিয়মকে লঙ্ঘন করার শক্তি কাব্যের নেই। এটা কাব্যের নিষ্ঠুরতা নয়, এটা কাব্যের স্বধর্ম। আগুনের কাছে দহনই প্রত্যাশিত, হীরকের কাছে কাঠিন্যই প্রত্যাশিত। তেমনি কাব্যের কাছে কাব্যের ধর্মই প্রত্যাশিত। এ-কথা রবীন্দ্রনাথ ভালোভাবেই জানেন। তিনি নিজেই বলেছেন, 'কাব্য হীরার টুকরার মতো কঠিন।'[৮৬]

কাব্যের এ-কঠিনতা অনুযোগ-অভিযোগের বিষয় নয়। বস্তুত, রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ এক ধরনের স্মিত অভিযোগলীলা, এক ধরনের ছদ্ম অভিযোগ—নিজের মায়াসৃজনের অবকাশ-রচনা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'জানি, কাব্যের মধ্যে সকলের সমান অধিকার থাকিতে পারে না। কঠিন-হৃদয় কবি তাঁহার নায়ক-নায়িকার জন্য কত অক্ষয় প্রতিমা গড়িয়া গড়িয়া নির্মমচিত্তে বিসর্জন দেন। কিন্তু তিনি যেখানে কাব্যের

৮৬. তদেব

প্রয়োজন বুঝিয়া নিঃশেষ করিয়া ফেলেন সেইখানেই কি তাহার সম্পূর্ণ শেষ হয়?'৮৭

রবীন্দ্রনাথের এ প্রশ্নের. উত্তর একই সঙ্গে হাঁ এবং না, দুই-ই। কবি আপাতদৃষ্টিতে যেখানে শেষ করেন, সেইখানেই কাব্য নিঃশেষে শেষ হয় না। কাব্যের নিগূঢ় ব্যঞ্জনা বহু দূর পর্যন্ত নিজেকে প্রসারিত করে দেয়। যে পর্যন্ত কাব্যের ব্যঞ্জনা প্রসারিত, সে পর্যন্ত কাব্যেরই অধিকার, সেই পর্যন্তই কাব্য। কিন্তু তার বাইরে কাব্য নেই। ব্যঞ্জনার সীমানাতে কাব্য নিঃশেষে পরিসমাপ্ত। ব্যঞ্জনার সীমানা পর্যন্তই সহৃদয় পাঠকের কল্পনার সীমানা বিস্তৃত। সহৃদয় পাঠক-পাঠক-হিসেবে এই সীমানার বাইরে কাব্যকে খুঁজবেন না। কিন্তু যিনি কবি-সমালোচক, সৃজনশীল সমালোচক, যিনি নিজে স্রষ্টা, যিনি কাব্যের অজাত সম্ভাবনার জাদুকর, কাব্যের সীমানা থেকেই তাঁর যথার্থ সৃজনের সূত্রপাত। কাব্যের তথাকথিত নিষ্ঠুরতা তাঁর কাছে নব-সৃজনের একটি উপলক্ষ মাত্র।

শকুন্তলা-নাটকের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যে-অভিযোগ, তা-ও এমনি একটি অভিযোগের ছলনালীলা, নব-সৃষ্টির সুযোগ-সন্ধান। শকুন্তলা-নাটকে যে-দুই লাবণ্যপ্রতিমা তপোবনবাসিনী শকুন্তলাকে নিজের সমস্ত দিয়ে সব সময় বেষ্টন ক'রে রেখেছিল, একা শকুন্তলা যে সমগ্রতার একতৃতীয়াংশ, যারা সেই সমগ্রতার অচ্ছেদ্য অংশ—সেই অনসূয়া প্রিয়ংবদাকে নাটকের প্রয়োজন ফুরোনোর সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস নির্মমভাবে বর্জন করেছেন। কালিদাস যে পর্যন্ত এসে বর্জন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ ঠিক সেইখান থেকেই তাদের গ্রহণ করলেন। 'শকুন্তলা বিদায় লইলেন, তাহার পরে সখীরা শূন্য তপোবনে ফিরিয়া আসিল তখন কি তাহাদের শৈশবসহচরীর বিরহই তাহাদের একমাত্র দুঃখ?'৮৮

এই যে বিশেষ এক নাম-হারা দুঃখের দিকে রবীন্দ্রনাথ অঙ্গুলিনির্দেশ করছেন, এ-দুঃখ শকুন্তলা-নাটকের বিষয় নয়, এ-দুঃখের সন্ধান রাখা কালিদাসের পক্ষে সম্ভবও নয়, সঙ্গতও নয়। কালিদাসের নাটকের সীমান্ত

৮৭. তদেব

৮৮. র।১৩।৬৬২ (৪১)

থেকে একটি সংকেতকে কুড়িয়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই দুঃখকে নিজের মনের মতো ক'রে রচনা ক'রে নিয়েছেন। 'শকুন্তলার অভাব ছাড়া ইতিমধ্যে তপোবনের আর কি কোনো পরিবর্তন হয় নাই? হায়, তাহারা জ্ঞানবৃক্ষের ফল খাইয়াছে, যাহা জানিত না তাহা জানিয়াছে। কাব্যের কাল্পনিক নায়িকার বিবরণ পড়িয়া নহে, তাহাদের প্রিয়তমা সখীর বিদীর্ণ হৃদয়ের মধ্যে অবতরণ করিয়া। এখন হইতে অপরাহ্নে আলবালে জল সেচন করিতে কি তাহারা মাঝে মাঝে বিস্মৃত হইবে না? এখন কি তাহারা মাঝে মাঝে পত্রমর্মরে সচকিত হইয়া অশোকতরুর অন্তরালে প্রচ্ছন্ন কোনো আগন্তুকের আশঙ্কা করিবে না? মৃগশিশু আর কি তাহাদের পরিপূর্ণ আদর পাইবে!'[৮৯]

ঊর্মিলা সম্পর্কে যে প্রশ্ন, এখানেও সেই প্রশ্ন। এ কোন্ অনসূয়া প্রিয়ংবদা? আলোচনার শেষে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এখন সেই সখীভাব-নির্মুক্তা স্বতন্ত্রা অনসূয়া এবং প্রিয়ংবদাকে মর্মরিত তপোবনে তাহাদের নিজের জীবনকাহিনীসূত্রে অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছি।...রচিত কাব্যের বহির্দেশে, অনভিনীত নাটকের নেপথ্যে, এখন তাহারা বাড়িয়া উঠিয়াছে; অতিপিনদ্ধ বল্কলে এখন তাহাদের যৌবনকে আর বাঁধিয়া রাখিতে পারিতেছে না, এখন তাহাদের কলহাস্যের উপর অন্তর্ঘন ভাবের আবেগ নববর্ষার প্রথম মেঘমালার মতো অশ্রুগম্ভীর ছায়া ফেলিয়াছে।'[৯০]

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলে' দিয়েছেন, এ অনসূয়া-প্রিয়ংবদা নাটকের বাইরের, রবীন্দ্রনাথ এদের 'নিজের জীবনকাহিনীসূত্রে অন্বেষণ' করছেন। বলা বাহুল্য, এই সূত্রটাই রবীন্দ্রনাথের নিজের কল্পনার সূত্র। লেডি ম্যাক্‌বেথের জাত বা অজাত সন্তানদের সম্পর্কে ব্র্যাড্‌লে-পন্থী অনুসন্ধিৎসা যদি পরিহাসের বিষয় হয়, তাহলে এ-দেশীয় কোনো এল্. সি. নাইট্‌সের[৯০ক] কাছে হয়তো একদিন রবীন্দ্রনাথের এই জীবন্ত অনসূয়া প্রিয়ংবদার সন্ধান, তাদের নিজেদের জীবনকাহিনীসূত্রে অন্বেষণ, এ-ও অনুরূপ পরিহাসের বিষয়

৮৯. তদেব

৯০. তদেব

৯০ক. 'How Many Children Had Lady Macbeth?' —Explorations.

হয়ে উঠবে। তবে ভরসা করতে পারি, 'কাব্যের উপেক্ষিতা'-প্রবন্ধের রচয়িতার অসামান্য সৃজনশীলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আধুনিক সমালোচকের অতি সঙ্গত প্রতিবাদ-স্পৃহাও হঠাৎ নীরব হয়ে যাবে। এইখানেই সৃজনশীল সমালোচকের শক্তি।

'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধের কাদম্বরী সংক্রান্ত অংশটি কিন্তু সামান্য পরিমাণে সৃজনশীল এবং বেশী পরিমাণেই সর্বজনস্বীকৃত সমালোচনা। বিচার এখানে গৌণ নয়, আপত্তি এখানে নব-সৃজনের অবকাশমাত্র নয়, অভিযোগ এখানে মোটেই অভিযোগলীলা নয়। রবীন্দ্রনাথের আপত্তি এখানে কাব্যের কঠিনতাকে নিয়ে নয়, আপত্তি এখানে বিশেষ একটি কাব্যের অন্তঃসঙ্গতিকে নিয়ে, তার প্রত্যয়-যোগ্যতার অভাবকে নিয়ে, জীবনের সঙ্গে তার বিষমতাকে নিয়ে।—

'পত্রলেখা পত্নী নহে, প্রণয়িনী নহে, কিঙ্করীও নহে, পুরুষের সহচরী। এই প্রকার অপরূপ সখিত্ব দুই সমুদ্রের মধ্যবর্তী একটি বালুতটের মতো। কেমন করিয়া তাহা রক্ষা পায়! নবযৌবন কুমার কুমারীর মধ্যে অনাদি-কালের যে চিরন্তন প্রবল আকর্ষণ আছে তাহা দুই দিক হইতেই এই সংকীর্ণ বাঁধটুকু ক্ষয় করিয়া লঙ্ঘন করে না কেন!'[৯১]

রবীন্দ্রনাথের অভিযোগ এই যে, বাণভট্ট পত্রলেখার নারীত্বকে পরিপূর্ণ স্বীকৃতি দেন নি, তার যৌবন-লাবণ্যের মধ্যে, পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্কের মধ্যে 'নারী-অধিকারের পূর্ণতা নাই'।[৯২]

পত্রলেখার এই অপূর্ণতা জীবনের, এবং সেই কারণেই কাব্যেরও। জীবন-সত্যই কাব্যকে শক্তি দেয়, সঙ্গতি দেয়, অমোঘতা দেয়। জীবনসত্যের অভাবেই পত্রলেখার যৌবন, তার নারীত্ব, পুরুষের সঙ্গে তার সম্পর্ক সব প্রাণহীন সব অবাস্তব হয়ে গিয়েছে। এই অবাস্তবতার প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'কিন্তু কবি সেই অনাথা রাজকন্যাকে চিরদিনই এই অপ্রশস্ত আশ্রয়ের মধ্যে বসাইয়া রাখিয়াছেন…। একটি সূক্ষ্ম যবনিকার আড়ালে বাস করিয়াও সে আপনার স্বাভাবিক স্থান পাইল না। পুরুষের হৃদয়ের

৯১. র।১৩।৬৬২ (৪২)

৯২. র।১৩।৬৬২ (৪৩)

পার্শ্বে সে জাগিয়া রহিল, কিন্তু ভিতরে পদার্পণ করিল না। কোনো দিন একটা অসতর্ক বসন্তের বাতাসে এই সখিত্ব-পর্দার একটি প্রান্তও উড়িয়া পড়িল না।'[৯৩]

নারীত্বের স্বাভাবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার দ্বারাই বাণভট্ট পত্রলেখাকে উপেক্ষা করেছেন। এ বঞ্চনা অকল্পনীয়। 'প্রেমের উচ্ছ্বসিত-অমৃত-পান তাহার সম্মুখেই চলিতেছে। ভ্রাণেও কি কোনো দিনের জন্য তাহার কোনো একটা শিরা চঞ্চল হইয়া ওঠে নাই!...রাজপুত্রের তপ্ত যৌবনের তাপটুকুমাত্র কি তাহাকে স্পর্শ করে নাই।'[৯৪]

এই উপেক্ষার চরম নিদর্শন মেলে সেইখানে যেখানে কাদম্বরীর নিকট থেকে প্রত্যাগতা পত্রলেখাকে রাজপুত্র আসন থেকে উঠে গিয়ে আলিঙ্গন করলেন। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'চন্দ্রাপীড়ের এই আদর এই আলিঙ্গনের দ্বারাই পত্রলেখা কবিকর্তৃক অনাদৃতা।'[৯৫]

এই অনাদরের মধ্যে দিয়েই কবি জীবন-সত্যের প্রতি তাঁর ঔদাসীনের পরিচয় দিয়েছেন। এর ফলে তাঁর কাব্যখানি জীবনের স্বাক্ষরলাভে বঞ্চিত হয়েছে। যা হ'তে পারতো প্রাণবেগে পরিপূর্ণ সচল একটি জীবন্ত কথা-কাব্য, এর ফলে তা হয়ে দাঁড়িয়েছে নিছক যান্ত্রিক পারম্পর্যে-আবদ্ধ একটি স্থির ছবির প্রদর্শনীতে। ছবিগুলি বর্ণাঢ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু পুতুলধর্মী।

পত্রলেখার নারীত্বের প্রতি এই উদাসীনতার মধ্যে বাণভট্টের মনে নায়ক-নায়িকার আভিজাত্য সম্পর্কিত কোনো সংস্কার ক্রিয়া করেছে কি না জানি না। করুক আর না-ই করুক, এই উদাসীনতার মধ্যে কাব্যের কঠিনতার কোনো নিদর্শন নেই, বাণভট্টের স্রষ্টাসুলভ নির্মমতার কোনো পরিচয় নেই, কেবল কল্পনাদৈন্যেরই পরিচয় আছে। কাব্যের উপেক্ষা এখানে কাব্যকেই বিড়ম্বিত করেছে। পত্রলেখার সঙ্গে সঙ্গে বাণভট্ট নিজেও বিড়ম্বিত হয়েছেন।

৯৩. র।১৩।৬৬২ (৪২)
৯৪. র।১৩।৬৬২ (৪৩)
৯৫. তদেব

৮

'কাব্যের উপেক্ষিতা'র পর 'প্রাচীন সাহিত্যে'র প্রথম গুচ্ছের অবসান। ভারমুক্ত মনের, খাঁটি সাহিত্যিক মনের সমালোচনাও ঠিক এই পর্যন্ত এসেই হঠাৎ যেন থমকে গিয়েছে। এতোদিন পর্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্য ছিল সৌন্দর্য-সম্ভোগের, রসসম্ভোগের আকর; অতঃপর তার ভূমিকা হয়ে দাঁড়ালো পরম পূজনীয় উপদেষ্টার ভূমিকা, গুরুর ভূমিকা। স্মরণীয় এই যে, এই সময় থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেও শান্তিনিকেতনে এসে একটু একটু ক'রে গুরুর ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে আরম্ভ করেছেন। তাঁর নিজের জীবনের ভূমিকার বদল ঘটার সঙ্গে সঙ্গে যেন তাঁর সাহিত্য-আলোচনারও সুর পালটে গিয়েছে।

এই সময় থেকেই রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-আলোচনায় নীতি-সচেতনতা আদর্শ-সচেতনতা অত্যন্ত প্রখর হয়ে উঠেছে। সে নীতি ঠিক লোকপ্রচলিত নীতি নয়। তাকে ধর্ম বললেও ভুল হয় না। এই ধর্মীয় দৃষ্টির প্রসঙ্গে এখানে একটি তথ্যের উল্লেখ করা যায়। তথ্যটি কতোদূর গুরুত্বপূর্ণ তা পাঠক নিজে বিবেচনা করবেন। এরই কাছাকাছি সময়ে রবীন্দ্রনাথ টলস্টয়ের বিখ্যাত 'What is Art?' বইখানি পড়েন। টলস্টয়ের এই অত্যন্ত উত্তেজক ও আক্রমণাত্মক ধর্মীয় শিল্পতত্ত্বের ছোট্ট বইখানিকে উপেক্ষা করা—না-গ্রহণ না-বর্জনের নীতি নিয়ে এর সম্পর্কে উদাসীন থাকা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে বইখানিকে 'suggestive' বর্ণনা করেছেন এবং এই সম্পর্কে বন্ধু প্রিয়নাথ সেনকে পত্র (২৩ আশ্বিন, ১৩০৭, ১৯০০ খ্রীঃ) লিখেছেন।'[৯৬] টলস্টয়ের কুণ্ঠাহীন, আপোষহীন, প্রবল ধর্মীয়তার দৃষ্টিভঙ্গী রবীন্দ্রনাথকে কিছুমাত্র প্রভাবিত করে নি, এমন অনুমান বোধকরি সঙ্গত হবে না।

'কাব্যের উপেক্ষিতা' প্রবন্ধের দেড় বছর পরে 'প্রাচীন সাহিত্য' গ্রন্থের দ্বিতীয় গুচ্ছের প্রথম প্রবন্ধ 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রকাশিত হয়। আগেই

৯৬. বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ ১৩৫০ পৃ ৭১৪ (প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-জীবনী, ১ম খণ্ড, ১৩৬৭ সং, পৃ ৪৫৫)।

বলেছি, এই খান থেকে যে কালপর্বের শুরু হ'লো তাকে 'নৈবেদ্য'-কাব্য-গ্রন্থের কাল বা শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রথম পর্যায়ের কাল বলে' চিহ্নিত করতে পারি। সমালোচনার দিক থেকে যদি দেখি, তাহলে কালটি মোটেই দীর্ঘ নয়। এর ব্যাপ্তি 'প্রাচীন সাহিত্যের' দ্বিতীয় গুচ্ছের তিনটি প্রবন্ধ পর্যন্ত। তার বছর তিনেক পরে হঠাৎ ব্যতিক্রম স্থানীয় প্রবন্ধ 'আধুনিক সাহিত্য' গ্রন্থের 'শুভবিবাহ' (১৯০৬)। তার পরেই বাংলা-সাহিত্যের ক্ষেত্র থেকে সমালোচক-রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ তিরোভাব।

'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' (বঙ্গদর্শন, ১৩০৮ পৌষ) খাঁটি নীতিভিত্তিক সাহিত্যসমালোচনা। নৈতিকতার এবং আদর্শ-সচেতনতার ভার এই পর্বের প্রায় সমস্ত রচনার নিয়ত-সহগামী ধর্ম, সে ভার এই প্রবন্ধের প্রথম থেকে শেষ অবধি সর্বত্র অনুভব করা যায়। তবে, নৈতিকতার প্রসঙ্গে একটা কথা এখানে মনে রাখতে হবে। নৈতিকতার নানান্ মাত্রা, নানান্ রূপ, নানান্ চরিত্র। বাইরের থেকে চাপানো সুলভ নৈতিকতাও নৈতিকতা, আবার সুগভীর জীবননীতি—মানুষের মৌল মানবধর্মের থেকে উৎসারিত জীবনবোধে যার ভিত্তি, চল্‌তি কথায় তা-ও নৈতিকতা। দু'য়ের গুরুত্ব এক নয়, সাহিত্যের সঙ্গে দু'য়ের সম্পর্কও এক নয়। রবীন্দ্রনাথের এই পর্বের সমালোচনা-প্রবন্ধে যে নৈতিকতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়, তারও মাত্রাভেদ আছে। কোনো ক্ষেত্রেই তাকে সুলভ নৈতিকতা বলা চলবে না। ক্ষেত্রবিশেষে তা সুগভীর, জীবনবোধের যে-গভীরে সমস্ত মূল্যবোধ একসঙ্গে মিশে থাকে, সেই গভীর থেকে উৎসারিত। 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' হয়তো সেই গভীরকে স্পর্শ করতে পারে নি, কিন্তু 'শকুন্তলা' প্রবন্ধ সম্বন্ধে সে-কথা বলা যাবে না। সাহিত্যের রসমূল্য ও জীবনমূল্য এখানে সম্পূর্ণ এক হয়ে গিয়েছে।

'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা'র মূল কথাটি প্রবন্ধের প্রথমেই প্রায় সূত্রাকারে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, কালিদাস সৌন্দর্যসম্ভোগের কবি, এই প্রচলিত মতটি সম্পূর্ণ ভুল। এই মূল কথাটির একটি ভিতরের-পিঠ আছে। সেইখানেই নৈতিকতার পাদপীঠ। মহাভারতের সঙ্গে তুলনা ক'রে কালিদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, 'মহাভারতে যে একটা বিপুল কর্মের আন্দোলন দেখা যায় তাহার মধ্যে একটি বৃহৎ বৈরাগ্য স্থির অনিমেষভাবে রহিয়াছে।...

'সেইরূপ কালিদাসের সৌন্দর্যচাঞ্চল্যের মাঝখানে ভোগবিরতি স্তব্ধ হইয়া আছে।...কালিদাসকেও একই কালে সৌন্দর্যভোগের এবং ভোগ-বিরতির কবি বলা যাইতে পারে।'[৯৭]

এই যে ভোগ এবং ভোগবিরতি, অথবা, একটু পরেই রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন, ভোগ থেকে ভোগবিরতিতে উত্তরণ, এ প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এই দিকটাতেই নিবদ্ধ। এই সূত্রেই রবীন্দ্রনাথ কুমারসম্ভব কাব্য ও শকুন্তলা নাটকের মধ্যে সংযোগ আবিষ্কার করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের মতে কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা উভয়েরই কাব্যবিষয় নিগূঢ়ভাবে এক। 'দুই কাব্যেই মদন যে মিলন সংসাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছে তাহাতে দৈবশাপ লাগিয়াছে : সে মিলন অসম্পন্ন অসম্পূর্ণ হইয়া আপনার কারুকার্যখচিত পরমসুন্দর বাসরশয্যার মধ্যে দৈবাহত হইয়া মরিয়াছে। তাহার পরে কঠিন দুঃখ ও দুঃসহ বিরহ-ব্রত দ্বারা যে মিলন সম্পন্ন হইয়াছে তাহার প্রকৃতি অন্যরূপ, তাহা সৌন্দর্যের সমস্ত বাহ্যাবরণ পরিত্যাগ করিয়া বিরলনির্মল বেশে কল্যাণের শুভ্র দীপ্তিতে কমণীয় হইয়া উঠিয়াছে।'[৯৮]

রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, যে-প্রেম, ভোগকে নয়, ভোগবিরতিকে অবলম্বন ক'রে নিজেকে সার্থক করে, উভয় গ্রন্থেই কালিদাস সেই প্রেমের বিজয়-কাহিনী রচনা করেছেন। এ প্রেমতত্ত্ব যে কেবল কালিদাসের তা নয়, এ প্রেমতত্ত্ব রবীন্দ্রনাথেরও, অন্তত আলোচ্য কালপর্বে। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, এই প্রেমতত্ত্ব প্রাচীন ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে সঙ্গত। এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য-আলোচনা অপেক্ষা ভারতীয় আদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনেই বেশি যত্নশীল। এই যে বিশেষ প্রেমাদর্শের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন, এ শ্রেষ্ঠত্ব কোন্ আদর্শের সঙ্গে তুলনায়? এক-কথায় বলা যায়, ভোগভিত্তিক প্রেমাদর্শের সঙ্গে তুলনায়। রবীন্দ্রনাথ প্রথমে সেই রকমই বলেছেন। অগ্রসর হওয়ার পর মনে হয়, বক্তব্যের নিহিতার্থে রবীন্দ্রনাথ আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়েছেন। তাঁর লক্ষ্য শুধু প্রেমতত্ত্ব নয়, তাঁর লক্ষ্য দাম্পত্যতত্ত্বও। প্রেমই তাঁর শেষ লক্ষ্য নয়, গৃহধর্মই তাঁর শেষ লক্ষ্য।—

৯৭. রা।১৩।৬৬২ (১০)

৯৮ ৭।১৩।৬৬২ (১১)

'যে প্রেমের কোনো বন্ধন নাই, কোনো নিয়ম নাই, যাহা অকস্মাৎ নরনারীকে অভিভূত করিয়া সংযমদুর্গের ভগ্ন প্রকারের উপর আপনার জয়-ধ্বজা নিখাত করে, কালিদাস তাহার শক্তি স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু তাহার কাছে আত্মসমর্পণ করেন নাই। তিনি দেখাইয়াছেন, যে অন্ধ প্রেমসম্ভোগ আমাদিগকে স্বাধিকারপ্রমত্ত করে তাহা ভর্তৃশাপের দ্বারা খণ্ডিত, ঋষিশাপের দ্বারা প্রতিহত ও দৈবরোষের দ্বারা ভস্মসাৎ হইয়া যায়।'[৯৯]

যে-প্রেম সমাজ-বন্ধনকে চরম বলে' গণ্য করে না, সংযম-শাসনকে পরম জ্ঞানে শিরোধার্য ক'রে নেয় না, কালিদাসকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথ এখানে সেই প্রেমকেই তিরস্কৃত করছেন। যে প্রেম প্রেমেই পরিসমাপ্ত, রবীন্দ্রনাথের মতে সে প্রেম ভারতীয় আদর্শের বিরোধী। অর্থাৎ প্রেম নয়, প্রেমকে অবলম্বন ক'রে প্রেমের-অধিক একটা-কোনো সত্যে পৌঁছুনো, এইটেই ভারতীয় আদর্শ। সেই প্রেমের-অধিক সত্য হ'লো কল্যাণ। বর্তমান ক্ষেত্রে কল্যাণ অর্থ সমাজ-কল্যাণ—আরো নির্দিষ্ট ক'রে বললে, গৃহধর্ম। কালিদাসের দুই গ্রন্থের তুলনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত এই গৃহধর্মের দিকটাতেই অঙ্গুলি-নির্দেশ করেছেন।—

'উভয় কাব্যেই কবি দেখাইয়াছেন, মোহে যাহা অকৃতার্থ মঙ্গলে তাহা পরিসমাপ্ত; দেখাইয়াছেন, ধর্ম যে সৌন্দর্যকে ধারণ করিয়া রাখে তাহাই ধ্রুব এবং প্রেমের শান্ত সংযত কল্যাণ-রূপই শ্রেষ্ঠ রূপ—বন্ধনে যথার্থ শ্রী…। ভারতবর্ষের পুরাতন কবি প্রেমকেই প্রেমের চরম গৌরব বলিয়া স্বীকার করেন নাই, মঙ্গলকেই প্রেমের পরম লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।'[১০০]

যে প্রেমে মোহ নেই, যে প্রেমে উন্মাদনা নেই, যা উত্তপ্ত নয়, স্বাধিকার-প্রমত্ত নয়, দুর্বার নয়—যে-প্রেম প্রেমের জন্যই নয়, তা কি সত্যিই প্রেম? সেই পরম-সংযত নিয়মশাসিত বিনীত বাধ্য গৃহপালিত ভাবটিই কি কালিদাসের তথা রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব-সমর্থিত আদর্শ প্রেম? আবোল-তাবোলের সেই-যে বাবুরাম সাপুড়ের কাছে প্রার্থিত সর্পিত্বহীন সাপ, সে যেমন সাপ, এ প্রেমও প্রায় সেই রকমই প্রেম। আসলে এটা রবীন্দ্রনাথের

৯৯. র।১৩।৬৬২ (১২)

১০০. র।১৩।৬৬২ (১৩)

প্রেমতত্ত্বই নয়, এটা রবীন্দ্রনাথের স্বল্পকালের জন্য গৃহীত দাম্পত্যতত্ত্ব, গৃহধর্মতত্ত্ব। প্রেমের থেকে গৃহধর্ম বড়ো, এইটেই এখানে রবীন্দ্রনাথের আসল বক্তব্য।—

'এক দিকে গৃহধর্মের কল্যাণবন্ধন, অন্য দিকে নির্লিপ্ত আত্মার বন্ধনমোচন, এই দুইই ভারতবর্ষের বিশেষ ভাব। সংসার-মধ্যে ভারতবর্ষ বহু লোকের সহিত বহু সম্বন্ধ জড়িত, কাহাকেও সে পরিত্যাগ করিতে পারে না...।'১০১

এ-কথা বোধ করি উল্লেখ করা খুব অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, এই প্রবন্ধটি সেই কালের রচনা, যে-কালটিকে অনেকে রবীন্দ্রনাথের জীবনের সব থেকে রক্ষণশীল কাল—প্রায় সনাতনী হিন্দুত্বের কাল বলে' গণ্য ক'রে থাকেন। 'গোরা' উপন্যাসে (১৯১০, রচনা-আরম্ভ ১৯০৭) যে-ভাবটিকে রবীন্দ্রনাথ উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন, এখানে ঠিক সেই ভাবটির মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ মগ্ন হয়ে আছেন। এই পর্বের রক্ষণশীলতার প্রসঙ্গে অল্পকাল পরের 'নৌকাডুবি' উপন্যাস-খানির (১৯০৬, রচনা-আরম্ভ ১৯০৩) কথা মনে পড়া বিচিত্র নয়। 'নৌকাডুবি'-তে রবীন্দ্রনাথ বিবাহ-সম্পর্কের গৌরব রক্ষার জন্য নর-নারীর স্বাভাবিক প্রেম-সম্পর্কের শক্তি ও সম্ভাবনাকে অস্বাভাবিক-ভাবে শাসিত ক'রে রেখেছেন। কমলা ও রমেশের সম্পর্ককে তিনি যেখানে নিয়ে গিয়ে স্তম্ভিত ক'রে রেখেছেন, তা জীবনের স্বাভাবিক দাবিকে অস্বীকার করে। কাজটা অনেকটা বাণভট্টেরই অনুরূপ এবং 'কাব্যের উপেক্ষিতায়' বাণভট্ট সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে মন্তব্য করেছেন, তা খানিকটা তাঁর নিজের সম্পর্কেও প্রযোজ্য। স্বভাবতই মনে হয় যে, জীবনসত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই অন্ধতা তাঁর তৎকালীন রক্ষণশীলতার সঙ্গে, তাঁর তৎকালীন দাম্পত্য-আদর্শের সঙ্গে যুক্ত।

এ আলোচনা আমাদের পক্ষে প্রসঙ্গচ্যুতিকর। যে-প্রেম সম্পূর্ণভাবে সমাজ-সমর্থিত, যে-প্রেম সমাজকে পুষ্ট করে এবং সমাজের দ্বারা পুষ্ট হয়, সে-প্রেম যে প্রেমধর্মে ন্যূন, এমন কথা বলা হয়তো হঠকারিতা। কোন্ প্রেম উচ্চতর, সামাজিক প্রেম, না সমাজনিরপেক্ষ স্বাধীন প্রেম, তার বিচারও

১০১. রা১৩।৬৬২ (১৭)

এখানে আমাদের দায়িত্ব নয়। একটি কথাই শুধু এখানে আমরা উল্লেখ করবো : 'কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ প্রেমকে উচ্চতর ও নিম্নতর জাতিতে অত্যন্ত কৃত্রিমভাবে ভাগ ক'রে, একটিকে শুধু ত্যাগের উপর এবং অপরটিকে শুধু আসক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এতে উভয়ক্ষেত্রেই সত্যহানি ঘটেছে। দেহাশ্রিত প্রেম নিছক দেহসম্ভোগ বলে' পরিগণিত হয়েছে, অন্যদিকে ত্যাগসর্বস্ব প্রেম প্রেমহীন কর্তব্যে পরিণত হয়েছে। এই শেষোক্ত প্রেম রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্ব-সমর্থিত প্রেমের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নয়। রবীন্দ্রনাথের প্রেমতত্ত্বে প্রেম থেকে আসক্তিকে বর্জন করার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু প্রেম থেকে প্রেমকেই বাদ দেওয়ার কথা বলা হয় নি। এ-প্রবন্ধে সাময়িক গৃহধর্ম-তত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের চিরকালের প্রেমতত্ত্বকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলেছে।

এই প্রবন্ধের আট মাস পরে রবীন্দ্রনাথের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সমালোচনা-প্রবন্ধ 'শকুন্তলা' (১৯০২) প্রকাশিত হয়। পূর্বের প্রবন্ধে আলোচনার কেন্দ্রস্থলে ছিল শকুন্তলা চরিত্রটি নয়, তার অভিজ্ঞতা ও জীবনালেখ্য নয়, তার সুখ দুঃখ নয়, আলোচনার কেন্দ্রস্থলে ছিল ভারতীয় দাম্পত্য-আদর্শ। এই প্রবন্ধে আলোচনার কেন্দ্রস্থলে তত্ত্ব নয়, মানুষ। এর কেন্দ্রে শকুন্তলা স্বয়ং, তার সুখকম্পিত কৈশোর, তার বেদনাস্তম্ভিত যৌবন, তার তপস্যা-পরিশুদ্ধ মাতৃত্ব-মহিমা—সুখে দুঃখে বৈরাগ্যে প্রশান্তিতে শকুন্তলার জীবন-চক্রের পূর্ণ আবর্তন। এ যেন মানবজীবনেরই—মানবজীবনচক্রের আবর্তনেরই একটি জীবন্ত অথচ প্রতিনিধিস্থানীয় প্রতিকৃতি।

এক সময় 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেসৃদিমোনা' প্রবন্ধের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন, 'শকুন্তলা অর্ধেক মিরন্দা, অর্ধেক দেসৃদিমোনা। পরিণীতা শকুন্তলা দেসৃদিমোনার অনুরূপিণী, অপরিণীতা শকুন্তলা মিরন্দার অনুরূপিণী।'[১০২]

'শকুন্তলা' প্রবন্ধ রচনার বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তি রবীন্দ্রনাথের অবশ্যই স্মরণে ছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্র সব সময়ই একটি বড়ো

১০২. বঙ্কিম রচনাবলী, বিবিধ প্রবন্ধ, ৮৮

উদ্‌বেজনা, একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ—সব সময়ই একই সঙ্গে গুরু এবং প্রতিপক্ষ। এখানেও একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেই কথা দিয়েই রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধ শুরু করেছেন। 'শেক্‌স্‌পীয়রের টেম্পেষ্ট নাটকের সহিত কালিদাসের শকুন্তলার তুলনা মনে সহজেই উদয় হইতে পারে। ইহাদের বাহ্য সাদৃশ্য এবং আন্তরিক অনৈক্য আলোচনা করিয়া দেখিবার বিষয়।'১০৩ এর একটু পরেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, '...উভয়ের আখ্যানমূলে ঐক্য দেখিতে পাই। কিন্তু কাব্যরসের স্বাদ সম্পূর্ণ বিভিন্ন, তাহা পড়িলেই অনুভব করিতে পারি।'১০৪

এই স্বাদের ভিন্নতার অন্যতম কারণ বিষয়ের ভিন্নতা, কবিদৃষ্টির ভিন্নতা। শকুন্তলায় জীবনচক্রের যে-পূর্ণ আবর্তন আছে, টেম্পেস্টে তা নেই। গ্যেটে শকুন্তলার সম্পর্কে বলেছিলেন, শকুন্তলা যেন তরুণ বৎসরের ফুল ও পরিণত বৎসরের ফল, যেন একত্রে মর্ত্য ও স্বর্গ। রবীন্দ্রনাথ গ্যেটের এই উক্তিটিকে শকুন্তলা-নাটকের প্রবেশক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। এই উক্তি শকুন্তলা-নাটকের গভীরতম তাৎপর্যের সন্ধান দেয়। সে তাৎপর্য একই সঙ্গে নীতিগত এবং সাহিত্যগত—মূলত তা জীবননীতিগত।

ফুল এবং ফলের, মর্ত্য এবং স্বর্গের সূত্র ধরে' রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছেন যে, শকুন্তলা-নাটকে একটি পূর্বভাগ ও একটি উত্তর ভাগ আছে। এদের বলা যায় পূর্বমিলন ও উত্তরমিলন। পূর্বমিলন যেন মর্ত্য আর উত্তরমিলন যেন স্বর্গ। মর্ত্য থেকে যাত্রা শুরু ক'রে স্বর্গে উত্তরণ, এরই মধ্যে জীবনচক্রের পূর্ণ আবর্তন। এই উত্তরণের প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'প্রথম-অঙ্কবর্তী সেই মর্ত্যের চঞ্চল সৌন্দর্যময় বিচিত্র পূর্বমিলন হইতে স্বর্গ-তপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞান-শকুন্তল নাটক। ইহা কেবল বিশেষ কোনো ভাবের অবতারণা নহে, বিশেষ কোনো চরিত্রের বিকাশ নহে; সমস্ত কাব্যকে এক লোক হইতে অন্য লোকে লইয়া যাওয়া—প্রেমকে স্বভাব সৌন্দর্যের দেশ মঙ্গলসৌন্দর্যের অক্ষয় স্বর্গধামে উত্তীর্ণ করিয়া দেওয়া।'১০৫

১০৩. র।১৩।৬৬২ (১৭)

১০৪. তদেব

১০৫. র।১৩।৬৬২ (১৮)

পূর্বের প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সামাজিক ও সমাজনিরপেক্ষ প্রেমের মধ্যে, অথবা স্বাধিকারপ্রমত্ত প্রেম ও সংযমবদ্ধ গৃহধর্মপালনের মধ্যে যে বিরোধ, তার উপরেই জোর দিয়েছেন। কিন্তু এখানে ফুল ও ফলের মধ্যে, মর্ত্য ও স্বর্গের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই—জীবনের গতিই এই রকম পর্বে-পর্বান্তরে পরিণতি-অভিমুখী। অথবা বলি, এই দুই মিলিয়েই জীবন। 'কালিদাস তাঁহার এই আশ্রমপালিতা উদ্ভিন্নযৌবনা শকুন্তলাকে সংশয়বিরহিত স্বভাবের পথে ছাড়িয়া দিয়াছেন, শেষ পর্যন্ত কোথাও তাহাকে বাধা দেন নাই। আবার অন্য দিকে তাহাকে অপ্রগল্‌ভা, দুঃখশীলা, নিয়মচারিণী, সতীধর্মের আদর্শরূপিণী করিয়া ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।'[১০৬]

শকুন্তলা নাটকটি যে খণ্ডিত সত্য নয়, তা যে একটি পূর্ণতার প্রতিকৃতি, এইটেই এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য। মানুষের স্বর্গরাজ্য থেকে পতন এবং আবার স্বর্গের পুনরুদ্ধার যেমন একটি পূর্ণতার আলেখ্য এবং সমগ্র মানবজীবননাট্যের প্রতীক, এ-ও তাই। 'শকুন্তলাকে আমরা কাব্যের আরম্ভে একটি নিষ্কলুষ সৌন্দর্যলোকের মধ্যে দেখিলাম; সেখানে সরল আনন্দে সে আপন সখীজন ও তরুলতামৃগের সহিত মিশিয়া আছে। সেই স্বর্গের মধ্যে অলক্ষ্যে অপরাধ আসিয়া প্রবেশ করিল, এবং সৌন্দর্য কীটদষ্ট পুষ্পের ন্যায় বিশীর্ণ স্রস্ত হইয়া পড়িয়া গেল। তাহার পরে লজ্জা, সংশয়, দুঃখ, বিচ্ছেদ, অনুতাপ। এবং সর্বশেষে বিশুদ্ধতর উন্নততর স্বর্গলোকে ক্ষমা, প্রীতি ও শান্তি। শকুন্তলাকে একত্রে Paradise Lost এবং Paradise Regained বলা যাইতে পারে।'[১০৭]

ব্যাখ্যা এবং স্থানে স্থানে রসপরিচয়মূলক বিষয়-বর্ণনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ধাপে ধাপে তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। দুর্বাশার শাপের তাৎপর্য, সেই শাপের প্রলেপ দিয়ে ঢাকা জীবনের এক নিষ্ঠুর সত্য—সেই সত্যের তাৎপর্য, এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যা অসামান্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। এরই সঙ্গে অনতিপ্রচ্ছন্ন সূত্রে পঞ্চম অঙ্কে শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্যের পূর্বপটে রাজার প্রণয়রঙ্গভূমির আবহ-বর্ণন, হংসপদিকার

১০৬. রা।১৩।৬৬২ (১৯)

১০৭. রা।১৩।৬৬২ (২৭)

নেপথ্য-সংগীত, রাজা ও বিদূষকের কথোপকথন। এইখানে কালিদাসকে বিন্দুমাত্র আবৃত না ক'রেও, মূল গ্রন্থের সীমানাকে কিছুমাত্র অতিক্রম না ক'রেও রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর সৃজনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন।

কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে কোনো অংশেরই উল্লেখ করা সমীচীন হবে না। বরং ব্যাখ্যার ফাঁকে ফাঁকে যে একটি পার্শ্বদায়িত্ব রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে পালন করেছেন, তার কথাটা স্বতন্ত্রভাবেই উল্লেখ করা দরকার। সে হ'লো বঙ্কিমচন্দ্রের মতের খণ্ডন, টেম্পেস্টের সঙ্গে শকুন্তলা নাটকের বৈসাদৃশ্য প্রতিপাদন।

রবীন্দ্রনাথ বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, টেম্পেস্ট ও শকুন্তলা ভাবে চরিত্রে বিষয়বস্তুতে এতোই পৃথক্ যে তাদের মধ্যে কোনো তুলনা টানা যায় না। আগেই ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শকুন্তলা নাটকে ফুল ও ফলের যে দুই বিপরীত অথচ স্বাভাবিকভাবে সংযুক্ত ভাবের সাক্ষাৎ পাই, এক ভাবের স্তর থেকে অন্য ভাবের স্তরে অভিযাত্রা পাই, দুয়ের সম্মিলনে যে পূর্ণতা পাই, টেম্পেস্টে তার কিছুই নেই। ছোটো ছোটো পার্থক্যও কম নয়। শকুন্তলার চরিত্রে যে গভীরতর আভ্যন্তরিক সরলতা পাই, মিরন্দার অজ্ঞানতাপ্রসূত সরলতা তার সঙ্গে তুলনীয় নয়। শকুন্তলা তার চারপাশের তপোবনপ্রকৃতির সঙ্গে যে রকম সম্পূর্ণভাবে একাত্ম, মিরন্দা তার দ্বীপপ্রকৃতির সঙ্গে মোটেই সে রকম একাত্ম নয়। টেম্পেস্ট নাটকে পাই গোটা বহির্বিশ্বের সঙ্গে মানুষের জয়পরাজয়ের সম্পর্ক, যুদ্ধ ও প্রভুত্বের সম্পর্ক, শকুন্তলা নাটকে পাই প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আত্মীয়বৎ সৌহার্দ্য। এই তুলনার মধ্যে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর এ-প্রবন্ধের আলোচনা সমাপ্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের মূল সিদ্ধান্তই এই তুলনার ভিত্তি। তা হ'লো এই যে, শকুন্তলা নাটকে জীবনের একটি সমগ্র সত্যকে তুলে ধরা হয়েছে, একটি সম্পূর্ণতার সত্যকে প্রকাশ করা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষাতেই এ-প্রসঙ্গের শেষ করি। 'টেম্পেস্টে শক্তি, শকুন্তলায় শান্তি। টেম্পেস্টে বলের দ্বারা জয়, শকুন্তলায় মঙ্গলের দ্বারা সিদ্ধি। টেম্পেস্টে অর্ধপথে ছেদ, শকুন্তলায় সম্পূর্ণতায় অবসান।'[১০৮]

১০৮. র।১৩।৬৬২ (২৯)

এর বৎসরাধিক কাল পরে 'রামায়ণ' প্রবন্ধ (১৩১০ পৌষ)। প্রবন্ধটি দীনেশচন্দ্র সেনের 'রামায়ণী কথা' বইটির ভূমিকা হিসেবে রচিত। রামায়ণ রবীন্দ্রনাথের কাছে অতি পূজনীয় গ্রন্থ। 'রামায়ণী কথা' রামায়ণেরই পূজা। তার ভূমিকা-রচনা কাজটির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'ভক্ত দীনেশচন্দ্র সেই পূজামন্দিরের প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়া আরতি আরম্ভ করিয়াছেন। আমাকে হঠাৎ তিনি ঘণ্টা নাড়িবার ভার দিলেন। এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আমি সেই কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।'১০৯

এই ঘণ্টা-নাড়ার কাজটি পূজারই অঙ্গ। যতোই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, সাধারণ অবস্থায় একে কেউ সমালোচনা বলে না। কিন্তু, কবি-সমালোচকদের যে-রকম হয়ে থাকে—তাঁরা যেমন সমস্ত কাজকেই তাঁদের নিজেদের বিশেষ আবেগের সঙ্গে যুক্ত ক'রে, নিজেদের বিশেষ কর্মপ্রেরণার সঙ্গে একাত্ম ক'রে দেখেন, এক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথও তাই করেছেন। তিনি এই ঘণ্টা-নাড়ার কাজটাকেই এখানে যথার্থ সমালোচনা বলে' দাবি করেছেন।

এ-প্রবন্ধে বিচার নেই। ব্যাখ্যা আছে কিন্তু তা বিচার বা রসপরিচয়-অভিমুখী নয়। সে-ব্যাখ্যা রামায়ণের ধর্মীয় ও নৈতিক তাৎপর্যের ব্যাখ্যা। তার প্রধান আবেগ পূজার আবেগ। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্ট ক'রে বলেছেন '...পূজার আবেগ-মিশ্রিত ব্যাখ্যাই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা...। ...যথার্থ সমালোচনা পূজা, সমালোচক পূজারী পুরোহিত।'১১০

রবীন্দ্রনাথের আলোচনার দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে মহাকাব্য হিসেবে রামায়ণের পরিচয় এবং সেই সূত্রে মহাকাব্যের বিশিষ্টতা-বর্ণন, রামায়ণে সেই বিশিষ্টতার নির্দেশ। এই অংশকে সমালোচনা বলতে কারোই আপত্তি হবার কথা নয়। প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে ভারতীয় জনচিত্তে রামায়ণের আবেদনের প্রসঙ্গ, রামায়ণে অভিব্যক্ত ভারতবর্ষের সুচিরকালে আদর্শসমূহ, সেই আদর্শের মহনীয়তা। পূজার আবেগ এই অংশেই সমুখিক। কিন্তু সেই আবেগ যে এখানে কোনো রকম অন্ধতার সৃষ্টি করে নি, এই কথাটা

১০৯. র।১৩।৬৬২ (৬)

১১০. তদেব

গোড়াতেই স্বীকার ক'রে নেওয়া দরকার। 'বিচার নেই'—এই কথাটাকেও সংশোধন করতে হবে, আসলে বিচার নেপথ্যচারী। ব্যাখ্যা সূক্ষ্মভাবে, পরোক্ষভাবে সেই বিচারকেই—অথবা বিচারের সিদ্ধান্তকেই সমর্থন করে। অর্থাৎ এ-প্রবন্ধে, কার্যক্ষেত্রে, রবীন্দ্রনাথ কেবল পূজাই করেন নি, কেন পূজা করছেন তার কারণ সম্পর্কেও ইঙ্গিত দিয়েছেন। সেই কারণে প্রবন্ধে দ্বিতীয় ভাগকেও সমালোচনা নয় বলে' সরাসরি বাতিল করা সঙ্গত নয়।

প্রথম ভাগে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, রামায়ণ কোনো একলা-কবির স্বগত-সংগীত নয়, রামায়ণ একটি বৃহৎ সম্প্রদায়ের কথা। রামায়ণ এমন এক প্রতিনিধিস্থানীয় কবির কীর্তি, 'যাহার রচনার ভিতর দিয়া একটি সমগ্র দেশ, একটি সমগ্র যুগ, আপনার হৃদয়কে, আপনার অভিজ্ঞতাকে ব্যক্ত করিয়া তাহাকে মানবের চিরন্তন সামগ্রী করিয়া তোলে।'[১১১]

গীতিকাব্য কবির একলার, মহাকাব্য সমগ্র জাতির, মহাকাব্যের এই বিশিষ্ট লক্ষণের কথা বলে' রবীন্দ্রনাথ রামায়ণের কথায় এসেছেন। তিনি বলেছেন, রামায়ণ একদিকে যেমন সমগ্র জাতির মনের কথা, সমগ্র জাতির রচিত কাব্য, অন্য দিকে তেমনি তা সমগ্র জাতির আশ্রয়স্থল। 'মনে হয় তাহা যেন বৃহৎ বনস্পতির মতো দেশের ভূতলজঠর হইতে উদ্‌ভূত হইয়া সেই দেশকেই আশ্রয়চ্ছায়া দান করিয়াছে। কালিদাসের শকুন্তলা-কুমারসম্ভবে বিশেষভাবে কালিদাসের নিপুণ হস্তের পরিচয় পাই। কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতকে, মনে হয়, যেন জাহ্নবী ও হিমাচলের ন্যায় তাহারা ভারতেরই, ব্যাস-বাল্মীকি উপলক্ষ্য মাত্র।'[১১২]

মহাকাব্যে সমগ্র জাতির আশা আকাঙ্ক্ষার, ভাবনা বেদনার প্রকাশ ঘটে, জাতির চিত্তের বিশুদ্ধতম মূল্যবোধের, উচ্চতম আদর্শসমূহের প্রকাশ ঘটে। সেই কারণেই বলা যায়, রামায়ণ-মহাভারতে সমগ্র ভারতবর্ষের আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। 'ইহা নিশ্চয় যে, ভারতবর্ষ রামায়ণ-মহাভারতে আপনাকে আর কিছুই বাকি রাখে নাই।'

১১১. র।১৩।৬৬৬ (৩)
১১২. তদেব

'এই জন্যই শতাব্দীর পর শতাব্দী যাইতেছে, কিন্তু রামায়ণ-মহাভারতের স্রোত ভারতবর্ষে আর লেশমাত্র শুষ্ক হইতেছে না।'[১১৩]

এই ভাবেই রামায়ণ-মহাভারত একই সঙ্গে জাতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ নিদর্শন এবং জাতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ ধারক, শ্রেষ্ঠ বাহক। তাকে কেবল কাব্য হিসেবে দেখলে ভুল করা হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এমন অবস্থায় রামায়ণ-মহাভারতকে কেবলমাত্র মহাকাব্য বলিলে চলিবে না, তাহা ইতিহাসও বটে। ঘটনাবলীর ইতিহাস নহে,...রামায়ণ-মহাভারত ভারতবর্ষের চিরকালের ইতিহাস।...ভারতবর্ষের যাহা সাধনা, যাহা আরাধনা, যাহা সংকল্প, তাহারই ইতিহাস এই দুই বিপুল কাব্যহর্ম্যের মধ্যে চিরকালের সিংহাসনে বিরাজমান।'[১১৪]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করেন যথার্থ মহাকাব্য সব সময়ই কোনো মহৎ চরিত্রকে অবলম্বন ক'রে রচিত হয়, তার মধ্যে সব সময়ই জাতির শ্রেষ্ঠ আদর্শ-গুলি অভিব্যক্ত হয়। প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগটি রামায়ণের সেই আদর্শ সমূহের কথা। 'রামায়ণ সেই নরচন্দ্রমারই কথা, দেবতার কথা নহে। রামায়ণে দেবতা নিজেকে খর্ব করিয়া মানুষ করেন নাই, মানুষ নিজগুণে দেবতা হইয়া উঠিয়াছেন।'[১১৫]

রামায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দুটি উক্তিকে পাশাপাশি সাজিয়ে দিলেই প্রবন্ধের শেষভাগের বক্তব্যটি স্পষ্ট ফুটে উঠবে। প্রথম উক্তি—

'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে ভ্রাতায়-ভ্রাতায় স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।...

'ইহাতে কেবল কবির পরিচয় হয় না, ভারতবর্ষের পরিচয় হয়।...বাহুবল নহে, জিগীষা নহে, রাষ্ট্র গৌরব নহে, শান্তরসাস্পদ গৃহধর্মকেই করুণার

১১৩. রা।১৩।৬৬২ (৪)

১১৪. তদেব

১১৫. রা।১৩।৬৬২ (৫)

অশ্রুজলে অভিষিক্ত করিয়া তাহাকে সুমহৎ বীর্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।'[১১৬]

রামায়ণ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় উক্তিটি কিছু-পরিমাণে তত্ত্ব-অভিমুখী। বিশেষ ক'রে এইখানেই আমরা 'নৈবেদ্যে'র কবির সাক্ষাৎ পাই।—

'পরিপূর্ণতার প্রতি ভারতবর্ষের একটি প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আছে।...সেই পরিপূর্ণতার আকাঙ্ক্ষাকেই উদ্‌বোধিত ও তৃপ্ত করিয়া রামায়ণের কবি ভারতবর্ষের ভক্তহৃদয়কে চিরদিনের জন্য কিনিয়া রাখিয়াছেন।'[১১৭]

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'এই কারণে রামায়ণ-মহাভারতের যে সমালোচনা তাহা অন্য কাব্য-সমালোচনার আদর্শ হইতে স্বতন্ত্র।'[১১৮] অর্থাৎ রামায়ণ-মহাভারতের সাহিত্য-বিচার সম্ভব নয়, তথ্য-ব্যাখ্যা সঙ্গত নয়, রসপরিচয় যথেষ্ট নয়—বিশুদ্ধ প্রশস্তিগানই এক্ষেত্রে সমালোচনার শ্রেষ্ঠ পথ।

বিচার, তথ্য-ব্যাখ্যা, রসপরিচয় কোনোটাই হয়তো যথেষ্ট নয়। যেখানে জীবনসত্যকে সাহিত্য-সত্য থেকে, সাহিত্য-রস থেকে একেবারেই বিশ্লিষ্ট করা যায় না, যেমন রামায়ণ-মহাভারতে, সেখানে নৈতিক আদর্শের আলোকে সাহিত্যব্যাখ্যা ছাড়া গত্যন্তর নেই। কিন্তু অন্য সকল রকম ব্যাখ্যাই যে অবান্তর, এমন কথা বলা যায় না। সব ব্যাখ্যাতেই যে পূজার আবেগ থাকতে হবে এমনও কোনো কথা নেই। রামায়ণের রবীন্দ্রকৃত সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা যে কী রকম আবেগবাষ্পহীন বস্তু, তা রবীন্দ্রসাহিত্যের পাঠকদের অগোচরে নেই। উদাহরণ হিসেবে 'সাহিত্য' গ্রন্থের 'সাহিত্যসৃষ্টি' প্রবন্ধ (১৯০৭) কিংবা 'রক্তকরবী' নাটকের প্রথম সংস্করণের 'প্রস্তাবনা'র (১৩৩১ সালে লিখিত) কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। আসল কথা, নৈতিক ব্যাখ্যাই হোক, সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যাই হোক, অথবা পূজাই হোক আর বিচারই হোক, নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে সকলেরই যথাযোগ্য স্থান আছে।

১১৬. তদেব

১১৭. র।১৩।৬৬২ (৭)

১১৮. র।১৩।৬৬২ (৪)

৯

'রামায়ণ' প্রবন্ধের আড়াই বছর পরে 'আধুনিক সাহিত্যে'র 'শুভবিবাহ' (বঙ্গদর্শন, ১৩১৩ আষাঢ়, ১৯০৬)। মাঝখানে 'ধম্মপদং' যা সাহিত্য-সমালোচনা নয়। 'রামায়ণ' প্রবন্ধ রচনার আগের থেকেই সমালোচনায় ঢিল পড়েছে। শুভবিবাহ উপন্যাসটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগতভাবে যুক্ত। তা না হলে হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'শুভবিবাহ' প্রবন্ধ রচিতই হ'তো না। যা-ই হোক, 'শুভবিবাহ' প্রকাশের পরেই রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার জগৎ থেকে বিদায় গ্রহণ করলেন।

এর পরে চিঠিপত্রে, প্রাসঙ্গিক আলোচনায়, অথবা সাহিত্যতত্ত্বের প্রবন্ধে দৃষ্টান্ত দেবার সময় রবীন্দ্রনাথের অনেক মূল্যবান্ বিক্ষিপ্ত মন্তব্য পাওয়া যাবে। সেই সব চকিত বিচ্ছিন্ন কিন্তু উজ্জ্বল সমালোচনা-কণিকাগুলিকে নিশ্চয়ই উপেক্ষা করা যাবে না, কিন্তু তাদের পূর্ণাঙ্গ সমালোচনার মূল্য দিলে সমালোচনা এবং সমালোচক উভয়ের প্রতিই অবিচার করা হবে।

পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা বলি আর না-বলি, দু-একটি প্রসঙ্গের কথা এবং দু-একটি রচনার কথা স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ না করলে অন্যায় হবে। যেমন শেক্স্‌পীয়ারের প্রসঙ্গ। পরিণত বয়সে শেক্স্‌পীয়ার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অল্প বয়সের মূল্যায়ন সম্পূর্ণ পাল্‌টে গিয়েছিল। পরিণত বয়সের প্রত্যেকটি উল্লেখ শ্রদ্ধাবনত, প্রত্যেকটি গৃহীত দৃষ্টান্ত সুগভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্বের সর্বগ্রহিষ্ণু জীবনবাদে শেক্স্‌পীয়ারের সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত জীবনদৃষ্টির কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে কিনা জানি না, কিন্তু কোনো কোনো সূক্ষ্মদর্শী লেখক যে উভয়ের জীবনদৃষ্টির গভীর সাম্য লক্ষ করেছেন, সে-কথা এখানে বিশেষভাবে স্মরণীয়।[১১৯]

কীট্‌স সম্পর্কেও পরিণত বয়সের রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন মন্তব্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। কীট্‌সের সঙ্গেও যে রবীন্দ্রনাথের সুগভীর ভাবসাম্য ছিল, তাও সুপণ্ডিত সমালোচকের দৃষ্টি এড়ায় নি।[১২০]

১১৯-১২০. Taraknath Sen, 'Western Influence on the Poetry of Tagore,' Rabindranath Tagore, A Centenary Volume, Sahitya Academy (New Delhi). p 151-175.

রচনাপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য জোড়াসাঁকো 'বিচিত্রাভবনে' প্রবীণ ও নবীনের আলোচনা সভায় (৪ঠা ও ৭ই চৈত্র ১৩৩৪) পঠিত রচনাদুটি —'সাহিত্যরূপ' (প্রবাসী, ১৩৩৫ বৈশাখ, ১৯২৮) এবং 'সাহিত্যসমালোচনা' (প্রবাসী, ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৯২৮)। প্রথমোক্ত রচনাটিতে কীট্‌সের নাইটিঙ্গেল পাখি বিষয়ক কবিতার ইন্‌টেন্‌সিটি নিয়ে রবীন্দ্রনাথের যে মন্তব্যটি আছে, ঈষৎ বক্র হলেও তা সুগভীর রসদৃষ্টির পরিচায়ক।

সব থেকে উল্লেখযোগ্য অবশ্য আধুনিক অর্থাৎ প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর পাশ্চাত্য কবিতার আলোচনা—'আধুনিক কাব্য' (পরিচয়, ১৩৩৯ বৈশাখ, ১৯৩২)। তখনকার কালের আধুনিক কবিতা যে তদ্‌গত নিরাসক্ত সেন্টিমেন্ট-বর্জিত কবিতা নয়—শাশ্বতভাবে আধুনিক নয়, সে যে রোমান্টিক কবিদের অতি-মুগ্ধতার সেন্টিমেন্টেরই বিপরীত সেন্টিমেন্ট—কৃত্রিম এক অতি-বিরূপতার ভঙ্গী, এইটেই এ-প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য। আলোচ্য কালপর্বের ইঙ্গ-মার্কিন কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এ-কথা যে বহুল-পরিমাণে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বিষয়টিকে এখানে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত আলোচনা ও যথাযোগ্য দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করেন নি। আধুনিক কবিদের আধুনিকতার ত্রুটি দেখাতে হলে সেই গোত্রের শ্রেষ্ঠ কবিদেরই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা দরকার। রবীন্দ্রনাথ সব সময় তা করেন নি। কিছু কবিতার ভাষ্যও একটু সন্দেহজনক। প্রথম শ্রেণীর যে দু-এক জন কবির কিছু কবিতা উদ্‌ধৃত হয়েছে, তা সুনিশ্চিতভাবে তাঁর বক্তব্যকে প্রমাণ করে না।

আসলে এখানে রবীন্দ্রনাথ বিস্তৃত সমালোচনার দিকে যান নি। গিয়েছেন আধুনিকতার তত্ত্বের দিকে। কিন্তু সে-দিক থেকেও তাঁর বক্তব্য অসম্পূর্ণ। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর আধুনিকতার বিশিষ্ট লক্ষণ কী কী তার প্রায় কিছুই তিনি বলেন নি। কিন্তু যে-একটির কথা বলেছেন, হতাশা বা অভিমানের বিকারে জীবনের প্রতি বিদ্রূপের ভাব, এই একটি লক্ষণকেই রবীন্দ্রনাথ অতি সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

আধুনিকদের সম্পর্কে কিছু সহানুভূতির অভাব—হয়তো কিছু অপরিচয়ও এর মধ্যে ক্রিয়া করেছে—আধুনিকতার বহিরঙ্গ ও তার অন্তরঙ্গ-ধর্মের মধ্যে

পার্থক্য না-করা, আধুনিক কবিতার কাব্য-রীতি বা আঙ্গিকের দিকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা—তার প্রকাশরূপের বিশেষত্বের দিকে দৃষ্টি না-দেওয়া, এবং বাচনে কিছু-পরিমাণ অসহিষ্ণুতা—এই মূল্যবান্ প্রবন্ধে খানিকটা অসম্পূর্ণতা এনে দিয়েছে। এ-সব সত্ত্বেও নানা কারণে এ-প্রবন্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অসাধারণ। কিন্তু আমাদের বর্তমান প্রসঙ্গ খাঁটি সমালোচনাকে নিয়ে। সমালোচনা যে এ-প্রবন্ধে বিক্ষিপ্ত খণ্ডিত, এবং অনাবশ্যক-রকমের অতিসংক্ষেপিত, এইটেই এখানে আমাদের কাছে বড়ো কথা। অর্থাৎ এই মূল্যবান রচনাটিকে আমরা যে যথার্থ সমালোচনা বলে' গ্রহণ করতে পারলাম না, এইটেই এখানে আমাদের পক্ষে পরিতাপের বিষয়।

বিশ্বভারতী সংস্করণ রবীন্দ্ররচনাবলী প্রকাশের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর কোনো কোনো বইয়ের 'সূচনা' নামে সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখে দেন। তার মধ্যে তিনি কিছু কিছু নিজের রচনার সমালোচনা করেছেন। 'সূচনা'-গুলি সবই অবশ্য অত্যন্ত স্বল্পায়তন, সমালোচনা তার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। তবু এগুলির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের পরিণত বয়সের সাহিত্যদৃষ্টির সাক্ষাৎ মেলে।

'সূচনা'-গুলির কোনো কোনোটিতে বিচার আছে। সে আত্ম-বিচার অতিশয় নির্মোহ, অতিশয় নির্মম। অধিকাংশ আলোচনাই ব্যাখ্যামূলক। তার দু-একটি থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যের ভবিষ্যৎ-কালের জীবনীভিত্তিক সমালোচক হয়তো কিছু মূল্যবান ইঙ্গিতও পেতে পারবেন।

এই সব গ্রন্থ-সূচনার আত্ম-সমালোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ ক'রে 'রাজা ও রানী', 'চিত্রা', 'নৌকাডুবি' ও 'তপতী'র কথা উল্লেখ করা যায়। প্রত্যেক-টিতেই রবীন্দ্রনাথের সুপরিণত সাহিত্যদৃষ্টির পরিচয় আছে। কিন্তু প্রত্যেকটিই খণ্ডাংশ, কোনোটিই পূর্ণাঙ্গ নয়, কোনোটিই সমালোচনাপ্রবন্ধ বলে' গণ্য হতে পারে না। তৎকালীন আধুনিক সাহিত্যিকদের কাছে লিখিত ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে সেই সব লেখকদের রচনার কিছু কিছু আলোচনা পাওয়া যাবে। তার মধ্যে পরিণত সাহিত্যবিচারের চকিত চমকও পাওয়া যাবে। কিন্তু ব্যক্তিগত চিঠির সেই সব টুক্রো মন্তব্যকে সমালোচনাসাহিত্য বলে' গণ্য করা সঙ্গত হবে না।

পরিণত বয়সের এই-যে গভীরতর সাহিত্যদৃষ্টি, সাহিত্যসমালোচনার কাজে

এ-দৃষ্টি ব্যবহৃত হয় নি। রবীন্দ্রনাথের পরিণততর রসবোধ ব্যবহারিক সমালোচনার কাজে লাগে নি।

রবীন্দ্রনাথ যা আমাদের দিতে পারতেন, কিন্তু দিলেন না, তার জন্য আক্ষেপ ক'রে যা দিয়েছেন তার মর্যাদাহানি করা অন্যায়। যা দেন নি তার জন্য অভিযোগ করবো না, কিন্তু প্রশ্ন অবশ্যই করতে পারি। প্রশ্ন অনুযোগের সুরে নয়, তথ্যজিজ্ঞাসুর সুরে। ১৯০৬ সালের কাছাকাছি সময়ে, আগে বা পরে, হঠাৎ কী এমন ঘটলো, যার জন্য সমালোচনার জগৎ থেকে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে এমন নির্মম ভাবে সরিয়ে নিলেন?

তাহলে কি সমালোচনা রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম নয়—অন্তত ঠিক সেই অর্থে স্বধর্ম নয় যে অর্থে কবিতা লেখা, গল্প লেখা, নাটক-উপন্যাস লেখা বা গান রচনা করা কি ছবি আঁকা রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম? এমন কি, যে-অর্থে সাহিত্য-তত্ত্বের প্রবন্ধ রচনা করাও রবীন্দ্রনাথের স্বধর্ম? যা স্বধর্ম তাকে কি এই রকম খেয়ালখুশীমতো কোনো এক শুভ প্রভাতে বিনা বাক্যব্যয়ে সত্যি সত্যি বিদায় দেওয়া যায়?

অথচ পরধর্মে কি এতোখানি সিদ্ধি কখনো সম্ভব? পরধর্ম অনুসরণ ক'রে কখনো কি 'মেঘদূত' অথবা 'রাজসিংহ' লেখা যায়, 'কাব্যের উপেক্ষিতা' অথবা 'শকুন্তলা' লেখা যায়? বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের সমালোচনা, 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধের মতো শিখরস্পর্শী মানের সমালোচনা, সে কি সখের সমালোচকের দ্বারা সম্ভব?

স্বধর্ম-পরধর্ম ভাগটাই বোধকরি এখানে খানিকটা অপ্রযোজ্য। সাধারণ শিল্পীর ক্ষেত্রে এ-ভাগ যেমন সুস্পষ্ট, মহৎ শিল্পীর ক্ষেত্রে তা নয়। রবীন্দ্রনাথের মতো বহুমুখী সাহিত্যপ্রতিভার কোন্ সাহিত্যিক প্রয়াসটি যে স্বধর্ম-সঞ্জাত নয়, তা নির্ণয় করা সহজ নয়। অন্তত প্রয়াসের দৈর্ঘ্য দিয়ে তা স্থির করা যাবে না।

কবি-সমালোচকের ক্ষেত্রে এ-অনিশ্চয়তা থাকবেই। সমালোচনা তাঁদের পরধর্ম হয়েও সম্পূর্ণ পরধর্ম নয়, স্বধর্ম হয়েও সম্পূর্ণ স্বধর্ম নয়। সৃজনশীল সমালোচকেরা, কবি-সমালোচকেরা কতকগুলি বিশেষ মুহূর্তে সৃজনশীলতারই তাগিদে সমালোচক হয়ে ওঠেন। যখন ওঠেন, তখন সমালোচনাই তাঁর স্বধর্ম। তার আগেও নয়, তার পরেও নয়।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রটাও এই রকম। অন্তরের তাগিদ যতোক্ষণ সত্য ছিল, ততোক্ষণই রবীন্দ্রনাথ সমালোচক। এবং ততোক্ষণ সমালোচনা অবশ্যই তাঁর স্বধর্ম। অন্তরের তাগিদ যখন স্তিমিত, কাল যখন উদাসীন, তখন রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও নিঃশব্দ বিদায় কিছুমাত্র কঠিন হয় নি।

বালক বয়সে নিজের কাব্যরুচির তাগিদে এবং অনেকটা আপন কবি-কর্মেরই প্রয়োজনে—গীতিকবিতার তরফ থেকে—রবীন্দ্রনাথ সমালোচনার জগতে প্রবেশ করেছিলেন। সচেতন শিল্পীরা যখন সমালোচক হন, তখন সাধারণত এইভাবেই আরম্ভ হয়। কিন্তু এইখানেই শেষ নয়।

সাধারণত কবিত্বের প্রেরণা আর সমালোচনার প্রেরণা পৃথক্। শিল্পী-সমালোচকেরা কবি-সমালোচকেরা এই পার্থক্য অনেকখানি ঘুচিয়ে দেন। ভিতর ও বাহিরের অনেক শুভসংযোগ ঘটলে তবে তাঁরা সমালোচনার জগতে পদক্ষেপ করেন, কিন্তু যদি করেন—এবং যখন করেন, তখন তাঁদের কবিত্বের টান আর সমালোচনার টান একসঙ্গে মিলে যায়, কবিত্বের প্রাণ আর সমালোচনার প্রাণ এক হয়ে যায়। 'মেঘদূত' রচয়িতার, 'রাজসিংহ' বা 'কাব্যের উপেক্ষিতা' রচয়িতার তাই ঘটেছে।

কালক্রমে যখন বাংলাসাহিত্যে গীতিকবিতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে বসলো, রোমান্টিক সাহিত্য-আদর্শ সর্বজনস্বীকৃত এবং রোমান্টিক সাহিত্যরুচি সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত হ'লো, তখন অন্তরের দিককার তাগিদ রবীন্দ্রনাথের অনেকটা কমে গেল। এর সঙ্গে সঙ্গে বাইরের প্রতিকূলতা—ঠিক প্রতিকূলতা না হোক: উদাসীনতা কিছু কম ছিল না। প্রথমত এবং প্রধানত সম্পাদকীয় দায়িত্বের অবসান। দূরের ও কাছের, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ আরো অনেক ঘটনার নাম করা যায়। শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্য-বিদ্যালয়ের ভারগ্রহণ, গুরুর পদবীতে আরোহণ, গীতাঞ্জলি-পর্বের গভীর আধ্যাত্মিকতার মধ্যে নিমজ্জন, নোবেল-পুরস্কার ও বিশ্বজনের স্বীকৃতি—এ রকম অনেক ঘটনারই প্রতিকূল প্রভাব বাইরের দিক থেকে রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনার ব্যাপারে উদাসীন করে তুলেছে।

ভিতরের এবং বাইরের দুই তাগিদই যখন শিথিল, তখন বিদায় অবশ্য-ম্ভাবী, নিঃশব্দই হোক আর সশব্দই হোক।

সপ্তম অধ্যায়

উপসংহার

১

কবি-সমালোচককে শিল্পী-সমালোচককে ঠিক জাত-সমালোচক বলা যায় না। জাত-সমালোচকেরা সমালোচনার জন্যেই এবং সমালোচনার আনন্দেই সমালোচনা করেন। সমালোচনার সময় তাঁরা পুরোপুরিই সমালোচক—পুরোপুরিই সচেতন সাহিত্য-পাঠক। শিল্পী-সমালোচক প্রধানত তাঁর শিল্পের কারণেই সমালোচক, যেমন রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে অন্তত প্রথম দিকটাতে দেখতে পাই। শিল্পী-সমালোচক—পুরোপুরি না হলেও অনেকখানি পরিমাণে—শিল্পের আনন্দেই সমালোচনা করেন, সমালোচনার সময়ও তিনি অনেকখানি পরিমাণে শিল্পী, তাঁর সমালোচনা তাঁর সৃজন-লীলারই সম্প্রসারণ। রবীন্দ্রনাথের অনেক সমালোচনা প্রবন্ধই এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

মনে রাখতে হবে, জাত-সমালোচক আর শিল্পী-সমালোচকের এই ভেদটা আপেক্ষিক অর্থেই মাত্র সত্য। এমন কোনো সমালোচক নেই যিনি আদৌ সৃজনশীল নন, যাঁর মধ্যে শিল্পী একেবারে অনুপস্থিত। এমন কোনো শিল্পী নেই যাঁর মধ্যে, গোচরে হোক অগোচরে হোক, সমালোচক একেবারেই নেই, কিছুমাত্র নেই। বিশেষ ক'রে যেসব শিল্পী সচেতন—নির্মিতি-সচেতন, পদ্ধতি-সচেতন, প্রক্রিয়া-সচেতন, নিজের অব্যবহিত অভিপ্রায় সম্পর্কে সচেতন, সুদূর লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন, শিল্পবস্তুর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন, যেমন রবীন্দ্রনাথ ছিলেন—যাঁরা স্রষ্টার সঙ্গে স্রষ্টা এবং পাঠকের সঙ্গে পাঠক, তাঁরা সকলেই সমালোচক, আলাদা ক'রে সমালোচনা লিখুন আর না-ই লিখুন। আলাদা ক'রে না লিখলে, নিজের ভিতরকার সমালোচকসত্তা অপরিণত ও অপরিস্ফুট থাকে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তা ঘটে নি। অথবা, পরিণত বয়সে পঞ্চাশোত্তরে পৌঁছে হয়তো তা-ও ঘটেছিল।

আপেক্ষিক হলেও, জাত-সমালোচক আর কবি-সমালোচকের ভেদটা কার্যক্ষেত্রে মোটেই মিথ্যা নয়। ভেদটা হয়তো মাত্রাগত, কিন্তু পরিমাণ খুব বেড়ে গেলে তখন তা গুণেই পরিণত হয়। তখন মাঝে মাঝে ভেদটাকে চূড়ান্ত বলেই মনে হয়।

একটা কথা বলে নেওয়া দরকার। কবিরা শিল্পীরা সমালোচক হলেই যে তাঁরা অবধারিত ভাবে কবি-সমালোচক শিল্পী-সমালোচক হবেন, প্রত্যেকেই হবেন এবং সব সময়ই হবেন, এমন কোনো কথা নেই। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে যেমন প্রথম শ্রেণীর শিল্পী, অন্যদিকে তেমনি প্রথম শ্রেণীর সমালোচক। কিন্তু আমাদের বিশিষ্ট অর্থে তিনি শিল্পী-সমালোচক নন। সমালোচনার রাজ্যে বঙ্কিমচন্দ্র মুখ্যত পাঠক, গৌণত শিল্পী। অপর পক্ষে সমালোচনার রাজ্যে রবীন্দ্রনাথ মুখ্যত শিল্পী এবং গৌণত পাঠক। দুজনেই কৃতী সমালোচক। কিন্তু দুজনের সমালোচনা এক চরিত্রের নয়। দুজনের সিদ্ধির মাপকাঠিও অভিন্ন নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রও সৃজনশীল, সমালোচনার ক্ষেত্রেও সেই অন্তঃসলিলা সৃজনশীলতা অব্যাহত। কিন্তু এ সৃজনশীলতা ঠিক রবীন্দ্রনাথের সৃজনশীলতার সমধর্মী নয়। উভয়ের পথ পৃথক্। বঙ্কিমচন্দ্রের পথ সমালোচনার প্রশস্ত রাজপথ, অসংখ্য রথী ও পদাতিকের চলবার পথ। রবীন্দ্রনাথের পথ সাধারণ-সমালোচকের পথ নয়। সাধারণ-সমালোচকের পক্ষে এ-পথ যেমন প্রলোভনের, তেমনি বিপদের।

কবি-সমালোচকদের বিশিষ্টতা সব থেকে বেশি ফুটে ওঠে তাঁদের সমালোচনার মেজাজের মধ্যে, সমালোচনার সামগ্রিক চরিত্রে। আর ফুটে ওঠে তাঁদের রুচির বিশিষ্টতায়, বিষয়বস্তুর নির্বাচনে। এবং—এটাও কিছু কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—সমালোচনার রঙ্গমঞ্চে তাঁদের সম্পূর্ণ স্বেচ্ছানুযায়ী প্রবেশে প্রস্থানে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এই বিশিষ্টতার সবগুলিই অল্পবিস্তর পাওয়া যাবে।

যতোই কৃতী হোন না কেন, কবি-সমালোচকদের উপর সব সময় খুব নিশ্চিন্তভাবে নির্ভর করা যায় না। তাঁদের বিষয়-নির্বাচন, তাঁদের রসোপভোগের পরিধি তাঁদের নিজেদের শিল্পরুচির দ্বারা কঠিনভাবে নিয়ন্ত্রিত।

মাঝে মাঝে তাঁদের মূল্যায়ন অবিশ্বাস্য রকমের উন্মার্গগামী। কিন্তু বিষয় যেখানে মনোমতো, রুচির সাযুজ্য যেখানে ঘটেছে, ভাবের সাযুজ্য যেখানে ঘটেছে, মেজাজ যেখানে অনুকূল, সেখানে মাঝে মাঝে তাঁরা সিদ্ধির যে-শিখরে উঠতে পারেন, জাত-সমালোচকদের পক্ষে তা সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।

প্রতি-তুলনা হিসেবে এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের দীনবন্ধু মিত্র সম্পর্কিত প্রবন্ধটিকে স্মরণ করা যায়। বিষয়নিষ্ঠায়, বিশ্লেষণের নৈপুণ্যে, সহানুভূতিতে, বিচার-শীলতায়, মাত্রাজ্ঞানে বঙ্কিমচন্দ্রের এ প্রবন্ধ তুলনাহীন। কল্পনা ও যুক্তির সামঞ্জস্যে, লেখকচিত্তের রহস্য-উদ্‌ঘাটনকারী সুগভীর অন্তর্দৃষ্টিতে, সমালোচক-রবীন্দ্রনাথের কথা মনে রেখেও বলা যায়—বঙ্কিমচন্দ্রের এ-প্রবন্ধটি এখন পর্যন্ত অপরাজিত। এই প্রবন্ধের সংযম ও ভারসাম্য যে-কোনো সমালোচকের ঈর্ষার বিষয় হতে পারে। কিন্তু তবু তা রবীন্দ্রনাথের ‘মেঘদূত’, কি ‘রাজসিংহ’, কি ‘কাব্যের উপেক্ষিতার’ সঙ্গে এক পঙ্‌ক্তিতে স্থান পাবে না।

‘দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব’ অসামান্য সমালোচনা, কিন্তু মাত্র সমালোচনাই, তার বেশি কিছু নয়। তার মধ্যে কোনো ইন্দ্রজাল নেই, কোনো অলৌকিক আলোকসম্পাত নেই। কিন্তু ‘মেঘদূত’’ ‘কাব্যের উপেক্ষিতা’, ‘শকুন্তলা’, এরা যেন স্রষ্টার দিব্যদৃষ্টির আলোকে উদ্ভাসিত। বঙ্কিমচন্দ্রের ‘রাজসিংহ’ উপন্যাস যেমন রচনামাত্র নয়—আবির্ভাব, রবীন্দ্রনাথের ‘রাজসিংহ’ সমালোচনাও তাই।

দীনবন্ধুর সঙ্গে শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের খুব যে ভাব-সাযুজ্য ছিল, এমন মনে করার হেতু নেই। ঈশ্বর গুপ্তের সঙ্গে ভাব-বৈপরীত্যই বরং সুগভীর। কিন্তু তার দরুন দীনবন্ধুর প্রতিভার স্বরূপ-নির্ণয়ে, ঈশ্বর গুপ্তের ক্ষমতার ক্ষেত্র-নিরূপণে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছুমাত্র বাধা ঘটে নি। তার কারণ বঙ্কিমচন্দ্র কোনো ভাব-সাযুজ্যের কারণে সমালোচক নন, স্বভাবের তাগিদেই সমালোচক—সহজেই সমালোচক।

২

মূল লেখকের সঙ্গে সমালোচকের রুচির সাম্য ঘটা, ভাবদৃষ্টির সাযুজ্য ঘটা, সমালোচক রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। যেখানেই লেখকের ভাবদৃষ্টির সঙ্গে নিজের ভাবদৃষ্টির অনায়াস-সাযুজ্য ঘটেছে, সেইখানেই রবীন্দ্রনাথের পক্ষপাত। এই কারণেই কালিদাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এতো উদ্দীপ্ত উৎসাহ; এই কারণেই কালিদাসকে রবীন্দ্রনাথ এমন মনোমতোভাবে চিনতে ও চেনাতে পেরেছেন। আবার ঠিক এই কারণেই তরুণ বয়সের রবীন্দ্রনাথ শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটককে বা টলস্টয়ের উপন্যাসকে অমন অবলীলাক্রমে ভুল বুঝতে পেরেছিলেন। এই কারণেই প্রথম বয়সে শেক্‌স্‌পীয়ারের নাটকের তীব্র উত্তেজনা তাঁর কাছে পীড়াদায়ক এবং টলস্টয়ের উপন্যাসের দৈর্ঘ্য ও বস্তুবাহুল্য তাঁর কাছে ক্লান্তিকর মনে হয়েছে। এবং বোধকরি এই কারণেই স্বদেশের এবং স্বকালের অনেক বিখ্যাত বা জনপ্রিয় সাহিত্যকীর্তি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ অমন সম্পূর্ণভাবে নীরব।

যিনি 'চোখের বালি' বা 'নষ্টনীড়' লিখতে পারেন, 'বিষবৃক্ষে'র জগৎ তাঁর অপরিচিত নয়, 'বিষবৃক্ষে'র লেখকের সঙ্গে তাঁর দৃষ্টির মিল সহজেই অনুভব করতে পারি। রবীন্দ্রনাথ বিষবৃক্ষ সম্পর্কে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লেখেন নি বটে, কিন্তু বিভিন্ন প্রসঙ্গে, বিভিন্ন উপলক্ষে তিনি বিষবৃক্ষ সম্পর্কে অনেক মূল্যবান মন্তব্য করেছেন। তাদের সংগ্রহ করলে একাধিক সমালোচনাপ্রবন্ধের ভাববীজের সন্ধান পাওয়া যাবে। যিনি 'ক্ষুধিত পাষাণ' বা 'দুরাশা' লিখতে পারেন, 'রাজসিংহ' উপন্যাসের জগৎ—অন্তত 'রাজসিংহে'র বিষয়পরিবেশ যে তাঁর সুপরিচিত, তা সহজেই বুঝতে পারি। কিন্তু দোসরহীন উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'? 'কপালকুণ্ডলা' নিশ্চয়ই বিস্মৃত হবার মতো শিল্পকীর্তি নয়। তার সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ এমন নীরব কেন? অনুমান করতে পারি, 'কপালকুণ্ডলা'র জগৎ রবীন্দ্রনাথের আকর্ষণের জগৎ নয়। অনুমান করতে পারি, এখানে ঠিক সেই রকম ভাব-সাযুজ্য ঘটে নি, যা কবি-সমালোচককে সমালোচনায় উদ্‌বুদ্ধ করতে পারে।

'ফুলজানি' উপন্যাসের লেখক শ্রীশচন্দ্র তাঁর বাঙালিত্ব দিয়ে, গ্রামবাংলার

অন্তরঙ্গ চিত্র দিয়ে রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছেন। শুধু বন্ধুত্ব নয়, রবীন্দ্রনাথ যে ফুলজানির সমালোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার মধ্যে এই মুগ্ধতারও ক্রিয়া আছে। অথচ অল্পকাল পরে বাঙালি ঔপন্যাসিকদের মধ্যে যিনি পরমতম বাঙালি, গ্রামবাংলার সার্থক চিত্ররচনায় এক গল্পগুচ্ছের লেখক ছাড়া সেদিন যাঁর আর কোনো প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিল না, সেই শরৎচন্দ্র—নানা উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অনেক প্রশংসাবাদ করেছেন সন্দেহ নেই—সেই শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনায় প্রবৃত্ত করবার মতো নাড়া দিতে পারেন নি। তাহলে কি এই অনুমানই করবো যে, শরৎচন্দ্রের অতিশয় বাঙালিত্বই এখানে ভাব-সাযুজ্যের বাধা ঘটিয়েছে ?

আমরা জানি, রবীন্দ্রনাথও প্রকৃতিপ্রেমিক, বিভূতিভূষণও প্রকৃতিপ্রেমিক। তবু, দুজনের জীবনদৃষ্টি ভিন্ন, প্রকৃতিদৃষ্টিও এক নয়। বিভূতিভূষণ রবীন্দ্র-নাথের প্রশংসা অর্জন করেছেন, রবীন্দ্রনাথের চিঠিতে তার প্রমাণও রয়ে গেছে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে সমালোচনার ক্ষেত্রে টেনে আনবার মতো সৌভাগ্য তাঁর হয় নি। কবি জীবনানন্দের ক্ষেত্রটিও অনুরূপ। ব্যক্তিগতভাবে তিনিও রবীন্দ্রনাথের দ্বারা প্রশংসিত হয়েছেন, কিন্তু সমালোচক-রবীন্দ্রনাথের কঠিন নীরবতাকে, রবীন্দ্রনাথের শালীন, অভিজাত কিন্তু কিছু-বা উদাসীন, কিছু-বা নিষ্ঠুর নীরবতাকে তিনিও ভাঙতে পারেন নি।

আর মধুসূদন ? আমরা সকলেই জানি, বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের প্রতি ঔদ্ধত্য দেখিয়েছিলেন, পরিণত বয়সে তার জন্য তিনি লজ্জা-প্রকাশ করেছেন, ক্ষমাভিক্ষা করেছেন ? কিন্তু মধুসূদন সম্পর্কে তাঁর মৌলিক সিদ্ধান্তের কতোটুকু পরিবর্তন ঘটেছে ? মৌলিক পরিবর্তন বোধকরি সম্ভবপরই নয়। নানাপ্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনকে কাব্য-জগতে আধুনিক ভাবের ভগীরথ বলে' প্রশংসা করেছেন। ক্ষেত্রবিশেষে মধুসূদনের রাবণ-চরিত্র-পরিকল্পনার জন্য সশ্রদ্ধ বিস্ময়ও প্রকাশ করেছেন। কিন্তু মধুসূদনের প্রতিভার কি এই যোগ্য স্বীকৃতি ? মহাপ্রতিভাধর উত্তরসূরীর কাছে মাত্র এইটুকুই কি মধুসূদনের প্রাপ্য ছিল ?

অস্কার ওয়াইল্ড কবি-সমালোচকদের সম্পর্কে যে মূল্যবান্ মন্তব্যটি করেছেন, এ-প্রসঙ্গে তা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

'That very concentration of vision that makes a man an artist limits by its sheer intensity his faculty of fine appreciation. ...A truly great artist cannot conceive of life being shown, or beauty fashioned, under any conditions other than those he has selected.'

কথাটার মধ্যে কিছু অত্যুক্তি থাকতে পারে, কিন্তু সত্যও অনেকখানি আছে। এবং সে সত্য সমালোচক-রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। সাধারণ পাঠক যেভাবে স্রষ্টার রূপদৃষ্টির কাছে অবাধে আত্ম-সমর্পণ করেন, নিজের বিশিষ্ট রূপদৃষ্টিকে সাময়িকভাবে প্রত্যাহার ক'রে নিয়ে মুগ্ধ স্রষ্টার অনুগমন করেন, সমালোচক-রবীন্দ্রনাথের পক্ষে সে-রকম অবাধ আত্মসমর্পণ, আপন রূপদৃষ্টির সে-রকম নিঃশর্ত প্রত্যাহার সম্ভব ছিল না। সম্পূর্ণ অপর গোত্রের যে-কোনো স্রষ্টার সঙ্গে সহজ একাত্মীভবন, তা যতো সাময়িকই হোক না কেন, তা রবীন্দ্রনাথের পক্ষে কখনোই সম্ভব হয় নি। অবিচার করবেন না বলেই হয়তো পরিণত বয়সে রবীন্দ্রনাথ বিচার থেকে নিবৃত্ত ছিলেন।

শ্রেষ্ঠ সমালোচকের কাছে আমাদের অন্যতম প্রধান প্রত্যাশা অতীতের পুনরাবিষ্কার, প্রাচীন কালের মহৎ কীর্তিগুলির পুনর্মূল্যায়ন। এ-কাজ বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দুজনেই করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের আলোচনা বহু-প্রশংসিত এবং, বলা বাহুল্য, বহু-প্রশংসাযোগ্য। কিন্তু এ-কাজে রবীন্দ্রনাথ তুলনা-রহিত। বঙ্কিমচন্দ্র একজন অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য অগ্রণী পথিক, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের মতো দিব্য রথের রথী নন।

শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের কাছে আমাদের আর-একটি প্রত্যাশা হ'লো অখ্যাত সাহিত্যশাখার, অবজ্ঞাত সাহিত্যধারার নিহিত তাৎপর্যের, নিহিত মূল্যের আবিষ্কার, তার উদ্ধার, তার পুনর্বাসন, তার প্রতিষ্ঠা। এ-কাজে রবীন্দ্রনাথ এখন পর্যন্ত নিঃসঙ্গ প্রতিভা। এই প্রসঙ্গে 'লোকসাহিত্যে'র প্রথম ও শেষ প্রবন্ধটির কথা স্মরণ করা যেতে পারে—বিশেষ করে প্রথম প্রবন্ধটির কথা। এই একটি প্রবন্ধের কারণেই রবীন্দ্রনাথ বাংলাসাহিত্যে শ্রেষ্ঠ সমালোচকের গৌরব দাবি করতে পারেন। এই বিশেষ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো দাবি নেই।

শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের কাছে আমাদের আর-এক প্রত্যাশা, তাঁরা আমাদের রুচিকে পরিশীলিত করবেন, সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী ক'রে তুলবেন, রসবোধকে গভীর ক'রে দেবেন। এ-কাজ বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ দুজনেই করেছেন। তাঁদের কাজের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচার করবার সময় এখনো আসে নি।

শ্রেষ্ঠ সমালোচকদের কাছে আমাদের আরো একটি প্রত্যাশা আছে। তা হ'লো সমকালের প্রতি সুবিচার এবং ভাবীকালের প্রতি সুবিচার। সমকালের নতুন প্রতিভার আবিষ্কার, নতুন সৃষ্টির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বিচার, নতুন স্রষ্টার উৎসাহ-বর্ধন ও প্রতিষ্ঠাবিধান, নতুন সাহিত্যধারার মূল্যবিচার। শুধু সমকাল নয়, ভাবীকালেরও। কারণ সমকালের মধ্যে ভাবীকালের বীজ নিহিত থাকে। ভাবীপ্রতিভার আবিষ্কারকেই, তার স্বরূপ অনুধাবন করতে পারাকেই সাহিত্যিক দূরদৃষ্টি বলে। এই যে সমকাল ও ভাবী-কালের সম্পর্কে প্রখর সচেতনতা, সমালোচকদের পক্ষে এই হ'লো যাকে বলে অগ্নিপরীক্ষা।

বঙ্কিমচন্দ্র এই অগ্নিপরীক্ষায় মোটামুটি সম্মানের সঙ্গেই উত্তীর্ণ হয়েছেন। মধুসূদন, হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্র, এঁদের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিরূপণে প্রথম দিকে কিছু বিভ্রান্তি ঘটেছিল সন্দেহ নেই। মধুসূদনের প্রতিভার গুরুত্ব তিনি অন্তত প্রথম দিকে ঠিকভাবে বুঝতে পারেন নি, অপর পক্ষে হেমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও কিছু মূল্যস্ফীতি ঘটেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এর অনেকটাই বঙ্কিমচন্দ্র কাটিয়ে উঠেছিলেন। সেটা বিশেষভাবে বুঝতে পারি রবীন্দ্রপ্রতিভার সমাদর দেখে।

বস্তুত এইখানেই সমালোচক-বঙ্কিমচন্দ্রের আসল পরীক্ষা। আমরা জানি, 'সন্ধ্যাসংগীতে'র কাব্যভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচিত কাব্যভাষা নয়। আমরা জানি 'সন্ধ্যাসংগীতে'র মুগ্ধ ললিত মধুর বিষাদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো পরিচয় থাকবার কথা নয়। আমরা জানি, 'সে প্রত্যূষে অধিক লোক জাগে নাই', 'সন্ধ্যাসংগীতে'র সুর তান লয় সবই তখন বাঙালি পাঠকের কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত। সেই উষালোকে, 'সন্ধ্যাসংগীত' প্রকাশিত (আষাঢ় ১২৮৯, জুলাই ১৮৮২) হওয়ার অল্প কয়েকদিন পরেই—সেই জুলাই

মাসেই, রমেশচন্দ্রের কন্যার বিবাহসভায় ভাবীকালের প্রতিভার কণ্ঠে জয়মাল্য অর্পণ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র একই সঙ্গে উদার সাহিত্যপ্রীতির এবং অসামান্য সাহিত্যিক দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের এবং দীনবন্ধুর প্রতিভা নির্ণয়ে বঙ্কিমচন্দ্র সমকালের প্রতি দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু একুশ বছর বয়সের বিষাদের স্বপ্ন নিয়ে যে-কবিকিশোর সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল, সে এক অনাগত কালের প্রতিনিধি। তাকে স্বীকৃতি দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শ্রেষ্ঠ সমালোচকের সব থেকে দুরূহ দায়িত্ব পালন ক'রে আগামী যুগের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ? সমকালের প্রতি, ভাবীকালের প্রতি দায়িত্বপালনে রবীন্দ্রনাথ কতোখানি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন? এ-প্রশ্নে নিরুত্তর থাকা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই। হয়তো তার একাধিক কারণও ছিল। হয়তো সমকালেই রবীন্দ্রনাথ—শিল্পী-রবীন্দ্রনাথ—কিছু পরিমাণে দূরস্থিত, কিছু-পরিমাণে নিঃসঙ্গ ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র যে-পরিমাণে সংযুক্ত, সে-সংযোগ রবীন্দ্রনাথের—শিল্পী-রবীন্দ্রনাথের অনায়ত্ত ছিল। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্রের থেকে রবীন্দ্রনাথের যে দূরত্ব, রবীন্দ্রনাথ থেকে জীবনানন্দের দূরত্ব তার থেকে ঢের বেশি। এ সবই হয়তো সত্য, কিন্তু সমগ্র সত্য নয়। এর মধ্যে সব থেকে বড়ো ব্যাপারটাকেই হিসেবে ধরা হয় নি। সে হ'লো এই যে, রবীন্দ্রনাথ কবি-সমালোচক।

অন্য সমালোচকদের পক্ষে যা অগ্নিপরীক্ষা, সে পরীক্ষা কবি-সমালোচকদের জন্য নয়। সমকাল ভাবীকাল কিছুই তাঁদের কাছে চূড়ান্ত নয়, চূড়ান্ত হ'লো কেবল নিজের সৃজন-শক্তির দাবি, নিজের শিল্পদৃষ্টির দায়।

এ নিয়ে পাঠকের অভিযোগ করা বৃথা। পাঠকের অনুযোগ-অভিযোগ, পাঠকের চাওয়া এবং পাওয়া, কবি-সমালোচকেরা এ-সবের কিছুরই ধার ধারেন না। তাঁরা পাঠকের প্রত্যাশার নিয়মে চলেন না, নিজেদের স্বভাবের নিয়মে চলেন। এইখানেই তাঁদের সীমাবদ্ধতা, এইখানেই তাঁদের গৌরব।

পরিশিষ্ট—ক

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যচিন্তামূলক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধসমূহের কালক্রম।

যে-সব রচনা পরোক্ষভাবেও সাহিত্যতত্ত্ব সংক্রান্ত নয়, অথবা পরোক্ষ-ভাবেও সাহিত্যসমালোচনা নয়, তা এখানে গৃহীত হয় নি। প্রধানত এই কারণেই 'সঙ্গীত', 'দ্রৌপদী—দ্বিতীয় প্রস্তাব', '৺ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনী' অথবা 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা''. জাতীয় রচনা এখানে বর্জিত হয়েছে। ইংরেজিতে রচিত সমালোচনা অথবা ইংরেজি গ্রন্থের সমালোচনাও এখানে ধরা হয়নি। যে-তিনটি প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশের সময় এক-নামে এবং গ্রন্থে ভিন্ন-নামে প্রকাশিত হয়েছে, তাদের পরবর্তী নামই সুপরিচিত। এই বিবেচনায় তাদের পরবর্তী নামই এই তালিকায় গৃহীত হ'লো, যদিও প্রকাশ-কালের ক্ষেত্রে পত্রিকায় প্রথম প্রকাশের কালই দেওয়া হয়েছে। পূর্বের নাম এখানে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হ'লো।

১.	বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা …	বঙ্গদর্শন	১২৭৯	বৈশাখ,	১৮৭২	বিবিধ প্রবন্ধ
২.	উত্তরচরিত …	”	”	জ্যৈষ্ঠ-আশ্বিন	”	”
৩.	নূতন গ্রন্থের সমালোচনা	”	”	কার্তিক	”	বিবিধ
৪.	কিঞ্চিৎ জলযোগ …	”	”	চৈত্র,	১৮৭৩	”
৫.	গীতিকাব্য (অবকাশরঞ্জিনী)	”	১২৮০	বৈশাখ,	”	বিবিধ প্রবন্ধ
৬.	প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত (দানবদলন কাব্য)	”	”	জ্যৈষ্ঠ	”	”
৭.	বিদ্যাপতি ও জয়দেব (মানস বিকাশ)	”	”	পৌষ		”
৮.	আর্যজাতির সূক্ষ্মশিল্প …	”	১২৮১	ভাদ্র,	১৮৭৪	”
৯.	মৃত মাইকেল মধুসূদন দত্ত	”	”	”	”	বিবিধ
১০.	কল্পতরু …	”	”	পৌষ		”
১১.	বৃত্রসংহার …	”	”	মাঘ,	১৮৭৫	”

১২. শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা ...	„	১২৮২	বৈশাখ	„	বিবিধ প্রবন্ধ
১৩. ঋতুবর্ণনা ...	„	„	„	„	বিবিধ
১৪. দ্রৌপদী-প্রথম প্রস্তাব	„	„	ভাদ্র	„	বিবিধ প্রবন্ধ
১৫. পলাশীর যুদ্ধ ...	„	„	কার্তিক	„	বিবিধ
১৬. রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা [জীবনী]		১২৮৩			
১৭. বাঙ্গালা ভাষা ...	বঙ্গদর্শন	১২৮৫	জ্যৈষ্ঠ,	১৮৭৮	বিবিধ প্রব
১৮. বাঙ্গালার নব্য-লেখকদিগের প্রতি নিবেদন ...	প্রচার	১২৯১	মাঘ,	১৮৮৫	
১৯. ধর্ম এবং সাহিত্য ..	„	১২৯২	পৌষ		
২০. ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব ...					বিবিধ
২১. দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব ['রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও গ্রন্থাবলীর সমালোচনা']—প্রবন্ধের 'কবিত্ব'-শীর্ষক সংযোজন		১২৯৩		১৮৮৬	„
২২. বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান		১২৯৯		১৮৯২	„

পরিশিষ্ট—খ

রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যচিন্তামূলক প্রধান রচনাসমূহের কালক্রম।

সাহিত্যতত্ত্ববিষয়ক অথবা সমালোচনাজাতীয় বিচ্ছিন্ন মন্তব্য কিংবা সংক্ষিপ্ত প্রাসঙ্গিক উক্তি রবীন্দ্রসাহিত্যে সুপ্রচুর। সেই সব বিচ্ছিন্ন ও সংক্ষিপ্ত উক্তি বর্তমান তালিকার লক্ষ্য নয়। সাহিত্যতত্ত্ব ও সাহিত্যসমালোচনার পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধই এই তালিকার উদ্দিষ্ট বিষয়। যে-সব রচনা প্রত্যক্ষভাবে সাহিত্যতত্ত্ব বা সাহিত্যসমালোচনা নয়, যে-সব রচনার সাহিত্যতত্ত্ব বা সাহিত্যসমালোচনা রবীন্দ্রনাথের মুখ্য লক্ষ্য নয়, অথবা যে-সব বিক্ষিপ্ত আলোচনা সমালোচনার ক্ষেত্রে মূল্যের দিক থেকে অপ্রধান বলে' গণ্য হতে পারে, তা এই তালিকায় গৃহীত হয় নি। যা এখন পর্যন্ত অপ্রকাশিত এমন কোনো রচনা, যথা অমুদ্রিত চিঠিপত্র, এ-তালিকায় ধরা হয় নি। পত্রিকায় প্রকাশিত কিন্তু সাহিত্যতত্ত্ব বা সমালোচনার গ্রন্থে বর্জিত অনেক চিঠিপত্র—যেমন বুদ্ধদেব বসুর 'বাসর ঘর' সম্পর্কিত আলোচনা-পত্র (বিচিত্রা, ১৩৪২ অগ্রহায়ণ) অথবা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'স্বগত' বিষয়ে আলোচনা-পত্র (প্রবাসী, ১৩৩৬ জ্যৈষ্ঠ) এখানে গৃহীত হয় নি। বাণীবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছদ্মনামে রবীন্দ্রনাথ টমসনের রবীন্দ্রজীবনের যে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন (প্রবাসী, ১৩৩৪ শ্রাবণ), নানা কারণে তা-ও এখানে গৃহীত হ'লো না। বস্তুত, গ্রন্থে অপ্রকাশিত রচনার যৎসামান্যই এখানে গৃহীত হয়েছে। অস্বাক্ষরিত এবং সেই কারণে ঈষৎ সন্দেহ-ভাজন—কিন্তু বক্তব্যে, বাচনে এবং স্থানকালের বিচারে মোটামুটি সন্দেহমুক্ত—একটি রচনা—'বাঙালি কবি নয় কেন'—এই তালিকায় গৃহীত হ'লো।

গ্রন্থ-সংকেত :

সমা=সমালোচনা (১৮৮৮), সা=সাহিত্য (১৯০১), আধু. সা=আধুনিক সাহিত্য (১৯০৭), লোক. সা=লোকসাহিত্য (১৯০৭), প্রাচী. সা=প্রাচীন সাহিত্য (১৯০৭), সা. পথে=সাহিত্যের পথে (১৯৩৬), সা. স্বরূপ=সাহিত্যের স্বরূপ (১৯৪১)।

উপরের বইগুলি ছাড়াও, বিবিধ প্রসঙ্গ (১৮৮৩), পঞ্চভূত (১৮৯৭), বিচিত্র প্রবন্ধ (১৯০৬), ছিন্নপত্র (১৯১২), ছন্দ (১৯৩৬), বাংলাভাষা পরিচয় (১৯৩৮) —গৌণ আকর হিসেবে এই বইগুলির নাম এখানে উল্লেখ করা যায়। অনুরূপ বিবেচনায়, সাহিত্যতত্ত্বের প্রসঙ্গে Sadhana (১৯১৩). Personality (১৯১৭), Creative Unity (১৯২২), The Religion of Man (১৯৩১), The Religion of an Artist (১৯৩৬।৫৩), Man (১৯৩৭)—এই ইংরেজি বইগুলির নামও এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১.	ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী	জ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব	১২৮৩ কার্তিক, ১৮৭৬	
২.	মেঘনাদবধকাব্য (১)	ভারতী,	১২৮৪ শ্রাবণ-কার্তিক, পৌষ, ফাল্গুন, ১৮৭৭-৭৮	
৩.	নীরব কবি ও অশিক্ষিত কবি (বাঙালি কবি নয়)	ভারতী	১২৮৭ ভাদ্র, ১৮৮০	সমা
৪.	বাঙালি কবি নয় কেন [অস্বাক্ষরিত]	”	১২৮৭ আশ্বিন, ১৮৮০	
৫.	বস্তুগত ও ভাবগত কবিতা	”	১২৮৮ বৈশাখ, ১৮৮১	সমা
৬.	কাব্যের অবস্থা-পরিবর্তন	”	” শ্রাবণ ”	”
৭.	ডি প্রোফণ্ডিস	”	” আশ্বিন ”	” [সংক্ষিপ্ত আকারে আধু. সা গ্রন্থে]
৮.	সংগীত ও কবিতা	”	” মাঘ, ১৮৮২	সমা
৯.	চণ্ডিদাস ও বিদ্যাপতি	”	” ফাল্গুন ”	”
১০.	বসন্ত রায়	”	১২৮৯ শ্রাবণ	”
১১.	মেঘনাদবধ কাব্য (২)	”	” ভাদ্র ”	”
১২.	বাউলের গান	”	১২৯০ বৈশাখ, ১৮৮৩	”

১৩. কাব্য : স্পষ্ট ও অস্পষ্ট	ভারতী ও বালক	১২৯৩ চৈত্র,	১৮৮৭	সা
১৪. সাহিত্যের উদ্দেশ্য	,,	১২৯৪ বৈশাখ,	,,	,,
১৫. সাহিত্য ও সভ্যতা	,,	,, ,,	,,	,,
১৬. আলস্য ও সাহিত্য	,,	,, শ্রাবণ	,,	,,
১৭. মেঘদূত	সাহিত্য	১২৯৮ অগ্রহায়ণ,	১৮৯১	প্রাচী. সা
১৮. আলোচনা [পত্র-১ লোকেন পালিতকে]	সাধনা	,, ফাল্গুন,	১৮৯২	,,
১৯. কাব্য	,,	,, চৈত্র	,,	,,
২০. বিদ্যাপতির রাধিকা	,,	,, ,,	,,	আধু. সা
২১. বাংলাসাহিত্যের প্রতি অবজ্ঞা	সাধনা	১২৯৯ বৈশাখ,	,,	সা
২২. সাহিত্য [পত্র-২, লোকেন পালিতকে]	,,	,, ,,	,,	,,
২৩. সাহিত্যের প্রাণ [পত্র-৩, লোকেন পালিতকে]	,,	,, আষাঢ়	,,	,,
২৪. মানবপ্রকাশ [পত্র-৪, লোকেন পালিতকে]	,,	,, ভাদ্র-আশ্বিন	,,	,,
২৫. বাংলা লেখক	,,	,, মাঘ,	১৮৯৩	,,
২৬. কঙ্কাবতী	,,	,, ফাল্গুন	,,	
২৭. রাজসিংহ	,,	১৩০০ চৈত্র,	১৮৯৪	আধু. সা
২৮. বঙ্কিমচন্দ্র	,,	১৩০১ বৈশাখ	,,	,,
২৯. বিহারীলাল	,,	,, আষাঢ়	,,	,,
৩০. সাহিত্যের গৌরব	,,	,, শ্রাবণ	,,	সা
৩১. ফুলজানি	,,	,, অগ্রহায়ণ	,,	আধু. সা
৩২. আর্যগাথা	,,	,, ,,	,,	,,

৩৩.	সঞ্জীবচন্দ্র	সাধনা	১৩০১	পৌষ		আধু. সা.
৩৪.	ছেলেভুলানো ছড়া					লোক. সা
	(ক) মেয়েলি ছড়া	,,	,,	ভাদ্র-আশ্বিন,	১৮৯৪	
	(খ) ছেলেভুলানো ছড়া					,,
	বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা		,,	মাঘ,	১৮৯৫	আধু. সা
৩৫.	কৃষ্ণচরিত্র	সাধনা	,,	মাঘ-ফাল্গুন	১৮৯৫	
৩৬.	যুগান্তর	,,	,,	চৈত্র	,,	
৩৭.	বাংলা জাতীয় সাহিত্য	,,	১৩০২	বৈশাখ	,,	সা
৩৮.	কবি সংগীত		,,			লোক. সা
৩৯.	ঐতিহাসিক উপন্যাস	ভারতী	১৩০৫	আশ্বিন,	১৮৯৮	সা
৪০.	আষাঢ়ে	,,	,,	অগ্রহায়ণ	,,	আধু. সা
৪১.	গ্রাম্য সাহিত্য		,,			লোক. সা
৪২.	কাদম্বরী চিত্র	প্রদীপ	১৩০৬	মাঘ,	১৯০০	প্রাচী. সা
৪৩.	কাব্যের উপেক্ষিতা	ভারতী	১৩০৭	জ্যৈষ্ঠ	,,	,,
৪৪.	জুবেয়ার	বঙ্গদর্শন	১৩০৮	বৈশাখ	১৯০১	আধু. সা
৪৫.	কবিজীবনী	,,	,,	আষাঢ়	,,	,,
৪৬.	কুমারসম্ভব ও শকুন্তলা	,,	,,	পৌষ		প্রাচী. স
৪৭.	বঙ্গভাষা ও সাহিত্য	,,	১৩০৯	শ্রাবণ,	১৯০২	সা
৪৮.	শকুন্তলা	,,	,,	আশ্বিন	,,	প্রাচী. সা
৪৯.	মন্ত্র	,,	,,	কার্তিক	,,	আধু. সা
৫০.	সাহিত্যের বিচারক (সাহিত্য-সমালোচনা)	,,	১৩১০	আশ্বিন,	১৯০৩	সা

৫১. সাহিত্যের সামগ্রী	বঙ্গদর্শন	১৩১০	কার্তিক	১৯০৩	সা
৫২. সাহিত্যের তাৎপর্য	,,	,,	অগ্রহায়ণ	,,	,,
৫৩. রামায়ণ		,,	পৌষ		প্রাচী. সা
৫৪. ধম্মপদং		১৩১২	জ্যৈষ্ঠ	১৯০৫	,,
৫৫. শুভবিবাহ	বঙ্গদর্শন	১৩১৩	আষাঢ়	১৯০৬	আধু. সা
৫৬. সৌন্দর্যবোধ	,,	,,	পৌষ		সা
৫৭. বিশ্বসাহিত্য	,,	,,	মাঘ,	১৯০৭	,,
৫৮. সাহিত্য-সম্মিলন	,,	,,	ফাল্গুন	,,	,,
৫৯. সাহিত্যপরিষৎ	,,	,,	চৈত্র	,,	,,
৬০. সৌন্দর্য ও সাহিত্য	,,	১৩১৪	বৈশাখ	,,	,,
৬১. সাহিত্যসৃষ্টি	,,	,,	আষাঢ়	,,	,,
৬২. বাস্তব	সবুজপত্র	১৩২১	শ্রাবণ,	১৯১৪	সা. পথে
৬৩. কবির কৈফিয়ত	,,	১৩২২	জ্যৈষ্ঠ,	১৯১৫	,,
৬৪. সভাপতির অভিভাষণ	শান্তিনিকেতন	১৩৩০	,,	১৯২৩	,,
৬৫. সভাপতির শেষ বক্তব্য	,,	,,	,,	,,	,,
৬৬. সাহিত্য	বঙ্গবাণী	১৩৩১	বৈশাখ,	১৯২৪	,,
৬৭. তথ্য ও সত্য	,,	,,	ভাদ্র	,,	,,
৬৮. সৃষ্টি	,,	,,	কার্তিক	,,	,,
৬৯. একখানি চিঠি	প্রবাসী	১৩৩২	আষাঢ়	১৯২৫	,,
৭০. সাহিত্য-সম্মিলন	,,	১৩৩৩	বৈশাখ,	১৯২৬	,,

৭১.	সাহিত্যধর্ম[1]	বিচিত্রা	১৩৩৪ শ্রাবণ,	১৯২৭	সা. পথে
৭২.	সাহিত্যে নবত্ব (যাত্রীর ডায়ারী)[2]	প্রবাসী	,, অগ্রহায়ণ	,,	,,
৭৩.	কবির অভিভাষণ	,,	,, ফাল্গুন,	১৯২৮	,,
৭৪.	সাহিত্যরূপ[3]	,,	১৩৩৫ বৈশাখ	,,	,,
৭৫.	সাহিত্য সমালোচনা[4]	,,	,, জ্যৈষ্ঠ	,,	,,
৭৬.	সাহিত্যবিচার	,,	১৩৩৬ কার্তিক	১৯২৯	,,
৭৭.	পঞ্চাশোর্ধম্	বিচিত্রা	,, ফাল্গুন,	১৯৩০	,,
৭৮.	রূপকার	প্রবাসী	১৩৩৮ জ্যৈষ্ঠ,	১৯৩১	,,
৭৯.	আধুনিক কাব্য	পরিচয়	১৩৩৯ বৈশাখ,	১৯৩২	,,
৮০.	কাব্যে গদ্য-রীতি (পত্র,—'পুনশ্চ')	,,	১৩৪০ বৈশাখ,	১৯৩৩	সা. স্বরূপ

১. এই প্রবন্ধে তৎকালীন আধুনিক সাহিত্যের আধুনিকতা সম্পর্কে প্রতিকূল সমালোচনা থাকায় প্রবন্ধটি সেদিনের আধুনিক ও অনাধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে কিছু বাদ-প্রতিবাদের সৃষ্টি করে।

২. প্রবন্ধটিকে 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধের পরিপূরক বলে গণ্য করা যায়।

৩-৪. 'সাহিত্যধর্ম' ও 'সাহিত্যে নবত্ব' প্রকাশের ফলে সেদিনের নতুনপন্থী ও পুরাতন-পন্থী সাহিত্যিকদের মধ্যে যে তর্ক-বিতর্কের সৃষ্টি হয় তার নিরসনকল্পে বিশ্বভারতী সম্মেলনের উদ্যোগে এবং রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রাভবনে একটি আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। সাহিত্যরূপ ও সাহিত্যসমালোচনা—এই প্রবন্ধদুটি সেই সভায় যথাক্রমে ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র ১৩৩৪ (মার্চ, ১৯২৮) সভাপতির ভাষণরূপে পঠিত হয়। সাহিত্যধর্ম, সাহিত্যে নবত্ব, সাহিত্যরূপ ও সাহিত্যসমালোচনা, এই চারটি প্রবন্ধ সাহিত্যে আধুনিকতা ও নিত্যতার প্রসঙ্গসূত্রে পরস্পরের সঙ্গে গ্রথিত। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যের স্বরূপ বইয়ের 'সাহিত্যে আধুনিকতা' প্রবন্ধটিও (১৯২৫) স্মরণীয়।

৮১. সাহিত্যের মাত্রা (পত্র)	পরিচয়	১৩৪০	বৈশাখ	১৯৩৩	সা. স্বরূপ
৮২. সাহিত্যতত্ত্ব	প্রবাসী	১৩৪১	,,	১৯৩৪	সা. পথে
৮৩. সাহিত্যের তাৎপর্য	,,	,,	ভাদ্র	,,	,,
৮৪. বাংলাসাহি-ত্যের ক্রমবিকাশ	বিচিত্রা	,,	মাঘ	১৯৩৫	,,
৮৫. সাহিত্যে আধুনিকতা (পত্র, —'ছিন্নপত্র')	পরিচয়	,,	,,	,,	সা. স্বরূপ
৮৬. 'সাহিত্যের পথে'-গ্রন্থের ভূমিকা বা সূচনা (পত্র— অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীকে)	শান্তিনিকেতন	১৩৪৩	আশ্বিন,	১৯৩৬	সা. পথে
৮৭. কাব্য ও ছন্দ ('গদ্যকাব্য')	কবিতা	,,	পৌষ		সা. স্বরূপ
৮৮. সাহিত্যের স্বরূপ	,,	১৩৪৫	বৈশাখ,	১৯৩৮	
৮৯. রূপশিল্প	প্রবাসী	১৩৪৬	আষাঢ়,	১৯৩৯	সা. পথে
৯০. গদ্যকাব্য (অভিভাষণের অনুলিপি)	,,	,,	মাঘ,	১৯৪০	সা. স্বরূপ
৯১. সাহিত্যের মূল্য	প্রবাসী	১৩৪৮	জ্যৈষ্ঠ,	১৯৪১	
	(কবিতা	,,	আষাঢ়	,,)	

৯২. সাহিত্যের চিত্রবিভাগ	প্রবাসী	১৩৪৮	জ্যৈষ্ঠ	১৯৪১	সা. স্বরূপ
৯৩. সত্য ও বাস্তব ('সাহিত্য, শিল্প')	,,	,,	আষাঢ়	,,	,,
৯৪. সাহিত্য-বিচার (২)	কবিতা	,,	,,	,,	,,
৯৫. সাহিত্যে ঐতিহাসিকতা (পত্র)	কবিতা	,,	আশ্বিন	,,	,,

নির্দেশিকা